যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে

উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গ্রন্থনির্মাণ, গ্রন্থপ্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথ

গবেষক

জয়দীপ ঘোষ

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার

বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৩২

২০১৭

Certified that the thesis entitled

‘গ্রন্থনির্মাণ, গ্রন্থপ্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথ’ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Professor Sekhar Samaddar, Department of Bengali, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or deploma anywhere/elsewhere.

Countersign by the Supervisor | Candidate

Date | Date

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের বইগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস, গড়ে ওঠার পথে নানা প্রতিকূলতা ও সেগুলিকে অতিক্রম করে যাবার রোমাঞ্চকর যাত্রা, গ্রন্থনির্মাণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক ধারণা, স্বপ্ন, এমনকী স্ববিরোধ : এই হল আমাদের বর্তমান গবেষণার বিষয়।

এই গবেষণায় আমরা বইয়ের 'গড়ে ওঠা' বা 'গ্রন্থনির্মাণ' শব্দগুলিকে কিছু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করেছি। রবীন্দ্রনাথের কোনো-একটি রচনার *লিখন*-প্রক্রিয়া কিংবা লিখে-ওঠার-পর তার সংযোজন-পরিমার্জনের যে বিস্তৃত পর্ব, তা আমাদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়। সেই লেখা অতঃপর (সাধারণভাবে) পত্রিকায় ছাপানোর যে প্রক্রিয়া, তাকেও আমরা 'গ্রন্থনির্মাণ'-এর চৌহদ্দির বাইরে রেখেছি। ফলে স্বভাবতই, *রচনার* শিল্পরূপ নিয়ে আমরা যেমন কথা বলি নি, তেমনই পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তরের পর্যালোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে নি। আমাদের আলোচনা শুরু হচ্ছে তখন থেকে যখন *গ্রন্থিত* হয়ে বেরোবার জন্যে কোনো-একটি লেখার 'প্রেস-কপি' তৈরি হচ্ছে। তারপর, বইটির 'হয়ে-ওঠা'র পথে লে-আউট, অলংকরণ, প্রচ্ছদভাবনা, প্রুফদেখা-সহ নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা। সবশেষে, বইটি প্রকাশিত হয়ে যাবার পর তার বিপনন ও প্রচারের ব্যাপারে উদ্‌যোগ। এই তিনটি স্তরে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ও ভাবনাকে খুঁজে দেখাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গে আর-একটি জরুরি বিষয়ের স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। আমাদের গবেষণার 'বই' বা 'গ্রন্থ' কথাদুটিকে সবসময়ই একটি 'বস্তুরূপ'কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে, অক্ষর-কালি-কাগজ দিয়ে পরিকল্পিত একটি বস্তুরূপ, তার 'বিষয়'টি নয়। অর্থাৎ, ধরা যাক, আমরা যখন *গীতাঞ্জলি* বইটির কথা বলেছি, তখন তার অসামান্য কবিতাগুলিকে দু-মলাটের মধ্যে ধারণ করে আছে যে গ্রন্থ-বস্তুটি, তারই কথা আমাদের বিবেচনায় এনেছি, কবিতাগুলি আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। ফলে *রচনার* শিল্পরূপ নয়, আমাদের কথা কেবল *বস্তুর* শিল্পরূপ নিয়ে।

আর-একটি কথা। 'রবীন্দ্রনাথের বই' বলতে আমরা সাধারণভাবে তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত বাংলা (*ছড়া* আর *শেষ লেখা* বইদুটিকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরতে হবে) এবং তাঁরই অনূদিত ইংরেজি বইগুলির কথা বুঝি। কিন্তু আমাদের এই গবেষণায় তাঁর তাঁর অনূদিত ইংরেজি বইগুলিকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। বিদেশী প্রকাশকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও চুক্তি সবটা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হয় নি, বিদেশেরই বিভিন্ন

সংগ্রহশালা ও প্রকাশকদের দপ্তরে তা রক্ষিত আছে নিশ্চয়ই। সেসব কিছুকে একত্রিত করবার জন্যে অর্থ ও পরিকল্পনার বিস্তৃততর আয়োজনের দরকার পড়বে। তাই কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখা বাংলা বইগুলিকে সামনে রেখেই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছি আমরা।

আমাদের গবেষণা মোট ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ('রবীন্দ্রনাথ ও ছাপা অক্ষরের মোকাবিলা') সামগ্রিক আলোচনার একটি রূপরেখা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার সঙ্গে রচনার *মুদ্রিত রূপ* নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক ধারণাকে আমরা বিচার করে দেখতে চেয়েছি এই অধ্যায়ে।

১৮৭৮ থেকে ১৯৪১, এই ৬৪ বছর রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশের কাল। এই কালপর্বকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করে পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ১৮৭৮ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজের উদ্‌যোগে ও খরচায় নিজের বই প্রকাশ করছেন। আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়টি এই কালপর্বের আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে 'মজুমদার লাইব্রেরি-পর্ব'। ১৯০১-এর মাঝামাঝি থেকে 'মজুমদার লাইব্রেরি'-র তত্ত্বাবধানে বেরোচ্ছে তাঁর অধিকাংশ বই। এই কালপর্বটি ছোট, কিন্তু নিজের প্রথম 'স্থায়ী' প্রকাশকের প্রতি কবির আস্থা ও আস্থাহীনতার নানা রোমাঞ্চকর ওঠা-পড়ার কাহিনিতে পরিপূর্ণ। ১৯০৮-এ রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের দায়ত্ব লাভ করছে এলাহাবাদের বিখ্যাত 'ইন্ডিয়ান প্রেস' প্রকাশনী, বাংলায় যাঁদের শাখা-প্রকাশনীটির নাম 'ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস'। ১৯০৮ থেকে 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' প্রতিষ্ঠার (১৯২২) আগে পর্যন্ত টানা প্রায় ১৪-১৫ বছর এঁরা রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের গৌরব অর্জন করেছেন। আমাদের গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে এই সময়কালে গ্রন্থনির্মাণে কবির ভূমিকা ও অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়টি 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়-পর্ব'। স্বাভাবিকভাবেই এটিই আমাদের আলোচনার দীর্ঘতম অধ্যায়। প্রাপ্ত তথ্যের প্রাচুর্য তার একটি কারণ। এছাড়াও, আমরা সচেতনভাবেই এই পর্বটি নিয়ে অনেকটা বিস্তারে কথা বলতে চেয়েছিলাম। মনে রাখা দরকার, প্রশান্তকুমার পালের মহাগ্রন্থ *রবিজীবনী* বইটি ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। ফলে সামগ্রিকভাবেই কবিজীবনের শেষ ১৬ বছর নিয়ে আরও বিস্তারিত চর্চার অবকাশ রয়েছে। আমরাও বিশেষত এই 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' পর্বটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ব্যবহার করতে পেরেছি প্রচুর অপ্রকাশিত ও অব্যবহৃত তথ্য। আমাদের গবেষণার শেষ অধ্যায়টিতে আছে বইয়ের প্রচ্ছদ ও

অলংকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বিষয়ে কথাবার্তা। এইখানে জানিয়ে রাখা যাক, ছবির নন্দন আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, সে যোগ্যতাও বর্তমান গবেষকের নেই। আমরা কেবল অলংকরণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বিবর্তনটুকু লক্ষ করতে চেয়েছি এই অধ্যায়ে।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের মূলত প্রথম সংস্করণগুলি নিয়ে আমাদের কাজ। ফলে আমাদের গবেষণায় সর্বত্র প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত গ্রন্থনামটিই ব্যবহার করা হয়েছে। সেই কারণেই *বনফুল* আমাদের লেখায় সর্বত্র *বন-ফুল*, *জীবনস্মৃতি* সবসময় *জীবন-স্মৃতি*, *গোড়ায় গলদ* নাটকটি হসন্ত-যুক্ত *গোড়ায় গলদ্*। সমগ্র গবেষণায় অনুসরণ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সবসময় মূলের বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। উদ্ধৃতির সম্ভাব্য ভ্রান্তি বা স্খলনের দিকে [য] চিহ্নযোগে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রে দিতেন ‘বাংলা’ তারিখ। তাঁর বইয়ের প্রকাশকাল হিসেবেও (আখ্যাপত্র ও অন্যত্র) ‘বাংলা’ তারিখ পাওয়া যায়। ফলে বেশিরভাগ সাল-তারিখ বঙ্গাব্দ ও খ্রিষ্টাব্দ এই দুই রীতিতেই জানাতে বাধ্য হয়েছি আমরা। সাধারণভাবে গুলিয়ে যাওয়ার কথা নয়, তবু স্পষ্টতা বজায় রাখার জন্যে ‘বাংলা’ তারিখ বোঝাতে সবসময়ই ‘বঙ্গাব্দ’ বা শুধু ‘ব’ অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি ও সূত্রপঞ্জি নির্মাণে মোটামুটিভাবে *MLA Handbook for Writers of Research Papers* বইটির সপ্তম সংস্করণটিকে মান্য করা হয়েছে। তবে এই ধরণের ইউরোপীয়-রীতি বাংলা বা যেকোনো ভারতীয় ভাষার গবেষণায় হুবহু মান্য করার নানা প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক অসুবিধা আছে। সেই কারণে মনে হয়, আমাদের নিজস্ব রীতি নির্মাণ করার আশু প্রয়োজন। যেমন, ভারতীয়-ভাষায়-লেখা ভারতীয় ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে পদবী আগে দেওয়ার রীতিটি মান্য করায় আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। পাশ্চাত্য প্রথায় পদবী-ধরেই মানুষকে চিনি আমরা, মারাদোনা-মেসি-ফেডেরার-ওবামা কিংবা শেক্সপিয়র-দস্তয়েভ্‌স্কি-সার্ত্র্‌-কাফকা সবই তাঁদের ‘পদবী’, এই মানুষদের ‘নাম’ ধরে ডাকলে চেনাই দুষ্কর হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশে নামেই পরিচয়, আমরা নাম রাখি বহু বিবেচনার পরে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো কত বাঙালির নামকরণ করে গেলেন! এক্ষেত্রে তাই পাশ্চাত্য প্রথাটির হুবহু অনুকরণ করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাই নি আমরা।

এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার। তাঁর উপদেশ-নির্দেশ ছিল আমার সবসময়ের প্রেরণা। নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আমাকে আমার-মতো-করে করে কাজ করার স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন। কাজ করতে গিয়ে তাই ভেবেছি, আমার গবেষণা যেন তাঁর মর্যাদার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। জানি না কতটুকু করতে পারলাম। স্যারকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সমস্ত শ্রদ্ধেয় সহকর্মী অধ্যাপক আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন কাজ কতদূর এগোলো। 'সবারে আমি প্রণাম করে যাই'। বিশেষত আব্দুল কাফি, বরেন্দু মণ্ডল আর রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা সর্বক্ষণ পাশে ছিলেন ভরসা হয়ে, যে-কোনো প্রয়োজনে তাঁরাই জীবনের নির্ভর। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতার নয়। আর অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়ার মতো শুভানুধ্যায়ী মানুষকে যে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছি, সে খানিক পুণ্যফল বলে বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণের খোঁজে, রবীন্দ্রনাথের আমলের পত্রপত্রিকার সন্ধানে যাতায়াত করতে হয়েছে নানা গ্রন্থাগারে। কিন্তু তারও আগে একজন মানুষের সাহচর্য পাওয়া গেছে যাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহটিই একটি বহুমূল্য রত্নখনি। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার এমন আশ্চর্য সংগ্রাহক কালেভদ্রে দেখা মেলে। তিনি চন্দননগর-নিবাসী শ্রীদেবাশিস গুপ্ত। তাঁর বাড়িতে একাধিক দিন তাঁরই সাদর আতিথ্যে সেইসব বই ও পত্রিকা তো নেড়েচেড়ে দেখেইছি, অনেকসময় তিনি নিজে থেকেই প্রয়োজনীয়-বোধে কোনো বিশেষ পৃষ্ঠার ছবি তুলে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন! তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাঁর কন্যা যশোধরা গুপ্তকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পাঁচ বছর পড়িয়েছি। বলা বাহুল্য, যশোধরার মাধ্যমেই তার বাবার সঙ্গে আলাপ হতে পেরেছে। তার বাবার সংগ্রহ থেকে বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা ফোটোকপি করে ও আমাকে দিয়েছে। কল্যাণীয়া যশোধরার জন্যে রইল অনেক শুভেচ্ছা।

আমার কাজের জন্যে বারবার যেতে হয়েছে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে। বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের তিন বিশিষ্ট অধ্যাপক অভ্র বসু, শ্রীলা বসু আর বিশ্বজিৎ রায়ের সাহায্য, সাহচর্য, উৎসাহ রবীন্দ্রভবনের দিনগুলিকে সহজ ও সুন্দর করে তুলেছিল, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করি।

মুদ্রণবিষয়ে, বিশেষভাবে অধুনালুপ্ত 'লেটার-প্রেস' বিষয়ে আমার বাবা শ্রীগোবিন্দ ঘোষের বিশেষ জানাশোনা আছে। জীবনের একটা পর্যায়ে সরকারি চাকরি করার পাশাপাশি তিনি একটি 'লেটার প্রেস'-এর তত্ত্বাবধায়কও

ছিলেন। তাঁর সেই জ্ঞান আমার কাজে প্রভূত সহায়তা করেছে। তাঁর আশীর্বাদ জীবনের সর্বস্তরেই আমার পাথেয়। আমার স্ত্রী বর্ণালি তাঁর লেখাপড়া আর গানের জগৎ সামলে আমার ভাগের সামাজিক-সাংসারিক প্রায় সমস্ত কাজও সামলে দেন। বর্ণালি আর আমাদের পুত্র সুপর্ণ, ওরা পাশে না-থাকলে তো কিছুই হত না।

‘রবীন্দ্রনাথ’ বিষয়ে আমার কাজ, ফলে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার ও গ্রন্থাগারই ছিল কার্যত আমার ‘গবেষণাগার’। রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক তপতী মুখোপাধ্যায় এজন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেখানকার কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতাও মনে রাখবার মতো। কলকাতার বিধান সরণী-স্থিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাগারটিতে বেশি মানুষের আনাগোনা নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বই নিয়ে কাজ করতে গেলে এখানে যেতেই হবে। অমূল্য এঁদের সংগ্রহ। এছাড়া কলকাতার ন্যাশানাল লাইব্রেরি, গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সময়ে কাজ করতে হয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী আইভি আদকের কাছে যখনই কোনো বইয়ের খোঁজে গেছি, তিনি প্রায় নিজের-কাজ মনে করে সেটি খুঁজে দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

এই গবেষণাটি বহুলাংশে তথ্যভিত্তিক কাজ। স্বাভাবিকভাবেই এই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সমস্ত গবেষণার সাহায্য নিয়েই আমাদের এগোতে হয়েছে। সূত্রপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জিতে বিস্তারিতভাবেই তার স্বীকৃতি জানানো আছে। তবু এখানে কয়েকটি বইয়ের কথা আলাদা করে উল্লেখ না-করলে অন্যায় করা হবে :

পুলিনবিহারী সেন, *রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী*, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৩

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী*, ১৯৩২

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি*, প্রথম খণ্ড, ১৩৮৫ব

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়*, ১৯৪২

স্বপন মজুমদার, *রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব, ১৩৯৫ব

বিভিন্ন রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশ। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র (মে ২০০১) অমূল্য ষোড়শ খণ্ডটি।

এবং, অবশ্যই, প্রশান্তকুমার পাল-এর *রবিজীবনী*র বিভিন্ন খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এখন যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের সবার শ্রম অনেকখানি লাঘব করে দিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট অ্যান্ড রেকর্ড্স'-এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত 'বিচিত্রা' (<bichitra.jdvu.ac.in>) নামের অনলাইন প্রোজেক্ট-টি। বহু পরিশ্রমে এই প্রোজেক্ট যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁদের সবার উদ্দেশে রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

এই কাজটি করতে গিয়ে বারবার হাতে ধরে দেখতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বইয়ের প্রথম সংস্করণ কিংবা তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত অন্যান্য সংস্করণ। মনে মনে ভেবেছি, কী জানি, এরই মধ্যে কোনো বইটি হয়তো পেয়েছিল তাঁরও হাতের স্পর্শ! তখনই শিহরিত হয়েছে মন, ধন্য হয়েছে নিভৃতে। 'অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে/ প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে'।

জয়দীপ ঘোষ

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

মুখবন্ধ III

পাঠ পরিচয় XI

প্রথম অধ্যায় : ছাপা-অক্ষরের মোকাবিলা ও রবীন্দ্রনাথ 12

ক. প্রকাশরূপ

খ. পণ্যরূপ

গ. শিল্পরূপ

দ্বিতীয় অধ্যায় : নিজস্ব উদ্‌যোগ (১৮৭৮ – ১৯০১) 35

ক. সূচনাকথা

খ. বই প্রকাশের অর্থনীতি

গ. বিপনন

ঘ. হাতে-কলমে কাজ

সংযোজন

তৃতীয় অধ্যায় : 'মজুমদার লাইব্রেরি'-পর্ব (১৯০১ - ১৯০৮) 70

ক. প্রথম 'স্থায়ী' প্রকাশক

খ. *কাব্যগ্রন্থ* (১৯০৩-) ও মোহিতচন্দ্র সেন

গ. সংকট

ঘ. 'আমার আর কোন বই ছাপিতে হইবে না'

ঙ. 'হিতবাদী' ও 'বসুমতী'

সংযোজন

চতুর্থ অধ্যায় : 'ইন্ডিয়ান প্রেস'-পর্ব (১৯০৮- ১৯২২) 104

ক. যোগাযোগ ও চুক্তি

খ. ছাপার উৎকর্ষ বনাম প্রকাশনার উৎকর্ষ

গ. *গীতাঞ্জলি* ও পরবর্তী টানাপোড়েন

ঘ. নিজস্ব প্রকাশনার দিকে

পঞ্চম অধ্যায় : 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়'- পর্ব (১৯২২ - ১৯৪১) 145

ক. 'শান্তিনিকেতন প্রেস'

খ. গ্রন্থালয়ের সূচনাপর্ব

প্রশান্তচন্দ্রের নব-উদ্‌যোগ ও করুণাবিন্দু বিশ্বাস — প্রথম বই — বানান ও বর্ণমালা সংস্কার — 'গ্রন্থালয়' ও পাঠকের সংযোগ — আরও কিছু বই — অসন্তোষ

গ. ‘বিশিষ্ট’ কিছু গ্রন্থ

‘গ্রন্থালয়’-এর ‘হাউস-স্টাইল’ — *লেখন* (১৯২৭) এবং ‘বৈকালী’ — মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা/১ — *মহুয়া* (১৯২৯) এবং ‘বরণডালা’ ও ‘রাখী’ — *সহজপাঠ* (১৯৩০) — মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা/২ — *বিচিত্রিতা* (১৯৩৩) — মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা/৩ — *খাপছাড়া, সে, ছড়ার ছবি* (১৯৩৭) — মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা/৪ — *গীতবিতান* (১৯৩১-) — ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’ — *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১৯৩৯-) — অন্তিম প্রসঙ্গকথা : গ্রন্থালয়ের আর্থিক অবস্থা

ঘ. ‘প্রেস-প্রুফ’ ও ছাপাখানার অন্দরমহল

সংযোজন

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বিশিষ্টতা 312

পরিশিষ্ট : প্রকাশনা তথ্য-সহ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বইয়ের কালানুক্রমিক তালিকা 337

গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রপত্রিকা-পঞ্জি 364

চিত্রমালা (মোট ৩২টি ছবি) 336 ও 337 পৃষ্ঠার মাঝে

পাঠপরিচয়

এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত গ্রন্থনির্মাণ-সংক্রান্ত
পরিভাষা ও চিহ্ন :

হরফ

বর্জইস : ৮ পয়েন্ট

স্মল পাইকা : ১০.৫ পয়েন্ট

পাইকা : ১২ পয়েন্ট

ইংলিশ : ১৪ পয়েন্ট

গ্রেট : ১৮ পয়েন্ট

ডবল পাইকা : ২৪ পয়েন্ট

ডবল গ্রেট : ৩৬ পয়েন্ট

(১ পয়েন্ট = ১/৭২ ইঞ্চি)

পুরোনো কালের টাকাপয়সার 'চিহ্ন'

৴ = এক আনা

৵ = দুই আনা

৶ = তিন আনা

। = চার আনা

।। = আট আনা

৸ = বারো আনা

৹ = 'আনা' বোঝাতে ব্যবহৃত চিহ্ন

(denominator)

কাগজের মাপ

নাম	মাপ (ইঞ্চি)
ইম্পিরিয়াল	30X22
রয়াল	25X20
ক্রাউন	20X15
ডিমাই	22.5X17.5
ডিমাই কোয়ার্টো	11X8.75
ডিমাই অক্টাভো	8.75X5.5
ফুলস্ক্যাপ	17X13.5

পাতার ভাঁজ

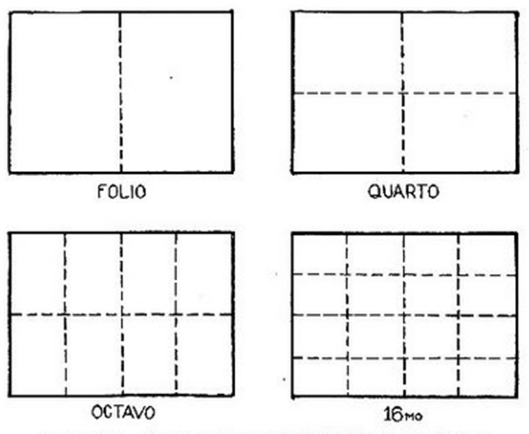

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও ছাপা-অক্ষরের মোকাবিলা

ক. প্রকাশরূপ

ডাকঘর নাটকে অমল বলেছিল, ‘পিসেমশায় তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না’, হৃদয়হীন ‘শুকনো’ পাণ্ডিত্যেকে প্রত্যাখ্যান করার আর্তি হিসেবেই এই সংলাপকে আমরা পড়ি। সেইসঙ্গে এও জানি, এ আর্তি স্বয়ং অমলের স্রষ্টারও। তাঁর অসংখ্য লেখালেখির মধ্যে এই প্রত্যাখানের নমুনা খুঁজে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আমরা অনেকসময় ভুলে যাই, তাঁর রচনার *মুদ্রিত* রূপটির প্রতিও রবীন্দ্রনাথের একধরণের বিরূপতা ছিল। এবং, সেটা বিস্ময়কর! ১৮৭৮-এ তাঁর প্রথম বই *কবিকাহিনী* প্রকাশিত হবার পর থেকে আর মাত্র দুটি বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ক্যালেন্ডার-বর্ষ) খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে তাঁর কোনো নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে না, ১৮৭৯ ও ১৯০২। অন্যপক্ষে কোনো কোনো বছর তাঁর প্রকাশিত নতুন বই-এর সংখ্যা ১০-এরও বেশি, যেমন, ১৯০৮![১] অবশ্য এই সব হিসেব বেশি না-দিলেও চলবে, রবীন্দ্ররচনাবলীর আকার-আয়তন সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের কম-বেশি ধারণা আছে। এরপরও ছাপাখানা-প্রসূত মুদ্রিত-বস্তুটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের নানামাত্রার বিরূপতার কথা বললে কিঞ্চিৎ হতবাক হওয়ার অধিকার জন্মায় বটে।

অবশ্য, এই অ-স্বাভাবিক বিরূপতার আগেছিল একটি পর্ব, ছাপা-অক্ষরে নিজের নাম ও নিজের লেখাটিকে দেখতে চাওয়ার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার পর্ব, সেটা অল্প কথায় বলে নেওয়া দরকার। *জীবনস্মৃতি*-র ‘বাংলা শিক্ষার অবসান’ অধ্যায়ে লেখা সেই চমৎকার স্বীকারোক্তিটুকু অনেকেরই মনে পড়বে এখানে, ‘বেশ মনে আছে, ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা অথবা আর-কোথাও হইতে একবার নিজের নামের দুই-একটা ছাপার অক্ষর পাইয়াছিলাম। তাহাতে কালী মাখাইয়া কাগজের উপর টিপিয়া ধরিতেই যখন ছাপ পড়িতে লাগিল, তখন সেটাকে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে হইল।’[২] এই (ছেলে)মানুষী বিহ্বলতা ঠিক কতদিন ছিল তাঁর? রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছেন, খুব দ্রুতই এই মোহ তাঁর কেটে যায়, *জীবনস্মৃতি*-রই ‘ভারতী’ শীর্ষক অধ্যায়ে তাই লিখেছিলেন, ‘বালককালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক...কিন্তু তাহার একটা সুবিধা আছে; ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখিবার প্রবল মোহ অল্পবয়সের উপর দিয়াই কাটিয়া যায়। আমার লেখা কে পড়িল, কে কী

বলিল, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া উঠা – লেখার কোন্‌খানটাতে দুটো ছাপার ভুল হইয়াছে, ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইতে থাকা – এই-সমস্ত লেখাপ্রকাশের ব্যাধিগুলা বাল্যবয়সে সারিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থচিত্তে লিখিবার অবকাশ পাওয়া যায়।'[৩] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখতে চাওয়ার 'মোহ' রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেই ঘুচে গেছিল, কিন্তু উপরোক্ত দাবির একটি অংশ, অর্থাৎ 'ছাপার ভুল' নিয়ে 'কণ্টকবিদ্ধ' হতে থাকা, এইটি রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেছিলেন বলে তো মনে হয় না। একটা উদাহরণ দিলেই একথা প্রমাণ করা যাবে। চিনদেশে গিয়ে বিভিন্ন সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর একটি সংকলন *Talks in China*-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে। কিন্তু অচিরেই গ্রন্থটির প্রচার স্থগিত রাখা হয়। অল্পকিছু পরিবর্তনের পর বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯২৫-এ। এর পিছনের কারণটি জানা যায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের (১৮৯৩-১৯৭২) লেখা একটি চিঠি থেকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের(১৮৬৫-১৯৪৩) কন্যা শান্তা চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৮৪)-কে ১৯২৪-এর ২১ নভেম্বর প্রশান্তচন্দ্র লিখছেন :

> Talks in China বইখানা antique কাগজে linotypeএ ছাপানো হয়েছিল কবি রওনা হবার পনেরো দিন আগে।... বইখানার আর কোনও দোষ নেই – ছাপার ভুলও খুবই সামান্য, শুধু margin কম আছে, আর পৃষ্ঠার অঙ্কটায় bracket দিয়েছে – (27) এইরকম – এইজন্য দেখ্‌তে একটু খারাপ হয়েছে। কবি তা'তে এত দুঃখিত হলেন যে আমরা সমস্ত editionটা suppress করতে বাধ্য হয়েছি। কবি তারপর আবার অল্পস্বল্প বদ্‌লিয়ে mss পাঠিয়েছেন, এখন সমস্ত বইখানা reprint করাচ্ছি।[৪]

মুদ্রিতরূপে নিজের লেখাকে দেখতে চাওয়ার সময় যিনি এতখানি খুঁতখুঁতে (perfectionist), মুদ্রিত গ্রন্থের বাহ্য রূপটি সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল গভীর, একথা বললে একটু অদ্ভুত শোনায় বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি। *গোরা* উপন্যাসে একজায়গায় আমরা এইরকম একটি দ্বিরালাপের মুখোমুখি হই :

> ললিতা মাঝে মাঝে বলিত, 'আপনি যেন বই পড়ে এসে কথা বলছেন, এমন করে বলেন কেন?'
>
> বিনয় উত্তর করিত, 'আমি যে এত বয়স পর্যন্ত কেবল বই পড়েই এসেছি, সেই জন্য মনটা ছাপা বইয়ের মতো হয়ে গেছে।'[৫]

বিনয়ের বলা এই 'ছাপা বইয়ের' উপমা কিন্তু ঠিক অমলের বলা শুকনো পাণ্ডিত্যের বেদনা নয়। বইয়ের 'বস্তুরূপ'টার মধ্যেই আছে কোনো একটা সমস্যা, তারই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন বিনয়ের

বকলমে রবীন্দ্রনাথ। কী সেই সমস্যা, ঐ ‘বস্তুরূপ’টিকে এখানে উপমা হিসেবে ব্যবহার করার কী তাৎপর্য, সেকথা শুরু থেকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ‘ভারতী’ জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট লেখা প্রকাশিত হয়, যার নাম, ‘লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী’।[৬] ২২ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলছেন যে তাঁর ধারণা ছিল ‘নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়িতে বুঝি বড়োই আনন্দ হইবে।’ কিন্তু, ‘আজ সমস্তদিন ধরিয়া মুদ্রাযন্ত্রের লৌহগর্ভ হইতে সদ্যপ্রসূত বইখানি হাতে লইয়া এ-পাত ও-পাত করিতেছি, কিছুই ভালো লাগিতেছে না।’ নিজের লেখা পরে পড়তে গেলে অনেকসময় পছন্দ হয় না, এটা ঠিক তেমন অপছন্দের ব্যাপার নয়। এ হল ঐ বস্তুরূপটিকেই পছন্দ করে উঠতে না-পারার সমস্যা, আর সেটা এখানে খোলসা করে জানালেনও তিনি :

> এসব তো সীসা ঢালা ছাঁচের অক্ষর, যেখানে যত বই দেখি, সকলই তো এইরকম অক্ষরের দেখিতে পাই। আমার সে বাঁকাচোরা সরু-মোটা অক্ষরগুলি কী হইল? কোনোটা-বা শুইয়া, কোনোটা-বা বসিয়া, কোনোটা উপরে, কোনোটা-বা নীচে। সেগুলি তো এমনতরো কোণ-ওয়ালা খোঁচা-খোঁচা রেখা-রেখা অক্ষর নহে; গোল, মোলায়েম, আঁকাবাঁকা, জড়ানো, অক্ষর।...তাহাদের পানে চাহিলে ভাবের একটা চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবটিকে রক্তমাংসের বলিয়া মনে হয়।...আর এরা কে রে! এরা তো সব দাসের জাতি। সীসার কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা, ভাবশূন্য মুখে খাড়া রহিয়াছে...

তাহলে, ছাপা বইয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মূল অভিযোগ হল, হাতের লেখার রূপাকৃতিটির মধ্যে ‘ভাবের একটা চেহারা’ দেখা যায়, বইতে তা হয়ে ওঠে ‘ভাবশূন্য’। বস্তুত গোটা নিবন্ধ জুড়েই বইয়ের বস্তুরূপকে রবীন্দ্রনাথ আক্রমণ করবেন কখনও ‘নিখুঁত ভদ্রলোক’ বলে কখনও ‘পরিপাটি বিজ্ঞভাব’ বলে। ঠিক এখান থেকেই *গোরা*-র পূর্ব-উদ্ধৃত অংশটিতে যদি আর-একবার ফিরে যাই আমরা তাহলে দেখব ললিতারও বিনয়ের প্রতি অভিযোগ ছিল কতকটা এইরকমই, বড়ো বেশি সাজিয়ে কথা বলার অভিযোগ, স্বাভাবিকের থেকে চ্যুতির অভিযোগ।

মুশকিল হল, এই অভিযোগ থেকে তো ‘বই’-এর কখনই মুক্তি সম্ভব না, যদি-না হাতের লেখাটাকেই ছাপার অক্ষরে ধরা যায়। ১৯২৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে বার্লিনে অবস্থানকালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বলেন এরকম এক যন্ত্রের কথা যা দিয়ে হাতের লেখাকে হুবহু মুদ্রিত রূপ দেওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তাই প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, এবং নির্মলকুমারী মহলানবিশের স্মৃতিবিবরণ অনুযায়ী[৭], তৎক্ষণাৎ আদেশ দেন, ‘কালই ঐ যন্ত্র একটা কিনে ফেল’, এত উৎসাহের কারণটাও নির্মলকুমারী জানিয়ে দেন, ‘[রবীন্দ্রনাথ] খুব খুশী

যে ছাপাখানার উপর নির্ভরতা অনেকখানি কমিয়ে ফেলতে পারবেন।' আমরা জানি, এই যন্ত্র, যার পোষাকী নাম ছিল 'রোটা প্রিন্ট' মেশিন, তারই উপর নির্ভর করে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে জার্মানিতে মুদ্রিত হল ও পরের বছর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে এ দেশে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের *লেখন* কাব্যগ্রন্থটি। কথাটা হল, 'ছাপাখানার উপর নির্ভরতা' কমাতে চাইছেন কেন আজ কবি? ২২ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি ছোট নিবন্ধের সঙ্গে ৬৫ বছরের পরিণত রবীন্দ্রনাথের একটি কাজকে মিলিয়ে দেখার কোনো অব্যর্থ কারণ আছে কি? প্রুফ দেখা ও অন্য আনুষঙ্গিক ঝামেলার থেকে মুক্তি পেতে এই নির্ভরতা কমানোর কথা ভাবছেন, এও কি সম্ভব না ? এর উত্তর পাওয়া যাবে *লেখন*-এর ভূমিকায় স্বয়ং লেখকেরই স্বীকারোক্তিতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয় – সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা লণ্ঠনের মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে। তাই জর্ম্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপাবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখনগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল। অন্যমনস্কতায় কাটাকুটি ভুলচুক ঘটেছে। সে সব ত্রুটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়েরই আভাস রয়ে গেল।' আশ্চর্য এই ভূমিকাটি। যেন ৪৩ বছর আগেকার 'লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী' প্রবন্ধটি সামনে নিয়ে ভূমিকার এই কথাগুলো লিখতে বসেছেন তিনি! যেন ৪৩ বছর আগেকার একটা স্বপ্নের উদ্‌যাপন হচ্ছে এতদিনে !

কিন্তু এটাও ঠিক, রবীন্দ্রগ্রন্থের প্রেক্ষিতে এর আগে বা পরে আর কখনই এভাবে হাতের-লেখাকে মুদ্রিতরূপে দেখা যাবে না। ফলে গ্রন্থের মুদ্রিত রূপ নিয়ে এক নিরুপায় অস্বস্তিকে মেনে নিয়েই ছাপা অক্ষরের মোকাবিলা করে যেতে হয়েছে তাঁকে চিরকাল, এই কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন।

ছাপা-অক্ষরকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'ভাবশূন্য', বলেছিলেন 'হৃদয়হীন'। কিন্তু সত্যিই কি রচনার মুদ্রিতরূপ কখনই *স্বতন্ত্রভাবে* কিছু প্রকাশ করে না? বা, প্রশ্নটা এভাবেও রাখা যায় যে, এই মুদ্রণের নিরীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কি তাঁর কোনো রচনার শিল্পরূপকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করেন নি ? দুটি উদাহরণের সাহায্যে প্রশ্ন দুটির উত্তর সন্ধান করা যেতে পারে।

লিপিকা বইটির কোনো কোনো রচনার শিল্পরূপ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মানুষেরা নানা সময়ে তর্ক করেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনেও ছিল নানা দ্বিধা। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৪ ভাদ্র (২১ আগস্ট ১৯১৯) প্রমথ চৌধুরীকে তিনি

লিখছেন, ‘আমার লেখাটির কি নাম দেব ভেবে পাইনে। “পুরাণো শোক” বোধ হয় চল্‌তে পারে। ছোট ছোট গল্পকে “কথাণু” না বলে “কথিকা” বলা যেতে পারে। “গল্পস্বল্প” বললে ক্ষতি কি?’[৮] অন্যদিকে আবার মংপুতে বসে মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি জানিয়েছিলেন ভিন্ন কথা, ‘“লিপিকা” কেন ভালো লাগে? সে তো গদ্যকবিতা, বিশুদ্ধ গদ্যকবিতা। লেখাটা গদ্যের ছাঁদে, এই মাত্র তফাৎ’।[৯] আশ্চর্য কথাটা হল, শিল্পরূপ নিয়ে এই দ্বিধার চিহ্ন কিন্তু *লিপিকা*-র অনেকগুলি লেখার *মুদ্রিতরূপের বিবর্তন* খুঁটিয়ে দেখলেও টের পাওয়া যায়। ‘ভারতী’ পত্রিকার ১৩২৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হল ‘প্রশ্ন’ কথিকাটি, তার একটা অংশ উদ্ধৃত করা হল এখানে, অবিকল রূপে :

> সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ,
>
> ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুম্‌রে উঠ্‌চে।
>
> দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিক্‌টিকি।
>
> সাম্‌নে খোলা ছাদ, কখন্‌ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

স্পষ্টতই লাইনগুলো ভেঙে নেওয়া হয়েছে কবিতার মতো করে, নানারকম ছোটবড়ো বিন্যাসে। এই কথিকাটিই যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯২২ সালে, তখন এই লেখাগুলির কবিতা হয়ে ওঠার সম্ভাবনার উপর হয়তো রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য ভরসা অনেকটা কমে গেল হয়তো, আর ‘প্রশ্ন’ মুদ্রিতরূপে তার পরিচয় ফুটে উঠল এইভাবে :

> সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ,   ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুম্‌রে উঠ্‌চে।
>
> দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো,   দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিক্‌টিকি।
>
> সাম্‌নে খোলা ছাদ,   কখন্‌ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

এখানে কবিতার ধরণে ভেঙে-নেওয়া লাইনগুলো অনেকটা টানা গদ্যের চেনা রূপে বদলে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু বাক্যাংশগুলির মধ্যে অতিরিক্ত ফাঁক (space) রেখে দিয়ে কবিতার যতিবিন্যাসের কথাটি মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা আছে। *লিপিকার* পরবর্তী সংস্করণ, অর্থাৎ, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বিশ্বভারতী সংস্করণে এই ফাঁকটাও আর রইল না, এবার তার চেহারাটা দাঁড়াল এইরকম :

> সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি।

সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়ালো।

তফাৎগুলি পরিষ্কার। অকারণ হসন্ত বাদ গেল এবার। 'উঠচে' হল 'উঠছে', 'দাঁড়াল' হল 'দাঁড়ালো'। অর্থাৎ বানানের একধরণের নতুন ঝোঁক যে এবার পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে, তা বোঝা গেল। আর সবচেয়ে জরুরি কথা, অন্তত প্রকাশ্যে এই লেখাগুলোকে কবিতা নামক শিল্পরূপটির সংস্পর্শ ঘুচিয়ে নির্দ্বিধায় গদ্যের চৌহদ্দিতে এনে ফেললেন কবি। লেখাগুলির *মুদ্রিত রূপ* হয়ে উঠল তার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্যদাতা !

ফলে গ্রন্থরূপ তথা মুদ্রণরূপকে রবীন্দ্রনাথ তাত্ত্বিকভাবে যতখানি নিভে-যাওয়া লণ্ঠনের মতো তাৎপর্যহীন ভাবেন বাস্তবিক তা ততখানি নয়। তার সক্ষ্যেও উন্মোচিত হতে পারে লেখকের ব্যক্তিমনের, বিশেষত টেক্সট্-এর সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ার নানা রহস্য।

রচনার মুদ্রিতরূপ কীভাবে লেখকের বদলে-যাওয়া অভিপ্রায়কে ধারণ করে, উপরে তার একটি উদাহরণ দেখলাম আমরা। এর উল্টোদিকে, মুদ্রণরূপটি নিজেই কীভাবে লেখকের অভিপ্রায়কে বদলে দেয় তারও একটি চমৎকার উদাহরণ আমরা তুলে আনতে পারি। *বাঁশরি* নাটকটি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-এর ২৫ জানুয়ারি। নাটকটির একটি চরিত্রনাম ছিল 'পৃথ্বীশ'। বইটি যখন ছাপা চলছে, তখন প্রুফেই রবীন্দ্রনাথ নামটি বদলে করে দিলেন 'ক্ষিতীশ'। এই বদলের কারণ কী? গ্রন্থালয়ের কর্মী সুধীরচন্দ্র করের স্মৃতিকথায় এর বিবরণ পাওয়া যায়, ''বাঁশরী' নাটকটি ছাপা হচ্ছে। প্রুফে দেখলেন 'পৃথ্বীশ' শব্দটির 'থ' এবং তার তলাকার 'ব' ফাঁক হয়ে থাকে, দেখতে সুশ্রী হয় না। অগত্যা নায়কের আদি নামটাই বদলে দিলেন। অর্থ একই রইল। করলেন 'ক্ষিতীশ'।'[১০] খুবই চমকপ্রদ এই বিবরণ। আজকের ডিজিটাল অফসেট মুদ্রণ-প্রযুক্তি যদি সেদিনও থাকত, তাহলে স্বভাবতই 'পৃথ্বীশ' রক্ষা পেত। 'লেটার প্রেস'-ই তাহলে হয়ে রইল 'ক্ষিতীশ'-এর আবির্ভাবের একমাত্র কারণ! স্মৃতিকথাটির ওই একই জায়গায় সুধীরচন্দ্র কর এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের যে, 'প্রুফ দেখার সময় কোনো বিশেষ অংশ যদি বদলাবার প্রয়োজন পড়ত, সাধারণত ছাপাখানার সম্ভাব্য অসুবিধার কথাটি মাথায় রেখেই সেটা বদলাতেন কবি, মেক-আপে যাতে হাঙ্গামা না বাড়ে তার জন্য যতটুকু অংশ বাদ দিতেন, সেই মাপেই নূতন অংশকে সংহত করে ফেলতেন।' ছাপাখানার সঙ্গে রচনার সম্পর্কটি এই অর্থেই নানা জটিল বিন্যাসে অন্বিত, রচনার মুদ্রণরূপকে রবীন্দ্রনাথ যতই একমাত্রিক বলে বোঝাতে চান না কেন !

দ্বিতীয় একটি উদাহরণও এখানে দেওয়া যায়। মুদ্রিত গ্রন্থ্-রূপটি অনেকসময়ই এমন কিছু চিহ্ন (sign) ধারণ করতে পারে তার শরীরে যা দিয়ে পান্ডুলিপি-পর্যায়ের অতিরিক্ত কিছু তাৎপর্য গড়ে ওঠে 'টেক্সট'-কে ঘিরে। রবীন্দ্রগ্রন্থের ইতিহাসে সে উদাহরণ দুর্লভ নয়। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে শুরু করে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত বিখ্যাত *কাব্য-গ্রন্থ* সংকলনটি। 'মজুমদার লাইব্রেরি' প্রকাশিত এই বইটির মোট ৯টি 'ভাগ' ও ১৩ টি 'খণ্ড'। এর সপ্তম ভাগের অন্তর্গত হয়ে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থটি। এই বইটিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে, বইয়ের কবিতাগুলির নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে 'ইংলিশ' টাইপ, আর মূল কবিতাগুলির ক্ষেত্রে 'গ্রেট' টাইপ। কিন্তু বাদবাকি ১২টি খণ্ডের টাইপ-ব্যবহার এর থেকে একেবারেই আলাদা। সেখানে দেখা যাবে কবিতানাম 'গ্রেট' টাইপে এবং কবিতার ক্ষেত্রে আরও ছোট 'স্মল পাইকা'-র ব্যবহার। অর্থাৎ, 'শিশু' খণ্ডের কবিতানাম এবং মূল টেক্সট্, দুইই অন্য খণ্ডগুলির থেকে অনেকটা বড়ো হরফে ছাপা হচ্ছে। আর এই টাইপসেটিং-এর পুরো পরিকল্পনাটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে, একথাও এখানে উল্লেখ্য। একটি তারিখহীন পত্রে মোহিতচন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, '"শিশু" খণ্ড যদি স্বতন্ত্র ছাপা মত হয় তবে ইংলিশ অক্ষরে এবং কবিতাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে যেন ছাপা হয়।'[১১] বইয়ের 'বিষয়'(content)-এর পাশে পরিকল্পিত এই 'রূপ'(form)-টি দেখা দিল যথাযোগ্য সহচর হিসেবে, শিশুর জন্যে রচিত কবিতার হরফ অনেকবেশি 'দৃশ্যগ্রাহ্য' হয়েই যে-'সম্পূর্ণ টেক্সট'-টি নির্মাণ করল, তা কবিতাগুলোকেই কি আরও তাৎপর্যবাহী করে তুলল না ?

মুদ্রিত বইকে বাঙ্ময় 'টেক্সট' হিসেবে কীভাবে পড়া যায়, বস্তুত পড়া উচিত, তার আরও একটি চমৎকার উদাহরণ এই 'শিশুখণ্ড' থেকেই তুলে আনা সম্ভব। আমরা এইবার হয়তো বোঝাতে পারব যে, এই বইটির (এবং তাঁর বেশিরভাগ বইয়ের) *নির্মাণ*-প্রক্রিয়ার সঙ্গে (শুধু *লিখন*-প্রক্রিয়ার সঙ্গে নয়) রবীন্দ্রনাথ নিজে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন বলেই, 'সীসা ঢালা ছাঁচের অক্ষরের' মধ্যেও কীভাবে 'ভাব' জাগিয়ে তুলতে হয় সেকথা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানতেন। *কাব্য-গ্রন্থ*-র অন্যসব খণ্ডগুলোর মতো 'শিশুখণ্ড'টিরও কবিতা বাছাই ও সম্পাদনার অন্যান্য দায়িত্বে ছিলেন মোহিতচন্দ্র সেন, সেকথা আগেই বলা হল। রবীন্দ্রনাথ নতুন কবিতা লিখে মোহিতচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অনেকসময় কবিতার নামকরণের ভারও তুলে দিতেন সম্পাদকের উপর। 'শিশুখণ্ড'-এর জন্যে ৫০টি কবিতা জমা হবার পর সেই কবিতাগুলি বইতে কোন পরম্পরায় সাজানো হবে তা

জানিয়ে ২২ শ্রাবণ ১৩১০ বঙ্গাব্দে (৭ আগস্ট ১৯০৩) মোহিতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। ১০ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লেখেন :

> শিশুখণ্ডের কবিতাগুলি আপনি যেরকম সাজিয়েছেন তথাস্তু। কেবল একটি বক্তব্য আছে। খোকা নিজের জবানীতে যে কবিতাগুলির নায়ক সেগুলিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া কি চলে ? বস্তুত সেটা একই মানুষের চরিত্রাবলীর মত – তারা সবগুলো জড়িয়ে একটি খোকাকে প্রকাশ করচে – সে যে কেবল সাধারণ খোকার typeমাত্র তা নয় – সে একটি বিশেষ খোকাও বটে – কাজেই এই কবিতাপর্য্যায়ের মাঝে মাঝে অন্য কবিতার প্রবেশ কি অনধিকার প্রবেশ হবে না ?[১২]

বইটি শেষপর্যন্ত ৫০টি কবিতায় থেমে যায়নি অবশ্য, 'প্রবেশক' কবিতাটি বাদ দিলেও কবিতাসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৬১তে। ফলে মোহিতচন্দ্রের প্রাথমিক প্রস্তাবিত সজ্জা স্বভাবিকভাবেই অনেকটা বদলে যাবে। কিন্তু জরুরি কথাটা হল, রবীন্দ্রনাথের দাবি মেনে 'খোকার নিজের জবানী'তে লেখা কবিতাগুলি এক জায়গায় জড়ো হয়ে আসবে। বইয়ের ১২নং কবিতাটি ('প্রশ্ন'/ 'মা গো আমায় ছুটি দিতে বল...') থেকে শুরু করে ৩৩নং কবিতা ('বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'/ 'দিনের আলো নিবে এল...') পর্যন্ত 'খোকা'র বক্তব্যের একটা ক্রমপরম্পরা তৈরি হয়ে উঠল যেন, আর তার ফলে কবিতাগুলিকে নিছক বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে যাবার অতিরিক্ত একটা সম্ভাবনা জেগে উঠল এই মুদ্রিত টেক্সটিতে ! রবীন্দ্রনাথ নিজেই জাগিয়ে তুললেন সেই আশ্চর্য সম্ভাবনা।

ফলে, ছাপা অক্ষরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিরকালীন অভিমান এবং সেই ছাপা অক্ষরকেই বাঙ্ময় করে তোলার জন্যে তাঁর আন্তরিক প্রয়াস, দুই-ই কিন্তু একইসঙ্গে সত্য।

খ. পণ্যরূপ

নিজের লেখাকে মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করেন কেন রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর নিশ্চয়ই সেটা যেটা চিরকালীন। অর্থাৎ, নিজের ভাবনাকে বহুমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বহুমানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করে নেবার প্রাপ্তি। এই চেনা কথাটা রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে অনেকবার তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন, আমরা *বিবিধ প্রসঙ্গ* থেকে কয়েকটি বাক্য মনে করতে চাই :

আমি যখন লিখি তখন মনে করি...আমি যেন এককালে শত শত পাঠকের ঘরের মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছি। আমি এই বঙ্গদেশের কত স্থানের কত শত পবিত্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি। আমি যাঁহাদের চিনি না তাঁহারা আমার কথা শুনিতেছেন, তাঁহারা আমার পাশে বসিয়া আছেন, আমার মনের ভিতরে চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের ঘরকন্নার মধ্যে আমি আছি, তাঁহাদের কত শত সুখ দুঃখের মধ্যে আমি জড়িত হইয়া গেছি ![১৩]

এই আকাঙ্ক্ষাটি মধুর ও সত্য, কিন্তু সেইসঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, একটা সময়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখালেখিকে অর্থ উপার্জনের একটি স্থায়ী উৎস হিসেবেও দেখেছেন, এবং সেকথা তিনি গোপনও করেন নি কারো কাছে। তাঁর গ্রন্থের প্রকাশ, প্রচার ও বিপননের ইতিহাস আলোচনা করার সময়ে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম তথা বিশ্বভারতীর বিপুল ক্ষুধা মেটাতে রবীন্দ্রনাথকে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করতে হয়েছে, দেশবিদেশের মানুষের কাছে ক্রমাগত হাত পাততে হয়েছে, বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে নিজেকে নিংড়ে, বৃদ্ধ বয়সে শান্তিনিকেতনের নাটকের দল নিয়ে ছুটে বেড়াতে হয়েছে দেশান্তরে। **১৯১৬** সালে আমেরিকায় **১১০** দিনে রেলপথে ভ্রমণ করেছেন প্রায় ৭০০০ মাইল, বক্তৃতা দিয়েছেন ৫৬টি, আর এরই ফাঁকে **১৯১৬**-র **১১** অক্টোবর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, 'বক্তৃতার ঝড়ের মুখে সহর থেকে সহরে ঘুরে বেড়াচ্চি।...আমার পক্ষে এই ঘুরপাক নিতান্তই ক্লেশকর। সমস্ত সহ্য করচি এই মনে করে যে,...শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে'।[১৪] এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে যে, নিজের *লেখা*-প্রকাশের ইচ্ছেটা কেবল *নিজেকে*-প্রকাশের সৃষ্টিশীল আকাঙ্ক্ষা-জাত তা নয়, লেখাকে তিনি দেখেছেন বিক্রিযোগ্য পণ্য হিসেবে, সদর্থে, বীরভূমের জনহীন প্রান্তরে বিশ্বমিলনযজ্ঞের যে আয়োজন তিনি শুরু করেছেন, তার জন্যে এটা অনিবার্য ছিল।

'বই' প্রকাশের কথায় পরে আসছি আমরা, তার আগে পত্রিকায় 'রচনা' প্রকাশের সময় টাকাপয়সার হিসেবটা তিনি কীভাবে বুঝে নিতেন তার একটা সহজলভ্য উদাহরণ দেখা যাক। পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করবার জন্যে সাম্মানিক দেওয়ার চল সেকালে ছিল না, আজও (কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে) তেমন নেই। 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম রবীন্দ্রনাথকে ৩০০টাকা সম্মান দক্ষিণা দেন **১৩১৪** বঙ্গব্দের শুরুর দিকে, দক্ষিণাটি 'অগ্রিম' দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ পরে সময়মতো রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কোনো একটি গল্প লিখে দেবেন

এই মৌখিক প্রতিশ্রুতির উপরে নির্ভর করেই ওই টাকা দিয়েছিলেন সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেও কথা রেখেছিলেন অচিরেই, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২মে, ১৯০৭) আজিতকুমার চক্রবর্তীকে(১৮৮৬-১৯১৮) রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আমাকে এই সমস্ত উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যেও প্রবাসীর জন্যে একটি ছোট গল্প লিখতে হয়েছে। সম্পাদক আমাকে তিনশো টাকা আগাম দিয়ে ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছেন।'[১৫] চিঠিতে উল্লিখিত 'উদ্বেগ ও ব্যস্ততার' কারণ হল নিজের কন্যা মীরার আসন্ন বিবাহ (বিয়ের তারিখ ৬ জুন ১৯০৭)। উল্লিখিত 'ছোট গল্প'টি হল 'মাষ্টারমশায়' (প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'-র ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুটি সংখ্যায়)।

পরবর্তীকালে *যোগাযোগ* উপন্যাসের প্রকাশকে কেন্দ্র করে এই রামানন্দর সঙ্গেই কবির প্রবল মনোমালিন্য ঘটে যায়। আর এই ভুল-বোঝাবুঝির পিছনের কারণটি ছিল অর্থনৈতিক। নবপ্রতিষ্ঠিত 'বিচিত্রা' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৩৪ব) ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার মলাটে প্রকাশিত হয় একটি বিজ্ঞাপন, যাতে প্রথমবার জানানো হয়, 'আশ্বিন মাস হইতে রবীন্দ্রনাথের নূতন উপন্যাস আরম্ভ হইবে।' আর সেই আশ্বিন মাস থেকে 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করে 'তিন পুরুষ' উপন্যাসটি, তৃতীয় সংখ্যা থেকে যার নাম বদলে হবে 'যোগাযোগ'। এর আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে মৌখিক আশ্বাস লাভ করেছিলেন যে নতুন উপন্যাস লেখায় কখনও হাত দিলে তা 'প্রবাসী'রই প্রাপ্য হবে। সেই কথার কেন অন্যথা হল, সেটা খানিক বোঝা যায় 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১২ চৈত্র(২৬ মার্চ ১৯২৭) খানিক কৈফিয়তের সুরে লেখা একটি চিঠি থেকে :

> "বিচিত্রা" নাম দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ চল্‌চে – যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা উৎসাহী ও ধনী।...আমি তাঁদের ফাঁদে কতকটা ধরা দিয়েছি, অভাবের দায়ে, লোভের তাড়নায়। আমার দৈন্য যে কত কঠিন হয়ে উঠেচে সে তোমরা অনুমান করতে পারবেনা – সেই কারণে নিষ্কামভাবে লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের কলমের জোর ছাড়া, সাধুতা রক্ষা করে অর্থোপার্জ্জনের আর কোনো উপায় জানি নে। অথচ রচনার রাস্তায় তোমাদের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভালো লাগে না – কেননা তোমাদের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তা আছে। ইদানীং এই বাহ্য বিচ্ছেদ নিয়ে আমার মন অনেক সময় পীড়িত হয়েচে – কিন্তু লক্ষ্মীর প্রকোপে পড়ে বাণীর প্রসাদপদ্ম নিয়েও ব্যবসা ফাঁদতে হ'ল এই শেষ বয়সে।[১৬]

মোদ্দা কথা, ভালো সম্মানদক্ষিণা পাওয়া যাচ্ছে বলেই যে নতুন উপন্যাস যাচ্ছে ‘বিচিত্রা’র ঝুলিতে সেটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই জানালেন প্রমথ চৌধুরীকে। কত টাকা দিচ্ছিল ‘বিচিত্রা’? এর নির্দিষ্ট উত্তর না দেওয়া গেলেও পরোক্ষ অনুমানের একটি সূত্র পাওয়া সম্ভব। *যোগাযোগ* উপন্যাসের একটি দ্বিতীয় পর্ব লেখার কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন পরবর্তীকালে, ১৯৩২ সালের ৭ জুন এই প্রসঙ্গে নির্মলকুমারী মহলানবিশ কবিকে সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখে রেখেছিলেন তাঁর ‘দিনলিপি’তে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সেদিন, ‘বিচিত্রা-ওয়ালারা তিন হাজার টাকা দেবে বলেছে কিন্তু বললেই কি লেখা যায়। তা যদি পারতুম তাহলে যথেষ্ট উপার্জন করতে পারতুম গল্প লিখে। কিন্তু পারি কৈ?’[১৭] পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখে ৩০০০ টাকা পাওয়া সেকালের বিচারে অকল্পনীয় রকমের লোভনীয় প্রস্তাব। আমরা জানি, শেষপর্যন্ত *যোগাযোগ*-এর কোনো দ্বিতীয় খণ্ড লিখে উঠতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু অনুমান করা যায় যে ‘প্রথম খণ্ড’টির জন্যেও অনুরূপ অর্থই তিনি পেয়ে থাকবেন, আর সেই কারণেই ‘সবুজপত্র’ ও ‘প্রবাসী’কে বঞ্চিত করে ‘বিচিত্রা’য় বেরোতে পারল তাঁর নতুন উপন্যাস।

প্রমথ চৌধুরী ব্যাপারটা সহজে বুঝেছিলেন। কিন্তু রামানন্দকে বোঝানো সহজ হয়নি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। অভিমানী এবং ক্ষুব্ধ রামানন্দ এই প্রসঙ্গে একাধিক চিঠি লিখেছেন কবিকে, তার মধ্যে একটিতে তো এতটাই লিখে ফেলেন যে, ‘প্রবাসীর ভাদ্রসংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখার হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।...মডার্ন রিভিউয়ের জন্যও অনুগ্রহ করিয়া অতঃপর আমাকে কোন লেখা দিবেন না।’[১৮] প্রায় ছেলেমানুষী এই অভিমান ভাঙাতে রবীন্দ্রনাথকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, দীর্ঘ চিঠিতে নানা কৈফিয়ত দাখিল করতে হয়েছিল তাঁকে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর কৈফিয়তটি হচ্ছে, ‘প্রমথ যদি বিচিত্রার ভার না নিতেন তাহলে আমি উপন্যাস কখনোই লিখ্‌তুম না।’[১৯] কৈফিয়তটি বিস্ময়কর, কেননা উপরে উদ্ধৃত প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিটি থেকেই বোঝা যায়, অর্থের বিনিময়ে ‘বিচিত্রা’কে নতুন উপন্যাস দেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনো যোগাযোগই নেই, ওটা রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন সিদ্ধান্ত। আর তাছাড়া, প্রমথ চৌধুরী বিচিত্রার ‘ভার’ কখনও নেন নি, রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ‘বিচিত্রা’র সঙ্গে তাঁর সাধারণ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল মাত্র। আরও আশ্চর্যের হল, এই নিদারুণ অভিমান ভাঙাতে রবীন্দ্রনাথকে ওই চিঠিতেই এরপর লিখে দিতে হল, ‘কিন্তু যখনই এই উপন্যাস [*যোগাযোগ*] লিখ্‌তে বসেচি তখনি আমার মনে হয়েচে প্রবাসীর

জন্যে একটা উপন্যাস লিখ্‌তেই হবে।...আমার পক্ষে, এ বয়সে একসঙ্গে কলমের রথে জুড়ি গল্প হাঁকান প্রায় অসম্ভব বল্‌লেই হয় কিন্তু তাও আমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল।' বস্তুত, এই দ্বিতীয়বার-দেওয়া প্রতিশ্রুতিটির মর্যাদা রাখতে গিয়েই *যোগাযোগ* উপন্যাস লেখা চলাকালীনই তাঁকে আর-একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিতে হল, তাঁর জীবনে প্রথমবার এটি ঘটল যে, দুটি উপন্যাস একই সময়কালে ধারাবাহিকভাবে দুটি কাগজে পাশাপাশি বেরোচ্ছে। *যোগাযোগ* 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন ১৩৩৪ব থেকে চৈত্র ১৩৩৫ব পর্যন্ত, আর এই দ্বিতীয় উপন্যাসটি, *শেষের কবিতা,* 'প্রবাসী'তে বেরোল ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে চৈত্র সংখ্যায় !

বাংলাদেশের প্রকাশকদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'পেশাদারিত্ব'(professionalism)-কে আত্মস্থ করা সহজ হয় নি সেদিন। অবশ্য প্রকাশক-লেখক মান-অভিমানের ফাঁক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যে আর-একটি নতুন উপন্যাস লেখা হয়ে গেল, বাংলা সাহিত্যের নিশ্চয় তার জন্যে রামানন্দের কাছে খানিক কৃতজ্ঞ থাকতে অসুবিধে হবে না।

আমরা রবীন্দ্রনাথকে বলছি 'প্রফেশনাল' লেখক, সেটা বলতে পারছি আরও এই ভরসায় যে, একটা পর্বের পর তিনি 'ভারতী' পত্রিকাকেও বিনা পারিশ্রমিকে লেখা দিতে চাইছিলেন না। মনে রাখতে হবে, 'ভারতী' কিন্তু ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একবছর কাল যাবৎ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলতে চাইছি সেই ১৯১১ সাল নাগাদ 'ভারতী'র সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়(১৮৮৮-১৯২৯)। ইনিও ঠাকুরবাড়ির সদস্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন। তাঁকে 'ভারতী'তে প্রকাশের জন্য 'রাসমণির ছেলে' গল্পটি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই লিখছেন যে, 'এ গল্পের মূল্য আমি ভারতীর কাছ থেকে নেব। আমার জন্মোৎসবে এখানে অনেক টাকা ঋণ এখনো আছে আমার শোধবার অন্য উপায় নেই। তুমি বোধ হয় জান অচলায়তনের জন্য রামানন্দবাবু আমাকে ২০০ টাকা দিয়েছেন। তোমরা যা দেবে আমি শিরোধার্য করে নেব, কিন্তু একেবারে বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করিনে।'[২০] খেয়াল করে দেখবার যে, সরাসরি কত টাকা তিনি চান সেটা না-বললেও 'প্রবাসী' তাঁকে কত সাম্মানিক দেয় সেকথাটা কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী' এই গল্পের জন্য কত সাম্মানিক দিয়েছিল তাঁকে তা বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই, কিন্তু এই চিঠির পর নিশ্চয় এর থেকে খুব কম কিছু দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না!

আশ্বিন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'অলকা' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' নাটকটি প্রকাশিত হবার পর তার সাম্মানিক মূল্য হিসেবে দেড় শত টাকার একটি চেক সজনীকান্ত দাস (১৯০১-১৯৬২) রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে রবীন্দ্রনাথ খানিকটা প্রসঙ্গহীনভাবে এক আশ্চর্য বাক্য লিখেছিলেন তাঁকে, 'সর্বত্র লেখা দিয়ে থাকি নিস্পৃহ ভাবে। পরিবর্তে মূল্য যদি পাই সম্মানের কথা বিচার করি নে।'[২১] সজনীকান্তের পাঠানো চিঠিটিতে সম্মান-অসম্মানের কোনো প্রসঙ্গই ছিল না, অপ্রসঙ্গত লেখা এই বাক্যটির মধ্যে দিয়ে তাই যেন ধরা পড়ে এক পেশাদার লেখকের কাঠিন্য ও তার আড়ালে এক সংবেদনশীল মানুষের বেদনার চকিত বিচ্ছুরণ। 'পেশাদার' লেখকেরা হিসেব-বুঝে টাকা নেন বলেই সম্মানের কথাটি নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে তাঁদের চলে না। এই বাক্যের অন্তর্গত বেদনা আমাদের ছুঁয়ে যায় !

পত্রিকায় লেখালেখির মতো, গ্রন্থ প্রকাশ ও বিপননের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একটা সময়ের পর সদর্থে 'প্রফেশনাল' হয়ে উঠতেই চেয়েছিলেন, সেকথাটাও বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রায় গোটা উনিশ শতক জুড়ে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশিত হয়েছে হয় নিজের অথবা স্বজন-বন্ধুদের উদ্‌যোগে ও খরচে। ব্যতিক্রম আছে কিছু, যেমন *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬) প্রকাশিত হচ্ছে পীপ্‌ল্‌স্ লাইব্রেরি থেকে, *চিঠিপত্র* (১৮৮৭) বের করছেন শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী অ্যান্ড্ কোং, *পঞ্চভূত* (১৮৯৭) বেরোচ্ছে সুর কোম্পানি থেকে। বিশ শতকের একেবারে শুরুতে (১৯০২) এই দায়িত্ব কতকটা স্থায়ী ভাবে বর্তায় মজুমদার লাইব্রেরির কাঁধে। বছর ছয়েক বাদে, ১৯০৮ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের হাতে এই দায়িত্ব তুলে দেন রবীন্দ্রনাথ (উভয় পর্বেই বেশ কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণ আছে অবশ্য)। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বাংলা বই প্রকাশের স্বত্ব একচ্ছত্রভাবে গ্রন্থনবিভাগই লাভ করে। (পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।) এর মধ্যে একমাত্র ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের আইনত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাছাড়া মূলত মৌখিক কথাবার্তা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমেই রয়্যালটি ও অন্যান্য বিষয়ে বোঝাপড়া হয়ে থাকত।

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজের বইয়ের পণ্যমূল্য বিষয়ে অল্পে অল্পে সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯০০ সালের আগস্ট মাসে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে এক তারিখহীন চিঠিতে তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন :

আমার কপিরাইট বিক্রি করার কথাটা চিন্তা কোরো এবং পার ত চেষ্টাও কোরো। গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিসর্জ্জন ও রাজা ও রাণী স্বতন্ত্র আকারে বাজারে আছে এবং বর্ত্তমান সংস্করণ গুরুদাসকে বিক্রয় করেছি – তেমনি কণিকা থেকে ক্ষণিকা পর্য্যন্ত পাঁচখানি সম্পূর্ণ নূতন বই আমার হাতের কাছেই আছে এবং ব্যবস্থা করে বিক্রি করতে পারলে পূজার কাছাকাছি কিছু ঘরে আস্‌বার সম্ভব। In fact গুরুদাস ঐ বইগুলির জন্যে বারম্বার দূত প্রেরণ করচে কিন্তু লোভ সম্বরণ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।[২২]

'কপিরাইট' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে যে কেবল 'সচেতন' হয়ে উঠছেন তা নয়, নতুন বইগুলি 'হাতে' রেখে দিচ্ছেন তিনি, বারম্বার দূত পাঠানো সত্ত্বেও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বই-বিক্রির সংস্থা 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স'কে সে বই দিচ্ছেন না এই আশায় যে অন্য কোথাও থেকে যদি বেশি বিনিময়মূল্য পাওয়া যায়! পরবর্তীকালে মজুমদার লাইব্রেরির প্রতি তাঁর অনাস্থারও অন্যতম কারণ হয়ে উঠবে অর্থ-সংক্রান্ত টানাপোড়েনই। মজুমদার লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের অগ্রজ এবং নিজের বিশেষ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ১৭ জুলাই ১৯০৭-এ একটি কঠোর চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেন, 'কাব্যগ্রন্থ গল্পগুচ্ছ প্রভৃতির হিসাব শৈলেশ দেয় নাই এবং দিবেও না তাহা আমি জানি – ঐ সকল গ্রন্থের উপস্বত্ব শৈলেশ সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে ও অবাধে ভোগ করিয়া আসিয়াছে – আর কোনো ব্যক্তি যদি এরূপ কাণ্ড করিত তবে শৈলেশ তাহার আচরণকে কি নাম দিত !'[২৩] এমনকী শ্রীশচন্দ্রের মতো ঘনিষ্ঠসুহৃদের সঙ্গে বিচ্ছেদ-আশঙ্কাও নিজের ন্যায্য প্রাপ্য নিয়ে ক্ষোভ জানাবার পথে অকারণ দ্বিধার সৃষ্টি করে উঠতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের 'গ্রন্থ' বিষয়ে চর্চা করতে গেলে তাই গ্রন্থের অর্থনীতির কথাটা ভুললে একেবারেই চলে না। নইলে এটা বোঝা যাবে না যে কেন গ্রন্থরূপের এরকম খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি ব্যস্ত হচ্ছেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ১০ কার্তিক ১৩২৩(২৮ অক্টোবর ১৯১৬) তারিখে লেখা একটা চিঠিতে যেমন নির্দেশ দেবেন তিনি, 'মণিলালকে এবং ইন্ডিয়ান প্রেসকে একটা কথা বলে দিস্ যে, আমার বইয়ের মলাটে যদি প্রকাশের তারিখ না বের হয় তা হলে কপিরাইট নিয়ে ভারি মুস্কিল বাধে। জগৎসংসারের আর সর্ব্বত্রই বইয়ের সঙ্গে তার তারিখ ছাপা থাকে কেবল বঙ্গসাহিত্যে কেন যে এই নতুন বিধান তা ত বল্‌তে পারিনে।'[২৪] কিংবা এ কথাও বোঝা মুশকিল হবে, কেন নতুন বই বেরোবার পর প্রিয় বন্ধুকে তার একটা অনুকূল সমালোচনা লিখে ফেলার জন্যে তিনি এইভাবে অনুরোধ করবেন যেভাবে করছেন প্রিয়নাথ সেনকে, *ক্ষণিকা* প্রকাশিত হবার পর ১৯০০ সালের ৮ আগস্ট

লেখা চিঠিতে, 'যারা স্বাধীনরসগ্রাহী লোক নয় তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্চেনা এটা [*ক্ষণিকা*] তাদের ভাল লাগা উচিত কি না – সুতরাং পনেরো আনা পাঠক ইতস্ততঃ করচে...একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে।'[২৫] রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের বইয়ের 'সমালোচনা'টা পাঠকের ইতস্তত-বোধকে অনুকূল আশ্রয় দেবার একটা মাধ্যম, বই বিক্রির সঙ্গেই যার বিশেষ যোগ।

যেমন সমালোচনা, তেমন বিজ্ঞাপন। নিজের বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ কখনই কার্পণ্য করেননি। শুধু তাই না, সেইসব বিজ্ঞাপন কখন কোন ভাষা-ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হবে, প্রকাশককে সে বিষয়েও নানা সময়ে পরামর্শ দিয়ে গেছেন তিনি। আপাতত একটা উদাহরণ এ প্রসঙ্গে দেওয়া চলে। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংকলন *চয়নিকা* প্রকাশিত হয় ১৯০৯-এর সেপ্টেম্বরে। কিন্তু সে বই বেরোবার আগেই প্রকাশকের তরফ থেকে 'ভারতী' পত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় *চয়নিকা*-র একটি বিজ্ঞাপন বের হয়, এই বয়ানে:

> কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসমুদ্র হইতে রত্নরাজি বাছিয়া বঙ্গবাণীর অপরূপ কণ্ঠমালা রচিত হইয়াছে। কবিবরের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ পাঠে যাঁহাদের সময় বা সুবিধা নাই তাঁহাদের পক্ষে এই চয়নিকা (selection) বিশেষ উপযোগী। ইহার মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিই স্থান পাইয়াছে। ইহাতে আটখানি মৌলিক বহুবর্ণে মুদ্রিত পরিকল্পনা চিত্র ও কবিবরের একখানি আধুনিক চিত্র আছে। আর্ট কাগজে ছাপা সুন্দর বাঁধাই রাজ সংস্করণের মূল্য চারি টাকা, সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা।

লক্ষ করার বিষয় হল, বইটি যে তখনও অবধি প্রকাশিত হয় নি, এই কথাটা এই বিজ্ঞাপন থেকে বোঝাবার উপায় নেই। এটা খেয়াল করা মাত্র, রবীন্দ্রনাথ তৎকালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের দায়িত্বপ্রাপ্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বই প্রকাশের আগেই আর এই বিজ্ঞাপন না-ছাপাবার পরামর্শ দিচ্ছেন, তাঁর মনে হচ্ছে পাঠক বই কিনতে এসে দোকান থেকে ফিরে যাবে, এটা ব্যবসার পক্ষে সুলক্ষণ নয়। চারুচন্দ্রকে লিখছেন কবি, 'শৈলেশ বলছিল তোমাদের বিজ্ঞাপন পড়ে অনেকে বই কিন্‌তে এসে ফিরে যাচ্চে – সেটা ক্ষতিজনক। শুনচি তোমরা মণিলালের কাছে, বিতরণের জন্য, কতকগুলি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছ – কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞাপন বিলি করা আমি শ্রেয় বোধ করি নে।'[২৬] বই কিনতে এসে আগ্রহী পাঠক ফিরে গেলে তা ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকর নাকি উপযোগী, তা নিয়ে তর্ক থাকতেও পারে, কিন্তু জরুরি কথাটা হচ্ছে, বইয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারেও যে

লেখকের স্পষ্ট মতামত থাকা সম্ভব, এবং তা স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশককে জানানো যায়, বাঙালির গ্রন্থপ্রকাশের সংস্কৃতিতে এটা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অবদান।

কোনো-একটি বই প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর তা অনায়াসে পাঠকের হাতে না-পৌঁছোলে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিরক্ত হতেন। *আকাশ-প্রদীপ* বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯-এর এপ্রিলে। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো বই বেরোবার পর তালিকা ধরে কবির ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষের কাছে তা পাঠানো হত। সেইরকম কারুর কাছ থেকে কবি জানতে পারেন, বই যথাসময়ে তাঁর কাছে পৌঁছোয় নি। কবির ধারণা হয়, হয়তো-বা সাধারণ পাঠকের কাছেও বই পৌঁছোচ্ছে না ঠিকমতো। এরপর কবির মনোভাবটা ঠিকঠাক জানা যায় কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে(১৯৮৮-১৯৬১) লেখা তাঁর কবি-সহযোগী সুধাকান্ত রায়চৌধুরী(১৮৯৬-১৯৬৯)-র লেখা একটি চিঠি থেকে। ২৩ এপ্রিল ১৯৩৯-এ পুরী থেকে (কবি এই সময়ে পুরীতে অবস্থান করছিলেন) সুধাকান্ত লিখছেন :

> সম্প্রতি প্রকাশিত "আকাশপ্রদীপ" বইটি ছাপা হলেও, সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত এবং যাদের কাছে লিষ্ট অনুযায়ী পাঠাবার কথা, না পাঠানোতে পূজনীয় গুরুদেবের মন বিশেষ উদ্‌বিগ্ন এবং তিনি রীতিমত বিরক্ত হয়ে আছেন। গতকাল চারুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দেওয়া হয়েছে; আজ কিশোরীবাবুকে যে চিঠি দিলেন তার কপি এইসঙ্গে পাঠালেম পড়ে দেখ্‌বেন। গুরুদেব বল্‌চেন "বই ছাপিয়ে যদি যথা রীতি তার প্রচার এবং সাধারণে তার প্রকাশ করায় প্রচুর গড়িমিশির[য] এবং অব্যবস্থার কারণ ঘটে থাকে তাহলে, যে সব বাকী বই ছাপাবার আয়োজন হচ্ছে তা ছাপা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।"
>
> আপনি দয়া করে এসম্বন্ধে যা কর্তব্য অবিলম্বে করবেন। গুরুদেবের নির্দ্দেশানুযায়ী এই চিঠি আপনাকে দিচ্ছি।[২৭]

রবীন্দ্রনাথের ক্রোধের পরিমাণ এই চিঠির ভাষা থেকেই স্পষ্ট হয়। এই চিঠিতে একই দিনে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে (১৮৯৩-১৯৪০) স্বয়ং কবির লেখা যে-চিঠিটির উল্লেখ আছে তা পাওয়া যাবে আকাদেমি পত্রিকার ৫ নং সংখ্যায়, সেখানে অবশ্য এতটা কঠোর ভাষাপ্রয়োগ নেই, তবে সেখানেও স্পষ্ট করে তাঁর বিরক্তির কথাটি কবি জানাবেন, 'আকাশপ্রদীপ একখানা চোখে পড়েছে কিন্তু সাধারণ্যে প্রকাশ হয়েছে কিনা সন্দেহ হয়।... আপিসে কার হাতে ভার জানি নে — বই প্রকাশের কাজে তার যে কোনো গা আছে এমন প্রমাণ পাচ্চি নে।... *বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচারের জন্যে যে উদ্যোগের প্রয়োজন*, তার কোনো চেষ্টা হয়েছে বলে আমার

মনে হয় না।’[২৮] (বাঁকানো হরফ আমাদের) রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘গ্রন্থনির্মাণ’ কেবল বইটির মুদ্রণকার্যটুকু নয়, বইয়ের যথাযথ বিপননের দিকটিকে, প্রচারের দিকটিকে তিনি একইরকম গুরুত্ব দিয়ে দেখে এসেছেন আজীবন।

নানা অর্থে বাংলা গ্রন্থনির্মাণ-প্রক্রিয়ায় যে পেশাদারিত্ব আমদানি করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আজও অধিকাংশ বাঙালি প্রকাশক ও লেখকেরা তার থেকে শতযোজন দূরে অবস্থান করেন, একথা দুঃখের সঙ্গেই কবুল করা যায়।

গ. শিল্পরূপ

টাকা দিয়ে যিনি বই কেনেন তিনি ‘রচনা’র শিল্পমূল্যের পাশাপাশি বইটির যে ‘বস্তুরূপ’ তার শিল্পমূল্যের জন্যেও দাম দেন, এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই মনে রাখতে চেয়েছেন। চেয়েছেন বলেই ছাপার ছোটখাট ভুলত্রুটি নিয়েও তার উদ্বেগ ছিল প্রকাণ্ড রকমের। বিশেষত বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় স্থাপিত হবার পর, যখন নিজের পূর্ণ অধিকারে এল ছাপার কাজটি, তখন ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতিতেই তিনি কীভাবে ধৈর্য হারাতেন তা আমরা আগেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের লেখা একটি চিঠির সূত্রে দেখেছি। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে *আকাশ-প্রদীপ* কাব্যগ্রন্থের একাধিক ‘প্রেসকপি’ সংরক্ষিত আছে। আমরা নিজেরা দেখেছি, তার মধ্যে একটি কপির ৩ নং পৃষ্ঠার উপরে সুধীরচন্দ্র করের স্বাক্ষর ও ’27.3.39’ তারিখ দেওয়া, এবং সুধীরচন্দ্র কর-এর হাতের লেখাতেই লেখা আছে ‘7th Proof’ ![২৯] একটি বই প্রুফ দেখা হচ্ছে সাত-সাত বার, বাংলা প্রকাশনার জগতে এ ঘটনা অতিদুর্লভ ! সেই সাত নম্বর প্রুফে কটি ভুল বেরিয়েছিল? আমরা গোটা প্রেসকপিটি খুঁটিয়ে দেখেছি : একটিও না ! নির্ভুল বই বের করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের এই আকুলতা তাঁর পেশাদারী মনোভাবেরই অংশ বলে আমরা মনে করতে চাই।

কিন্তু এও তো ঠিক, ছাপার ভুল কিছু হয়েই যায়। রবীন্দ্রনাথের বইতেও হত। ভুল যদি একেবারে শেষমুহূর্তে ধরা পড়ে তাহলে ‘শুদ্ধিপত্র’-র মাধ্যমে পাঠকের কাছে তা জানিয়ে দেওয়াই রীতি। রবীন্দ্রনাথের বইপ্রকাশের প্রথমযুগ থেকেই অনেক বইতে ‘শুদ্ধিপত্র’ ব্যবহার করতে হয়েছে, যেমন *বন-ফুল* (১৮৮০), *প্রভাত সঙ্গীত* (১৮৮৩), *গোড়ায় গলদ্* (১৮৯২), *গদ্যগ্রন্থাবলী* প্রথম ভাগ (‘বিচিত্র প্রবন্ধ’, ১৯০৭), *গদ্যগ্রন্থাবলী,* ১৫শ ভাগ

('শব্দতত্ত্ব', ১৯০৯), *শান্তিনিকেতন* ২য় খণ্ড (১৯০৯) প্রভৃতি। ঘটনা হল, এই শুদ্ধিপত্র বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের একটি স্থির আদর্শগত অবস্থান ছিল। ১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের তৎকালীন সহসচিব কিশোরীমোহন সাঁতরাকে একটি চিঠিতে কবি লিখছেন, 'তোমরা শুদ্ধিপত্রকে ব্যর্থ করেছো – নিজেদের লজ্জা গোপন করবার জন্যে। এ চলবে না। ও পত্রকে হয় বইয়ের আরম্ভেই, নয় সূচিপত্রের আরম্ভে দেওয়াই চাই, কিছুতে যেন তার অন্যথা না হয়।'[৩০] কোন বই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখছেন তা বলা মুশকিল, কেননা এই সময়ের অব্যবহিত আগে বা পরে কোনো বইতেই 'শুদ্ধিপত্র' যুক্ত হয়ে নেই। হয়তো কোনো বইয়ের নতুন কোনো পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে বলে থাকবেন এই কথা। কিন্তু, এইটাই রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের অবস্থান, উপরে যে ক'টি বইয়ের নাম বলা হল, তাদেরও প্রত্যেকটিতে 'শুদ্ধিপত্র' আছে বইয়ের একেবারে শুরুতে। রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশের প্রথম দিকের এইরকম কয়েকটি উদাহরণ *বন-ফুল* (১৮৮০), *প্রভাত-সঙ্গীত* (১৮৮৩) বা *গোড়ায় গলদ্* (১৮৯২)-এর প্রথম সংস্করণ। আমরা *কড়ি ও কোমল*-এর দ্বিতীয় সংস্করণের (জুলাই ১৮৯৪) গোড়ায় 'বিজ্ঞাপন' অংশে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কী লিখেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। প্রসঙ্গত জানানো যাক, *কড়ি ও কোমল*-এর দ্বিতীয় সংস্করণটি আসলে তিনটি বইয়ের একত্র সমাহার। *কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান* এবং *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* (এই সংস্করণে আখ্যাপত্র ও অন্যত্র 'ভানুসিংহের পদাবলী' নামে উল্লিখিত!) বই তিনটির নির্বাচিত অংশের একত্র প্রকাশ হল ১৮৯৪-এর জুলাই মাসে। এই বইতে অনেকগুলি ভুল থাকার কারণে বইয়ের গোড়ায় জুড়তে হল প্রায় কুড়ি পঙ্ক্তির লম্বা শুদ্ধিপত্র। তার আগে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন, 'নানা কারণে গ্রন্থকার নিজে প্রুফ দেখিতে না পারায় অনেক গুলি গুরুতর ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ যদি শুদ্ধিপত্র দেখিয়া গ্রন্থপাঠের পূর্ব্বে সেগুলি সংশোধন করিয়া রাখেন তবে পড়িবার সুবিধা হইবে।' গ্রন্থনির্মাণ-গত 'ত্রুটি' পাঠকের কাছে প্রারম্ভেই স্বীকার করার সততা রবীন্দ্রনাথের 'প্রফেশনালিজ্‌ম'-এরই চিহ্ন।

মধ্যবয়সে প্রকাশিত *শান্তিনিকেতন* ২য় খণ্ড (১৯০৯) বইটির শুদ্ধিপত্রটি আরও ব্যঞ্জনাময়। এই বইতে 'ভ্রম সংশোধন'-এর যে-পৃষ্ঠাটি 'সূচিপত্র'-এর ঠিক পরেই যুক্ত করা হল, তাতে কিন্তু ওই ২য় খণ্ডের কোনো মুদ্রণপ্রমাদ সম্পর্কে জানানো হল না, ওখানে জানানো হল *শান্তিনিকেতন* ১ম খণ্ডের দুটি মুদ্রণপ্রমাদের বিবরণ! বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী এই দুটি খণ্ডেরই প্রকাশ অবশ্য একই দিনে, ১৯০৯-এর ২৪ জানুয়ারি। কিন্তু নিশ্চয়ই প্রথম খণ্ডটির মুদ্রণকার্য আগেই সমাপ্ত হয়ে গেছিল, তারপর ধরা পড়ে সেই ভুল দুটি, দ্বিতীয়

খণ্ডের গোড়ায় তাদের সম্পর্কে জানিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। পাঠকের কাছে দায়বদ্ধতার এই রূপটি বাংলা প্রকাশনায় খুব সুলভ নয়, অথচ সদর্থে পেশাদারিত্ব এই দায়বদ্ধতা ছাড়া কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না।

পেশাদারি দায়বদ্ধতার আর-একটি চমকপ্রদ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এখানে। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-প্রাসঙ্গিক একমাত্র বই *বিশ্ব-পরিচয়* প্রকাশিত হল ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে। বিজ্ঞানের বই বলেই এর মধ্যে কিছু-কিছু ত্রুটি থেকেই যাচ্ছিল। আগস্টে বই বেরোবার এক বছরের মধ্যেই তাই দু-দুবার 'সংশোধিত ও পরিবর্তিত' সংস্করণ বের করতে হল। 'শ্রাবণ ১৩৪৫' (১৯৩৮-এর জুলাই) তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হবার পরও কোনো কোনো বিজ্ঞানবিশারদ রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়ে দিলেন, এতেও কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ 'সংশোধিত ও পরিবর্তিত' সংস্করণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই সবে যে তৃতীয় সংস্করণটি বেরোল তার কী হবে? ৮ জুলাই কিশোরীমোহনকে কবি স্পষ্টই লিখলেন, 'বিক্রির যা বাকি আছে তাড়াতাড়ি তা বিক্রি করে ফেলা দোকানদারি হবে।'[৩১] রবীন্দ্রনাথ অচিরেই কিছুটা বদল করে *বিশ্ব-পরিচয়*-এর নতুন প্রেসকপি পাঠিয়েও দিলেন গ্রন্থালয়ের দপ্তরে। কিন্তু আগস্ট মাসের প্রায় শেষের দিকেও সেই সংস্করণ যখন বের হল না, ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ২৪ আগস্ট কিশোরীমোহনকে লিখলেন, এবার আরও কঠোর ভাষায় :

> অনেকদিন হোলো বিশ্বপরিচয়ের ফর্মাগুলো তোমাকে পাঠানো হয়েচে কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। আশঙ্কা করচি তোমরা চেপে রেখে পুরোনো বইগুলি শেষ করতে চাও। তা যদি হয় অত্যন্ত লজ্জা পাব। *যাদের পুরোনো সংস্করণ বেচেছি তাদের কাছে আমি অপরাধী*— আরও কি অপরাধ বাড়াতে চাও?[৩২] [বাঁকানো হরফ আমাদের]

বইতে ভুলভ্রান্তি হয়, পরবর্তী সংস্করণে সেই ভুল শুধরে নেওয়াও হয়, এটিই দুনিয়াজোড়া দস্তুর। কিন্তু সেই 'ভ্রান্তি' চোখে পড়তেই লেখক নিজেই বই বিক্রি বন্ধ রাখার উদ্‌যোগ করছেন, এমনকী ক্রেতাবর্গের কাছে নিজেকে অপরাধী ভাবছেন, এই উদাহরণ অন্তত বাংলা প্রকাশনার জগতে খুব সুলভ নয় বলেই মনে হয়।

'ক্রেতাবর্গ'কে এতখানি গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি কোনো কোনো বিশেষ ক্রেতা কীভাবে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের শিল্পরূপকে প্রভাবিত করতেন সেই কথাটাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়(১৮৭২-১৯৩১) রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ পাঠক। বই-প্রকাশ সংক্রান্ত নানা ফরমাশ, মন্তব্য, সমালোচনায় ভরে থাকত রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২২ ফাল্গুন (৪ মার্চ ১৮৯৬), *চিত্রা* বেরোবার আগে যেমন লিখছেন তিনি 'দোহাই আপনার আপনি আর পাতলা খারাপ কাগজে বহি

ছাপিবেন না। প্রথম সংস্করণের সোনার তরী, মানসী, রাজা ও রাণী [য] পড়িয়া আমাদের মেজাজ অত্যন্ত নবাবী ধরণের হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এটার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বহির কাগজ নির্বাচন করিবেন।'[৩৩] পাতলা খারাপ কাগজে এর আগে রবীন্দ্রনাথ কোন বই ছেপেছিলেন বলা মুশকিল। এখানে প্রভাতকুমার সম্ভবত কোন বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের কথা বলছেন। যাইহোক, এই সংগত আবদারকে মান্যতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত করলেন প্রভাতকুমারকে যে *চিত্রা* উৎকৃষ্ট কাগজেই ছাপা হচ্ছে। সেটি জানা যায় প্রভাতকুমারের লেখা ২৫ ফাল্গুন (১৩০২ব)-এর চিঠির এই বাক্যটি থেকে, 'নতুন বহির কাগজ ভাল হইতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম।' পাঠক শুধু 'কৌতুহলভরে' কবিতা পড়বেন না, বইয়ের ছাপা-বাঁধাই-সজ্জায় তিনি অংশ নেবেন, এই অধিকার রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

চিত্রা প্রকাশিত হবার পর তার কাগজও প্রভাতকুমার পছন্দ করে উঠতে পারেন নি অবশ্য, লিখেছিলেন এই ছাপা 'সোনার তরীর মত নহে', আর সেইসঙ্গে জানিয়েছিলেন (৪ চৈত্র ১৩০২/১৬ মার্চ ১৮৯৬) কীভাবে ভালো ছাপা সম্ভব তার কারিগরী-পরামর্শ, 'আমি সাহিত্য সম্পাদকের নিকট শুনিয়াছিলাম, সোনার তরী শুষ্ক কাগজে ছাপা হইয়াছিল; ভিজাইলে প্লেট নষ্ট হইয়া যায়। শুষ্ক ছাপা কিছু কঠিন, সাবধানতার প্রয়োজন, নহিলে কাগজ সরিয়া যায়। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কি শুষ্ক ছাপা হইতে পারে না?'[৩৪] প্রভাতকুমারের মতো সুহৃদ ও একনিষ্ঠ পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া এরকম পরামর্শ রবীন্দ্রনাথের মুদ্রণ-প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধতর করেছে। তার সঙ্গে একেবারে প্রথম যুগ থেকে এই বিষয়ে তাঁরও আগ্রহ মুদ্রণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ অর্থেই 'বিশেষজ্ঞ' করে তুলেছিল, সেই কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক প্রেমতোষ বসুকে লেখা একটা চিঠি এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি। ১৫ বৈশাখ [১৩০৭ব/২৭ এপ্রিল ১৯০০] তাঁকে কবি লিখছেন, 'ডিকেন্‌সনদের একপ্রকার কাগজ আছে, তাহার বর্ণনা Orange Label Antique Laid এবং মলাটের কাগজ Wool Fibre Antique Laid কাগজটা যদি ডবল ক্রাউন সাইজে পাওয়া যায় ত দেখিবেন — নতুবা সেই Primrose Labelটাই কিনিবেন।'[৩৫] গ্রন্থনির্মাণের খুঁটিনাটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই জানাশোনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়!

এই বিশেষজ্ঞতা যে তাঁর বইয়ের শিল্পরূপকে প্রভাবিত করেছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের বই, তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়েই বিশিষ্ট, সাহিত্যের শিল্পরূপের দিক থেকে তো বটেই, গ্রন্থের শিল্পরূপের দিক

থেকেও। তার পিছনে রয়ে গেছে স্বয়ং লেখকেরই সবচেয়ে বড়ো অবদান। ১৯০৩-এর শেষ থেকে খণ্ডে খণ্ডে যে *কাব্য-গ্রন্থ* বেরোবে, তাঁর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬)। সেই 'সম্পাদনা'-কাজে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ভূমিকা কতটা ছিল তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ এখানে দিলে বোঝা যাবে, গ্রন্থের শিল্পরূপের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার বিষয়টি। *কাব্য-গ্রন্থ*-এর সপ্তম ভাগে বেরোবে শিশু-কিশোরদের লেখা কবিতা। তাই বিশেষভাবে সেই খণ্ডের ছাপার জন্যে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ গেল মোহিতচন্দ্রের কাছে। ১৩ আগস্ট ১৯০৩-এ কবি তাঁর সম্পাদককে লিখলেন :

> শিশুখণ্ডে ছন্দগুলিকে অংশ ভাগ করে ছাপবেন। ত্রিপদীকে তিন লাইনে ছড়িয়ে দেবেন — "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" প্রভৃতি কবিতার বড় লাইনগুলোকে দুই লাইনে ভেঙে দেবেন। একটা কবিতা যে পাতায় শেষ হবে সে পাতায় অন্য কবিতা আরম্ভ করবেন না। দুই লাইনের মাঝখানে বেশি করে ফাঁক রাখবেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বোধ হয় ১৮ লাইনের বেশি ধরবে না।[৩৬]

উপরের পত্রাংশতে যে চার বা পাঁচটি নির্দেশ আছে, খেয়াল করলে দেখা যাবে তাদের প্রত্যেকটির পিছনে আছে উদ্দিষ্ট পাঠকের জন্যে লেখকের ভাবনা। এই বই পড়বে শিশু-কিশোররা, তাই লাইনের মাঝে ফাঁক হবে বেশি, লাইনগুলোকে ভেঙে দিতে হবে চোখের আরামের জন্যে, একই পাতায় দ্বিতীয় কবিতা শুরু করা যাবে না। পাঠকের জন্যে গ্রন্থনির্মাণ-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এই দায়বদ্ধতা এবং সর্বক্ষণের পূর্ণ সচেতনতাই তাঁর বইয়ের বস্তুরূপকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

আমাদের গবেষণায় এই ভিন্ন মাত্রাটি এবং তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ভূমিকার কথা বিস্তারিতভাবে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করা হবে।

টীকা ও তথ্যপঞ্জি

১. ১৯০৮-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি হল : *প্রজাপতির নির্বন্ধ* (গদ্যগ্রন্থাবলী ৮ম ভাগ। প্রকাশকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি), *প্রহসন* (গদ্যগ্রন্থাবলী, ৯ম ভাগ। ১৬ এপ্রিল) *রাজা প্রজা* (গদ্যগ্রন্থাবলী ১০ম ভাগ। ৩০ জুন) *সমূহ* (গদ্যগ্রন্থাবলী ১১শ ভাগ। ২৫ জুলাই), *স্বদেশ* (গদ্যগ্রন্থাবলী ১২শ ভাগ। ১২ অগাস্ট), *সমাজ* (গদ্যগ্রন্থাবলী ১৩শ ভাগ। ৭ সেপ্টেম্বর), *গান* (২০ সেপ্টেম্বর), *শারদোৎসব* (২০ সেপ্টেম্বর), *গল্পগুচ্ছ* প্রথম ভাগ (ইন্ডিয়ান প্রেস এডিশন। ২৮ সেপ্টেম্বর), *গল্পগুচ্ছ* দ্বিতীয় ভাগ (ইন্ডিয়ান প্রেস এডিশন, ১২ অক্টোবর), *শিক্ষা* (গদ্যগ্রন্থাবলী, ১৪শ ভাগ। ১৭ নভেম্বর), *মুকুট* (৩১ ডিসেম্বর)

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* দশম খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ব, পৃ. ৩৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, বৈশাখ১৩৬৮ব, পৃ. ১২০

৬. সমগ্র লেখাটি পাওয়া যাবে : *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* পঞ্চদশ খ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৪১১ব, পৃষ্ঠা ৯৩৫-৯৩৭

৭. নির্মলকুমারী মহলানবিশ, *কবির সঙ্গে য়ুরোপে,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬ব, পৃ.২৫৫-৫৬

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব, পৃ. ২৬১

৯. মৈত্রেয়ী দেবী,*মংপুতে রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬০, পৃ. ১৭

১০. সুধীরচন্দ্র কর, *কবিকথা,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, মে ২০১৪, পৃ. ৪৬

১১. পুলিনবিহারী সেন, 'সম্পাদক ও কবি', সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮ব, পৃ.৪৫

১২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৬

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সমাপন", 'বিবিধ প্রসঙ্গ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮ব, পৃ. ৫৮০

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ৬৯-৭০

১৫. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ভক্ত ও কবি,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৮

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব, পৃ. ২৮৮

১৭. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ২৮, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৪০২ব, পৃ. ৬৯

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯৩ব, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

২০. অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, শারদীয় দেশ, ১৩৭৩ব, পৃ. ১৮

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, ঊনবিংশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪১১ব, পৃ. ১৯

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ব, পৃ. ১০৮-১০৯

২৩. সুশীল রায় সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩ব, পৃ. ১৮৯

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ৭৫

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ব, পৃ. ১১৩

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪০৭ব, পৃ. ৭

২৭. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, Bengali Correspondence, File no. 169(ii)

২৮. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্র, মে ১৯৯৩, পত্র নং ১১৭, পৃ. ৩৯

২৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'Press Proof', Serial no. 1(ii).

৩০. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্র, মে ১৯৯৩, পত্র নং ৪, পৃ. ৪

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, পত্র নং ৯০, পৃ. ৩১

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, পত্র নং ৯১, পৃ. ৩১

৩৩. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ব, পৃ. ১৫৫

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩৫. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, Bengali Correspondence, File no. 455

৩৬. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮ব, পৃ. ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিজস্ব উদ্‌যোগ(১৮৭৮-১৯০১)

ক. সূচনাকথা

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে নিজের নামের টাইপ জোগাড় করে, তাতে নিজেই কালি লাগিয়ে নিজেই ছাপ মেরে, ছাপা অক্ষরে নিজের নাম দেখার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল একেবারে ছোটবেলায়, *জীবনস্মৃতি*-র সূত্রে সে কথা আমরা জানি। আর শুধু নাম নয়, নিজের রচনা ছাপার অক্ষরে দেখার জন্যেও তাঁকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শকাব্দ [১২৮১ব] সংখ্যায় প্রকাশিত 'অভিলাষ' কবিতাটিকেই যদি রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা ধরি তাহলে তখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। অবশ্য পত্রিকায় বা গ্রন্থে মুদ্রিত অবস্থায় নিজের নাম ও নিজের লেখাটিকে দেখবার অভিজ্ঞতা ঠিক কেমন সেটা পরোক্ষে আরও কিছু আগে জানা হয়ে যাবার কথা, ছেলেবেলায় তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৯-১৯২৫) প্রথম বই *কিঞ্চিৎ জলযোগ* বেরোচ্ছে ১৯৭২-এ, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১১। অন্যদিকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তো ছিলই, তাঁর আশেপাশের বহুমানুষের লেখা সে পত্রিকায় নিয়মিত বেরোত।

তবে, মুদ্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা স্বচ্ছ হতে শুরু করে হয়তো 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের কালে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর(১৮৫০-১৮৯৮) স্ত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর(১৮৬১-১৯২০) স্মৃতিকথায় 'ভারতী'র শুরুর দিনগুলোয় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা জানা যায় : 'সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া "ভারতী" সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাঁহাকে'[অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] লইয়া ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে যোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।'[1] 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৮৭৭-এর জুলাই, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৭। ছাপা, প্রুফ দেখা, পাতা সাজানো, অলংকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে হাতে-কলমে জানাশোনার শুরুটা এই সম্পাদনা-সহায়তার সূত্রেই হয়ে থাকবে তাঁর। শরৎকুমারী পূর্বোক্ত লেখাটিতেই লিখেছেন কীভাবে 'অনেক গবেষণার পর' আর্ট স্টুডিওর

দেবী সরস্বতীর ছবির আদলে ‘ভারতী’র মলাটের ব্লক তৈরি হয়ে ওঠে। সেই গবেষকদের মধ্যে ১৭ বছরের এক তরুণও যে অনায়াসে ঠাঁই পেয়ে যাচ্ছিলেন সেই কথাটা নিশ্চয়ই স্মরণীয়।

তবে ঘটনাচক্রে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুটি বই যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখন তিনি নিজে বঙ্গদেশের বাইরে। তাঁর প্রথম বই *কবিকাহিনী* প্রকাশিত হচ্ছে (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী) ১৮৭৮-এর ৫ নভেম্বর, রবীন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে। দ্বিতীয় বই *বনফুল*-এর প্রকাশ ১৮৮০-র ৯ মার্চ, রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেত থেকে ভারতবর্ষের পথে, জাহাজে। প্রথম বইটি প্রকাশ করেছিলেন বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বই-এর আখ্যাপত্রে প্রকাশক হিসেবে তাঁর নামই মুদ্রিত আছে। *বনফুল* প্রকাশের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন দাদা সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৫৯-১৯২২)। অবশ্য বইতে তাঁর নাম কোথাও নেই। তৃতীয় বই *ভগ্নহৃদয়* প্রকাশের সময় (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী ২৩ জুন ১৮৮১, অবশ্য প্রশান্তকুমার পালের অনুমান বইটি এর মাস দেড়েক আগেই প্রকাশিত হয়ে যায়) রবীন্দ্রনাথের বয়স ২০, বইটির মুদ্রণকার্য তদারকির ভারও যে এবার তিনি নিজেই তুলে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ বইটির পাণ্ডুলিপি ও প্রেসকপির মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে *ভগ্নহৃদয়*-এর যে পাণ্ডুলিপিটি[২] রাখা আছে সেটিই পাঠানো হয়েছিল প্রেসে, তার কয়েকটি পৃষ্ঠার ধারে ছাপাখানার উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ৩১তম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, ‘কপি ফেরত চাই/নষ্ট করা না হয়’। কিংবা ৩৯তম পৃষ্ঠায় কয়েকটি লাইনকে চিহ্নিত করে তাঁর মন্তব্য, ‘এইটুকু ছাপাইবে না’।

ভগ্নহৃদয় বিষয়ে আরও দু-একটা কৌতুহলজনক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত *রবীন্দ্রকথা* বইতে লিখেছিলেন, ‘এই পুস্তক প্রকাশের পর যুবকমহলে, ছাত্রমহলে, রবীন্দ্রনাথের নাম পড়িয়া গেল। তিনি বাংলার “শেলী” হইলেন – তাঁহার বেশ, তাঁহার কেশ, তাঁহার চসমা সবই অনুকৃত হইতে লাগিল।’[৩] বস্তুত, তখনকার পাঠক ও সমালোচক বইটিকে কীভাবে দেখছিল, তার একটি ‘সরকারি’ প্রমাণ দেওয়া যায়। ভারত সরকার ১৮৭৪ সাল থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে প্রকাশিত বইপত্রের উপর একটি করে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠাবার আদেশ দেয়। ১৮৮০ সাল থেকে এই রিপোর্ট লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন চন্দ্রনাথ বসু, তিনি ছিলেন তৎকালীন বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক। ১৮৮১-র রিপোর্টে *ভগ্নহৃদয়* সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লেখেন যে, ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’র একটা বৈশিষ্ট্য হল ‘vagueness’ বা অস্পষ্টতা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের *ভগ্নহৃদয়* স্পষ্ট ও জীবনঘনিষ্ঠ, ‘The characters introduced it look like real living beings, with

mental and bodily features that may be clearly distinguish'।[৪] রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই রিপোর্টের কথা জানা সম্ভব ছিল না কিন্তু বইটিকে সেকালের বুদ্ধিজীবীমহল কীভাবে দেখছিল তার একটা জরুরি সূত্র হয়তো এর থেকে আজ আমরা জানতে পারি। অন্যদিকে, *জীবনস্মৃতি*-র 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন, 'তখন মনে হইয়াছিল, লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে।...তখনকার পাঠকদের কাছেও এ-লেখা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই।' তা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বইটির কোনো স্বতন্ত্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-র 'অচলিত সংগ্রহ'-র প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত হয়ে বইটি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। কেন এরকম হল? বই-এর মুদ্রিত রূপ থেকে লেখকের মনস্তত্ত্বের সন্ধান করা সম্ভব, কিন্তু যে-বই মুদ্রিতই হল না, তার সন্ধানে বেরোলেও হয়তো লেখকের মনোরাজ্যের চৌহদ্দিতে পৌঁছনো যায় কখনও কখনও। প্রিয়নাথ সেন(১৮৫৪-১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের এইসময় পর্বের প্রিয়তম সুহৃদ। কতটা 'প্রিয়' সে স্বীকারোক্তি *ছিন্নপত্রাবলী*-র একটি চিঠির মধ্যে ধরা আছে, 'প্রি[য়] বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি।'[৫] প্রিয়নাথকে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে এই নির্ভরতা ও মুগ্ধতার ইতিহাস ধরা আছে। *ভগ্নহৃদয়* যে কখনই বেরোল না আর, তার কারণ, বইটিকে প্রিয়নাথ পছন্দ করেন নি! তাঁদেরই বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত(১৮৬১-১৯৪০)-র স্মৃতিচারণে তার সাক্ষ্য ধরা আছে, 'It was in deference to his [প্রিয়নাথ সেন] unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his early works from circulation and it has never been reprinted.'।[৬] প্রিয়নাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র সম্পাদনা করতে গিয়ে পুলিনবিহারী সেন অনুমান করেছেন এই বই *ভগ্নহৃদয়*। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং *জীবনস্মৃতি*-তে জানিয়েছিলেন, 'ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি[প্রিয়নাথ] আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন'।[৭] যখন পাঠক ও সমালোচক সকলেই বইটিকে পছন্দ করছেন, তখন শুধুমাত্র প্রিয়নাথের ঋণাত্মক মনোভাবের কারণে একটি বই আর ছাপাতেই চাইছেন না কবি, রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের ইতিহাসে এটি একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমি ঘটনা। প্রসঙ্গত, এই বইটিকে কবি কোনোদিনই আর পছন্দ করে উঠতে পারেননি। ১৯১১ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে রবীন্দ্রনাথের পুরনো বইগুলি নতুন করে ছাপার উদ্‌যোগ গ্রহণ করা হয়। সেইসময়ে এই বইটিরও ছাপা

শুরু হয়, রবীন্দ্রনাথকে প্রুফ পাঠালে তিনি তা সংশোধনও করেন, কিন্তু তারপর শেষে লিখে দেন, 'দোহাই ধর্ম্মের এটা ছাপিয়োনা !!' (দ্রষ্টব্য : চিত্র-২৩) এই মন্তব্যের পর *ভগ্নহৃদয়* পুনঃপ্রকাশের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

খ. বই-প্রকাশের অর্থনীতি

'মজুমদার লাইব্রেরি' রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশের দায়িত্ব পাওয়ার (১৯০৩) আগে পর্যন্ত সময়কালকে আমরা বলছি তাঁর নিজস্ব উদ্‌যোগের সময়। এই সময়ে তাঁর নিজের এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদের চেষ্টা ও খরচায় প্রকাশিত হয়ে এসেছে যাবতীয় বই। *কবিকাহিনী* ও *বনফুল* প্রকাশিত হচ্ছে যথাক্রমে বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ও দাদা সোমেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে, সে তো আগেই বলা হল। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ খরচের দায়ও বহন করেছিলেন, কিন্তু সোমেন্দ্রনাথও কি তাই? পরবর্তী বইগুলি ছাপানোর খরচই-বা আসছিল কোথা থেকে? রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থনির্মাণের ইতিহাসের সঙ্গে প্রশ্নটি গভীরভাবে যুক্ত বলেই আমাদের মনে হয়।

এটা বুঝতে গেলে ঠাকুরবাড়ির আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির জগৎটিকে একটু দেখে নিতে হয়। জোড়াসাঁকোর ৬নং বাড়ির খরচা বণ্টন করা হত দুভাবে। একটি ছিল কেন্দ্রীয় তহবিল, অপরটি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের নিজস্ব মাসোহারা। বিবাহের পর এই মাসোহারার পরিমাণ সাধারণত বাড়ত, নব-আগত স্ত্রী বা জামাতাও পৃথক মাসোহারার অধিকারী হতেন। কত মাসোহারা পেতেন এক-একজন? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরকম ছবি পাওয়া যায় এর। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী(১৮৫০-১৯৪১) লিখেছেন, 'দুএক টাকা করে মাসহারা পেতুম'[৮], কিন্তু 'উনি বিলেত চলে যাবার পর ওঁর মাসহারা আট টাকা আমাকে দেওয়া হল; তাতে নিজেকে খুব বড়লোক মনে করলুম।'[৯] ['উনি' অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ(১৮৪২-১৯২৩) বিলেত যান ১৮৬২ সালে।] অর্থনীতির সাধারণ নিয়মেই মাসোহারার পরিমাণ সময়ে সময়ে বাড়ত। রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে থেকে এই টাকা পেতে শুরু করেন তা জানা নেই, প্রশান্তকুমার পালও এর নির্দিষ্ট খবর দেন নি। রথীন্দ্রনাথের(১৮৮৮-১৯৬১) স্মৃতিকথায় এর পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া যায়। *On the Edges of Time* বইতে রথীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, 'My father used to draw a monthly allowance of two hundred rupees from my grandfather as did the

others who had families to maintain. To this was now added another hundred'[১০]। এই বিবরণ অনুযায়ী বিবাহের পর থেকে (১৮৮৩ ডিসেম্বর) রবীন্দ্রনাথের মাসোহারা পাওয়ার কথা ২০০ টাকা করে, তবে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন[১১] অন্তত ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৫-র মার্চ) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ১০০ টাকাই মাসোহারা পেতেন। ১২৯২ব-এর বৈশাখ থেকে মাসোহারা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০ টাকায়, ২০০য় গিয়ে পৌঁছোয় আরও পরে, সম্ভবত প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্মের (১৮৮৬-র ২৫ অক্টোবর) পর থেকে। উপরে উদ্ধৃত রথীন্দ্রনাথের বক্তব্যে উল্লিখিত 'now added another hundred' কথাটির তাৎপর্য হল, ১৮৯৬-এর ৮ আগস্ট একটি আমমোক্তারনামার (power of attorney) মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ জমিদারি ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করেন, সেই কারণে তাঁর মাসোহারার পরিমাণও ১০০ টাকা বেড়ে যায়। 'সর্বময় কর্তৃত্ব' বলা হল বটে তবে সবকিছুই ছিল দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদন সাপেক্ষ, *জীবনস্মৃতি*-র 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন, 'প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত।...যেখানে ছিদ্র পড়িত সেখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ওই দুটা দিন বিশেষ উদ্‌বেগের দিন ছিল।'[১২]

এখন প্রশ্ন হল, বই প্রকাশের খরচ কি এই মাসোহারার থেকেই সামলাতে হত, না কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে পাওয়া যেত? একথা ঠিকই যে এই বাড়ির ছেলেমেয়েরা কারণে-অকারণেই কেন্দ্রীয় তহবিলের দ্বারস্থ হতেন, দেবেন্দ্রনাথের বিবেচনার পর তার অনেকটা মঞ্জুরও হত। রবীন্দ্রনাথের বই বের করবার খরচ প্রসঙ্গে আমাদের অনুমান, তাঁর বিবাহের আগে পর্যন্ত (১৮৮৩) তঁর বই-এর খরচ কেন্দ্রীয় তহবিল থেকেই যথাযম্ভব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিবাহের পর, পারিবারিক নিয়মেই যখন রবীন্দ্রনাথের মাসোহারার পরিমাণ বেড়ে গেছে তখন সেই ভার মূলত রবীন্দ্রনাথকেই বহন করতে হয়েছে। আমাদের এই অনুমানের সমর্থনে আমরা কিছু প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করব খানিক পরেই।

এই ভূমিকাটুকু মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পর্যায়ের বইগুলি বেরোবার পিছনের অর্থনৈতিক অবলম্বনকে একটু বিস্তারিতভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। ঠাকুরবাড়ির কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে সাহায্যের কথা বাদ দিলে, বই প্রকাশের জন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রধানতম সহায় ছিলেন দুজন মানুষ, প্রথমজন তাঁর জ্যোতিদাদা,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৪৯-১৯২৫)। আর দ্বিতীয়জনের ভূমিকা অনেক বিস্তৃততর, রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর(১৮৪৭-১৯২০) জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়(১৮৫৯-১৯৩৩)।

'ক্যাশবহি' উদ্ধৃত করে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন[১৩] রবীন্দ্রনাথের প্রথম-গ্রন্থাকারে-প্রকাশিত-উপন্যাস *বৌ-ঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮২) বইটি প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ব্যয় মানে শুধু ছাপার খরচ না, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্ব হিসাবের খাতায় দেখা যায়, 'নব বিভাকর', 'চারুবার্ত্তা', 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে জ্যোতিদাদারই খরচে। প্রিয় দাদা তাঁর স্নেহের ভাইটির স্বপ্নপূরণের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন স্বেচ্ছায়। অন্যদিকে *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* (১৮৮১)-র জন্য প্রয়োজনীয় খরচ জুগিয়েছিলেন নিশ্চয়ই সত্যপ্রসাদের পিতা, রবীন্দ্রনাথের বড় জামাইবাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়(? -১৮৮৩), বইটির আখ্যাপত্রে প্রকাশক হিসেবেও তাই তাঁরই নাম মুদ্রিত হয়। এই বই দুটি ছাড়া (এবং *কবিকাহিনী*-র কথা আগেই বলা হয়েছে) *শৈশব সঙ্গীত* (প্রকাশ ২৯মে, ১৮৮৪) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বই-এর খরচ মেটানো হয়েছে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে। এই অনুমানের কারণগুলি একে একে বিবৃত করা যাক এবার।

এক। *শৈশব সঙ্গীত*-এর ঠিক পরের বই, *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* (প্রকাশ ১ জুলাই ১৮৮৪) বইতে প্রথমবার আখ্যাপত্রে 'প্রকাশক' হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম মুদ্রিত হচ্ছে। তিনি অর্থের দায়িত্ব না-নিলে স্বাভাবিকভাবেই এটা সম্ভব হত না।

দুই। এই বইটির পরে অবশ্য আর কোনোদিনই এই ভূমিকায় তাঁর নাম মুদ্রিত হবে না। কিন্তু এর পর থেকেই আমরা দেখব, 'আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস'-এর বাইরে অন্য মুদ্রাকর ও প্রকাশকের সন্ধান করছেন রবীন্দ্রনাথ। তারই ফল হিসেবে *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*-পরবর্তী ছটি বই-এর মধ্যে চারটি বেরোচ্ছে বাইরের ছাপাখানা থেকে। *রবিচ্ছায়া* (২জুন ১৮৮৫) ছাপা হচ্ছে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র'-এ, প্রকাশক 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'রই অধ্যক্ষ সভার সভ্য যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। *কড়ি ও কোমল* (১৭ নভেম্বর ১৮৮৬)-এর প্রকাশক পিপল্স লাইব্রেরি। *চিঠি-পত্র* (২ জুলাই ১৮৮৭)-র প্রকাশক শরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং। এবং *সমালোচনা* (২৬ মার্চ ১৮৮৮)-র দায়িত্ব নিচ্ছেন 'পিপেল্স্ প্রেস'-এর গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁদের কেউই পরবর্তী 'মজুমদার লাইব্রেরি' বা 'ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস'-এর মতো ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিচ্ছেন না বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে সেরকম প্রকাশকের খোঁজ যে শুরু হয়ে গেছিল তা

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আসলে, যতদিন কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে খরচ আসত ততদিন আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রেস-এর বাইরে যাবার কোনো জরুরি তাগিদ ছিল না। খরচ নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানোর দুশ্চিন্তাতেই 'অন্য' প্রকাশকের সন্ধান করতে হয়েছে। যদিও অনুমান করা যায়, এইসব ক্ষেত্রে বইয়ের খরচের সবটা উক্ত প্রকাশনী মেটাতো না, অন্তত একটা অংশ রবীন্দ্রনাথকেই বহন করতে হত।

তিন। **সত্যপ্রসাদের ভূমিকা।** ১৮৮৪-র পর থেকেই আমরা দেখব বই প্রকাশের প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে বারবার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে সত্যপ্রসাদের কাছে। বস্তুত এসময়ে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই অর্থের প্রয়োজনে সত্যপ্রসাদের শরণাপন্ন হতেন।[১৩] সত্যপ্রসাদ কীভাবে এত অর্থ জমিয়ে তুলেছিলেন তা বলা মুশকিল, কেননা তিনি ব্যবসা বা অন্যকোনো অতিরিক্ত উপার্জনশীল কাজ করতেন না, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কলকাতা-সেরেস্তার কাজ দেখাশোনা করতেন। যাইহোক, সত্যপ্রসাদের নিজস্ব 'ক্যাশবহি' সংরক্ষিত হয়েছে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে। সেই উপাদানের উপর নির্ভর করে প্রশান্তকুমার পাল *রবিজীবনী*-র বিভিন্ন খণ্ডে দেখিয়েছেন কখনও দার্জিলিং যাবার আগে (১৮৮৭) শীতবস্ত্র নির্মাণের জন্যে রবীন্দ্রনাথ টাকা ধার করছেন তাঁর কাছে, কখনও (১৮৯৮) ব্যাবসার ১০০০০ টাকা ঋণ শোধের জন্য ধার করছেন সত্যপ্রসাদের কাছ থেকে, কখনও (১৯০৮) শান্তিনিকেতনে কুয়ো খোঁড়ার টাকা দিচ্ছেন সত্যপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থনির্মাণে সত্যপ্রসাদের ভূমিকাটি তাই একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের অন্তত দুটি বই-এর সম্পূর্ণ মুদ্রণব্যয় বহন করেছিলেন সত্যপ্রসাদ। একটি ১৮৮৭-র ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত *রাজর্ষি*। অন্যটি ১৮৯৬-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসমগ্র *কাব্যগ্রন্থাবলী*। দ্বিতীয় বইটিতে প্রকাশক হিসেবে সত্যপ্রসাদের নামও মুদ্রিত ছিল। কিন্তু এ ছাড়াও আরও অনেকগুলি বই-এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ টাকা ধার করেছেন তাঁর এই ভাগিনাটির কাছ থেকে, অনেকসময়েই সুদসহ তা ফেরত দিতে হয়েছে। যেমন, ১৮৯৩-এর মাঝামাঝি স্ত্রী মৃণালিনীকে (১৮৭৪-১৯০২) লেখা একটি তারিখহীন চিঠি থেকে আমরা জানতে পারছি এই খবর, 'কাল ডিকিন্সন্‌দের বাড়ি থেকে আবার তাগিদ্‌ দিয়ে আমার কাছে এক একশো বিরাশি টাকার বিল এবং চিঠি এসেছে। আবার আমাকে সত্যর শরণাপন্ন হতে হল। তা হলে তার কাছে আমার ন শো টাকা ধার থাক্‌ল।'[১৫] অন্যদিকে সত্যপ্রসাদের নিজস্ব 'ক্যাশবহি' উদ্ধৃত করে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন, তিনি ৬ বৈশাখ ১২৯৭ব (১৮ এপ্রিল ১৮৯০) 'রবিমামা'কে ১০০০ টাকা হাওলাত দিচ্ছেন, ৩১ বৈশাখ ফের ১০০

টাকা। এত ঘনঘন টাকা ধার করতে হচ্ছে কেন? তার একটা সম্ভাব্য কারণ নিশ্চিতভাবেই এই যে, আর কিছুদিনের মধ্যেই বেরোতে চলেছে তাঁর লেখা একটি পুস্তিকা ও একটি বই, যথাক্রমে *মন্ত্রি অভিষেক* ও *বিসর্জন*। দুটি বইয়েরই প্রকাশ ১৫ মে ১৮৯০। বই প্রকাশের আগেই সত্যপ্রসাদের কাছে টাকা ধার নিচ্ছেন, এমন উদাহরণ আরও আছে। অবশ্য, আগেই বলা হল, এ তাঁর ভাগিনাটির দান নয়, ধার, সব টাকাই রবীন্দ্রনাথকে শোধ দিতে হয়েছে সময়মতো।

১৩০৩-এর চৈত্র মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিসেবপত্র একটি নিজস্ব 'ক্যাশবহি'তে রাখতে শুরু করেন। এটি একান্তভাবেই তাঁর এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সম্পর্কিত আয়ব্যয়ের বিবরণ। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রজীবন রচনায় এই 'ক্যাশবহি' অভূতপূর্ব মাত্রা যোগ করেছে, *রবিজীবনী*-কার প্রশান্তকুমার পাল এর থেকে প্রচুর উপাদান গ্রহণ করে নতুন তথ্যে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরই উদ্ধৃত করা একটি দিনের বিবরণ আমরা দিচ্ছি।[১৬] ৩০ চৈত্র ১৩০৩ব (১১ এপ্রিল ১৮৯৭)-র 'এন্ট্রি'তে দেখা যায় 'বৈকুণ্ঠের খাতা ছাপাইবার ব্যয়/কভারিং-এর কাগজ ক্রয়', '১৩ চৈত্র নদীর বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয়' ও 'চিত্রা পুস্তকের বিজ্ঞাপনের সাহিত্য প্রেসের শোধ' প্রভৃতি খাতে নানা খরচের উল্লেখ। একেবারে কাগজ কেনার টাকা থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন দেবার খরচ পর্যন্ত সবটা যে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই দায় হয়ে উঠেছে, এ তার অব্যর্থ প্রমাণ।

গ. বিপনন

যেহেতু এই পর্বের প্রায়-সমস্ত বই তাঁর নিজেরই খরচে ছাপা, তাই বইগুলির প্রচার ও বিপননের দিকেও রবীন্দ্রনাথকে অনেকটা দৃষ্টি দিতে হয়েছে। *কবিকাহিনী*-র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি নিজে *জীবনস্মৃতি*-র 'ভারতী' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছিলেন, 'দণ্ড তিনি [প্রকাশক-বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ] পাইয়াছিলেন, কিন্তু বইলেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায়, সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।'[১৭] একেবারে প্রথম কয়েকটি বই, আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, আত্মীয়স্বজনদের প্রশ্রয়ে ও খরচেই প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে সেই বইগুলির বিপনন-সংক্রান্ত লাভক্ষতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের নিজের দুশ্চিন্তা করার খুব

বেশি কারণ ঘটেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে এ বিষয়ে গভীরভাবে তাঁকে ভাবতে হয়েছে। প্রশ্নটা হল, সেইসব ক্ষেত্রে কি তাঁর নিজের চিত্ত 'ভারাতুর' হয়ে ওঠার মতো কোনো অবস্থা হয়েছিল ? কেমন ছিল তাঁর সেকালের বই বিক্রির পরিমাণ ?

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের নতুন কোনো বই প্রকাশিত হলে সাধারণত 'তত্ত্ববোধিনী' 'সোমপ্রকাশ ''সঞ্জীবনী ''ভারত শ্রমজীবী' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। এই বিজ্ঞাপন মারফত বিপনন সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়। যেমন *রাজা ও রানী* (আগস্ট ১৮৮৯) প্রকাশিত হবার পর এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮১১ শকের কার্তিক সংখ্যায়[১৮] :

রাজা ও রানী
নূতন নাটক।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।
মূল্য এক টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান ব্যাতীত অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে ও ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। আদি ব্রাহ্মসমাজ, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী, ক্যানিং লাইব্রেরী, পিপ্‌লস্‌ লাইব্রেরী, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী, বহুবাজার এস. সি. আঢ্যের দোকান, চিনাবাজার পদ্মচন্দ্রনাথের দোকানে পাওয়া যায়।

এই বিজ্ঞাপনে সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় পুস্তক বিক্রেতাদের নাম জানানো আছে। শেষ দুটি দোকানের ঠিকানাও মোটামুটি জানানো আছে বিজ্ঞাপনে, বাকিগুলির ঠিকানা উল্লেখ করা যেতে পারে। ৯৭নং কলেজ স্ট্রিট-এ ছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান তথা প্রকাশনা সংস্থা, বিখ্যাত 'বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি'। এঁদের সঙ্গে আগে-পরে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সূত্রে সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তা আমরা দেখব। এই একই ঠিকানায় ১৮৮৪ সাল থেকে সোমপ্রকাশেরও বই-এর দোকান চালু হয়। ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রিটে ছিল সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি। ৫৫নং কলেজ স্ট্রিটে ক্যানিং লাইব্রেরি। আর পিপ্‌লস্‌ লাইব্রেরির ঠিকানা ৭৮ নং কলেজ স্ট্রিট। এঁরা রবীন্দ্রনাথের *কড়ি ও কোমল* (নভেম্বর ১৮৮৬) গ্রন্থখানির প্রকাশকও বটে।

অর্থাৎ, সেকালের কোনো সম্ভাব্য পাঠক রবীন্দ্রনাথের নতুন-প্রকাশিত বইয়ের খবর পেতে পারতেন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখে, তারপর সেটি সংগ্রহ করাও খুব দুরূহ কাজ ছিল না। কিন্তু ঘটনা হল, এসব সত্ত্বেও তাঁর বইয়ের বিক্রি সেকালে আশানুরূপ ছিল না। রবীন্দ্র-অনুরাগী কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর বিখ্যাত রবীন্দ্র-স্মৃতিকথায় এই স্বীকারোক্তি করে গেছেন যে, 'তখন কবির কাব্যপুস্তকের তত আদর ছিল না, বই বিক্রয়ও অল্পই হইত। সেই অপরাধ লইয়া কোন কোন রসিক কবি 'ওজন দরে তাঁহার কবিতাপুস্তক বিক্রয় হয়' ও সে বই 'কাটছে বটে পোকায় কিন্তু আলমারি কি সিন্দুকে' বলিয়া কবিতায় রসচেষ্টা করিয়া বিদ্রুপ বর্ষণ করিয়াছিলেন।'[১৯]

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যায়। ১৮৮৫-র জুন মাসে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানের বই *রবিচ্ছায়া*। ছাপা হল ১০০০ কপি, দাম বারো আনা। কিন্তু প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই এই দাম কমিয়ে ফের বিজ্ঞাপন দিতে হল। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার ২১ অগ্রহায়ণ ১২৯২ব থেকে ৪ মাঘ ১২৯২ব পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হল সেই বিজ্ঞাপন[২০] :

মূল্য কমিল   রবিচ্ছায়া   মূল্য কমিল

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুগ্ধ হন নাই এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিরল। তিনি কবিতা লিখিয়া বঙ্গ ভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি একত্র মুদ্রিত করিয়া "রবিচ্ছায়া" নামে এতদিন বিক্রীত হইতেছিল। ইহা প্রেমসঙ্গীত, শোকসঙ্গীত ও ধর্ম্মসঙ্গীতে পরিপূর্ণ, বঙ্গবাসী যদি কখনও নির্ম্মল পবিত্র আমোদ অনুভব করিবার বাসনা থাকে, যদি কখনও হৃদয়-মনকে ক্ষণকালের নিমিত্তও সংসারের অতীত করিতে অভিলাষ হয়, যদি কখনও বিষাদময় অন্ধকার জীবনে জ্যোৎস্নালোক আনয়ন করিতে মানস থাকে, তবে আপনার জন্য বড় সুবিধার সময় আসিয়াছে। এতকাল ৮৹ আনা করিয়া "রবিচ্ছায়া" বিক্রয় হইতেছিল। অতঃপর ।।৹ আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ডাকমাশুল ৵৹।...

এই হ্রাসমূল্যে বইটি কতখানি বিক্রি হয়েছিল বলা শক্ত, কেননা *রবিচ্ছায়া* দ্বিতীয়বার আর মুদ্রিত হয় নি কখনই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গানের বই *গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা* প্রকাশিত হয় এর প্রায় আট বছর বাদে ১৮৯৩-র এপ্রিলে, সেখানে *রবিচ্ছায়া*-র গানগুলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়, বইটির শুরুতে 'বিজ্ঞাপন'

অংশে রবীন্দ্রনাথ জানান, ‘সেই গ্রন্থ [*রবিচ্ছায়া*] নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে’। হ্রাসমূল্য সত্ত্বেও ১০০০ কপি নিঃশেষিত হতে ৮ বছর লাগছে, এটা নিশ্চয়ই খুব আশাপ্রদ কথা নয়। বস্তুত, শুধু একটি গীতসংকলনের ক্ষেত্রেই যে মূল্যহ্রাস অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এরকম না, এই কাজটা এই পর্বে রবীন্দ্রনাথকে বারবারই করতে হয়েছে। সেকালের সবচেয়ে বিখ্যাত বইয়ের দোকান বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে ১৮৮৪-র ১২ জুলাই লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি[২১] এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য :

> আমার ফর্দ্দে লিখিত পুস্তকগুলি আমি আপনার নিকট দুই হাজার তিন শত নয় ২৩০৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলাম। তন্মধ্যে অদ্য এগার শত টাকা বুঝিয়া পাইলাম। বাকী টাকা আপনি দুই মাসের মধ্যে দুই বারে পরিশোধ করিবেন। ইহা ব্যতীত দোকানদারদিগের নিকটে যে সকল পুস্তক আছে তাহা ক্রমে পাঠাইয়া দিব, তাহা নগদ মূল্যে লইবেন। এ সকল পুস্তক যতদিন না আপনার বিক্রয় শেষ হইবে ততদিন আর এগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবনা। এ সকল পুস্তক অল্প অবশিষ্ট থাকিতে আমাকে জানাইতে হইবে। পুস্তক আপনার ইচ্ছামত মূল্যে আপনি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে ফর্দের কথা লিখেছেন, সেটি পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর ঠিক পরেই ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার ১৪ শ্রাবণ সংখ্যায় ‘বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি’র তরফ থেকে দেওয়া একটি বিজ্ঞাপন থেকে আমরা জানতে পারি মোট ১২টি বইয়ের বিক্রির দায়িত্ব পেয়েছেন।[২২] সেগুলি হল (প্রকাশের কালানুক্রমে) : *ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, সন্ধ্যাসঙ্গীত, বৌঠাকুরাণীর হাট, প্রভাতসঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, শৈশব সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*। অর্থাৎ, এ যাবৎ প্রকাশিত মোট ১৬টি বইয়ের ১২টিকে তুলে দেওয়া হল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের হাতে, এককালীন অর্থের বিনিময়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বইগুলি বিক্রি না-হয়ে যাওয়া অবধি তিনি এগুলির পুনর্বার ছাপবেন না। এই বারোটি বইয়ের মধ্যে যে একমাত্র উপন্যাসটি আছে, সেই *বৌঠাকুরাণীর হাট*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হবে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি, এই সময়কালের তিন বছর পর, ১৮৮৭-এ। *সন্ধ্যাসঙ্গীত* আর *প্রভাতসঙ্গীত* পুনর্বার বেরোবে ৮ বছর বাদে, ১৮৯২তে। বাকি বইগুলির অধিকাংশ পরবর্তীকালে *কাব্যগ্রন্থাবলী* (১৮৯৬) *কাব্য-গ্রন্থ* (১৯০৩) অথবা *রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী*র(১৯০৪) অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হবে। অবশ্য, আসল কথাটা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন অনেক পরে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে, ‘...গ্রন্থাবলী যখন বাহির হয়েছিল

তখন তার অন্তর্ভুত অনেকগুলো বই বাজারে ছিল’[২৩] ! ‘গ্রন্থাবলী’ মানে ১৮৯৬-এর *কাব্যগ্রন্থাবলী*। একটা-একটা বই প্রকাশের প্রায় ১৫ বছর পরও সেগুলো ‘বাজারে ছিল’, এইটাই হল প্রথমযুগে রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রি সম্পর্কিত করুণতম তথ্য !

কাব্যগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, বইটির প্রকাশক সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। *মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী*-সহ রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতার বই ও গান এই সংকলনের অন্তর্গত হয়। আখ্যাপত্র-ভূমিকা-সুচি ইত্যাদি বাদ দিয়েও মূল বই ৪৭৬ পাতার, লম্বা-চাওড়ায় বইটির আয়তনও সুবিশাল, $১০\frac{১}{২}''$ x $৮\frac{১}{২}''$, সেই কারণে একে ‘টালি-সংস্করণ’ বলে অভিহিত করা হত। বইটি তিনটি ভিন্ন রূপে প্রকাশ করা হয়। ৬ টাকা, ১০ টাকা ও ২৫ টাকা যথাক্রমে তাদের মূল্য। এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনাসংগ্রহ। দুই মলাটে কার্যত সমস্ত কাব্য ও নাটক একত্রে পেয়ে যাওয়ার প্রথম সুযোগ পাঠকের কাছে। প্রশ্ন হল, এই বইও কি লোকপ্রিয় হতে পেরেছিল? অন্তত বিক্রির হিসেবে সেকথা বলা যাবে না। প্রিয়নাথ সেনকেই লেখা আর-একটি চিঠি এর সাক্ষ্য দেয়, সম্ভবত আগস্ট ১৯০০তে লেখা সেই তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুটিকে অনুরোধ করছেন, ‘একটা কাজের ভার দেব?...আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যের copyright কোন ব্যক্তিকে ৬০০০্ টাকায় কেনাতে পার? শেষের যে বইগুলি বাজারে আছে সে আমি সিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রি করব – গ্রন্থাবলী যা আছে সে এক তৃতীয়াংশ দামে দিতে পারব (কারণ এটাতে সত্যর অধিকার আছে, আমি স্বাধীন নই)’।[২৪]

শুধু *কবিকাহিনী* বইটি নয়, গোটা উনিশ শতক জুড়ে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বই যে পুস্তকবিক্রেতার শেল্‌ফ এবং লেখকের চিত্তকে ভারাতুর করে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করত, সে কথা সত্যের খাতিরে আমাদের মেনে নিতেই হবে।

তবে, এর পরেও আর-একটু কথা থাকে। বিক্রেতা আর লেখক-ই তো সব কথা নয়, এই দুয়ের মাঝে আছেন রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠ পাঠক। তাঁরা আছেন একেবারে এই প্রথম যুগ থেকেই। সেইরকম একজন পাঠক কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭২-১৯৩১)। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের ‘বিষয়’ নিয়ে তিনি মুগ্ধ, বইয়ের ‘রূপ’ নিয়ে তিনি কঠোর সমালোচক, সেখানে কোনো ‘আপোস’ তাঁর কাছে অ-সহ্য। এমনকী, এই

স্বল্পমূল্যে বিক্রির পরিকল্পনাও না-পসন্দ, এতে তাঁর বিমুগ্ধ পাঠকসত্তার 'অহং' আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৬ বৈশাখ (২৮ এপ্রিল, ১৮৯৫) এক চিঠিতে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন :

> আপনি ভবিষ্যতে আর পাতলা কাগজে আপনার পুস্তক ছাপিবেন না এবং অর্ধমূল্যে বিক্রয়াদির বিজ্ঞাপন আর যেন দেখিতে না পাই। যাহারা আপনাকে বোঝে এবং চাহে, তাহারা প্রায় সকলেই উত্তমরূপে মুদ্রিত পুস্তকের ব্যয় বহন করিতে পারে। যাহারা না বোঝে, সে শ্রেণীর লোকের গলায় বই বাঁধিয়া দিলেও (বিনামূল্যে) তাহারা পড়িবে না। সুতরাং অর্ধমূল্যে বিক্রয়ে কোনও ফল নাই, মানসী যে প্রথম সংস্করণে ২২০ খণ্ড মাত্র ছাপা হইয়াছিল, কলিকাতা গেজেটে আমি এ সংবাদ পাইয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই, ইহাতে আমরা আপনার জন্য আনন্দিত এবং লোকের জন্য দুঃখিত।[২৫]

এই হল ভক্ত পাঠকের একরোখা আবদার ! এই ভালোবাসা ব্যাবসার নিয়ম বা অর্থনীতির দস্তুর মানে না। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য, এইরকম পাঠক তিনি পেয়েছিলেন তাঁর লেখালেখির আদিযুগ থেকে।

ঘ. হাতে-কলমে কাজ

রবীন্দ্রনাথের লেখালেখির এই প্রথম যুগে গ্রন্থ-মুদ্রণ কার্যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নিয়ে বিস্তারিত বলার মতো উপাদান কম। প্রকাশকদের সঙ্গে তাঁর চিঠির (সম্ভাব্য) আদানপ্রদান – একটিমাত্র ব্যতিক্রম বাদ দিলে – রক্ষিত হয় নি। প্রিয়নাথ সেন ছাড়া বন্ধুস্থানীয় মানুষদের লেখা চিঠিপত্রের পরিমাণ খুবই কম, মুদ্রণ-বিষয়ে কথাবার্তা আরও কম। এবং, এই সময়পর্বে একমাত্র *ভগ্নহৃদয়* ছাড়া রক্ষিত হয় নি অন্য কোনো বইয়ের প্রেসকপিও! তবু আনুষঙ্গিক কয়েকটি উপাদানের সাহায্যে আমরা চেষ্টা করব নিজের বইয়ের মুদ্রণপর্বে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার।

১৮৭৮ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়কালেঅন্তত যে তিনটি বই বেশ গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ-সহ প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমরা লক্ষ করতে পেরেছি সেগুলি হল *সন্ধ্যাসঙ্গীত* (জুলাই ১৮৮২)এবং *গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা* (এপ্রিল ১৮৯৩)। কী ধরণের প্রমাদ, সেটা প্রথমে একটু খেয়াল করে দেখা যাক। *সন্ধ্যাসঙ্গীত*-এ সমস্যা অনেকগুলি। প্রথমত, বইটির একেবারে প্রথম কবিতা ('উপহার', প্রথম ৫টি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) ও একেবারে শেষ

কবিতা (‘উপহার’, একই নাম কিন্তু ভিন্ন কবিতা, শেষ ৩টি পৃষ্ঠা) মোট যে-আটটি পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে তাদের কোনো পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া নেই। দ্বিতীয়ত, ‘কেন গান গাই’ ও কেন গান শুনাই’ কবিতাদুটি যথাক্রমে ৯৬ ও ১০০ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হলেও সূচীপত্রে যথাক্রমে ১০০ ও ১০১ পৃষ্ঠা নির্দেশ করা আছে। তৃতীয়ত, ‘গান সমাপন’ কবিতাটি ১০৭ পৃষ্ঠায় শেষ হবার পর হঠাৎ ১০৮-১১০ এই তিনটি পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ ফাঁকা রেখে ১১১ পৃষ্ঠা থেকে ‘বিষ ও সুধা’ কবিতাটি ছাপা হয়েছে।

অন্যদিকে *গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা* বইতেও কতকটা এরকম অনবধান-জনিত ত্রুটি দেখা যায়। সেইগুলি এইরকম। প্রথমত, গানগুলি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করে সাজানো। তার মধ্যে ২৫৬ ক্রমিক সংখ্যাটি অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, ২০৮ পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণ সাদা। তৃতীয়ত, ২২৭ এবং ২৭৫ পৃষ্ঠায় অকারণে দুটি অর্ধ-উড়োপত্র আছে। চতুর্থত, সূচিপত্রে অন্তত দশটি গানের প্রথম ছত্র উল্লিখিত হয় নি।, কয়েকটি গানের প্রথম ছত্র আবার দুবার করে ছাপা হয়েছে। পঞ্চমত, এইটাই সবচেয়ে গুরুতর, বেশ কয়েকটি গান দুবার মুদ্রিত হয়েছে বইতে। যেমন, ৫৭ ও ২৫০ পৃষ্ঠায়, ৫৮ ও ১৯১ পৃষ্ঠায়, ৫৮ ও ১৯০ পৃষ্ঠায়, ৬৬ ও ১৩৬ পৃষ্ঠায়, এবং ২১৬ ও ২৯০ পৃষ্ঠায় গানগুলি দুবার করে ছাপা হয়েছে !

সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর মুদ্রণে রবীন্দ্রনাথ নিজে তদারকি করতে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনী পাঠের সূত্রে এ তথ্য খুবই সুবিদিত যে মোটামুটি চৈত্র ১২৮৮বঙ্গাব্দ (মার্চ-এপ্রিল ১৮৮২) থেকে আষাঢ় ১২৮৮ব (জুন ১৮৮২) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতিদাদা আর নতুন বৌঠানের সঙ্গে ভারতীয় যাদুঘরের পাশে ১০নং সদর স্ট্রিটের একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিলেন। তাছাড়া নব-উদ্‌ভাবিত সারস্বত-সমাজের কাজকর্মে তিনি এবং তাঁর দাদা এইসময়ে খুবই ব্যস্ত। তাই আমাদের মনে হয়, সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর মুদ্রণকালে হয়তো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছাপাখানার সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি।

গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা বইটির ক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চিত করেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথ মুদ্রণকার্যে তদারক করতে পারেন নি। বস্তুত, বইয়ের সূচনায় ‘বিজ্ঞাপন’ অংশে স্বয়ং গ্রন্থকার তা স্বীকারও করেছেন, ‘ভ্রমক্রমে দুই একটি গান এই গ্রন্থে একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনবসর ও অনুপস্থিতিক্রমে প্রুফ সংশোধনে মনোযোগ দিতে না পারায় অন্যান্য ভ্রমও থাকিতে পারে। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।’ ভুলগুলি কী তা আমরা

আগেই বলেছি। বই ছাপাকালীন রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততার কারণটিও জীবনীসূত্রে খুব সহজেই জানা যায়। ১৮৯২-এর ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত জমিদারী পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উড়িষ্যায়। প্রশান্তকুমার পালের অনুমান এই সময়েই বইটির ছাপার কাজ চলছিল[২৬], 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখা 'অনুপস্থিতি' শব্দটার তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

মুদ্রণপর্ব চলার সময় লেখকের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থের চেহারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে থাকে। এর উল্টোদিকে, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি তত্ত্বাবধানের চরিত্রটি কেমন সেটাও আমরা দেখার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে আর একটি জরুরি কথা বলে নেওয়া যায়। কোনো স্থায়ী প্রকাশকের অভাবে, বারবার প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বদলের ফলে, কখনও কখনও যোগাযোগহীনতা (miscommunication) ও ভুল বোঝাবুঝির কিছু সম্ভাবনাও যে তৈরি হচ্ছিল, সেই ইতিহাসটিও আমাদের মনে রাখতে হয়। যেমন, *সোনার তরী*-র (জানুয়ারি ১৮৯৪) প্রকাশকে ঘিরে সেইরকমই কিছু সমস্যা ঘনিয়ে উঠছিল।

সোনার তরী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী) ১৮৯৪-এর ২ জানুয়ারি। আখ্যাপত্রের বিবরণ এইরকম :

> সোনার তরী/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত।/ কলিকাতা; / ১২ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে, / শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত/ ও / ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / ১৩০০।

বইটি ছাপানো হয় মাত্র ২৫০ কপি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'সাহিত্য-যন্ত্র' নামক যে-ছাপাখানা থেকে বইটি মুদ্রিত হল সেটির স্বত্বাধিকারী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। বইটি বেরোবার বছরখানেকের মধ্যে এর একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন সুরেশচন্দ্র। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

> সোনার তরী।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর /প্রণীত/ কলিকাতা,/ ১৩/৭নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে,/ শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত/ ও / ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / ১৩০১।

এই সংস্করণটি সুরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে না-জানিয়ে প্রস্তুত করেননি, বস্তুত দ্বিতীয় সংস্করণটি বেরোবার আগে '১৩/৭নং বৃন্দাবন বসুর লেন'-স্থিত 'সাহিত্য-কার্য্যালয়' থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে সেই সংস্করণ প্রসঙ্গেই লিখছেন তিনি, '"সোনার তরী" ছাপিয়া শেষ করিয়াছি ৫/৭ দিন। কভারের কাগজ নেই, তাই বই বেরুচ্ছে না। আপনার এখানকার কার্য্যকারদের নামটি লিখিয়া পাঠাইবেন। কাগজের জন্য আমি মনে করে সত্যবাবুকে পত্র লিখিয়াছি।'[২৭] এই চিঠিটির তারিখ ৩ ভাদ্র ১৩০১ (১৮ আগস্ট ১৮৯৪)। মুশকিল হল, ১৯৩২ সালে লেখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একটি ডায়ারি এ বিষয়ে কিছু আশ্চর্য তথ্য দেয়। সেসময়ে প্রশান্তচন্দ্রের সন্দেহ হয় যে কীভাবে মাত্র এক বছরের মধ্যে *সোনার তরী*-র দ্বিতীয় একটি সংস্করণ ছাপা হতে পারে ! এই সংশয়ের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ৩১.০১.১৯৩২ তারিখে তাঁকে যা বলেন সেটি বিস্ময়কর, 'সমাজপতি অত্যন্ত চতুর লোক, যদি অল্প সংখ্যক কপি, ১০০খানেক প্রথমে ১ম সংস্করণ ব'লে ছাপিয়ে, পরে বাকিগুলি ২য় সংস্করণ করে থাকে, বলতে পারছি না।'[২৮] পরে আর-একদিন, ২৪.০২.১৯৩২ তারিখে প্রসঙ্গটি ওঠে এবং কবি এবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'তা হলে আমি যা বলেছিলুম ঠিক হয়েছে। ও ঐ সমাজপতির কাণ্ড।'[২৯] সুকুমার সেন এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিত জানিয়েছেন, 'সমাজপতি এমন এক কাণ্ড করে বসলেন যাতে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁকে প্রকাশক রাখতে পারলেন না। Publicity Stunt হিসেবে সমাজপতি সোনার তরী প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই, যখন অধিকাংশ বই অবিক্রীত রয়েছে তখন, শুধু নামপত্রটি বদলিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ বলে ছেপে দিলেন।'[৩০] অধ্যাপক সেন এই তথ্যের কোনো উৎস জানাননি। কিন্তু আগেই আমরা দেখেছি, সুরেশচন্দ্র এই দ্বিতীয় সংস্করণ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েই ছাপছেন। সেক্ষেত্রে ১০০ কপি বিক্রি হবার পর বাকি ১৫০ কপিকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলে চালাবার কী যুক্তি থাকতে পারে? এতে সুরেশচন্দ্রের ঠিক কী ধরণের লাভ হতে পারে তা ভেবে পাওয়া যায় না। আর তাছাড়া, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ দুটি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এদের মধ্যে অন্তত অলংকরণের বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ফলে, সুদ্ধমাত্র আখ্যাপত্রটি বদলে প্রথম সংস্করণকেই দ্বিতীয় সংস্করণ বলে চালানো হচ্ছে না। আর প্রথম সংস্করণ মাত্র ২৫০ কপি ছাপানো হয়েছিল, তাই এক বছরের মধ্যে সেই সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়া মোটেও অভাবনীয় কিছু না। মুদ্রাকরের প্রতি লেখকের এইরকম- শুধু অনাস্থা নয় – একেবারে অবিশ্বাসের কাহিনিও তাঁর প্রথমযুগের বইপ্রকাশের ইতিহাসের অন্তর্গত সত্য। এরকমটি আগে-পরে আর কখনই দেখা যাবে না।

তবে এখানে একটি কথা না-বললে সুরেশচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হয়, সে-হল, *সোনার তরী*-র প্রথম সংস্করণের মুদ্রণসৌকর্য ছিল সত্যিই সর্বাঙ্গসুন্দর। ম্যাপলিথো কাগজে চমৎকার ছাপা বাঁধাই সমেত সেই বই আজও হাতে নিলে তার বিভা চোখে পড়ে। আমরা অবশ্য এই ব্যাপারে সমকালীন সাক্ষ্যকেই গুরুত্ব দিতে চাই এবং আর-একবার রবীন্দ্রনাথের ভক্ত-পাঠক কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমারের মতামত এখানে উপস্থিত করতে চাই। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ (৩১ মে ১৮৯৫) তারিখে লেখা চিঠিতে প্রভাতকুমার কথা শুরু করেছিলেন *কড়ি ও কোমল*-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিকে (প্রকাশ ১৮৯৪-এর ১৮ জুলাই) নিয়ে। আগেই বলা হয়েছে, এটি *কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান* এবং *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* বইতিনটিকে একত্র করে প্রকাশিত একটি সংস্করণ। কিন্তু এই তিনটি বইয়ের সব রচনা এই মিশ্র-সংস্করণটিতে গৃহীত হয় নি, এর সূচনায় 'বিজ্ঞাপন' অংশে কবি জানিয়েছিলেন, 'ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল।' এই বিচিত্র পরিকল্পনা প্রভাতকুমারের মোটেও পছন্দ হয় নি। ফলে ছদ্মক্রোধে তিনি পূর্বোক্ত তারিখে প্রথমে লিখলেন :

> আপনি দ্বিতীয় সংস্করণ কড়ি ও কোমলের ওরূপ দুর্দশা করিয়াছেন দেখিয়ে মর্মাহত হইলাম। তিনখানি পুস্তক একত্র করিবার কি প্রয়োজন ছিল? করিলেন করিলেন, ছাঁটিলেন কেন? কোনগুলি আমাদের ভাল লাগিবে কোনগুলি না লাগিবে, সে বিচার ঘরে বসিয়া আপনার করিবার কি আধিকার আছে? আর আর যাহা বাদ দিন, শ্রীমতী ইন্দিরার পত্রগুলি বাদ দিয়া বড়ই অত্যাচার করিয়াছেন... কী অন্যায়! কী স্বার্থপরতা! ইহা অপেক্ষা আপনার পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন না কেন?[৩১]

প্রভাতকুমারের এই যুক্তি অত্যন্ত ন্যায্য ও অকাট্য। মুশকিল হল, এইসব চিঠির রবীন্দ্রনাথ কী উত্তর দিতেন তা আজ-আর জানার উপায় নেই। এইসময়কার রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি রক্ষিত হয় নি। যাইহোক, এই অনুযোগের পরই, একই চিঠিতে রসিকতার সুরে এল *সোনার তরী*-র প্রসঙ্গ, এইভাবে :

> মনে আশা হইল, যদি [*কড়ি ও কোমল*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ] অল্পসংখ্যক ছাপাইয়া থাকেন, তবে শীঘ্র ফুরাইবে, তৃতীয় সংস্করণে আবার অনুরোধ, অনুনয়, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি উপায়ে পূর্বমত করিয়া লইব। হরি হরি, কলিকাতা গেজেট অন্বেষণ করিয়া দেখি না, আমার মাথা খাইয়া, ১০০০ খণ্ড ছাপাইয়া বসিয়া আছেন। সোনার তরী বরং ২৫০ না ছাপাইয়া ১০০০ ছাপিলেই ঠিক হইত – তা ছাপিবেন *কেন? সোনার তরী যে চমৎকার ছাপা,*

চমৎকার কাগজ, চমৎকার মলাট। সোনার তরী যদি খারাপ ছাপান দ্বিতীয় সংস্করণে, তবে ত-ত-তখন আপনি আছেন আর আমি আছি – বলিয়া রাখিতেছি। (বাঁকানো হরফ আমাদের)

রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবনে অগণ্য মানুষজন চিঠি লিখেছেন, কিন্তু ঠিক এই ভাষায় চিঠি লেখা এক প্রভাতকুমারের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। এই ভাষাব্যবহার থেকেই প্রভাতকুমার-রবীন্দ্রনাথ সখ্যের গভীরতাটি অনুমান করা যায়। অবশ্য, সখ্যতা ছাড়াও ভাষার উপরে প্রভাতকুমারের আশ্চর্য দখলটিরও প্রয়োজন এমন চিঠি লেখবার জন্যে। যাইহোক, এই লাইনগুলি থেকে *সোনার তরী*-র মুদ্রণ সৌকর্য সম্বন্ধে সমকালীন প্রতিক্রিয়াটিও ধরা পড়ে। সোনার তরী-র মুদ্রণ ও বাঁধাই নিয়ে প্রশংসা প্রভাতকুমারের অন্য চিঠিতেও আছে। এইসব প্রশংসার অনেকটা নিঃসন্দেহে সুরেশচন্দ্রের প্রাপ্য।

এইবার আমরা কিছু উদাহরণ সহযোগে দেখার চেষ্টা করব, তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের এই প্রথম পর্বে তাঁর নিজের ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির রূপরেখাটি। আগেই বলা হয়েছে, উপাদানের একান্ত অভাবে এর বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করা বেশ মুশকিল।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-ইতিহাসে প্রথম অলংকরণ-সমৃদ্ধ সচিত্র বইটির নাম *চিত্রাঙ্গদা* (সেপ্টেম্বর ১৮৯২)। সমস্ত রচনাবলী ও পৃথক গ্রন্থেই এর রচনা-শেষের তারিখটি মুদ্রিত আছে : ‘কটক/২৮ভাদ্র ১২৯৮’ (=১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১)। অন্যদিকে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে ঠিক এর এক বছর পর, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশকাল ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯২। লেখা শেষের পর একবছর দেরি হল কেন এর সুনির্দিষ্ট উত্তর তথ্যের অভাবে দেওয়া মুশকিল, তবে অনুমান করা যায় যে বইটির প্রকাশরূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এইসময় গভীরভাবে ভাবছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, ‘চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে। রবিকা বললেন, ছবি দিতে হবে। আমার তখন একটু সাহসও হয়েছে, বললুম, রাজি আছি। সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজে হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি।’[৩২] অবনীন্দ্রনাথের এই বিবরণে ‘চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে’ এই বাক্যটি যদি নিতান্ত স্মৃতিবিভ্রম না-হয় তাহলে বুঝতে হবে লেখা শুরুর পর থেকেই বইয়ের প্রকাশরূপটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবনাচিন্তা শুরু করে দেন। অবনীন্দ্রনাথকে নির্দেশদানও সেই বড় ভাবনাচিন্তারই অংশ। সেই ভাবনাই উনিশশতকের গ্রন্থচিত্রণের ধারায় *চিত্রাঙ্গদা*-কে একেবারে একটি স্বতন্ত্র আসনে বসিয়ে দেয়। ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের উদ্‌যোগে কলকাতার ফেরিস কোম্পানীর প্রেস থেকে

ছাপা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বাংলাভাষার প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। তারপর থেকে অসংখ্য সচিত্র গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে গোটা উনিশ শতক জুড়ে। কিন্তু এই বইতে লেখার সঙ্গে ছবি আক্ষরিক অর্থেই মিশে গিয়ে যেন একটি নতুন অলংকরণ-রীতি তৈরি করে তুলল। সাধারণত লেখা ও অলংকরণ স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় হওয়াটাই ছিল উনিশ শতকের দস্তুর। এক্ষেত্রে যে শুধু লেখা ও ছবি একই পাতায় ধরা থাকল তা নয়, লেখার মধ্যে উঠে এল রেখা, রেখাকে আক্ষরিক অর্থেই স্পর্শ করে থাকল লেখা। (দ্রষ্টব্য : চিত্র-১৯) আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসের সঙ্গে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বোঝাপড়ার কোনো বিবরণ পাওয়া গেলে এই যুগান্তকারী অলংকরণ-প্রয়াসটির পিছনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি আরও স্পষ্ট করে বোঝা যেত। কিন্তু এটুকু আমরা বুঝতে পারি যে রচনাকাল থেকে প্রকাশকালের মধ্যেকার ১টি বছরের অনেকটাই ব্যয় হয়েছে এই পরিকল্পনা-খাতেই। আর সেখানে লেখকের ভূমিকাটি অনিবার্য।

এই প্রসঙ্গে *চিত্রা* গ্রন্থটি নিয়েও কিছু কথা বলা যায়। বন্ধু প্রভাতকুমারের নিরন্তর 'গঞ্জনা'য় বিব্রত রবীন্দ্রনাথ চিত্রা প্রকাশ হবার আগে বন্ধুকে জানালেন তিনি এবার এই নতুন কাব্যগ্রন্থটির জন্যে উৎকৃষ্ট কাগজ নির্বাচন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু সেই চিঠি পেয়ে প্রভাতকুমারের উত্তরটি ছিল, 'নতুন বহির কাগজ ভাল হইতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম।'[৩৩] কাগজের মান-সহ মুদ্রণ বিষয়ক যাবতীয় সিদ্ধান্ত যে সেকালে রবীন্দ্রনাথ একাই নিতেন, তার কিছু প্রমাণ আমরা আগে দিয়েছি, এই চিঠিকে তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের মুদ্রণ-সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞতার উপর প্রভাতকুমারের যে বিশেষ আস্থা ছিল তার একটি প্রমাণ এই সূত্রেই আমরা উপস্থিত করতে পারি। নিজের লেখা 'কাহিনী' নামের একটি কবিতা-পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি ১৮৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রভাতকুমার পাঠালেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, সেটি ছাপা হবে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস' থেকে। ২২ ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দে (৪ মার্চ ১৮৯৬) লেখা পরবর্তী একটি চিঠিতে এই প্রকাশিতব্য বইটির যাবতীয় দায়িত্ব প্রভাতকুমার তুলে দিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে :

> আমার বহি ছাপিবার কথা। আপনি কাগজ, মলাটের কাগজ নির্বাচন করিয়া দিয়া, মুদ্রাকর প্রভৃতিকে general instruction দিয়া যাইবেন যাহাতে বহি দেখিতে খুব সুন্দর হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। প্রুফ আমার কাছে আসিবে।[৩৪]

প্রভাতকুমারের এই বইটি শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষজ্ঞতার প্রতি তাঁর আস্থাটি নিঃসন্দেহে এই চিঠি থেকে প্রমাণিত হয়।

চিত্রা বইটি প্রকাশিত হল ২৯ ফাল্গুন ১৩০২ব (১১ মার্চ ১৮৯৬)। বইটি পেয়ে প্রভাতকুমার কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না। 'গ্রন্থ' নামক বস্তুরূপটি সম্পর্কে, বিশেষত প্রিয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথের বইয়ের ব্যাপারে, প্রভাতকুমার যে ছিলেন অতিশয় খুঁতখুঁতে সেইটি বোঝা যায় প্রভাতকুমারের প্রতিক্রিয়া থেকে। ৪ চৈত্র (১৬ মার্চ ১৮৯৬) মিঠে-কড়া ভাষায় তিনি লিখলেন :

> চিত্রা পাইলাম।... চিত্রার কাগজ, লিখিয়াছিলেন, ভাল দিয়াছি। কই, এমনই কি ভাল? সোনার তরীর মত নহে ত? এ ত সাধনার জন্য ক্রীত, পড়িয়া-থাকা কাগজের স্তূপের সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে – (আমার ডিডেক্‌টিভ-বুদ্ধির প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই)। সেইজন্য ফর্মাগুলো আট-পেজি হইয়াছে; চৌড়ায় বেশি হইয়া দেখিতে যেন একটু বেঢপ হইয়াছে। তাহার উপর, দপ্তরীর দেখিলাম বড় অমনোযোগ। এক্ষুণি খুলিয়া যাইতেছে, পরে না জানি কি অবস্থা হইবে।[৩৫]

পাঠক যদি এতটা মনোযোগী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হন, লেখককেও তখন – যিনি নিজে কার্যত প্রকাশকও – হয়ে উঠতে হয় আরও বেশি সচেতন আর যত্নবান। 'গ্রন্থনির্মাতা' রবীন্দ্রনাথের গড়ে ওঠার পিছনে তাই প্রভাতকুমারের মতো পাঠকের ভূমিকাটিকে মনে রাখা জরুরি হয়ে ওঠে।

এই সময়পর্বের অন্তত একটি বইয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের সরাসরি বোঝাপড়ার খানিকটা ছবি পাওয়া সম্ভব হয়, আর সেই সূত্রে বুঝে নেওয়া যায় বই প্রকাশের নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথের ভুমিকাকে। সেই বইটি হল *ক্ষণিকা*। বইটির আখ্যাপত্রে প্রকাশক হিসেবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই নাম দেওয়া আছে। মুদ্রাকরের বিবরণে জানানো আছে, 'শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ, ভারত যন্ত্র, ১১৫ আমহার্স্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা'। কিন্তু এই বই গড়ে তোলার প্রকৃত নেপথ্যচারী মানুষটির নাম প্রেমতোষ বসু, ইনি ভারত যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বসুর একটি স্মৃতিবিবরণে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের এরকম একটি খণ্ডমুহূর্তের ছবি, 'তখন ডাক আসিল। একখানি চিঠি রবীন্দ্র বাবুর মুদ্রাকর লিখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এবার আমি অনেক কবিতা থলি-ঝাড়া করিয়াছি। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক একটু ভাল করিয়া ছাপাইতেছি, তাহার নাম 'ক্ষণিকা'।'[৩৬] এ হল ১৩০৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি কোন একদিনের বিবরণ, স্থান শিলাইদহ। আর যে-মুদ্রাকরের চিঠি এসে

পৌঁছনোর খবর পাওয়া যাচ্ছে এখানে, তিনিই প্রেমতোষ বসু। ইনি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বিশেষ বন্ধুও বটে। *ক্ষণিকা* প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন লিখেছেন, 'তাঁহারই [প্রেমতোষ বসু] আগ্রহে ও উদ্যোগে কবির 'ক্ষণিকা' নামের কাব্য, তাঁহাদেরই Acme Press হইতে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের আকার, প্রকার ও টাইপ নির্বাচনও শুনিয়াছি, তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত।'[৩৭] যতীন্দ্রমোহনের এই স্মৃতিচারণ থেকে মনে হতে পারে *ক্ষণিকা* নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা খুবই কম। পাণ্ডুলিপি প্রেমতোষের হাতে তুলে দিয়েই যেন রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে দায়িত্ব শেষ করেছিলেন। কিন্তু আসল ঘটনা এর থেকে অনেক জটিল। প্রেমতোষ-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলী থেকে গ্রন্থনির্মাণের অন্দরমহলের অনেকটা খবর জানা সম্ভব হয়। তবে যতীন্দ্রমোহন যে 'Acme Press'-এর কথা বলেছেন, তার তাৎপর্য কী তা আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। *ক্ষণিকা* ছাপা হয়, আগেই বলা হল, 'ভারত যন্ত্র' নামের প্রেস থেকে।

এই প্রসঙ্গে প্রেমতোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৩টি চিঠির বয়ান বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে[৩৮] (চিঠিগুলির পূর্ণ বয়ান তুলে ধরা হল এই অধ্যায়ের 'সংযোজন' অংশে)। এগুলি *ক্ষণিকা* ছাপা সংক্রান্ত আদেশ ও অনুযোগে পরিপূর্ণ। প্রেমতোষ বসুর জবাবি-পত্রগুলি অবশ্য রক্ষিত হয় নি, হলে এই বিবরণটি পূর্ণতা পেত। তবু রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো থেকেই লেখকের উদ্বেগ ও অধিকারের কথাটি অনেকটা স্পষ্ট হয়। *ক্ষণিকা* প্রসঙ্গে প্রথম চিঠিতে [২১ চৈত্র ১৩০৬ব : ৩ এপ্রিল ১৯০০] রবীন্দ্রনাথ 'বন্ধুদের মধ্যে খুঁৎখুঁৎ সহ্য করতে না পারিয়া' বইটি 'সাজাইবার ভার' পুরোটাই তুলে দেন প্রেমতোষ বসুর জিম্মায়। সঙ্গে বইটির প্রাথমিক একটি বিবরণও জানান তিনি, 'জিনিসটা কণিকার ধরণে স্বল্পায়তন হইবে। সবসুদ্ধ হয়ত গুটি কুড়িক কবিতা। ৬০০ খণ্ডের অধিক ছাপিব না। আপনার উত্তর পাইলে প্রস্তুত হইতে পারিব।' দ্বিতীয় চিঠিটিতে [২৩ চৈত্র : ৫ এপ্রিল] রবীন্দ্রনাথ কাগজের মানও নির্দিষ্ট করে দেন ('কাগজ ঐ ডবল ক্রাউন প্রিমরোজ লেবল ৪০ পাউণ্ডেই চলিবে'), আর তার সঙ্গে প্রেমতোষকে বলেন, 'ছাপাটা একটু সুদৃশ্য সুপাঠ্য সুবিন্যস্ত করা আপনার উপর ভার রহিল'।

এতে উৎসাহ পেয়ে বইটির সাজসজ্জার নানারকম বন্দোবস্তে মেতে ওঠেন প্রেমতোষ। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল তাঁর আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষ্যে বইটি বের করে ফেলার, সেইজন্যে ১০ বৈশাখ [২২ এপ্রিল] তিনি তাগাদা দিয়ে লেখেন, 'কিন্তু মহাশয় মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা করিবেন না। খুব করিয়া হাত চালাইয়া লইবেন। ফর্মা পাঁচেকের বেশী হইবে না, অতএব ধরিতে গেলে এক সপ্তাহের কাজ বিশেষতঃ

কম্পোজ করিবার ম্যাটার অতি অল্প, অক্ষর অল্পই জুড়িবে।' এর সঙ্গে কবিতাগুলির পারম্পর্য ও অন্যান্য বিষয়েও যে রবীন্দ্রনাথ সারাক্ষণ প্রেমতোষকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তার প্রমাণ আছে একটি লিখে-কেটে-দেওয়া চিঠিতে, '...ঘাঁটিয়া দেখিবেন : "প্রগল্‌ভতা" নামক একটা কবিতা আছে। প্রথমতঃ তাহার নাম বদলাইয়া "ভীরুতা" করিয়া দিবেন, তাহার পরে উপরিলিখিত শ্লোকদুটি তাহার সব শেষে বসাইয়া দিবেন। পরপৃষ্ঠায় "উদাসীন" বলিয়া যে কবিতাটা লিখিয়া দিলাম সেটা শেষ কবিতার আগে ছাপিতে হইবে।'

'প্রগল্‌ভতা'র নাম বদলে 'ভীরুতা' করা হয়েছিল, অবশ্য ছাপার অনেক বিলম্ব হবার কারণে 'উদাসীন' কবিতাটির শেষপর্যন্ত শেষের আগে স্থান হয় নি, মুদ্রিত বইতে ৬২টি মোট কবিতার মধ্যে 'উদাসীন' ৫২তম কবিতা। মনে হয়, এই চিঠিটি লিখে কেটে দেওয়া হলেও অনুরূপ বয়ানের চিঠি তিনি পরে পাঠিয়ে থাকবেন। বইটির 'হয়ে ওঠা'-র পিছনে রবীন্দ্রনাথের ভুমিকার একটা অংশ এই ধরণের চিঠির নির্দেশ থেকে পরিষ্কার হয়। ১৪ বৈশাখ [২৬ এপ্রিল] লেখা আর-একটি চিঠিতে কবি তাগাদা দিচ্ছেন প্রুফ নিয়ে আসবার জন্যে, 'শনিবার [২৮ এপ্রিল] প্রাতে যোড়াসাঁকো বাড়িতে কাপি প্রুফ ইত্যাদি সহ যদি উপস্থিত হইতে পারেন তবে মোকাবিলায় আধঘন্টার মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইতে পারে। চাই কি গোড়াকার প্রুফটা দেখিয়া দিয়া আসিতে পারি।' কিন্তু এপ্রিল গড়িয়ে মে মাসের প্রথম সপ্তাহেও যখন বইটির প্রেস থেকে বেরোচ্ছে না, তখন রবীন্দ্রনাথ বেশ কঠোর হয়েই প্রেমতোষ বসুকে লিখলেন, 'বইটার সৌন্দর্যসঞ্চারের দিকে আপনি যে এত উৎকট মনোযোগ দিবেন আমি গোড়ায় আশঙ্কা করি নাই। দেখিতেছি ক্রমেই আপনার নেশা চড়িয়া যাইতেছে। আমি চাহিয়াছিলাম মধ্যম রকমের সৌষ্ঠব কিন্তু চটপট সমাধা আপনি সর্বোত্তমের দিকে মন দিলেন এবং [ভাবি]লেন "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ।" – মহাকাল নিরবধি বটে কিন্তু মানুষের কারবার খণ্ডকাল লইয়া – "ক্ষণিকা" সম্বন্ধে সেটা আপনাকে বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে।... অতএব প্রসাধন কার্যের নেপথ্যবিধানে অতিরিক্ত কালাতিপাত না করিয়া ক্ষণিকাকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিয়া দিন।' অবশ্য 'রঙ্গভূমি'তে *ক্ষণিকার* 'উপস্থিতি' খুব সহসা ঘটে উঠবে না, তা প্রকাশিত হবে আরও তিনটি মাস পার করে, ২৬ জুলাই । এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও নতুন-নতুন কবিতা লিখে বইটির মধ্যে যুক্ত করতে থাকবেন। ১৪ জুনও বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একটা চিঠিতে কবি জানিয়েছিলেন, 'ক্ষণিকার চতুর্থ ফর্ম্মার প্রথম প্রুফ আজ দেখে দিলুম – বোধহয় পঞ্চম ফর্ম্মায় সমাপ্ত হবে – কবিতার সংখ্যা ৫৫।'[৩৯] পাঁচ ফর্মায় হয় নি, প্রথম সংস্করণ *ক্ষণিকা* সাত

ফর্মার বই। আর কবিতার সংখ্যাও ৫৫ থেকে বেড়ে শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৬২। এই কাহিনিটা আমরা ভবিষ্যতেও একাধিকবার পুনরাবৃত্ত হতে দেখব, কবিতার বই ছাপতে দেরি হবার কারণে রবীন্দ্রনাথ আরও কবিতা লিখে যোগ করতে থাকেন, ফলে ছাপার কাজ আরও দেরি হয়, কবিতার বইয়েরও প্রাথমিক পরিকল্পনার অনেক বদল করতে হয় ছাপা চলাকালীনই। ২০ জুন প্রিয়নাথ সেনকেই ফের লিখছেন কবি, 'ক্ষণিকা সম্বন্ধে হতশ্বাস হয়ে পড়ছি। ফর্ম্মা গেলি প্রুফ হয়েছে – অদ্য কেবল দ্বিতীয় ফর্ম্মার অর্ডর প্রুফ পাওয়া গেল।'[৪০]

এইসব চিঠিপত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি, গ্রন্থনির্মাণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার প্রকৃত স্বরূপটি। বইয়ের সজ্জা নির্দেশ করছেন তিনি। কবিতার পারম্পর্য স্বাভাবিকভাবে তাঁরই নির্দেশনায় সাজানো হচ্ছে। যাবতীয় প্রুফ দেখার ভার তাঁর। এবং 'গেলি প্রুফ' বা 'অর্ডর প্রুফ'-এর মতো টেকনিক্যাল শব্দের ব্যবহার দেখে বোঝা যায় মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা কত অনায়াস। প্রসঙ্গত, লেটার প্রেসে ছাপার সময় যে ধাতব ট্রে-তে এক-একটি পৃষ্ঠার টাইপ 'সেট' করা হয় তাকে বলে গেলি-ট্রে (Galley Trey)। *প্রাথমিক প্রুফ* দেখার জন্যে তার উপরে কালি লাগিয়ে ছাপ তোলা হয় কাগজে। সেই ছাপ-দেওয়া কাগজটিকে প্রকাশনা-জগতের নিজস্ব পরিভাষায় বলা হয় গেলি প্রুফ। রবীন্দ্রনাথ 'গেলি' বলতে এই গেলি-প্রুফকেই বোঝাচ্ছেন। একাধিকবার এই গেলি-প্রুফ দেখবার জন্যে দেওয়া হতে পারে। অন্যদিকে গেলি প্রুফ সংশোধন হয়ে যাবার পর ছাপার উপযোগী করে পুরো পাতাটিকে 'সেট' করে নেবার পর একেবারে শেষে যে-প্রুফটি দেখতে দেওয়া হয় তাকে বলে 'অর্ডর প্রুফ'। এই প্রুফেই লেখক ছাপা শুরু করার নির্দেশ দেন। এইভাবে বোঝা যায়, পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়ে অন্তত রবীন্দ্রনাথ দায় সেরে ফেলেন না, প্রকাশনার 'রান্নাঘর'-এ চলতে থাকে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা। রবীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থনির্মাণ-সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রমাণ হিসেবে সেরা নমুনা সম্ভবত ১৫ বৈশাখের চিঠিটি :

> প্রুফে কাটাকাটি হইবে না অতএব পেজ বাঁধাইয়া পাঠাইবেন। অনুমান করিতেছি প্রত্যেক পেজে ১৬ লাইন ধবে। সাজাইবার সংকল্পে অধিক দেরী না হয় – সৌখীন ছাপার সখ আমার প্রায় নাই, কিন্তু সত্বর ছাপানর দিকে আমার ঝোঁক আছে জানিবেন।

> ডিকেন্‌সনদের একপ্রকার কাগজ আছে, তাহার বর্ণনা Orange Label Antique Laid এবং মলাটের কাগজ Wool Fibre Antique Laid কাগজটা যদি ডবল ক্রাউন সাইজে পাওয়া যায় ত দেখিবেন – নতুবা সেই Primrose Labelটাই কিনিবেন।

রবীন্দ্রনাথ এখানে যেন কোনো প্রেস-ম্যানেজারের ভাষায় কথা বলছেন !

প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে, *ক্ষণিকা*-র ছাপা নিয়ে প্রেমতোষ বসুর এত দীর্ঘসূত্রতায় শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এতটাই বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন যে, অনেকদিন পরেও এই অভিজ্ঞতাটিকে তিনি ভোলেন নি। ১৯০৩-এ মোহিতচন্দ্র সেন(১৮৭০-১৯০৬)-এর সম্পাদনায় 'মজুমদার লাইব্রেরি' থেকে খণ্ডে খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংকলং *কাব্য-গ্রন্থ* বেরোতে শুরু করে। সেই সময়ে, কাজ ত্বরান্বিত করবার জন্যে একাধিক প্রেসে বিভিন্ন খণ্ড ছাপার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন মোহিতচন্দ্র। সেই সূত্রে ৩২ শ্রাবণ ১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৭ আগস্ট ১৯০৩) তিনি কবির কাছে জানতে চাইছেন, 'কাল প্রেমতোষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল — শিশুখণ্ড তাদের প্রেসে ছাপাবার। আপনি কি বলেন?'[৪১] রবীন্দ্রনাথের [৩ ভাদ্র/ ২০ আগস্ট] উত্তরটি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অনুকূল ছিল না, কবি লিখলেন, 'প্রেমতোষবাবুর প্রেসকে আমি বড় ডরাই। ক্ষণিকা ছাপতে তিনি ছমাস করেছিলেন। যদি তিনি অতি শীঘ্র ছাপিয়ে দিতে একেবারে দৃঢ়নিশ্চয় হন — যদি বলেন যে তাঁর কথার কিছুমাত্র নড়চড় হবে না তাহলে আর একবার তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করা যেতে পারে। তাঁর কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে আমার বড় বিশ্বাস নেই।'[৪২] রবীন্দ্রনাথের এই অনাস্থার পরে মোহিতচন্দ্র আর প্রেমতোষের কাছে *কাব্য-গ্রন্থ*-এর কোনো খণ্ড ছাপার ভার তুলে দিতে ভরসা পাননি।

যাইহোক, আগেই বলা হয়েছে, *ক্ষণিকা* ছেপে বেরোয় ২৬ জুলাই। বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৪?-১৯১৫)-এর উদ্দেশে বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা হয়, 'ক্ষণিকারে দেখেছিলে/ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,/ সাজিয়ে তারে এনে দিলেম/ ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায় !' লোকেন্দ্রনাথ বা সাধারণ পাঠক, কেউই জানতে পারেন না যে ওই 'কাঁচা খাতা'টি থেকে 'বাঁধা পাতা' পর্যন্ত সাজিয়ে দেবার প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের কত পরিশ্রম কত হাঙ্গামা কত উদ্বেগ এবং, অবশ্যই মেধার দ্যুতি লুকিয়ে আছে। সমালোচকও 'কাঁচা খাতা'র কবিকেই বাহবা দেন, সেটাই স্বাভাবিক, তবে তার পরের অংশটুকু লক্ষ করলে হয়তো জন্ম নিতে পারে কবির প্রতি আমাদের এক অনাস্বাদিত মুগ্ধতা। সেটাই আমাদের লাভ।

সংযোজন

ক্ষণিকা বইটির প্রকাশক প্রেমতোষ বসুকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তার অধিকাংশ মুদ্রিত হয়েছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ব সংখ্যায় এবং অধুনালুপ্ত 'বসুধারা' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৬৮ব সংখ্যায়। স্বভাবতই চিঠিগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। প্রাসঙ্গিক চিঠিগুলির পূর্ণাঙ্গ বয়ান এখানে উপস্থিত করা হল। এর মধ্যে ৪, ৯ ও ১০ সংখ্যক চিঠিগুলির ক্ষেত্রে মূল চিঠিই বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে, বাকিগুলি টাইপ-করা কপি, মূল চিঠি রবীন্দ্রভবনে নেই। চিঠিগুলির প্রতিটিই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থনির্মাণ-বিষয়ক জ্ঞান ও ধারনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য।

১.

প্রিয়বরেষু

একটি নূতন ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ আপনার প্রেসে ছাপিতে দিতে ইচ্ছুক আছি। ছোট সাইজ, ৩২ পেজি – অর্থাৎ ভারতীকে দুই ভাঁজে মুড়িলে যেমন হয় – রয়াল ডবল ক্রাউনের ক্ষুদ্রতম ভাঁজ। উক্ত সাইজের ভাল গোছের বিলাতী কাগজ ডিকিন্‌সন্‌রা কত দরে বিক্রয় করে খবর পাইলে কাগজ কিনিবার টাকা ও পাণ্ডুলিপি আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

প্রতি পেজে দশ লাইনের অধিক ধরাইতে চাই না। ভাল বর্জায়িস অক্ষরে কিরূপ দেখিতে হইবে? সাজাইবার ভার আপনার উপর – সে সম্বন্ধে আমি অন্ধ ও উদাসীন – কিন্তু বন্ধুদের খুঁৎ খুঁৎ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনার প্রতি ভারার্পণ করিলাম। জিনিসটা কণিকার ধরণে স্বল্পায়তন হইবে। সবসুদ্ধ হয়ত গুটি কুড়িক কবিতা। ৬০০ খণ্ডের অধিক ছাপিব না। আপনার উত্তর পাইলে প্রস্তুত হইতে পারিব।

একখণ্ড কাহিনী পাঠাইলাম অবসর মত পড়িয়া দেখিবেন। আমরা ত সকলে ভাল আছি – কিন্তু কলকাতাবাসী আপনাদের জন্য উদ্বেগ অনুভব করি। আশা করি মারী আপনাদের পল্লীতে লুব্ধ হস্ত প্রসারিত করে নাই, পণ্ডিত মহাশয় দিব্য আছেন। যখন প্লেগের আশঙ্কা ছিল না তখন মফস্বলবাসের... খেদ অনুভব করিয়া সকলেরই নিকট আক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেন এক্ষণে সেই মফস্বলবাসের জন্য বিধাতাকে এবং সেই সঙ্গে উপলক্ষ্য স্বরূপ আমাকেও বোধহয় মনে মনে ধন্যবাদ দিতেছেন। ইতি ২১শে চৈত্র ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[*চিঠির অন্তর্গত বর্জন-চিহ্নটি আমাদের দেওয়া নয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিঠির কপিটিতেই এই চিহ্ন দেওয়া আছে।*]

২.

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত আছি। কাপি ইতিমধ্যেই পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু দুই চারিদিনের মধ্যে এখানে বন্ধু সমাগম প্রত্যাশা করিতেছি – নব রচিত কবিতাগুলি তাঁহাদিগকে শোনাইবার প্রলোভনবশতঃ এগুলি এখনো মুদ্রাযন্ত্রের লৌহজঠরে সমর্পণ করিলাম না। কাগজ ঐ ডবল ক্রাউন প্রিমরোজ লেবল ৪০ পাউণ্ডেই চলিবে – ছাপাটা একটু সুদৃশ্য সুপাঠ্য সুবিন্যস্ত করা আপনার উপর ভার রহিল। একেবারে কাগজের মূল্য এবং কাপি একসঙ্গে পাঠাইব। বইখানির নাম হইবে – ক্ষণিকা। বিষয়গুলিও তদ্রূপ। এইজন্যই ছাপাটা কাগজটা কিছু অতিরিক্ত ভাল হওয়া চাই।

প্লেগটাকে সর্বদা দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবেন। আপনার প্রতি সম্প্রতি আমার এই একমাত্র পরামর্শ। ইতি ২৩শে চৈত্র ১৩০৬

ভবদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

লোকেন পালিত আমার ''ক্ষণিকা''র সমস্ত কাপি এখান হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেছেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি আপনার ঠিকানায় যেন কাপি পাঠাইয়া দেন। পাইলে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইবেন আমি কাগজের বন্দোবস্ত করিয়া দেব। জিনিসটি ছোট, আশা করি ছাপিতে অধিক দেরী হইবে না।

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪.

...ঘাঁটিয়া দেখিবেন : “প্রগল্‌ভতা” নামক একটা কবিতা আছে। প্রথমতঃ তাহার নাম বদলাইয়া “ভীরুতা” করিয়া দিবেন, তাহার পরে উপলিলিখিত শ্লোকদুটি তাহার সব শেষে বসাইয়া দিবেন। পরপৃষ্ঠায় “উদাসীন” বলিয়া যে কবিতাটা লিখিয়া দিলাম সেটা শেষ কবিতার আগে ছাপিতে হইবে।

কিন্তু মহাশয়, মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা করিবেন না। খুব করিয়া হাত চালাইয়া লইবেন। ফর্মা পাঁচেকের বেশী হইবে না, অতএব ধরিতে গেলে এক সপ্তাহের কাজ বিশেষতঃ কম্পোজ প্রভৃতি করিবার ম্যাটার অতি অল্প, অক্ষর অল্পই জুড়িবে।

পণ্ডিত মশায় উড়ুক্কু ডানা মেলিয়াছেন, খাঁচায় কবে ফিরিবেন জানি না। আশা করি খবর ভাল। ইতি ১০ বৈশাখ ১৩০৭

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[*এই চিঠির মূল কপিটি রবীন্দ্রভবনে নেই, তার বদলে একটি টাইপ কপি রক্ষিত আছে। সেখানে চিঠির শেষে লেখা আছে, ‘এই পত্রাংশটি লিখিয়া কবি নিজেই কাটিয়া দিয়াছিলেন’।*]

৫.

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

কৈ মশায়, আপনার ত সাড়াই নাই ! শীঘ্র ছাপা হইবে আশা করিয়াই পুরাতন সমাজপ্রেসকে বঞ্চিত করিয়া আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি – কিন্তু দোহাই যেন তপ্ত কটাহ হইতে অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া না হয়। যদি কোন কারণে সত্বরতার কোন ব্যাঘাত থাকে তবে এই বেলা খবর দিবেন। উৎকণ্ঠিত আছি। ইতি ১২ বৈশাখ ১৩০৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কর্মচারীদের বলিয়া দিয়াছি, কাগজের হিসাবে আপনাকে ২০টাকা পাঠাইয়া দিতে। আজ রবিবার বলিয়া হইল না, কাল পাঠাইবে। কিন্তু আপনি বইখানি ছাপাইতে বিলম্ব করিলে চলিবে না – বৈশাখের মধ্যেই প্রকাশ করিতে চাই। প্রুফে কাটাকাটি হইবে না অতএব পেজ বাঁধাইয়া পাঠাইবেন। অনুমান করিতেছি প্রত্যেক পেজে ১৬ লাইন ধরিবে। সাজাইবার সংকল্পে অধিক দেরী না হয় – সৌখীন ছাপার সখ আমার প্রায় নাই, কিন্তু সত্বর ছাপানর দিকে আমার ঝোঁক আছে জানিবেন।

ডিকেন্‌সনদের একপ্রকার কাগজ আছে, তাহার বর্ণনা Orange Label Antique Laid এবং মলাটের কাগজ Wool Fibre Antique Laid কাগজটা যদি ডবল ক্রাউন সাইজে পাওয়া যায় ত দেখিবেন – নতুবা সেই Primrose Labelটাই কিনিবেন।

কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই যে, ছাপিতে দেরী করিবেন না। আপনি নিজের ও পরের বিবিধ কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহার উপর ভারতী ছাপার তাড়া, সেইজন্যই আশঙ্কা হয়। ইতি ১৫ বৈশাখ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আজ হইল ২১শে বৈশাখ। বই সাজাইবার জন্য উত্তরোত্তর আপনার উৎসাহমত্ততা দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি – কেবলমাত্র কালবিলম্বের ভয় নহে – ব্যয়বাহুল্যটাও বিচার্য বিষয়। এইবার নিজেকে সংযত করুন – হাতে যা আছে তাই দিয়াই কাজ চালাইয়া দিন্‌ – তিনটে চারটে পাঁচটারমের কালী না হলেও বিশেষ ক্ষতি কি ! আমার ভবিষ্যৎটাও ভাবিয়া দেখিবেন। আর যাই করুন চট্‌পট্‌ সারিয়া ফেলুন। আর একটা কবিতা আছে এইটে বইয়ের সবশেষে যাইবে কপি করিয়া পাঠাইতেছি। পৃষ্ঠা দেখুন। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩০৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮.

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

সুহৃদবরেষু

আমি দেখিতেছি আপনি নীরবে কাজ করিতে ভাল বাসেন, তাহা প্রশংসনীয় বটে কিন্তু কাজ যে চলিতেছে এটা জানিতে যাহাদের স্বার্থ বা ঔৎসুক্য আছে তাহাদের পক্ষে বড় মুস্কিল। বোধ করি মনে আছে আপনি রেলোয়ে স্টেশনে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে সেই রাত্রের ডাকেই একটা কি ব্যাপার আপনি আমাকে পাঠাইয়া দিবেন কিন্তু পঞ্চরাত্রি কাটিয়া যাওয়াতে আমার চিন্তার কারণ হইয়াছে। বইটার সৌন্দর্যসঞ্চারের দিকে আপনি যে এত উৎকট মনোযোগ দিবেন আমি গোড়ায় আশঙ্কা করি নাই। দেখিতেছি ক্রমেই আপনার নেশা চড়িয়া যাইতেছে। আমি চাহিয়াছিলাম মধ্যম রকমের সৌষ্ঠব কিন্তু চটপট সমাধা আপনি সর্বোত্তমের দিকে মন দিলেন এবং [ভাবি]লেন "কাল্যোহ্যয়ং নিরবধিঃ"। – মহাকাল নিরবধি বটে কিন্তু মানুষের কারবার খণ্ডকাল লইয়া – "ক্ষণিকা" সম্বন্ধে সেটা আপনাকে বিশেষরূপ মনে রাখিতে হইবে। আমার অধীর প্রগল্‌ভতায় আপনি বোধহয় ভীত হইতেছেন কিন্তু আপনার অবিচলিত মৌনে আমি ততোধিক ত্রস্ত হইতেছি। অতএব প্রসাধন কার্যের নেপথ্যবিধানে অতিরিক্ত কালাতিপাত না করিয়া ক্ষণিকাকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিয়া দিন। আমি অল্পে সন্তুষ্ট। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩০৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার মৌনব্রত ভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। আর্টপেপার পাওয়া যায় নাই সে আমার শাপে বর হইয়াছে। কারণ রিক্ত ভাণ্ডার লইয়া বর্ষ আরম্ভ করিয়াছি। সেইজন্যই আরও একটি বক্তব্য আছে। আপনারা ডিমাই কাগজে ছাপিতে প্রস্তুত হইয়াছেন – তাহার ফল এই যে ডবল ক্রাউনে যাহা একবার ছাপিলেই চলিত ডিমাইয়ে তাহা দুবার ছাপিতে হইবে। একে ত মসী বৈচিত্র্যবশতঃ একাধিকবার ছাপিতেই বাধ্য তাহার পরে আয়তনের অনুরোধে ছাপার

কাজ বাড়িয়া গেলে সময় এবং শ্রম এবং অর্থ এই তিনেরই প্রচুর অপচয় হইবে। সেটা বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন না কি ?

আপনাদের ছাপার বিলম্বে অধীর হইয়া শেষকালে কবিতা রচনায় হাত দিতে হইয়াছিল।

সুতরাং ক্ষণিকার আরও কয়েকটি লেখা বাড়িয়া গেছে। এইবার কিন্তু পজিটিভলি দি লাস্ট – আশা করি বিলম্ব সম্বন্ধে আপনারাও সেইরূপ আশ্বাস দিতে পারিবেন। পরপৃষ্ঠা দেখুন। ইতি ২৮শে বৈশাখ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনঃ ছন্দের অনুরোধে কথাগুলির মাঝে মাঝে যেখানে কিঞ্চিৎ অধিক ফাঁক ফেলিয়াছি – ছাপায় যাহাতে সেটা রক্ষা হয় দেখিবেন – প্রুফে এ সকল direction বোধগম্য করিয়া দেওয়া বড় কঠিন।

১০.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

এক কোপে না কাটিয়া ফেলিলে হিন্দুশাস্ত্রমতে অপরাধ হয়। পাব্লিক্‌দেবীর জন্য আমি যে বলিটি আপনার হাতে দিয়াছি তাহাকে একেবারে ঝড়াৎ করিয়া কেন নিকাশ করিতেছেন না ? তাহাকে ফুলচন্দন পরাইতে যত দেরী করিবেন তত আপনার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইবে। মাঝে মাঝে few and far between আপনার আশ্বাস পাই – কিন্তু শিকি পয়সা নগদ পাইতেছি না কেন? বৈশাখের আর দুটি মাত্র দিন আছে। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার সহিত নির্ম্মম ব্যবহার কেন করিতেছেন, ইহাকেই বাঁধিয়া মারা বলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

এখানে নির্ভরযোগ্য যে কয়টি আত্মীয়স্বজনের সহিত পরামর্শ করিলাম কেহই চিত্রবিচিত্রের পক্ষপাতী নহেন। আমার নিজের ত কথাই নাই মহাশয় – সাদা মার্জিন একটু বড় থাকাই চাই – কারণ : – আমার সব কবিতাতেই ধুয়া আছে ধুয়াটি ডাহিনে বামে সরাইয়া ছাপিতে হইবে – যথা –

জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি
মর্ত্যে যেন না ভেঙে যায় মিথ্যে মায়াগুলি !
থাকব না ভাই থাকব না কেউ
থাকবে না ভাই কিছু
সেই আনন্দে চলরে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু !
ফুল তুলি তাই তাড়াতাড়ি...

অতএব কতকটা অংশ ডাহিনে কতকটা অংশ বাঁইয়ে সরাইয়া ছাপিলে মার্জিন বেশী থাকিবে না। যে কবিতার ধুয়া নাই তাহারও একঘেয়েত্ব ভাঙ্গিবার জন্য একটা শ্লোক বামে ছাপিলে দেখিতে ভাল হইবে। সাজসজ্জা সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র চিন্তা ও বিলম্ব না করিয়া আপনি এইভাবে ছাপাইয়া যান। দোহাই আপনার এবারে আর দেরী না – বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ আসিল – মনে আশা ছিল বসন্তে বাহির হইবে, গ্রীষ্মে হইলেও চলে কারণ তখনও দক্ষিণ বাতাস থাকে কিন্তু পূবে বাতাসের আমলে গিয়া যদি পড়ি তবে আষাঢ়ের ধারার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য কবির মুষলধারে অশ্রুপতন আরম্ভ হইবে। যাহাই হৌক গ্রন্থের পত্রে পত্রে বর্ডার দিয়া ছাপা আমার চক্ষে কোন মতেই শোভন ঠেকিল না – ভাল লাগাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু চক্ষু মেলিয়া কিছুতেই ভাল লাগাইতে পারিলাম না – অতএব আপনার অনেক বৃথা কষ্টের কারণ হইলাম বলিয়া বিনীতভাবে মার্জনা চাই। এইখানে উদ্যোগপর্ব একেবারেই শেষ হইল – এখন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া যুদ্ধং দেহি। আমার কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করিবেন। ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

বইখানি হাতে পাইয়াও অত্যন্ত দুঃখের সহিত ফিরাইতে হইল। খুলিয়া দেখিবেন **১৬** পেজের পর কয়েক পৃষ্ঠা একেবারে উল্‌টাপাল্‌টা। একান্ত মনে আশা করি সকল বইগুলিই এরূপ হইবেনা [?] । এবং জগদীশবাবুকে যে বইখানি দেওয়া হইয়াছে সে খানিতে পাতা ঠিক আছে ভরসা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উল্লেখপঞ্জি ও টীকা

১. শরৎকুমারী চৌধুরাণী, 'ভারতীর ভিটা', রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ব, পৃ.১১২

২. রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন সংগ্রহ। accession no. 93.

৩. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র কথা*, কলকাতা : জয়শ্রী পুস্তকালয়, ১৯৯১, পৃ. ১৯৫

৪. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সরকারী দলিলে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা', সুধীরঞ্জন দাস সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ব, পৃ. ২৮৪-৮৫

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ব, পত্র নং ১৩৭, পৃ.১৫৪

৬. পুলিনবিহারী সেন, *রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮০ব, পৃ. ৩১

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ব, পৃ. ৯৮

৮. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *পুরাতনী*, কলকাতা : রূপা অ্যান্ড কোং, প্রথম সংস্করণ, তারিখের উল্লেখহীন ('ভূমিকা' রচনার তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ১৯৫৬) পৃ. ২৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১০. Tagore, Rathindranath. *On the Edges of Time.* Calcutta : Visva-Varati. June 1981. Pp.9.

১১. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৪ব, পৃ. ৬৬

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিম্বঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ব, পৃ. ৪২

১৩. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৯১ব, পৃ. ১৬১

১৪. এ বিষয়ে মৃণালিনী দেবীর একটি চিঠি প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়। তারিখহীন সেই চিঠিতে সত্যপ্রসাদকে তিনি লিখছেন, 'আগেকার যে পঞ্চাশটাকা আমার নামে সরকারীতে হাওলাত আছে আর সে দিন যে চল্লিশটাকা নিয়েছি এই নব্বুই টাকা এ মাসে কেটে নিওনা। আগামী মাসে কেটে নিও। এমাসে কেটে নিলে আমার খরচ চলা অসম্ভব।' (দ্র. *চিঠিপত্র*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪০০ব, পৃ. ৭৮) । বাক্যগুলি যেন মাস চালাতে হিমসিম-খাওয়া এক নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহকর্ত্রীর অসহায় আর্তির মতো শোনায় !

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব, পত্র ১৪, পৃ. ২৪

১৬. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৫ব, পৃ. ১২৯

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ব, পৃ. ৭১

১৮. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৩ব, পৃ. ১৯১

১৯. যতীন্দ্রমোহন বাগচী, *রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য,* কলকাতা : পত্রলেখা, ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ৩৭-৩৮

২০. পুলিনবিহারী সেন, *রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮০ব, পৃ. ১৬৬

২১. *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ পরিক্রমা,* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৭ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ১৩

২২. দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, *সোমপ্রকাশ,* ১৪ শ্রাবণ, ১২৯১ব, পৃ. ৬০৬-৬০৭

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ব, পৃ. ১০৫

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

২৫. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ব, পৃ. ১৪৫-৪৬

২৬. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৪ব, পৃ.২৬২.

২৭. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। correspondence file(Bengali), Serial no. 837

২৮. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, 'দিনলিপি', অনাথনাথ দাস সম্পাদিত রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ২৮, কলকাতা : বিশ্বভারতী, আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. ৫৭-৫৮

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৩০. সুকুমার সেন, *পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ,* কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ১০০

৩১. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ব, পৃ. ১৪৭

৩২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জোড়াসাঁকোর ধারে', সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রচনাসংগ্রহ ১ স্মৃতিকথা,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৬৬-৬৭

৩৩. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫ব, পৃ. ১৫৬

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩৬. যতীন্দ্রনাথ বসু, 'শিলাইদহে রবীন্দ্রবাবু', শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৯

৩৭. যতীন্দ্রমোহন বাগচী, *রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য,* কলকাতা : পত্রলেখা, ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ২৯

৩৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, File no. 455

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ব, পত্র ১০১, পৃ. ৮৯

৪০. প্রাগুক্ত, পত্র ১০২, পৃ. ৯২

৪১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, File no. 597. এই চিঠি এবং এর পরের চিঠিটির আংশিক পাঠ ছাপা হয়েছে দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮ব-তে। তবে সেখানে আমাদের উদ্ধৃত অংশগুলি বর্জিত।

৪২. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, File no. 597.

তৃতীয় অধ্যায়

‘মজুমদার লাইব্রেরি’-পর্ব (১৯০১ – ১৯০৮)

ক. প্রথম ‘স্থায়ী’ প্রকাশক

সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০?-১৯০৮) ভাই শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের(?-১৯১৪) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কর্মসূত্রে যোগাযোগ ‘মজুমদার লাইব্রেরি’ প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই। উনিশ শতকের শেষ দশকে, রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব নেওয়ার পরে কোনো-একসময়ে শৈলেশচন্দ্রকে কালীগ্রাম পরগণার নায়েব হিসেবে নিযুক্ত করেন। *ছিন্নপত্রাবলী*-র একাধিক চিঠিতে শৈলেশচন্দ্র-র উল্লেখ আছে। অবশ্য সে উল্লেখের মধ্যে কখনও কখনও কবির বিরক্তির প্রকাশও লক্ষ করা যায়। নির্জনতা-প্রিয় কবির সামনে নায়েবের ‘কেজো’ উপস্থিতিই এই বিরক্তির কারণ। যেমন, ১৮৯৪-এর ১১ ডিসেম্বর শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, ‘আজকাল [শৈলেশে]র ভয়ে খুব সকাল-সকাল বেড়াতে বেরই; অনেকক্ষণ একলা বেড়াবার পর শৈ[লেশ] এসে হাজির হয়। ততক্ষণ আমি মনটিকে শান্ত ও শীতল করে নিই এবং দিনের সমস্ত চিন্তা ও কাজের ছিন্ন আবর্জনাগুলোকে একেবারে ঝেঁটিয়ে সুদূরে ফেলে দিই।... তার পরে হঠাৎ শৈ[লেশ] এসে যখনি জিজ্ঞাসা করে ‘আজ দুধ খেয়ে আপনার কোনো অসুখ করেনি তো’ কিম্বা ‘নায়েব মশাই ঠাকুরবাড়ির সমস্ত হিসেব পেশ করেছিলে নকি’ – সেগুলো এমনি অদ্ভুত খাপছাড়া শুনতে হয়!’[১] নির্জনতাকামী কবি হিসেবে শৈলেশের উপস্থিতিকে যতই ‘ভয়’ পান রবীন্দ্রনাথ, জমিদার হিসেবে নিশ্চয়ই অনেকটা নির্ভরও করতেন তাঁর উপর।

১৯০০ সালের মাঝামাঝি কোনো-এক সময়ে শৈলেশচন্দ্রেরই উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘মজুমদার লাইব্রেরি’। তবে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন, সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই, *গল্পগুচ্ছ* প্রথম খণ্ড (প্রকাশ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০), প্রকাশিত হবার সময়েও শৈলেশচন্দ্র নায়েবের চাকরিতেই বর্তমান ছিলেন।[২] এর অল্প পরেই অবশ্য তিনি নিজে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন ও প্রকাশনার কাজকেই পূর্ণসময়ের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। একেবারে শুরুর দিকে সংস্থাটির নাম ছিল ‘মজুমদার এজেন্সী’, *গল্পগুচ্ছ* প্রথম খণ্ডেও এই নামই পাওয়া যাবে। পরে তা ‘মজুমদার লাইব্রেরি’ নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। গোড়ার দিকে এর ঠিকানা ছিল ২০৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, পরে ঠিকানারও বদল হয়, ২০ নম্বর কর্নওয়ালিসে উঠে আসে এটি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে এই প্রকাশনার প্রধান নির্ভর হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের বই, আর রবীন্দ্রনাথও ভরসা পান কার্যত ঘরের লোকের এই প্রকাশন-উদ্‌যোগে। মনে রাখতে হবে, ততদিনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততা ও মনোযোগের অনেকটা কেড়ে নিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। ফলে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে একের পর এক বই ছাপিয়ে যাওয়ার শারীরিক ও মানসিক শ্রম থেকে তিনি স্বভাবতই মুক্তি চাইছিলেন।

সে 'মুক্তি' অবশ্য শৈলেশচন্দ্র তাঁকে কখনই দিতে পারেন নি !

আমরা একটু আগে যে *গল্পগুচ্ছ* বইটির কথা বললাম সেটি প্রকাশিত হয় দুটি খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডটির নাম অবশ্য ছিল *গল্প*। দুটি খণ্ডেরই প্রকাশক হিসেবে কোথাও শৈলেশচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হবে না, নাম থাকবে শৈলেশ-শ্রীশচন্দ্রের ভগিনী রাজলক্ষ্মী দেবীর পুত্র অমূল্যনারায়ণ রায়ের। যাইহোক, বই দুটি প্রকাশের যাবতীয় খরচ ও অন্যান্য দায়ভার রবীন্দ্রনাথই বহন করেছিলেন। এমনকী বই ছাপানোর জন্য কাগজ জোগাড় করার দায়ও ! বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে (১৮৫৪-১৯১৬) [৭] আগস্ট ১৯০০ তারিখে যে চিঠিটি লেখেন তার প্রায় পুরোটা উদ্ধৃত করছি আমরা এখানে, এর থেকে বই-ছাপার নেপথ্যভূমির অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে উঠবে আমাদের কাছে :

> তুমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র Chander Brothersদের একটা অনুরোধ করবে? ইংরাজি ২৪ পাউন্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ১০ রীম, সমাজ প্রেসে আমার অ্যাকাউন্টে তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন? এবং যে রকম কাগজে ক্ষণিকা ছাপা হয়েছে, সেই রকমের ৩৫ পাউন্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ২ রীম তৎসহ ঐ ঠিকানাতেই পাঠাতে পারবেন? দাম পেতে বিলম্ব হবে না – অর্থাৎ আগামী বাঙ্গালা মাসের আরম্ভেই পাবেন। আমার গল্পাবলী ছাপতে সবসুদ্ধ বোধহয় ৭০/৭৫ রীম ২৪ পাউন্ড ও আট রীম ৩৫ পাউন্‌ড্ দরকার হবে। আশা করি Chunder Brothersদের কাছে পেতে কোন ব্যাঘাত হবে না। আমি এই সঙ্গে সমাজ প্রেস্ ওয়ালাদেরও লিখে দিচ্ছি যে তারা Chunder ব্রাদার্সের ওখানে গেলে আমার অ্যাকাউন্টে কাগজ পাবে। আপাততঃ ৭০ রীম পর্য্যন্ত ক্রমশঃ আবশ্যকমত সমাজের লোকের হাতে তাঁরা কাগজ দিতে পারেন – তার পরে আরো আবশ্যক হলে আমার অর্ডর দেখে তাঁরা যেন দেন। এটা একটু জরুরী – ছাপা বন্ধ হয়ে আছে।[৩]

৯৮, রাধাবাজার স্ট্রিট, এই ঠিকানায় অবস্থিত Chander & Brothers সেকালের বিখ্যাত সংস্থা, মূলত কাগজ ও ছাপাখানার অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহকারী। ছাপা হচ্ছে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকেই। এর আগে যে সমস্ত

গল্পের বই ছাপা হয়েছে তার অধিকাংশ তখনও নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, তবু অন্তত ২০টি গল্প ছিল তখনও অপ্রকাশিত। সে কারণেই সমস্ত গল্প ধরে রাখার আয়োজন করার ইচ্ছা জাগে তাঁর। অবশ্য অন্তত ৬টি গল্প (‘ঘাটের কথা’, ‘রাজপথের কথা’, ‘রীতিমত নভেল’, ‘অসম্ভব কথা’, ‘একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প’, ও ‘গিন্নি’) এই দু খণ্ড গল্পগুচ্ছেরও অন্তর্গত হয় নি, সে তথ্যও স্মরণীয়। উদ্ধৃত চিঠিটি থেকেই স্পষ্ট যে, প্রকাশনা সংক্রান্ত আর্থিক ও অন্যান্য সব দায়ভার ছিল রবীন্দ্রনাথেরই কাঁধে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, প্রকাশক হিসেবে ‘মজুমদার এজেন্সী’ ঠিক কী ভূমিকা পালন করেছিল এই বইটির ক্ষেত্রে? প্রিয়নাথ সেনকেই কিছুদিন আগে লেখা আর-একটি (তারিখহীন) চিঠি থেকে এর কিছুটা সদুত্তর পাওয়া সম্ভব :

> গল্পের বইয়ের প্রুফ আমি কালই পাঠিয়ে বসে আছি। যদি সুরেশ বাবু নিতান্ত নিতে ইচ্ছা করেন তবে একটু শীঘ্র তাঁর মতটা জান্‌তে পারলে ভাল হয় – বিস্তারিত বিবরণ এই –
>
> বইটা আন্দাজ ৭৫ ফর্ম্মা হবে – দুই খণ্ড করব – প্রত্যেক খণ্ডের দাম ১৸০।
>
> কাগজ বিলাতী ২২ পাউণ্ড্। অর্থাৎ প্রায় চার টাকা দাম। ছাপার খরচ তিন টাকা ফর্ম্মা। তাহলে সবসুদ্ধ খরচ ৫০০৲। হাজার বইয়ের মূল্য৩৫০০।
>
> গুরুদাসকে বিক্রয় করলে সে আমাকে শিকি মূল্য ৮৭৫৲টাকা দেবে -- ৫০০৲খরচ বাদ দিলে ৩৭৫৲টাকা আমার থাকে।
>
> কিন্তু এক টাকা বারো আনা দাম যদি অধিক মনে হয় ত দেড় টাকার কম দাম কিছুতেই করব না। কিন্তু প্রায় ৫০০ পাতার বইয়ের দাম ১৸০ আনা হওয়া অন্যায় নয়।
>
> সুরেশ বাবু যদি আমাকে ৩০০৲ টাকা মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে আমার বক্তব্য আর কিছুই থাকে না।[4]

বই প্রকাশের যাবতীয় অর্থকরী দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জানাশোনা প্রায় স্তম্ভিত করে দেবার মতো! তাঁর প্রতিভার নানাদিক নিয়ে আমরা চর্চা করি, গ্রন্থনির্মাতা হিসেবে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ মুল্যায়ন কেন প্রয়োজন তা এই সমস্ত চিঠি পড়লে বুঝতে পারা যায়। যাইহোক, এই চিঠির ‘সুরেশ বাবু’ হচ্ছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। এর আগেই, ১৩০৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখে সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত-জীবনকে ব্যঙ্গ করে লেখা হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কুৎসিত গল্প ‘প্রণয়ের পরিণাম’, কিন্তু বছর ঘুরতেই দেখা যাচ্ছে সুরেশচন্দ্র-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে, তাঁর হাতে নিজের বইয়ের দায়িত্ব তুলে দিতে রবীন্দ্রনাথের অন্তত কোনো অসুবিধা নেই। তবে বোঝাই যাচ্ছে, সুরেশচন্দ্রের ভূমিকা হবে

কেবল বিপননকারীর। আগ্রিম টাকা দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বই কিনে নিয়ে বিক্রি করবেন, রবীন্দ্রনাথ চান মোট খরচের অতিরিক্ত অন্তত ৩০০ টাকা। বই-এর বিক্রয়মূল্যও ঠিক করে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। 'মজুমদার এজেন্সী'-র হাতে এইরকমই কোনো শর্তে বই তুলে দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। ফলে প্রকাশক হিসেবে এজেন্সীর তরফে আমূল্যনারায়ণ রায়ের নাম থাকলেও প্রকৃতপক্ষে প্রকাশক যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম খণ্ডটির দাম অবশ্য রাখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত দামের চেয়ে বেশি, দু টাকা। দ্বিতীয় খণ্ডটির দু টাকা চার আনা।

'মজুমদার এজেন্সী' থেকেই যে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত বই প্রকাশ করবেন তিনি, এমন পরিকল্পনা নিশ্চয়ই তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। কেননা, গল্পের দুটি খণ্ড বেরোবার পরেও *নৈবেদ্য*-র মতো গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ (প্রকাশকাল ৪ জুলাই ১৯০১), অথবা *ঔপনিষদ ব্রহ্ম*-র মতো পুস্তিকা (প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩০৮ব) কিন্তু এই এজেন্সীর সাহায্য ছাড়া আগের মতো আদি ব্রাহ্মসমাজের নামেই প্রকাশিত হবে। ১৯০৩ থেকে ঠিকঠাকভাবে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের একচ্ছত্র দায়িত্ব এসে পড়বে শৈলেশচন্দ্রের উপর। ১৯০৩-এর ৫ এপ্রিল প্রকাশিত হবে *চোখের বালি*। আর তার অল্প কিছুদিন পর থেকেই শুরু হবে মোহিতচন্দ্র সেন(১৮৭০-১৯০৬)-এর সম্পাদনায় খণ্ডে খণ্ডে সুবৃহৎ *কাব্য-গ্রন্থ* প্রকাশের বিস্তৃত আয়োজন।

খ. *কাব্য-গ্রন্থ* ও মোহিতচন্দ্র সেন

মোহিতচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ১৯০২-এর গোড়ায়। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি, তাঁর ভাই প্রমথলাল সেন(১৮৬৬-১৯৩০) নববিধানের অন্যতম কর্তা। সেই সূত্রেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকবে। আলাপের অল্প সময়ের মধ্যেই তা গভীর পারস্পরিক সখ্যতা ও নির্ভরতায় পরিণত হয়। ১৯০২-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি নববিধানের আর-এক সদস্য বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে(১৮৬৮-১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'শুভদৈবক্রমে মোহিতবাবুর সহিত আমার আলাপ হইয়াছে – আলাপের চেয়ে অনেক বেশি হইয়াছে বলিতে পারি। তিনি আমাকে আপনাদের সকলের দিকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন।...আপনাদিগের আমার প্রয়োজন আছে।'[৫] চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যু হয়

মোহিতচন্দ্রের (মৃত্যু ৯জুন ১৯০৬), কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বৌদ্ধিক সাহচর্যে মোহিতচন্দ্র সত্যই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম বৃত্তের একজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ ও তার সম্ভাব্য সজ্জারীতির প্রাথমিক পরিকল্পনা কিন্তু ছিল রবীন্দ্রনাথের একারই। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর(২৩ নভেম্বর ১৯০২) পরেই মোহিতচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি তারিখহীন চিঠি থেকে তা বোঝা যায়, 'গ্রন্থাবলী নূতন আকারে বাহির করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে জানিনা কেন তাড়া আসিতেছে। তাহা ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি।'[৬] 'নূতন আকারে' কথাটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সত্যপ্রসাদ সম্পাদিত *কাব্যগ্রন্থাবলী*-র পরিকল্পনার থেকে এটি যে ভিন্নরকম হতে চলেছে তা এর থেকে বোঝা যায়। আর, 'ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি' বাক্যাংশ থেকে বোঝা যায় সেইসময়ে দাঁড়িয়ে গ্রন্থপ্রকাশের সব আয়োজনই সারা।

বইটি অবশ্য বেরোবে আরও এক বছর পর, ১৯০৩-এর ডিসেম্বরে। এর মধ্যে মোহিতচন্দ্র এর 'সম্পাদনা'র দায়িত্ব পাবেন, প্রাথমিক পরিকল্পনারও বিস্তর বদল ঘটবে। এই পরিকল্পনা-পর্বে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ঠিক কতখানি ছিল, সেটা মূলত মোহিতচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ থেকে আমরা বোঝবার চেষ্টা করব। পুলিনবিহারী সেন 'সম্পাদক ও কবি' নামের একটি লেখায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৭] তবে সেখানে চিঠিগুলির প্রাসঙ্গিক অংশই কেবল উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু চিঠির পূর্ণাঙ্গ বয়ান পাওয়া যাবে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ও 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র নানা সংখ্যায়।

কাব্য-গ্রন্থ বইটিকে মোট ৯টি ভাগ ও ১৩টি খণ্ডে পরিকল্পনা করা হয়। প্রতিটি খণ্ডে কবিতাগুলিকে সাজানো হয় এক বা একাধিক বিষয়বিন্যাসে। সেগুলি এরকম :

প্রথম ভাগ। প্রথম খণ্ড : 'যাত্রা', 'হৃদয়ারণ্য', 'নিষ্ক্রমণ', বিশ্ব'

প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ড : 'সোনার তরী', 'লোকালয়'

দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম খণ্ড : 'নারী', 'কল্পনা', 'লীলা', 'কৌতুক'

দ্বিতীয় ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ড : 'যৌবনস্বপ্ন', 'প্রেম'

তৃতীয় ভাগ : 'কবিকথা', প্রকৃতিগাথা', 'হতভাগ্য'

চতুর্থ ভাগ : 'সংকল্প', 'স্বদেশ'

পঞ্চম ভাগ : 'রূপক', 'কাহিনী', 'কথা', কণিকা'

ষষ্ঠ ভাগ : 'মরণ, নৈবেদ্য', 'জীবনদেবতা' 'স্মরণ'

সপ্তম ভাগ : ‘শিশু’

অষ্টম ভাগ : ‘গান’

নবম ভাগ। প্রথম খণ্ড : ‘সতী’, ‘নরকবাস’, ‘গান্ধারীর আবেদন’, ‘কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ’, ‘বিদায় অভিশাপ’, ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’

নবম ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ড : ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’, ‘বিসর্জ্জন’, ‘মালিনী’

নবম ভাগ। তৃতীয় খণ্ড : ‘রাজা ও রাণী’

একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। ‘সোনার তরী’, ‘কল্পনা’, ‘নৈবেদ্য’ প্রভৃতি শিরোনামাঙ্কিত অংশগুলির সঙ্গে ওই একই নামের কাব্যগ্রন্থগুলির তফাৎ বিস্তর। যেমন, প্রথম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের ‘সোনার তরী’ অংশটিতে আছে একটি প্রবেশক কবিতা-সহ মোট ২৩টি কবিতা। এর মধ্যে মাত্র ৩টি কবিতা মূল *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থের ! বেশিরভাগ কবিতাই *ক্ষণিকা* ও *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। তেমনই, *কাব্য-গ্রন্থ* প্রকাশের পরবর্তীকালে বেরোবে *শিশু* ও *স্মরণ* নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ, এই বইতে ওই একই শিরোনামের অংশগুলোর সঙ্গেও সেই ভবিষ্যৎ কাব্যগ্রন্থগুলির যে অল্প-বিস্তর তফাৎ থেকে যাবে, সেটা লক্ষণীয়।

কোন কবিতা কোন অংশে যাবে, সেই সিদ্ধান্তে যে মোহিতচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা বোঝা যায় তাঁর লেখা একাধিক চিঠির এইরকম অংশগুলি থেকে, ‘“যাত্রিনী” কবিতাটি “সোনার তরী”তে দিতে বলিলাম। “চৈত্রের গান” ত প্রকৃতিগাথার অন্তর্ভূত। “ভোরের পাখী”...থাকুক, কিন্তু কোন শ্রেণীতে ? “রূপকে”র ভিতর কি? – “চিঠি”খানা কি “জীবনদেবতা”য় স্থান পাইতে পারে না ?’[৮] অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও নানা বিষয়ে মোহিতচন্দ্রের উপর ভরসা করে যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, যেমন, নতুন-লেখা-কবিতার নামকরণ প্রসঙ্গে লিখছেন তিনি, ‘কবিতাগুলির নাম চট্ করে মনে আসছে না। নাম সব সময় বাপে দেয় না পিতৃবন্ধুও দিয়ে থাকে অতএব আপনার উপর নামকরণের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে রইলুম।’[৯] নামকরণ করে মোহিতচন্দ্র অবশ্য সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিয়ে নেবেন। তবে, সম্পাদক হিসেবে মোহিতচন্দ্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল, শিশুদের উপযুক্ত কবিতাগুলোকে আলাদা করে শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাব তিনিই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেন। ১৭ জুলাই ১৯০৩-এ লেখা একটা চিঠিতে এই প্রস্তাব দেন মোহিতচন্দ্র, ‘একটা suggestion করবার আছে। কবিতাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করবার সময় কতকগুলি ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় সেগুলি এই সংস্করণেই সন্নিবিষ্ট করা ভাল, নইলে গ্রন্থাবলী অসম্পূর্ণ থেকে

যায়।...আমার মনে হয় "শিশু" বা "শৈশব" নাম দিয়ে একটা শ্রেণী করলে হয়'[১০], রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবটাকে মেনে নিয়েও প্রথম দিকে শ্রেণীটির নাম 'কিশোর' বা 'কুমার' দেওয়ার পাল্টা পরামর্শ দেন[১১], যদিও কিছুদিন পরে মোহিতচন্দ্রের পরামর্শটিই তিনি মেনে নেন, 'এই সমস্ত কবিতা গ্রন্থাবলীর যেভাগে যাবে তার নাম "কুমার" বা "কিশোর" না দিয়ে শিশু দেওয়াই ভাল।'[১২]

সম্পাদনা-বিষয়ে মোহিতচন্দ্র সেনের উপর এতখানিই নির্ভর করছিলেন রবীন্দ্রনাথ একথা যেমন ঠিক, তেমনই বইটির মুদ্রণ কার্য সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি নির্দেশ যে তিনিই নেপথ্য থেকে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেকথাও এখানে স্মরণীয়। যেমন, ২৮শে শ্রাবণ ১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৩ আগস্ট ১৯০৩) লেখা একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট নির্দেশ, 'শিশুখণ্ডের ছন্দগুলির অংশভাগ করে ছাপাবেন। অর্থাৎ ত্রিপদীকে তিন লাইনে ছড়িয়ে দেবেন – "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" প্রভৃতি কবিতার বড় লাইন গুলোকে দুই লাইনে ভেঙে দেবেন। একটা কবিতা যে পাতায় শেষ হবে সে পাতায় অন্য কবিতা আরম্ভ করবেন না। দুই লাইনের মাঝখানে বেশ একটু ফাঁক রাখ্‌বেন।'[১৩] একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে এই প্রতিটি নির্দেশ আসছে সম্ভাব্য অল্প-বয়সী পাঠকটির কথা মাথায় রেখে, তারই জন্যে বড়ো লাইনকে ভেঙে ছোট করার আয়োজন, তারই চোখের আরামের কথা ভেবে দুটি লাইনের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁক রাখার ভাবনা। এরকম আর-একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এমনকী কোন হরফে বইটি ছাপান হবে তা-ও নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, '"শিশু"খণ্ড যদি স্বতন্ত্র ছাপা মত হয় তবে ইংলিশ অক্ষরে এবং কবিতাগুলির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে যেন ছাপা হয়।'[১৪] সত্যি 'শিশু' খণ্ডের হরফ ছিল অন্য খণ্ডগুলির থেকে বড়ো আকারের, অন্য ভাগগুলিতে কবিতা ছাপা হয়েছে 'স্মল পাইকা'য়, কবিতার শিরোনাম 'ইংলিশ' টাইপে, আর 'শিশু' খণ্ডে কবিতাগুলোই ছাপা হচ্ছে 'ইংলিশ'-এ (যেমন নির্দেশ ছিল রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে) আর কবিতানাম আরও বড়ো হরফ 'গ্রেট'-এ ! শিশুকিশোরের জন্য তৈরি হয়ে ওঠা বই কীভাবে তাদের স্বাচ্ছন্দের কথা মনে রেখে সাজিয়ে তুলতে হয়, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই সুনিপুণ নির্দেশনা আজও বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। বিশেষত যদি এই তথ্য স্মরণ রাখা যায় যে, এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম শিশুদের জন্যে লেখা বই!

প্রশ্ন হল, এই বই প্রকাশে তাহলে শৈলেশচন্দ্র আর তাঁর প্রকাশনার ভূমিকা ঠিক কতখানি ছিল ? আমরা দেখব, প্রকাশকের সম্ভাব্য ভূমিকাও কিছু ক্ষেত্রে পালন করে দিচ্ছেন সম্পাদক ও লেখক। যেমন, কোন খণ্ড কোথা থেকে ছাপানো হবে সেই সিদ্ধান্ত শৈলেশচন্দ্র-নিরপেক্ষভাবে মোহিতচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ মিলেই নিচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা মোহিতচন্দ্রের একটি চিঠিকে আমরা এর প্রমাণ হিসেবে হাজির করতে পারি, 'ছাপার কাজ গেল সপ্তাহে বেশ দ্রুত চলছে। আপনি নূতন ফাইল কিছু পেলেন কি?...হরসুন্দররাও বোধহয় শীঘ্র প্রুফ দেবে। কাল প্রেমতোষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল – শিশুখণ্ড তাদের প্রেসে ছাপাবার। আপনি কি বলেন ? শৈলেসকেও[য] লিখ্ব। গুপ্ত, মুখার্জি (ডাক্তার দুর্গাদাস বাবু[র] ছেলে যে প্রেস করেছে) এক খণ্ড ছাপাতে ইচ্ছুক আছে। তাদের কিন্তু এখন টাইপ প্রভৃতি যথেষ্ট নেই।'[১৫] বাস্তবিকই, এই নটি ভাগ ছাপা হবে মোট চারটি প্রেস থেকে, তার মধ্যে সপ্তম ভাগটি ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকেই ! অবশ্য অর্থনৈতিক দায় ও ছাপার সামগ্রিক তদারকি শৈলেশচন্দ্রের উপরেই ন্যস্ত ছিল। উপরে উদ্ধৃত চিঠির একটি অংশ থেকে আরও বোঝা যায় যে প্রুফ দেখার অনেকটা দায়িত্বও ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। তাছাড়া মোহিতচন্দ্র এবং অন্যান্যরাও প্রুফ দেখতেন।

প্রুফ অনেকবার দেখা সত্ত্বেও কিছু ছাপার ভুল অবশ্য থেকেই গেছিল। সেটা তেমন বিস্ময়ের কথা না, বিস্ময় হল, এই ভুলের অনেকগুলি বই-প্রকাশের অনেক আগেই চোখে পড়া সত্ত্বেও তা শুধরে নেওয়া হয় নি ! যেমন রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে মোহিতচন্দ্রকে লিখছেন, 'আজ শৈলেশের কাছ থেকে গোটাকতক ফর্ম্মার ফাইল পেলুম। "নারী" খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায় ২য় ছত্রে "সুন্দরী" না হয়ে "সুন্দর" ছাপা হয়েছে – তাতে সৌন্দর্য্যের কোনো ব্যাঘাত হতনা যদি না মিলের বিঘ্ন ঘট্‌ত। নাট্যখণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় ৭ম ও ৮ম ছত্রে ২বার "কোরোনা" হয়েছে – অবশ্য এতে অর্থবোধের বিশেষ অসুবিধা হবে না – কিন্তু বিদ্যার্ণবমশায়কে একটু সতর্ক করে দেবেন।'[১৬] এই চিঠি লেখা হচ্ছে ২৩ জুলাই ২০১৩, বই বেরোবে ডিসেম্বরে। তা-ও চিঠিতে উল্লিখিত প্রতিটি ভুল কিন্তু বইতে অসংশোধিতই রয়ে যাবে ! তার মানে কি এতটা আগেই প্রকাশযোগ্য শেষতম-রূপে সমস্ত পৃষ্ঠা ছাপা হয়ে যাচ্ছিল ?

এই রহস্যের উত্তর হচ্ছে, ডিসেম্বরের অনেক আগেই আসলে বইগুলি বেরোবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। মার্চ মাস থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা প্রুফ দেখা শুরু করেন। জুলাই মাসের মধ্যে অন্তত প্রথমদিকের খণ্ডগুলির মুদ্রণকাজ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চাইছিলেন পুরো গ্রন্থাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে। ১০ জুলাই ১৯০৩-এ মোহিতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে জানান, 'শৈলেস[য] কাল শপথ করে গেছেন পূজার ছুটির ভেতর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী বের করবেন।'[১৭] এর ঠিক সাতদিন পরেই, ১৭ জুলাই, মোহিতচন্দ্র প্রস্তাব করেন

শিশুদের জন্যে কবিতা সন্নিবেশের (সেকথা আমরা আগেই বলেছি), ফলে রবীন্দ্রনাথও নতুন কবিতা একের-পর-এক লিখতে শুরু করেন। অন্তত ২৩ আগস্ট পর্যন্ত এই কবিতা লেখার পালা চলে (ওইদিন লেখা হয় 'জগৎপারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা')। তারপর হঠাৎ শিশুখণ্ডটি (অর্থাৎ সপ্তম খণ্ড) প্রকাশ করে দেওয়া হয় অন্য খণ্ডগুলির আগেই, ১৩১০ বঙ্গাব্দের ২ আশ্বিন[১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩]। সম্ভবত এটি আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে ছাপা বলে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে একে দ্রুত সম্পূর্ণ করে তুলতে পেরেছিলেন। অন্য খণ্ডগুলির ছাপা অনেকটা আগেই হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেন এরই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল না, তা বলার মতো নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। খুব সম্ভব, অর্থনৈতিক অসুবিধাই এর কারণ। এই অবাঞ্ছিত বিলম্বের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বারবার বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখব আমরা। দীনেশচন্দ্র সেনকে(১৮৬৬-১৯৩৯) ২৪ কার্তিক ১৩১০ বঙ্গাব্দে [৯ নভেম্বর ১৯০৩] লিখছেন তিনি, 'শৈলেশের গতিক কি রকম বুঝিতেছেন ? সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগরণ এই তিন অবস্থার মধ্যে সে কোন্ অবস্থায় আছে? ছাপাখানার করাল কবলের ভিতর হইতে গ্রন্থাবলী ত সাড়া দিতেছে না – হতভাগ্যের কথা মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় – আজকাল হতাশ হইয়া মনে না করিবারই চেষ্টা করি।'[১৮] শেষপর্যন্ত অবশ্য দুটি খণ্ড বাদ দিয়ে বাকিগুলি ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

গ. সংকট

আমরা আগেই বলেছি, শৈলেশচন্দ্রকে নিজের জমিদারীর কাজে গুরুদায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার উপর যে রবীন্দ্রনাথের খানিক ভরসা ছিল তাতে সন্দেহ নেই, মাঘ ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শ্রীশচন্দ্রকে লেখা একটা তারিখহীন চিঠিতে সেই ভরসার প্রমাণও পাওয়া যায়, 'শৈলেশ আজ কাল এই সমস্ত সাহিত্য সম্পর্কীয় ব্যবসায়ে খুবই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহার উদ্যম যথেষ্ট আছে ব্যবসায় বুদ্ধিরও অভাব নাই, সহায়ও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে সুতরাং সফলতার আশা করা যাইতে পারে।[১৯] রবীন্দ্রনাথের আশা থাকলেও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে সকলের যে এতটা ভরসা ছিল একথা বলা যাবে না। তাঁদের একজন দীনেশচন্দ্র সেন। তখন একদিকে শৈলেশচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হচ্ছে (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রথম সংখ্যাটির প্রকাশকাল ১৫ মে ১৯০১), রবীন্দ্রনাথই তার সম্পাদক। অন্যদিকে শৈলেশচন্দ্র একটি ধারাবাহিক সাহিত্যসভারও পরিকল্পনা করেছেন, নাম দেওয়া হয়েছে

'আলোচনা সমিতি', 'মজুমদার লাইব্রেরি'র অফিসের উপরকার একটা ঘরে এর নিয়মিত অধিবেশনও বসছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'(বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৯ব), 'ব্রাহ্মণ' (বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৯ব), 'চীনেম্যানের চিঠি' (বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৯ব), প্রভৃতি প্রবন্ধ এই সমিতিরই বিভিন্ন অধিবেশনে প্রথমবার পঠিত হয়েছিল। এই বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠী ও 'আলোচনা সমিতি'র অন্যতম সদস্য ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন, সেইসূত্রে শৈলেশচন্দ্রকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তাঁর *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য* (১৯২২) বইতে শৈলেশচন্দ্র সম্পর্কে লিখছেন তিনি, 'এমন উদারচেতা ভোলামহেশ্বর সংসারে কমই আছে। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকবর্গকে তিনি মুক্তহস্তে টাকা দিতেন, অর্থাৎ যখন হাতে টাকা থাকিত। এই ব্যক্তি অদৃষ্টের কি রহস্যে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন জানি না, হিসাব সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে ছিল না। বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করিতে তাঁর মত মুক্তহস্ত ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। ধার দিলে তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাওয়া বড় শক্ত ছিল। নিজের হউক, পরের হউক, টাকা পাইলে তাহা খরচ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না...'।[২০] (নিম্নরেখ আমাদের) দীনেশচন্দ্রের-লক্ষ-করা শৈলেশচন্দ্রের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কতকটাও যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁর পক্ষে সফলভাবে ব্যবসা চালানো মুশকিল হবারই কথা বটে! বস্তুত, আমরা দেখব, ১৯০৪ নাগাদ তাঁর প্রকাশনা গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে। এর আগে ১৯০৩-এ *কাব্য-গ্রন্থ* প্রকাশের অস্বাভাবিক বিলম্বের যুক্তি হিসেবে আমরা ভাবতে চেয়েছিলাম যে, কোনো আর্থিক সংকটই সম্ভবত তার অন্তর্নিহিত কারণ। সেই অনুমানের সমর্থনেও কিছু কথা এখন আমরা বলতে পারি।

যখন প্রথম বই-এর ব্যবসা শুরু করেন শৈলেশচন্দ্র, মূলধনী-ঋণের জন্যে তখন অনেকেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছিল তাঁকে। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে উৎসাহভরে সাহায্য করেছিলেন শৈলেশচন্দ্রকে, নিজেও লগ্নি করেছিলেন এক হাজার টাকা। কিন্তু বছর দুয়েকের বেশি অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এর কিছুই শোধ করতে পারেননি শৈলেশচন্দ্র, আসলের সঙ্গে সুদ যোগ হয়ে ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। এসময় রবীন্দ্রনাথও ফের একবার মানসিকভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা তাঁর অনেকগুলো চিঠিতে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আমরা দেখতে পাব। যেমন, ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১১ বৈশাখ[২৩ এপ্রিল, ১৯০৪] লেখা একটা চিঠি সমস্যার স্বরূপটা খানিক বুঝতে সাহায্য করে, 'শৈলেশ বলে তাহার liability প্রায় ১২।১৩ হাজার হইবে। Assets অন্তত হাজার পনেরো টাকার আছে। যে দেনার শুদ[য] খাটিতেছে অর্থাৎ যাহা আশু পরিশোধ করা

কর্ত্তব্য তাহার পরিমাণ ৬/৬।। হাজার। বাকি টাকা ক্রমশঃ শুধিলে চলিবে ইত্যাদি।'[২১] নিরুপায় হয়ে ১৯০৪-এর গোড়ায় মজুমদার লাইব্রেরি বিক্রি করে দেবার কথা ভাবা হতে থাকে। জনৈক নগেন্দ্রবাবু এই সংস্থা কিনে নেবেন, তাও ঠিক হয়। ২৮ এপ্রিল দীনেশচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে পারা যায়, 'অবশ্য নগেন্দ্রবাবু যদি এই কারবার গ্রহণ করেন তবে এই কোম্পানীর সহিত আমার সম্বন্ধ পূর্ববৎ থাকিবে – আমার সমস্ত গ্রন্থ ইঁহাদের হাতে রাখিব এবং সুবিধামত termsএই রাখিব।'[২২] এখন আমরা জানি যে, কোনোভাবে এই আর্থিক বিপর্যয় তখনকার মতো এড়ানো গেছিল, মজুমদার লাইব্রেরি বিক্রি করতে হয় নি। প্রশান্তকুমার পাল ঠাকুরবাড়ির 'ক্যাশবহি' উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন 'বঙ্গদর্শন'কে সাহায্যের খাতে মে মাস থেকে ত্রিপুরার মহারাজের পক্ষ থেকে ১০০টাকা করে সাহায্য আসতে শুরু করে।[২৩] 'বঙ্গদর্শন' চালাবার আর্থিক দায়ও যেহেতু পুরোটাই ছিল শৈলেশচন্দ্রের, সে কারণে এই টাকা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মজুমদার লাইব্রেরিকেও সামর্থ যোগায়। এইসব কারণে সে-যাত্রা মজুমদার লাইব্রেরির হস্তান্তর রহিত করা সম্ভব হয়। তবে এটাও ঠিক, শৈলেশচন্দ্র এবং তাঁর সংস্থার উপর রবীন্দ্রনাথের আস্থা অনেকখানি টলে যায় এর ফলে। শৈলেশচন্দ্রও তাঁর স্বভাবগত ঔদাসীন্যের কারণে (যেমন বলেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন) রবীন্দ্রনাথের আস্থা পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হন। ১৯০৮-এ 'ইন্ডিয়ান প্রেস'-এর সঙ্গে চুক্তি সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাছে খানিক 'পরিত্রাণ' হয়ে আসবে, আমরা পরে সেটা দেখব।

আমরা আগেই বলেছি, *কাব্য-গ্রন্থ*-এর খণ্ডগুলি চারটি বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপা হয়। বইটির মোট ১১টি খণ্ডের মধ্যে মাত্র ৪টি মজুমদার লাইব্রেরি-র নিজস্ব ছাপাখানা – 'দীনময়ী প্রেস' – থেকে মুদ্রিত হয়। ১৯০৩-এর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে মজুমদার লাইব্রেরির নিজস্ব দপ্তর, ২০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট-এই ছাপাখানাটি চালু করা হয়। *কাব্য-গ্রন্থ*-এর ৪র্থ, ৮ম, ৯ক ও ৯গ খণ্ডগুলিই এই ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত প্রথম বই। সে সময় মুদ্রাকর হিসেবে নাম থাকত জনৈক অনুকূলচন্দ্র পারিহাল-এর। পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই এঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এঁর পরিবর্তে মুদ্রণের মূল দায়িত্বে আনা হয় হরিচরণ মান্না নামে এক ব্যক্তিকে। পরবর্তী প্রায় এক দশক ধরে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বই-এর মুদ্রাকর হিসেবে এই হরিচরণ মান্নারই নাম আমরা পাব। (১৯০৮-এ প্রেসটি যখন ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস অধিগ্রহণ করবে, নামও তার বদলে হবে 'কান্তিক প্রেস', তখনও মুদ্রাকরের দায়িত্বে থেকে যাবেন ইনিই। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব)।

ইংরাজি সোপান নামে দুখণ্ডের একটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ছাড়া ১৯০৪-এ রবীন্দ্রনাথের কোনো নতুন বই প্রকাশিত হবে না। ১৯০৫-এরও প্রথমাংশে বেরোবে না তাঁর কোনো নতুন বই ! এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। লেখা হচ্ছে মূলত দেশবোধে জারিত অনেক গান। সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা-সংক্রান্ত বাঁকবদলের গুরুত্বপূর্ণ নানা চিহ্ন এইসব প্রবন্ধের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই প্রবন্ধাবলী ও গান/কবিতা আস্তে আস্তে গ্রন্থাকারে বেরোতে শুরু করবে ১৯০৫-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। পরপর চারটে বই (বা পুস্তিকা) এইসময়ে হরিচরণ মান্নার মুদ্রণ-তত্ত্বাবধানে বেরোবে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে। সেগুলি হল : *স্বদেশ* (বেঙ্গল লাইব্রেরি অনুযায়ী প্রকাশকাল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫), *বাউল* (৩০ সেপ্টেম্বর), *আত্মশক্তি* (১৯০৫) ও *ভারতবর্ষ* (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬)। আর এর পরেই শুরু হবে খণ্ডে খণ্ডে *গদ্যগ্রন্থাবলী* প্রকাশের বিস্তৃত পরিকল্পনা।

ঘ. 'আমার আর কোন বই ছাপিতে হইবে না'

১৯০৬-এর ৯ জুন মৃত্যু হয় মোহিতচন্দ্র সেনের। তিনি জীবিত থাকলে হয়তো *কাব্য-গ্রন্থ*-র মতো *গদ্যগ্রন্থাবলীর*ও সম্পাদনার অনেকটা দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিতেন। অন্যদিকে প্রকাশক শৈলেশচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথের ভরসার পরিমাণ ততদিনে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়েও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন-শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে(১৮৭১-১৯৫০) লেখা দুটি চিঠির দুটি প্রাসঙ্গিক অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। ১৯০৬-এর ৩ অক্টোবর তাঁকে লিখছেন, 'মহাভারত অর্দ্ধমূল্যে পাওয়া অসম্ভব নহে। আপনি শৈলেশকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া পত্র লিখিবেন...*শৈলেশ স্বভাবতই নিশ্চেষ্ট – আপনিও যদি নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করেন তবে বিধাতা আপনার সহায় হইবেন না*।'[২৪] আর ১৯০৭-এর ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁকেই লেখা চিঠিতে পাচ্ছি এমন মন্তব্য, 'এবার কলকাতা থেকে বেরবার সময় আমার কোনো অনুচরকে বলে এসেছিলুম আপনাকে "লোকসাহিত্য" ও "সাহিত্য" গ্রন্থ দুটি পাঠিয়ে দিতে। *যেহেতু শৈলেশের উপর এ ভার দিই নি আপনি এত দিনে নিঃসন্দেহে পেয়েচেন*।'[২৫] (উভয় উদ্ধৃতিতেই বাঁকানো হরফ আমাদের সংযোজন) নিজের স্থায়ী প্রকাশকের উপর

লেখকের আস্থার যদি এই নমুনা হয় তাহলে অনুমান করে নেওয়াই যায় যে প্রকাশকের বদল কেবল সময়ের ও সুযোগেরই অপেক্ষা !

যাইহোক, *গদ্যগ্রন্থাবলী* সম্পাদনা ও প্রকাশের যাবতীয় ভার নিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। বস্তুত যাবতীয় খরচও তাঁর নিজের, প্রশান্তকুমার পাল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব 'ক্যাশবহি'-র সূত্রে জানাচ্ছেন[২৬] ২ জানুয়ারি ১৯০৭-এ প্রথম ১০ ফর্মা ছাপানোর উপযুক্ত কাগজ কেনবার জন্যে শৈলেশচন্দ্রকে দেওয়া হচ্ছে ৫০ টাকা। এমনকী, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে ছাপাখানায় নতুন টাইপ কেনার জন্যে ! এরকম হিসেব আরও আছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, সম্ভাব্য ১৬টি খণ্ডে পরিকল্পিত এই সুবিশাল বইটি ছাপার উপযুক্ত পুঁজি মজুমদার লাইব্রেরির ছিল না। তাই প্রকাশনাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় বহন করতে হচ্ছিল লেখককেই !

বাছাই ও সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্বও নিতে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথকে। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি চিঠি এ প্রসঙ্গে মূল্যবান, 'সাময়িক সমস্ত প্রসঙ্গ বর্জ্জন করিলেও এবং গল্প উপন্যাস বাদ দিলেও গদ্যগ্রন্থাবলী নিতান্ত ছোট হইবে না। বোধ হয় ষোলো পেজি ফর্ম্মার অন্ততঃ ১০০ ফর্ম্মা হইবে। সমালোচকের সুতীক্ষ্ণ কুঠার হাতে লইয়া সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত আছি – বোধ হয় জঙ্গল আগাছা অধিক দেখিতে পাইবেন না – প্রত্যেক লেখাই পাঠ্য হইবে এইরূপ আশা করি।'[২৭] একেবারে প্রথম দিকে পরিকল্পনাটি কীরকম ছিল সেটা জানা যায় একটি বিজ্ঞাপন মারফৎ। প্রথম খণ্ডটি বেরোবারও আগে বিভিন্ন পত্রিকায় গ্রাহক হবার আবেদন করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আমরা সেরকম একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি 'মুকুল' পত্রিকার ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়। (এর আগে পরপর সাত-আটটি সংখ্যায় একই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে)। দুষ্প্রাপ্য বলে তার পুরোটাই এখানে উদ্ধৃত করা হল :

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

গদ্য-গ্রন্থাবলী — (যন্ত্রস্থ)

প্রথম ভাগ ... ... "বিচিত্র প্রবন্ধ"

বৈশাখ মাসেই গ্রাহকগণ পাইবেন। প্রথম ভাগের (বিচিত্র-প্রবন্ধের) মূল্য ১৷৷০

গদ্য গ্রন্থাবলী ১২। ১৩ ভাগে সমাপ্ত হইবার কথা। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুস্তক ছাপা হইতেছে; প্রথম খণ্ডের গ্রাহকগণ অথবা অন্য কেহ গ্রন্থাবলীর সমস্ত খণ্ডের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিলে এক্ষণে নাম পাঠাইলে ভবিষ্যতে গ্রন্থ না পাইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

গদ্য গ্রন্থাবলীতে রবীন্দ্রবাবুর গত ২২ । ২৩ বৎসরের উল্লেখযোগ্য যাবতীয় গদ্য রচনা, সাহিত্য, সমালোচনা[,] স্বদেশ, সমাজ, রাজনীতি, ভ্রমণ[,] কৌতুক, ছোট গল্প, নকশা[,] উপন্যাস খণ্ডে খণ্ডে সমস্তই থাকিবে। "বউ ঠাকুরাণীর হাট" প্রভৃতিও বাদ যাইবে না। রবীন্দ্রবাবুর পদ্য-গ্রন্থাবলী এখনও সাড়ে সাত টাকায় পাওয়া যায়।

নানা কারণে বিজ্ঞাপনটি গুরুত্বপূর্ণ। *গদ্যগ্রন্থাবলী*-কে শেষপর্যন্ত যে চেহারায় আমরা দেখতে পাব, প্রাথমিক পরিকল্পনা তার থেকে অনেকটাই ভিন্ন ছিল তা এই বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটগল্প আর উপন্যাসকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে বের করার কথা ভাবা হয়েছিল। অবশ্য আমরা জানি, ৭ম ভাগের অন্তর্গত হয়ে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপন্যাসই এখানে স্থান পাবে না। অন্যদিকে প্রথম খণ্ডে *বিচিত্র প্রবন্ধ*-এর অন্তর্গত হয়ে দুটি ছোটগল্প 'অসম্ভবকথা' ও 'রাজপথ' ['রাজপথের কথা'] ছাড়া পাওয়া যাবে না আর-কোনো গল্পও। এত বিস্তারিত পরিকল্পনা সত্ত্বেও অবশ্য ১২-১৩ ভাগে শেষ করে দেবার কথা ভাবা হয়েছিল। আমরা এখন জানি, *গদ্যগ্রন্থাবলী* প্রকাশিত হবে মোট ১৬ খণ্ডে।

উপরে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হচ্ছিল 'মজুমদার লাইব্রেরি'র তরফ থেকে। ভাদ্র মাসে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে 'বৈশাখ মাসেই গ্রাহকগণ পাইবেন' এই জাতীয় বয়ান কিঞ্চিৎ কৌতুকের সৃষ্টি করে নিশ্চয়ই। আসলে পরপর সাত-আটটি সংখ্যায় একই বয়ানের বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছিল, তার বয়ান যে বদলে দেওয়া প্রয়োজন সে কথাটা 'মজুমদার লাইব্রেরি' কর্তৃপক্ষ মনে রাখেন নি।

প্রথম খণ্ডটি তৈরি করে তোলার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে সত্যি প্রচুর পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। এর অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয় 'বিচিত্র প্রবন্ধ'। তাতে সংকলিত লেখাগুলির তালিকা আনুষঙ্গিক তথ্যসহ উদ্ধৃত করলে সম্পাদকের পরিশ্রমের মাত্রাটা বোঝা যাবে:

১. লাইব্রেরি (বালক, পৌষ ১২৯২ব)	২. মাভৈঃ (বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯ব)
৩. পাগল (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১১ব)	৪. রঙ্গমঞ্চ (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৯ব)
৫. কেকাধ্বনি (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৮ব)	৬. বাজে কথা (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩০৯ব)
৭. পনেরোআনা (বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩০৯ব)	৮. নববর্ষা (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮ব)
৯. পরনিন্দা (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৩০৯ব)	১০. বসন্তযাপন (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩০৯ব)
১১. অসম্ভবকথা (সাধনা, আষাঢ় ১৩০০ব)	১২. রুদ্ধগৃহ (বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২ব)

১৩. রাজপথ (নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯১ব) ১৪. মন্দির (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১০ব)

১৫. ছোটনাগপুর (বালক, আষাঢ় ১২৯২ব) ১৬. সরোজিনীপ্রয়াণ (ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১২৯১ব)

১৭. য়ুরোপ-যাত্রী (সাধনা ১২৯৮-৯৯ব) ১৮. পঞ্চভূত (সাধনা, ১২৯৯-১৩০২ব)

১৯. জলপথে (১৩টি অপ্রকাশিত পত্র) ২০. ঘাটে (১৭টি অপ্রকাশিত পত্র)

২১. স্থলে (৫টি অপ্রকাশিত পত্র) ২২. বন্ধুস্মৃতি : সতীশচন্দ্র রায় (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০ব)

২৩. বন্ধুস্মৃতি : মোহিতচন্দ্র সেন (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩ব)

বোঝাই যাচ্ছে, প্রচলিত *বিচিত্র প্রবন্ধ*-র সঙ্গে এই সংস্করণের পার্থক্য বিস্তর। দুটি ছোটগল্প 'অসম্ভবকথা' ও 'রাজপথ' ['রাজপথের কথা'], গোটা 'পঞ্চভূত', ৩৫টি চিঠি, 'য়ুরোপ-যাত্রী' ['য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'] ও 'বন্ধুস্মৃতি' অংশগুলি প্রচলিত সংস্করণে আজ আর পাওয়া যাবে না। যাইহোক, এই তালিকাটি আমাদের বর্তমান আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ একথা বোঝবার জন্যে যে, এই *গদ্যগ্রন্থাবলী* গড়ে তুলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হচ্ছে প্রায় ২০ বছর ধরে প্রকাশিত নানা পত্রিকার অগনিত সংখ্যা, এই প্রথম খণ্ডেই আছে ১২৯১ বঙ্গাব্দের-এর লেখা আবার ১৩১০ বঙ্গাব্দেরও লেখা ! তার পাশাপাশি এ তথ্যও এখানে স্মরণীয় যে, প্রায় প্রতিটি লেখার পত্রিকা-পাঠ আর গ্রন্থপাঠেরও তফাৎ বিস্তর। অর্থাৎ লেখা শুধু পত্রিকা-ঘেঁটে বাছতেই হচ্ছে না, সেগুলি নিয়ে রীতিমতো কাটাছেঁড়াও করতে হচ্ছে তাঁকে। একটা বই তৈরি করে তোলার পিছনে এত পরিশ্রম আগে-পরে কখনই আর তাঁকে করতে দেখা যায়নি। 'সুতীক্ষ্ণ কুঠার হাতে' নিয়ে 'আগাছা' পরিষ্কার করার কথা বলেছিলেন তিনি দীনেশচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে। এর তাৎপর্য কী, তা হয়তো এবার খানিক বোঝা সম্ভব।

সম্পাদকের এই প্রবল পরিশ্রম ও মনোযোগ সত্ত্বেও *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র প্রথম খণ্ডে কিন্তু রয়ে গেছিল অনভিপ্রেত ও বিচিত্র সব ছাপার ভুল ! ভুলের পরিমাণ অনেক, এবং নানা মাত্রার। অর্থাৎ ছোট ও উপেক্ষাযোগ্য ভুল থেকে একেবারে অর্থ-বিপর্যয়-ঘটানো বড়ো ভুল। ফলে এ বইতে দু পৃষ্ঠা-জোড়া এক শুদ্ধিপত্র সংযোজনা করতে হয় সুচি-র ঠিক পরেই। এরকম নিশ্চয়ই নয় যে, তাঁর কোনো বইতে এই প্রথম শুদ্ধিপত্র যোগ করতে হল। এর আগে আমরা দেখেছি, *বন-ফুল* (১৮৮০), *প্রভাত-সঙ্গীত* (১৮৮৩) বা *গোড়ায় গলদ* (১৮৯২)-এর মতো বইতেও তা যুক্ত করতে হয়েছিল। সে বিষয়ে সম্ভাব্য কিছু কারণ আমারা আগেই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই বইতে অশুদ্ধির পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর ! বই-এর ১৬৬ পৃষ্ঠার ২৪ ছত্রে যখন 'অধীনতার পীড়ন'

হয়ে যায় ‘স্বাধীনতার পীড়ন’, অথবা ৯৮ পৃষ্টার শেষ ছত্রে ‘ফিরে গিয়ে চুপিচুপি’ হয়ে যায় বিচিত্র ‘ফিরেচু গিয়ে পিচুপি’ তখন লেখকের খানিক অভিমান করার অধিকার জন্মায় বটে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কি প্রথম খণ্ডের প্রুফ দেখেছিলেন? বলা শক্ত। ১৯০৭-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি নতুন টাইপ কেনার জন্যে শৈলেশচন্দ্রকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, আর বই বেরোচ্ছে ১৬ এপ্রিল। এই দুটি মাস রবীন্দ্রনাথ একটানা শান্তিনিকেতন ছিলেন। বইয়ের ছাপার কাজে তিনি প্রত্যক্ষ তদারকি করতে পারেননি বলেই এই বিড়ম্বনা বলে মনে হয়। আমরা দেখব, পরের খণ্ডগুলি থেকে প্রুফ দেখার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহ দেখাবেন। এই ধরণের ভুলও আর ফিরে আসবে না।

অন্যদিকে, *গদ্যগ্রন্থাবলী* প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে এর বিপননের ব্যবস্থাও করতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকেই। এই সম্পূর্ণ *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র স্বত্ব তিনি দান করেছিলেন ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে’। ফলে এই বইটির বহুল প্রচারের জন্যে তাঁর উদ্‌যোগ ছিল ভিন্ন মাত্রার। ১৬ এপ্রিলই ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যর একান্ত সচিব যতীন্দ্রনাথ বসুকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেন, ‘আমার গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম সংখ্যা (বিচিত্র প্রবন্ধ) ছাপা হয়ে গেছে। এই বইয়ের স্বত্ব বিশেষভাবে বোলপুরে দিয়েছি। যদি কিছু বিক্রি হয় তবে আমার কিঞ্চিৎ ভার লাঘব হবে। তুমি যদি মহারাজকে দিয়ে কয়েক খণ্ড কেনাতে পার তবে আমার উপকার হয়। তুমি যে কয়েকখানা তাঁর কেনা সম্ভব মনে করো সেই কয়খানা যদু কিম্বা শৈলেনের[শৈলেশ] কাছ থেকে একেবারে নিয়ে যেয়ো – এবং একখানা বাঁধানো বই আমার উপহার স্বরূপে মহারাজকে দিয়ো। তোমার জানাশোনা আর কোন লোককেও এই বই বেচবার চেষ্টা করো।’[২৮] *রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা* গ্রন্থে মুদ্রিত এই চিঠিটির পাদটীকায় সম্পাদকদের তরফে জানানো হয়েছে যে ‘ত্রিপুরা রাজ্যসরকার কয়েকশত পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন।’ কিন্তু ত্রিপুরা রাজসভাকেই শুধু নয়, বিক্রির সূত্রে তাঁকে অনেকেরই দ্বারস্থ হতে হচ্ছিল নিশ্চয়ই। প্রশান্তকুমার পাল ‘ক্যাশবহি’ মারফত আশ্চর্য কিছু তথ্য আমাদের জানান। যেমন, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের দিনই ৯৮৫টি বই আনিয়ে নেওয়া হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।[২৯] অন্য খণ্ডগুলোর ক্ষেত্রেও এই হিসেব পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডটি ছাপানো হয়েছিল ১০৫০ কপি, একথা মনে রাখলে বোঝা যায় বই বিক্রির পুরো দায়ই কার্যত রবীন্দ্রনাথ নিজের উপরেই নিয়ে নিচ্ছেন !

রবীন্দ্রনাথ এর যথাযথ বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও করেন। 'মুকুল' পত্রিকায় তেমন একটি বিজ্ঞাপনের বয়ান আমরা আগেই দেখেছি। এবার প্রবাসীর একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করা যাক। 'প্রবাসী'-র ১৩১৪ব-এর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এখানে উদ্ধারযোগ্য :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য গ্রন্থাবলী।

> ...গদ্য গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের মূল্য পুস্তকের আকার অনুসারে ধার্য হইবে ও প্রতি খণ্ড ধার্যমূল্যে পৃথক পৃথক বিক্রয় হইবে, তবে যাঁহারা এক্ষণে সমগ্র গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইবেন তাঁহারা পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রতি খণ্ডের ধার্য মূল্যের বারো আনা মূল্যের সেই খন্ড পাইবেন। কিন্তু প্রতি টাকায় তাঁহারা যে চারি আনা হিসাবে বাদ পাইবেন এজন্য তাঁহাদিগকে আপাততঃ একটি টাকা অগ্রিম দিতে হইবে, এবং এ টাকা শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন জোড়াসাঁকোয় পাঠাইতে হইবে। গ্রাহকগণ এই টাকার রসিদ পাইবেন।... রবীন্দ্রবাবু এই গদ্যগ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।[৩০]

এই বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে 'প্রকাশক এস, মজুমদার'-এর পক্ষ থেকে, কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয়, গ্রাহকের জন্য ধার্য মূল্য জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে জোড়াসাঁকোর ঠিকানায়। এর যাবতীয় খণ্ড বিক্রির দায়ও যে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন, এই বিজ্ঞাপন তার একটি অতিরিক্ত প্রমাণ।

আমরা দেখেছি, *গদ্যগ্রন্থাবলী* প্রকাশের কাজ ঠিকঠাক শুরু হয় জানুয়ারির প্রথমে, প্রথম খণ্ড বেরোল ১৬ এপ্রিল। বিলম্বের এই কারণে রবীন্দ্রনাথ এমনিতেই শৈলেশচন্দ্রের উপর বিরক্ত ছিলেন। প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় খণ্ড নিয়েও একই টালবাহানা চলতে থাকলে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর থেকে ১৪জ্যৈষ্ঠ [২৮মে] শৈলেশচন্দ্রকে খুবই কড়া একটা চিঠি লেখেন :

> তোমাকে বৃথা তাগিদ দিয়া সময় নষ্ট করিব না বলিয়া চুপ করিয়াছিলাম। আজ পনেরো দিনে এক ফর্ম্মা প্রুফ আমার চোখে পড়িয়াছে। চিঠিতে লিখিয়াছ তিন ফর্ম্মা প্রুফ দেখা হইয়াছে – "দুই একদিনের মধ্যেই" আমার কাছে পাঠানো হইবে – তোমার যেমন অভিরুচি তাহাই করিয়ো এ সম্বন্ধে আমি কোনো কথাই বলিব না। কিন্তু এবার কলিকাতায় গিয়া আমি সান্যাল প্রেস ও মেটকাফ প্রেসে কাপি দেবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিব। তোমারওপর রাগ করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ তুমি অসমর্থ – তুমি যাহা কোনোমতেই পার না তাহারই ভার লইয়াছ। আমি তোমার একলার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের সুবিধা যেখানে হয় সেখানেই কাজের ব্যবস্থা

করিব। ইহাতে মনে করিয়ো না আমি তোমার উপর বিরক্ত হইয়াছি। এখন হইতে আমি কাজের নিয়ম পালন করিয়া চলিব।[৩১]

গদ্যগ্রন্থাবলী-র যে ন'টি ভাগ মজুমদার লাইব্রেরি থেকে বেরোবে তার প্রতিটিই অবশ্য শেষপর্যন্ত দীনময়ী প্রেস থেকেই ছাপা হবে, মেটকাফ বা অন্য ছাপাখানার দ্বারস্থ হতে হবে না। তবে, তার মানে, এই প্রকাশনাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তির যে এখানেই শেষ তা নয়, সেটা আমরা একটু পরেই দেখব।

উপরে উদ্ধৃত চিঠিটির পরবর্তী একটা অংশ থেকে *চারিত্রপূজা* নামে সদ্য-প্রকাশিত আর-একটি বইয়ের প্রকাশনা-সংক্রান্ত একটি ছোট রহস্যেরও সমাধান হয়, সেটাও এই সূত্রে বলে নেওয়া যেতে পারে। *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র অন্তর্গত হয়ে নয়, স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবেই *চারিত্রপূজা*-র প্রকাশ ১৯০৭-এর ২৮ মে। বইটির প্রকাশক কে ? এর আখ্যাপত্রে প্রকাশকের নাম নেই। আখ্যাপত্রের পিছনের পাতায় লেখা আছে, 'কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি,/ ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দীনময়ী প্রেসে/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।' এর থেকে মজুমদার লাইব্রেরিকেই প্রকাশক হিসেবে ধরে নেওয়া যেত, কিন্তু ঠিক এর পরের একটা স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় জানানো আছে, 'প্রকাশক/ ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স,/ ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।' দুটি পৃষ্ঠায় লেখা দুটি পরস্পরবিরোধী তথ্যের সমাধান হয় উপরে উদ্ধৃত চিঠিটির শেষাংশ থেকে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে শৈলেশচন্দ্রকে লিখছেন, 'যদুকে বুঝাইয়া দিয়ো চারিত্রপূজা ২০০০ খণ্ডের জন্য ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর নিকট পূর্ব্বে ২০০টাকা পাওয়া গেছে – এক্ষণে ২৫টাকার হারে কমিশন বাদে ৫৫০টাকা পাওনা হইবে।...অতএব অবিলম্বে ভট্টাচার্য্যদিগকে বই গণিয়া দিয়া এই টাকাটা লইতে হইবে।' এই চিঠি থেকে পরিষ্কার হয় যে, বইটি ছাপা হয়েছিল মজুমদার লাইব্রেরির তত্ত্বাবধানে দীনময়ী প্রেসে, রবীন্দ্রনাথের খরচে। ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হবার পর বইগুলি 'ভট্টাচার্য এন্ড সন্স'-কে কার্যত বিক্রি করা হয় মোট ৭৫০ টাকায়। মজুমদার লাইব্রেরির আর্থিক দুরবস্থার এ-ও এক অতিরিক্ত প্রমাণ, নিজস্ব খরচে তাঁরা আসলে রবীন্দ্রনাথের একটি বইও প্রকাশ করছেন না ! এমনকী বিক্রির দায়িত্বটুকুও তাঁদের উপর ছাড়তে চাইছেন না রবীন্দ্রনাথ!

মে মাসের শেষে *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের আগে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতে হয়েছিল শৈলেশচন্দ্রকে, তৃতীয় খণ্ড বেরোবার আগে ১৭ জুলাই ১৯০৭-এ পুনরায় বিরক্ত ও নিরুপায় রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন

শৈলেশচন্দ্রের দাদা শ্রীশচন্দ্রকে, সে চিঠি আগেরটির থেকে আরও কঠোর, এত উষ্মাভরা ব্যক্তিগত পত্র কবি সারাজীবনে খুব বেশি লেখেননি । শিলাইদহ থেকে লিখছেন কবি :

> তোমার ভাইয়ের হাত হইতে আমাকে উদ্ধার কর। মনে করিয়াছিলাম পূজার পূর্ব্বে গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তত সাহিত্য-প্রবন্ধ পর্য্যায় ছাপা শেষ হইয়া যাইবে – তাহা হইলে পূজা উপলক্ষ্যে হয়ত গোটাকতক বই বিক্রি হইতে পারিবে। কিন্তু সাতদিন অন্তর এক ফর্ম্মা করিয়া প্রুফ পাইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এমন করিয়া ৫।৬ বৎসরেও আমার বই ছাপা শেষ হইবে না। ওদিকে, এই সকল কারণেই আমি যোগীন সরকারের সঙ্গে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা প্রায় পাকা করিয়াছিলাম – ইতিমধ্যে পুনশ্চ আমার দুর্ভাগ্য ও দুর্বুদ্ধিক্রমে শৈলেশেরই পরামর্শ শুনিয়া শিলাইদহে আসিবার পূর্ব্বে যোগীন সরকারকে জবাব দিয়া পত্র লিখিয়াছি।...আমি তাহাকে এতবার এতরকম শাসাইয়া পত্র লিখিয়াছি যে সে আমার শাসনবাক্যে আর ভয়ই করে না – জানে আমি কেবল গর্জ্জনই করি।...কাব্যগ্রন্থ গল্পগুচ্ছ প্রভৃতির হিসাব শৈলেশ দেয় নাই এবং দিবেও না তাহা আমি জানি – ঐ সকল গ্রন্থের উপস্বত্ব শৈলেশ সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে ও অবাধে ভোগ করিয়া আসিয়াছে – আর কোনো ব্যক্তি যদি এরূপ কাণ্ড করিত তবে শৈলেশ তাহার আচরণকে কি নাম দিত ![৩২]

আগেরবার শৈলেশকে লিখেছিলেন ছাপাখানা বদলে ফেলার কথা, এবার তাঁর দাদাকে জানালেন প্রকাশকই বদলে ফেলার কথা ভেবেছিলেন তিনি, নেহাতই ‘দুর্বুদ্ধিক্রমে’ এটা ঘটে ওঠে নি ! শুধু তাই না, গুরুতর আর্থিক অসাধুতারও অভিযোগও আনছেন রবীন্দ্রনাথ, রয়্যালটির টাকা না-দেবার অভিযোগ। ব্যক্তিগত পরিচয়ের মোড়ক থাকা সত্ত্বেও প্রকাশকের উপর লেখকের এই অনাস্থা নিশ্চিতভাবেই বুঝিয়ে দেয় যে মজুমদার লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের অবসান আসন্ন-প্রায়। রবীন্দ্রনাথের এই ‘পত্রাঘাত’-এ কাজ হয়েছিল অবশ্য। এই চিঠি লেখার দশদিনের মধ্যে (২৬ জুলাই) প্রকাশিত হল *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র তৃতীয় খণ্ডটি । আর রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে মতো ‘সাহিত্য পর্যায়ের’ বাকি দুটি খণ্ডও পুজোর আগেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এমনকী ১৩১৪ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য রয়্যালটির বিষয়ে সদর্থক কিছু প্রস্তাবও শৈলেশচন্দ্রের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, কিন্তু পুরনো সম্পর্ক আর জোড়া লাগানো যায় নি, কেননা ততদিনে এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস-এর কলকাতা-শাখা ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কথাবার্তা এগোতে শুরু করেছে। (পরের অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) ১৩১৪-র ১৮ চৈত্র [৩১ মার্চ ১৯০৮] এই ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে শৈলেশচন্দ্রকে একটি শেষ চিঠি লিখতে দেখি রবীন্দ্রনাথকে, সেই চিঠির প্রথমে তিনি

জানান, 'তুমি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছ তদনুসারে যে আমাকে কিছু দিতে পারিবে এরূপ আমি আশা করিতেই পারি না – অবশ্য দেওয়া যদি তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয় তবে এই টাকা হইতে আমার অনেক কাজ হইতে পারে সন্দেহ নাই।'[৩৩], আর চিঠির শেষদিকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, 'আমার আর কোন বই ছাপিতে হইবে না'। এই বাক্যটির সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার লাইব্রেরি ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘোষিত হয়।

১৯০৮-এর ১৬ এপ্রিল প্রকাশিত *গদ্যগ্রন্থাবলীর* নবম ভাগটিই ('প্রহসন') মজুমদার লাইব্রেরি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ বই। দশম ভাগ প্রকাশিত হবে 'ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস'-এর তত্ত্বাবধানে।

শেষে আর-একটি কথা বলে এই আলোচনাটি শেষ করা যেতে পারে। শৈলেশচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথ খুবই আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন, ফলে 'মজুমদার লাইব্রেরি'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। মূলত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে এলাহাবাদের প্রকাশনা 'ইন্ডিয়ান প্রেস' ও তার স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ সেই কাজটিকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এলাহাবাদের সঙ্গে যোগাযোগটা যদি না-হত কবির, তাহলেও বাংলার নিজস্ব প্রকাশনাগুলিই তাঁকে সন্তুষ্ট করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা রাখত, এই কথাটাও উল্লেখ থাকা দরকার। এটা নিতান্ত স্বাজাত্যবোধ থেকে করা একটি দাবি নয়, রবীন্দ্রনাথেরই বলা শংসাবাক্যের জোরে এই কথাটি আমরা বলতে পারলাম। 'মজুমদার লাইব্রেরি'-'ইন্ডিয়ান প্রেস' হাতবদলটি যে-সময়ে ঘটছে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গীতিসংকলন বেরোবার প্রস্তুতি চলছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই বই প্রকাশের দায়িত্ব দিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'সিটি বুক সোসাইটি'কে। *গান* নামের সেই বইটি প্রকাশিত হল (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী) ১৯০৮-এর ২০ সেপ্টেম্বর, ততদিনে অবশ্য ইন্ডিয়ান প্রেস তথা ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। সুবিশাল এই বই, ৪০০ পৃষ্ঠার অধিক, মূল্যবান অ্যান্টিক কাগজে ছাপা, অথচ দাম রাখা হয়েছিল সেযুগের পক্ষেও অনেকটা কম, সাধারণ বাঁধাই দেড় টাকা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই দু টাকা মাত্র। বইটি হাতে পেয়ে একটি চিঠিতে (চিঠিটির তারিখ দুষ্পাঠ্য) যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে কবি লিখেছিলেন, 'আপনার প্রেরিত দুই খণ্ড গান পাইলাম। বই খানার বাঁধা প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।... আপনি পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বইখানি যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।'[৩৪] রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত এই 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' বিশেষণটিই বুঝিয়ে দেয় এই বইটির নির্মাণগত উৎকর্ষের মাত্রাটিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সিটি বুক সোসাইটির পক্ষ

থেকে ‘প্রবাসী’ পত্রিকার পাতায় এই বইটির যে বিজ্ঞাপন বেরোত তার ভাষাটি বেশ মজাদার। যেমন ১৩১৬ব-এর কার্তিক সংখ্যায় এই বইটি প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছিলেন :

> কোকিলকণ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের গানে বাঙলা দেশ আজ মুগ্ধ, সুতরাং আপনিও হয়ত তাহার দুই চারিটা জানেন কিংবা তাঁহার গানের একখানি বইও হয়ত সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সভায়, সমাজে, সম্মিলনে যেখানে যত গান তিনি গাহিয়াছেন, তাহার একখানি উত্তম সংগ্রহ আপনার নিকট আছে কি? যদি না থাকে, তবে এই নবপ্রকাশিত গানের একখণ্ড সংগ্রহ করুন।
>
> বসন্তের মলয়ানিল, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুস্বর এ সকলি যদি অসময়েও ভোগ করিবার জন্য আপনি ব্যাকুল হইয়া থাকেন, তবে বসন্তের রাজা এই গানের শরণ লউন।[৩৫]

এই ধরণের বিজ্ঞাপনের ভাষা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে অস্বস্তিতে ফেলত। তাঁর ‘স্থায়ী’ প্রকাশক যাঁরা, ‘মজুমদার লাইব্রেরি’ বা ‘ইন্ডিয়ান প্রেস’ অথবা পরে ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’, তাঁরা কখনই এইরকম বিচিত্র ভাষায় বিজ্ঞাপন দেননি। কিন্তু যখনই কোনো প্রকাশক বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর একটি-দুটি বই প্রকাশ করেছেন, তাঁর বিজ্ঞাপনের ভাষা হয়ে উঠেছে বিচিত্র ও অস্বস্তিকর। ‘হিতবাদী’ ও ‘বসুমতী’ থেকে প্রকাশিত বইগুলির ক্ষেত্রে এই ভাষা হয়ে উঠেছে বিচিত্রতর সেটা একটু পরেই আমরা দেখব।

যাইহোক, এই কথাটা আমরা নিশ্চয়ই বলতেই পারি, এলাহাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ না-হলেও রবীন্দ্রনাথের পছন্দের প্রকাশক তিনি আশেপাশেই পেয়ে যেতে পারতেন।

ঙ. হিতবাদী ও বসুমতী

১৯০০ থেকে ১৯০৭, এই সাত বছর মজুমদার লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের কালপর্ব। কিন্তু এই সময়ে আরও দুটি প্রকাশনা-সংস্থার সঙ্গে কবির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পর্ক-সূত্রে আমরা গ্রন্থনির্মাণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, ভাবনা, উদ্বেগ ও অসহায়ত্বের নানা খবর জানতে পারি।

আমরা আগেই বলেছি, পত্রিকায় বা গ্রন্থাকারে নিজের লেখালেখি প্রকাশের ক্ষেত্রে কেবল সাহিত্যগত বা নান্দনিক মাত্রার বিবেচনাই রবীন্দ্রনাথের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, একই সঙ্গে প্রায় সমান জরুরি ছিল তার অর্থকরী দিকটিও। প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরে বিশ্বভারতীর বিপুল ‘ক্ষুধা’ মেটাতে গিয়ে তাঁকে তাঁর লেখালখি নিয়ে কার্যত হাটের মাঝে দাঁড়াতে হয়েছে। শৈলেশচন্দ্র যখন মজুমদার লাইব্রেরি খোলেন তখন তিনি এতে লগ্নিও করেছিলেন অতিরিক্ত প্রাপ্যের আশায়। অচিরেই অবশ্য বোঝা যায়, এখান থেকে বই বিক্রির নিয়মিত উপস্বত্বটুকু পাওয়াই সমস্যা। ফলে এই সময়পর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বই প্রকাশ ও বিক্রির অধিকার দিতে থাকেন অন্য প্রকাশককেও, হিতবাদী ও বসুমতী তাদের অন্যতম।

সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘হিতবাদী’ প্রথম প্রকাশিত হয় **১৮৯১**-এর ৩০মে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তার সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ নিজে সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক। নিছক কয়েকজনের ব্যক্তিগত উদ্‌যোগে বের হওয়া আর-একটি পত্রিকা নয়, প্রথম থেকেই ‘হিতবাদী’কে একটি ‘প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে গড়ে তোলার ভাবনা ছিল। এইসময়ে শ্রীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে সেকথা জানা যায়, ‘আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্চে। ২৫,০০০৲টাকা মূলধন। ২৫০৲টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশদত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েচেন।...লেখা আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাবে। আর যদি এক আধটা share নিতে ইচ্ছুক হও তাও আমাকে লিখো’।[৩৬] আমরা জানি, ‘দেনাপাওনা’ ‘পোস্টমাস্টার’-সহ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ছটি বা সাতটি গল্প ও অন্যান্য নানা রচনা এই পত্রিকার পাতাতেই প্রকাশিত হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ খুব অল্পদিনই ছিল। **১৮৯১**-এরই ডিসেম্বর মাস থেকে ‘সাধনা’ পত্রিকা বেরোতে শুরু করলে ‘হিতবাদী’র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে।

আমাদের আলোচ্য সময়ে ‘হিতবাদী’র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। সে সময় অনেক পত্রিকাই তাদের প্রচার বাড়ানোর জন্যে বিখ্যাত লেখকদের লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশ করে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে বিতরণ করত। ‘হিতবাদী’র তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে রবীন্দ্রনাথ সম্মতি দেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩-এর ‘ক্যাশবহি’র হিসাব থেকে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন যে এই বাবদে ১৫০০টাকা ‘হিতবাদী’ কর্তৃপক্ষ দেন রবীন্দ্রনাথকে।[৩৭] এই বিপুল টাকার বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রায় যাবতীয় গল্প-উপন্যাস-নাটক ও প্রবন্ধ ছাপানোর অধিকার প্রাপ্ত হন এঁরা। ‘৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে’ ১৯০৪-এর ২৯ আগস্ট ‘হিতবাদির উপহার/ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী’ নাম দিয়ে ১২৯০ পৃষ্ঠার বৃহৎ বইটি প্রকাশিত হয়। মুদ্রণ সংখ্যা দশ হাজার । কিন্তু এই সুবৃহৎ বইটির দাম রাখা হয় মাত্র ১টাকা ২ আনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মজুমদার লাইব্রেরি থেকে ১৯০৩-এর এপ্রিলে প্রকাশিত ৩৩৮ পৃষ্ঠার *চোখের বালি* উপন্যাসটির দাম ছিল ২টাকা ৪ আনা।

বইটিতে গল্পগুলিকে সাজানো হয়েছে মোট চারটি ভাগে : ‘সংসারচিত্র’ (২৩টি গল্প), ‘সমাজচিত্র’(১৪টি গল্প), ‘রঙ্গচিত্র’ (‘চিরকুমারসভা’ ও ৪টি গল্প) এবং ‘বিচিত্রচিত্র’(১৬টি গল্প)। প্রসঙ্গত ‘চিরকুমারসভা’ এখানে প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হল। এছাড়া আছে ৩টি উপন্যাস : ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’, ‘রাজর্ষি’ ও ‘নষ্টনীড়’। আছে ‘বিদায় অভিশাপ’-সহ ৭টি নাটক। আছে ‘গানের বহি’। আর ‘সমালোচনা’, ‘আলোচনা’ ও ‘য়ুরোপ-প্রবাসির পত্র’। গল্পগুলিকে ওইভাবে চারটি বিন্যাসে সাজানো বা গোটা বইটার মূল পরিকল্পক কে বলা শক্ত। তবে কোনো সুধীর পরিকল্পনা যে বইটা নির্মাণে কাজ করেছে এটা সত্যের খাতিরে বলা যাবে না।। ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ‘পঞ্চভূত’ ‘য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি’-র মতো বিখ্যাত গদ্যবইগুলো অথবা ‘চোখের বালি’-র মতো বিখ্যাত উপন্যাস এখানে কেন অন্তর্ভুক্ত হয়নি তার পিছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পাতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্যে যুক্তিহীনভাবে কিছু বই বাদ রাখা হয়েছে, এছাড়া আর কী কারণ হতে পারে? গোটা বইটাতেই নানারকম ভুলের নমুনা আছে, তার মধ্যে একটির উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। ১৮৯২-এর ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *গোড়ায় গলদ* নাটকটি, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে। সেই প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় একটি ভ্রম-সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া ছিল, ‘গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভ্রমক্রমে “বিনোদ” ও “বিনু” নামের পরিবর্ত্তে “নীরদ” ও নীরু” বসিয়াছে। পাঠকেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।’ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮৯৯তে। তাতে এই ভুলটি সংশোধিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য হল, ‘রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী’তে এই ভুল পুনরায় ফিরে আসে! প্রথম সংস্করণ দেখে তাঁরা বইটি ছেপেছেন, ভ্রমসংশোধনের নির্দেশটি আর খেয়াল করেননি! বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রুফ দেখলে এই ভুল হতেই পারতো না। অনেক

অর্থের বিনিময়ে গ্রন্থ-নির্মাণ সংক্রান্ত এই ধরণের আপোস তাঁকে পরেও করতে হয়েছে, সেটা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব।

কিন্তু বইটিতে সবচেয়ে দৃষ্টিকটু বিষয় হচ্ছে, বইয়ের একেবারে শেষে যুক্ত হয়েছে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন নামে দুই কবিরাজের বানানো বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপন। সেইসব বিজ্ঞাপনের মারফৎ জানা যাচ্ছে যে, কোনো বিশেষ তেল 'ব্যবহারে গেঁটে বাত শীঘ্র নিবারিত হয়', কোনো 'ক্ষতান্তক ঘৃত' লাগালে 'অর্শঃ ক্ষত, নালী-ঘা ও ঘুরঘুরে ঘা প্রভৃতি দুরারোগ্য ক্ষতরোগ সকল অচিরে দূরীভূত হয়', কিংবা কোনো 'মকরধ্বজ'-এর ব্যবহারে নাশ হয় 'অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি প্রভৃতি সর্ব্বরোগ' ! হালকা চালে আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গদ্য পড়ে পাঠক-মনে জমে ওঠা সিদ্ধরস বইয়ের শেষে এসে চুরমার হয়ে যাবার ভালো বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন 'হিতবাদী' কর্তৃপক্ষ। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এইসব অরসিক বিজ্ঞাপন রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময়েই মানতে হয়েছে, তা আমরা আগেও বলেছি।

এরপর ফের ১৯০৯ সালে হিতবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ একটি চুক্তি হয়। তবে এর আগেই যেহেতু ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি পাকাপোক্ত চুক্তি হয়ে গেছে (পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাই এবার সেই চুক্তির আওতার বাইরের শুধু কিছু ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ও *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকটি প্রকাশের অনুমতিই তাঁরা পান। অনুমতিপত্রটি পাওয়া যায়না, তবে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা 'হিতবাদী লাইব্রেরি'র 'তত্ত্বাবধায়ক' অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ২ মে ১৯১৪-র একটি চিঠি থেকে বিষয়টি জানা যায় :

> আপনার আদেশ অনুযায়ী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (১) প্রায়শ্চিত্ত, (২) ছুটীর পড়া, (৩) ইংরাজি সোপান ১ম ও ২য়, (৪)ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা, (৫)ইংরাজি পাঠ, (৬) সংস্কৃত প্রবেশ ১ম, ২য়, ৩য় ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত (৭) শিবাজী ও মারাঠা জাতি পুস্তকের হসাব পাঠাইলাম। ১৩১৬ সালের ৩০শে ভাদ্র [= ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৯] মাসের চুক্তি অনুসারে উক্ত ৭খানি পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ মূল্য হইতে শতকরা ৭৫৲ টাকা কমিশন আমাদের ও শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন তাঁহার প্রাপ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমরা আড়াই হাজার ২৫০০৲ টাকা অগ্রিম দিয়াছি। আড়াই হাজার টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ঐ পুস্তকগুলি নূতন নূতন সংস্করণ করিয়া বিক্রয় করিব ইহাও রবিবাবুর স্বাক্ষরিত পত্রে লিখিত আছে। ঐ আড়াই হাজার

টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত রবিবাবু অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি পুস্তকগুলি প্রকাশিত করিতে কিম্বা অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিতে দিতে পারিবেন না।[৩৮]

এই চিঠি থেকেই জানা যাচ্ছে যে, 'হিতবাদী'র সঙ্গে চুক্তিটি হয়েছিল ১৯০৯-এর ১৫ সেপ্টেম্বর, যদিও তালিকায় উল্লিখিত বইগুলোর মধ্যে একমাত্র *সংস্কৃত প্রবেশ*-এর তিনটি খণ্ড বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের বাকি সব বই এর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছিল। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) স্কুলপাঠ্য-গ্রন্থ হিসেবে রচিত হলেও বইগুলির নির্মাণ-পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের পরিশ্রম ও উদ্বেগ কোনোটাই কম কিছু ছিল না। 'রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী' নিয়ে তিনি আদৌ মনোযোগী ছিলেন না, আমরা দেখেছি। কিন্তু এই বইগুলি শিশু-কিশোরদের কাছে পৌঁছোবে বলেই, এবং প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে বলেও, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্য দেখাতে রাজি ছিলেন না। যেমন, *ইংরাজি সোপান* বইটির মুদ্রণকাজ চলাকালীন, আমরা দেখি, অজিতকুমার চক্রবর্তী(১৮৮৬-১৯৭২)-কে রবীন্দ্রনাথ এই সংক্রান্ত নানা নির্দেশ পাঠাচ্ছেন একাধিক পত্র মারফত, যেমন ২৩মে ১৯০৯-এ লিখছেন, 'ইংরাজি সোপান যতটা হয়েছে আমাকে যদি পাঠাতে পার তাহলে ছাপাখানাকে সমস্ত direction দিয়ে ছাপবার, ছবি করবার, ও প্রুফ দেখবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাই।'[৩৯] রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আর-একটি দিক হিসেবেই আমরা তাঁর মুদ্রণ-শিল্পে বিশেষজ্ঞতার কথা বলতে চাইছি। এইধরণের চিঠি থেকে তা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দেবার পর বাকি দায় প্রকাশকের, এই সাধারণ নিয়মকে ছিন্ন করে গ্রন্থ-নির্মাণের প্রতিটি পর্যায়কে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতে চান। কেবল সাহিত্যরূপ হিসেবে নয়, 'প্রোডাক্ট' হিসেবেও বইটির অনেকটা দায় যে লেখকেরই, তাকে আস্বীকার করেননি তিনি কখনই। আপোস তাঁকে করতে হয়েছে বারবার, সেটা প্রায় অনিবার্যই, কিন্তু দায়ের কথাটা বিস্মৃত হননি তিনি।

এখানে আর-একটি অপ্রকাশিত কিন্তু চমকপ্রদ তথ্যের উল্লেখ হয়তো বাহুল্য হবে না। আমরা দেখলাম, ১৯০৯ সালে 'হিতবাদী'র সঙ্গে এই গ্রন্থগুলি বিষয়ে চুক্তি হয় এবং ২৫০০টাকা শোধ না-হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে এরকম লেখা হয় সেখানে। সেই টাকা নিশ্চয়ই শোধ হয়ে গেছিল অচিরেই, কিন্তু এই বইগুলি ছাপার অধিকার রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী'র থেকে নিয়ে নেন নি। এমনকী পরবর্তী দীর্ঘ 'ইন্ডিয়ান প্রেস' পর্বেও (১৯০৮-১৯২২) এই বইগুলি প্রকাশের অধিকার 'হিতবাদী'র হাতেই ছিল। ১৯২২-এর শেষ থেকে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের স্বত্ব বিশ্বভারতী নিজেই গ্রহণ করে। তখন তাঁরা 'হিতবাদী'র থেকে এই বইগুলি পুনরায় ছাপিয়ে

নিজেরা কিনে নেন। সেসময়ে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্মী কিশোরীমোহন সাঁতরার একটি অপ্রকাশিত চিঠি থেকে গোটা বিষয়টি জানা যায়। চিঠিটি লেখা হয়েছি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩।

> হিতবাদীর সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে। (ক) 'ছুটীর পড়া' "ইংরাজী সোপান ১ম ভাগ" "প্রায়শ্চিত্ত" ২০০০ হাজার [২ হাজার] করে ছাপা হচ্ছে। ১৫ দিনের মধ্যে ছাপা শেষ হবে। এর জন্য ৫৩০৲ টাকা মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাদের দিতে হবে। তাদের প্রকৃত খরচ যা হচ্ছে; তাই তারা নিচ্ছে। সমস্ত stock এর delivery ১লা মার্চ্চ নিতে হবে। তখন থেকে ২ বৎসরের মধ্যে তাদের অবশিষ্ট টাকা দিতে হবে। সে টাকার পরিমাণ ৯০০৲ থেকে ১০০০৲ এর মধ্যে হবে। (খ) "সংস্কৃত প্রবেশ ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ" "ইংরাজী সোপান ২য় ভাগ" "শ্রুতিশিক্ষা" পূরোপূরি [যু] ছাপ্‌তে হবে। প্রশান্তবাবুর কাছে ৫৩০৲ টাকার Blank Cheque আছে। তিনি হিতবাদীকে দেবার জন্য তা draw করবেন কি?[৪০]

স্পষ্টত এই হস্তান্তরের সময় হিতবাদী কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট উদার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনটি বই তাঁরা ছেপে দিচ্ছেন 'প্রকৃত খরচ'-এ। বাকি বইগুলির যা 'স্টক' তাও দিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বভারতীকে, বিশ্বভারতী সেই টাকা শোধ দেবেন পরবর্তী ২ বছর ধরে। এই উদারতাকে হিতবাদী গোষ্ঠীর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে দেখলে হয়তো ভুল হয় না।

'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' নামের প্রকাশনা সংস্থাটির জন্ম ১৮৮০, প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯১৯)। দীর্ঘকাল ধরে সুলভে ধর্মগ্রন্থ, ক্লাসিক সাহিত্য ও সমকালীন বিখ্যাত লেখকদের 'গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেছেন এঁরা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগের সূচনা ১৯০৬ সালে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যখন 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছে (বৈশাখ ১৩১০-আষাঢ় ১৩১২) সেই সময়েই সেটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার অনুমতি চেয়ে 'বসুমতী'র তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। 'মজুমদার লাইব্রেরি'র অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথ রাজি হয়ে যান। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তরফে নিকুঞ্জবিহারী দত্ত নামে একজন ১৯০৪-এর ৩ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথকে ৩০০ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রন্থটির প্রকাশ-স্বত্ব গ্রহণ করেন।[৪১] পরবর্তীকালে 'মজুমদার লাইব্রেরি' প্রকাশিত *চোখের বালি* উপন্যাসটিরও প্রকাশ ও বিক্রয়স্বত্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দিয়ে দেন। ১৯০৫-এর ৭ ডিসেম্বর উপেন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠি থেকে এই সংক্রান্ত চুক্তিটির বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় :

আপনার ৯ অগ্রহায়ণ [১৩১২, = ২৫ নভেম্বর ১৯০৫] তারিখের অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলাম। "চোখের বালি" ও "নৌকাডুবি" দুইখানি উপন্যাস নৌকাডুবি প্রকাশের তারিখ হইতে তিন বৎসর কাল আমি বিক্রয় এবং উপহার প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলাম। এই স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার জন্য পূর্ব্বে আপনাকে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দিয়াছি, বাকি ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা আগামী মাঘ মাসে ৫০০৲ আগামী বৎসরের বৈশাখ মাসে ৫০০৲ শ্রাবণ মাসে ৫০০৲ টাকা দিয়া এই দেড়হাজার টাকা পরিশোধ করিব।[৪২]

এই চিঠিতে উল্লিখিত না-থাকলেও নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করার অধিকারও লাভ করেন এঁরা। তার জন্যে নিশ্চয়ই অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়েছিল। যদিও সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না।

১৯০৩ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গল্প-উপন্যাস-নাটক ও প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতিলাভের জন্যে (অবশ্য সেই স্বত্ব একচ্ছত্র ছিল না) 'হিতবাদী' রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিল ১৫০০ টাকা, সেই টাকাই সেকালের বিচারে যথেষ্ট বেশি ছিল। আর দুটি মাত্র উপন্যাস প্রকাশে তিন বছরের একচ্ছত্র অনুমতির জন্য 'বসুমতী' দিচ্ছে ২০০০ টাকা, এর দ্বারা একদিকে বসুমতী কর্তৃপক্ষের আর্থিক সামর্থের দিকটি টের পাওয়া যায়, অন্যদিকে বিশ শতকের গোড়ায় অন্তত 'কথাসাহিত্যিক' হিসেবে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার মাত্রাটিকেও অনুধাবন করা যায়। *নৌকাডুবি* প্রকাশিত হয় ১৯০৬-এর ২ সেপ্টেম্বর। *চোখের বালি*-র 'বসুমতী' সংস্করণটিও এর ঠিক পরেই প্রকাশিত হয়।

প্রচুর টাকা দিয়েছিল 'বসুমতী', ফলে এর মুদ্রণকার্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রাক-শর্ত তাঁরা গ্রহণ করেননি। বই দুটি খুব স্বল্পমূল্যে বিতরিত হয়েছিল এমন বলা যাবে না মোটেই, *নৌকাডুবি*-র দাম করা হয়েছিল ২ টাকা, অন্যদিকে *চোখের বালি*-র সংস্করণটির ২ টাকা ৪ আনা ! (আগেই বলা হয়েছে, মজুমদার লাইব্রেরি প্রকাশিত প্রথম সংস্করণটির দামও ছিল ঠিক এইটাই) কিন্তু প্রকাশনার গুণগত মানে এই দুটি বই-ই রবীন্দ্রনাথের সব বই-এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ! কাগজের মান খুবই খারাপ, তাও গোটা বইটা ঠিক একই মানের কাগজে ছাপা নয়। *নৌকাডুবি* বইটির একেবারে শেষে দু পৃষ্ঠা জুড়ে তাঁদের প্রকাশিত *নৈবেদ্য* ও *চোখের বালি*-র বিজ্ঞাপন ছাপা আছে (বিজ্ঞাপন দুটির পূর্ণাঙ্গ পাঠের জন্যে এই অধ্যায়ের শেষে 'সংযোজন' দ্রষ্টব্য।) সেই বিজ্ঞাপনের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রথমে *নৈবেদ্য* :

যিনি প্রেমিক, যিনি ভাবুক, যিনি সুধার রসাস্বাদে অভ্যস্ত, তিনিই এই সুন্দর, প্রেমময় – প্রাণময় – ভাবময় – সুধাময় – গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন। সহৃদয়কে কাঁদাইতে, ভাবুককে ভাবসাগরে ভাসাইতে, তন্ময় করিয়া

> মরজগৎ হইতে চিরসুন্দর অমর-রাজ্যে বিচরণ করাইতে এই গ্রন্থ কিরূপ উপযোগী হইয়াছে, কিরূপ পাঠ-মনোহর হইয়াছে, তাহা দেখিবার – পাঠ করিবার – শুনিবার – পক্ষে এবং উপহার প্রদানে – উপহার গ্রহণে – বিবাহ-বাসরে – ফুলশয্যায় – শুভকার্য্যে – সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে একমাত্র আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে। তাহা ভাবুকেরা বুঝিবেন এই ফুলের-হার গলায় পরিলে – সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইবে, পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পল্লীও "নৈবেদ্যর" পবিত্র সৌরভে সুরভিত হইবে। জীবনের অপকার্য্যের অবসাদ যাইবে, জীয়ন্তে স্বর্গের সুষমা প্রাপ্ত হইবেন। কবির ভাব বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব; আমাদের সবিনয় অনুরোধ – একবার পাঠ করুন।

বিচিত্র এই বিজ্ঞাপনের ভাষা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ মানতে বাধ্য হয়েছিলেন, ২০০০ টাকারও অধিক মূল্য গ্রহণের পর এই আপোসটুকু করতেই হত। *চোখের বালি*-র বিজ্ঞাপনটিও বিচিত্র, প্রসঙ্গত তা-ও এখানে উদ্ধার করা যায় :

> অতি শীঘ্র এই উপন্যাস পাঠ করুন। নরনারী, যুবক-যুবতী, বিবাহিত অবিবাহিত, যাঁহারা নুতন বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবাহ পুরাতন হইয়াছে, যাঁহাদের প্রেমে ভাটা পড়িতেছে, যাঁহারা স্ত্রীকে মনের মত করিতে চাহেন, যাঁহারা সুখের দাম্পত্য প্রেম চাহেন, তাঁহারা "চোখের বালি" নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন।

ভাবতে কৌতুহল হয়, ভাটা-পড়া প্রেম জাগ্রত করবার বা সুখের দাম্পত্যপ্রেম লাভের অভীপ্সায় এই উপন্যাস পাঠ করুক পাঠক, এই আবেদন পড়ে রবীন্দ্রনাথ কেমন বিমর্ষ কৌতুক অনুভব করতেন !

১৯১৪ সালের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ হয়, চুক্তির নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিনা অনুমতিতে 'হিতবাদী' ও 'বসুমতী' উভয় প্রকাশকই তাঁর বই বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছে। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একাধিক চিঠিতে এই প্রসঙ্গে কথাবার্তা আছে। মুশকিল হল, বিশ্বভারতী প্রকাশিত *চিঠিপত্র* পঞ্চম খণ্ডে, যেখানে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিপত্রগুলি ছাপা আছে, সেখানে তিন-ফুটকির বর্জন চিহ্ন দিয়ে প্রসঙ্গগুলি সর্বত্র এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রশান্তকুমার পাল তাঁর *রবিজীবনী*র ষষ্ঠ খণ্ডে সেই বর্জিত অংশগুলি অনেকটাই উদ্ধৃত করেছেন। আমরা রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে মূল চিঠিগুলি দেখে এই প্রসঙ্গটি এখানে বিবৃত করছি।

একটি তারিখহীন চিঠিতে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'দুই একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এই চিঠিখানি। বসুমতীর নামে নালিশ। হিতবাদীর কাছে হিসাব চাওয়া।'[৪৩] পরে, ১০ মার্চ, বিস্তারিতভাবে জানালেন, 'বসুমতী শৈলেশের দ্বারায় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়েছিল – সে ছাড়া আর কেউ ওর কোনো তথ্য জানে

না।...হিতবাদীর উপেন্দ্র সেনদের একটা পুস্তকপ্রকাশ বিভাগ আছে। সেই বিভাগে হরেন্দ্র মৈত্র কাজ করত তারি প্রস্তাব অনুসারে আমার ও অন্যান্য দুই একজন অধ্যাপকের রচিত কয়েকখানি বই ওদের হাতে দিয়ে আমি বিদ্যলয়ের গৃহনির্ম্মাণ উপলক্ষ্যে দেড় হাজার (ঠিক মনে নেই) টাকা আগাম নিয়েছিলুম।...এদের সঙ্গে ত মামলা করতে হবে না – কেবল হিসাব চাইতে হবে।'[৪৪] 'হিতবাদী'র কাছে হিসাব চাওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে ১৯১৪-র ২ মে হিতবাদীর তরফে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরীকে যে চিঠিটি পাঠান সেটি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। তাতেই সমস্যা মিটে গেছিল। 'বসুমতী'র বিরুদ্ধে কিন্তু মামলা করতে হয়। এই মামলার আপোস নিষ্পত্তি হয় ১৯১৫-র ২৮ এপ্রিল, ১০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও মামলার খরচের বিনিময়ে।

অবশ্য এরপরেও অন্তত আর-একবার 'বসুমতী'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। বিশ্বভারতীর জন্য টাকার যোগান অব্যাহত রাখতে ফের বসুমতীর সঙ্গে ব্যবসায় রবীন্দ্রনাথেরও আপত্তি ছিল না। ১৯২৫ সালের ৯ জুলাই বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্মসচিব প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ(১৮৯৩-১৯৭২) 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন।[৪৫] ইংরজি ভাষায় লেখা সেই চিঠির মাধ্যমে জানা যায়, এ বিষয়ে উভয়ের টেলিফোনে কথা হয়েছে, এবং সেইসূত্রে ৮টি প্রস্তাব করছেন প্রশান্তচন্দ্র। তার মধ্যে অন্যতম হল, বসুমতী বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পাশাপাশি গ্রন্থাবলী ও সাধারণ পুস্তক ছাপতে পারবে, বিনিময়ে বছরে অন্তত ৪০০০ টাকা দিতে হবে তাঁদের। এই প্রস্তাব শেষপর্যন্ত কোনো আজানা কারণে বাস্তবায়িত হয় নি। তবে এই স্থায়ী অর্থসমাগমের সম্ভাবনা যে বিশ্বভারতীর কাছে গভীর আকাঙ্ক্ষিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই কারণেই, এর বছর তিনেক পরেও (১৯০২৮-এর ৩০ সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে লেখেন, 'গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বসুমতীর কথা আর একবার চিন্তা করে দেখো। যদি নগদ ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় তাহলে আমাদের দেনাটা শোধ হয়ে সমস্ত চৌকোষ হয়ে যায়, তাহলে নতুন প্রাণ ও নতুন শরীর নিয়ে আমরা কাজ করতে পারব। অবশ্য আশা করি বইয়ের আয় বিশেষ কমবে না, অন্তত যতটুকু কমবে তা ত্রিশ হাজারের সুদ থেকে পূরণ হতে পারবে।'[৪৬] একজন মানুষ তাঁর জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত, তাঁর মেধাসম্পদের সবটুকু 'বিক্রি' করে অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা করে যাচ্ছেন নিরন্তর, কেবল বীরভূমের এক প্রান্তরে এক 'বিশ্বজাগতিক মিলনকেন্দ্র' তৈরির স্বপ্নকে সাকার করে তুলবেন বলে ! গ্রন্থনির্মাণের ইতিহাসের সূত্রে এই আশ্চর্য মহৎ-কে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করতে পেরে ধন্য হয়ে থাকে মন!

সংযোজন

নৌকাডুবি-র প্রথম সংস্করণের (বসুমতী আফিস, ১৩১৩) শেষ দুটি পৃষ্ঠায় প্রকাশকের তরফ থেকে দেওয়া *চোখের বালি* ও *নৈবেদ্য*-র বিজ্ঞাপন :

চোখের বালি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত – বিশ্ব-বিমোহন নবীন সামাজিক উপন্যাস দ্বিতীয় সংস্করণ রাজসংস্করণ পুস্তক ছাপা হইতেছে কাগজ মসৃণ – ছাপা অতিসুন্দর, সুবর্ণ-মণ্ডিত বিলাতি বাঁধাই দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

যে গ্রন্থের নাম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই কর্ণকুহরে প্রতিদিন প্রতিধ্বনীত হইতেছে, যে উপন্যাস কবে প্রকাশিত হইবে বলিয়া প্রত্যেক বঙ্গবাসী একদিন উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, যে উপন্যাস – বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনে প্রতিমাসে এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া পর অধ্যায় পাঠের আশায় পর মাসের বঙ্গদর্শনের জন্য গ্রাহকগণ ডাকঘরে ছুটাছুটি করিতেন, যে উপন্যাস অধ্যায়ে অধ্যায়ে – অগ্নিময় সত্য, নিত্য সিদ্ধ – ঘটনাবলী পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে, যে উপন্যাস প্রচারিত হইয়াই বঙ্গীয় উপন্যাস-জগতে একদিনেই সগৌরবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, যে উপন্যাসে বঙ্গসমাজের উলঙ্গ চিত্র কবি নির্ভয়ে আঁকিয়াছেন, যে উপন্যাস প্রচারের অনতিবিলম্বেই নাট্যশালায় অভিনয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শককে মোহিত করিয়াছে, যে উপন্যাসে লোকচরিতে – নারীচরিত্র – সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিয়া কবি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন সেই – সামাজিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আজ গ্রাহকগণের দ্বারে উপস্থিত হইল।

অতি শীঘ্র এই উপন্যাস পাঠ করুন! নরনারী যুবক-যুবতী, বিবাহিত অবিবাহিত, যাঁহারা নূতন বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবাহ পুরাতন হইয়াছে, যাঁহাদের প্রেমে ভাটা পড়িতেছে[,] যাঁহারা স্ত্রীকে মনের মত করিতে চাহেন, যাঁহারা দাম্পত্যপ্রেম চাহেন, তাঁহারা “চোখের বালি” নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন।

রাজ সংস্করণ, বিলাতী বাঁধাই মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাত্র এক্ষণে ২৲ দুই টাকায় পাইবেন।

যাঁহারা একত্রে দুইখানি পুস্তক – "চোখের বালি" ও "নৈবেদ্য" লইবেন, তাহারা [তাঁহারা] ২৲ দুই টাকায় পাইবেন ডাকমাশুল ৶০ তিন আনা

বসুমতী পুস্তক বিভাগ – গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা ।

নৈবেদ্য।

শিক্ষিত নরনারীর চির-আদরের, সুপ্রতিষ্ঠ সুকবি অধুনা বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ – সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন লিখিত – সুচারু কাব্যগ্রন্থ।

রাজ সংস্করণ – গ্লেজ তাসের ন্যায় কাগজে, মুক্তার ন্যায় অক্ষরে, রেশমের ন্যায় কাগজের আভরণে এই কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত; ২০০ দুই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। যিনি প্রেমিক, যিনি ভাবুক, যিনি সুধার রসাস্বাদে অভ্যস্ত, তিনিই এই সুন্দর, প্রেমময় – প্রাণময় – ভাবময় – সুধাময় – গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন। সহৃদয়কে কাঁদাইতে, ভাবুককে ভাবসাগরে ভাসাইতে, তন্ময় করিয়া মরজগৎ হইতে চিরসুন্দর, অমর-রাজ্যে বিচরণ করাইতে এই গ্রন্থ কিরূপ উপযোগী হইয়াছে, কিরূপ পাঠ-মনোহর হইয়াছে, তাহা দেখিবার – পাঠ করিবার – শুনিবার – পক্ষে এবং উপহার প্রদানে – উপহার গ্রহণে – বিবাহ-বাসরে – ফুলশয্যায় – শুভকার্য্যে – সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে একমাত্র আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে। তাহা ভাবুকেরা বুঝিবেন এই ফুলের হার গলায় পরিলে – সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইবে, পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পল্লীও "নৈবেদ্যর" পবিত্র সৌরভে সুরভিত হইবে। জীবনের অপকার্য্যের অবসাদ যাইবে, জীয়ন্তে স্বর্গের সুষমা প্রাপ্ত হইবেন। কবির ভাব বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব; আমাদের সবিনয় অনুরোধ – একবার পাঠ করুন।

মূল্য ১৲ এক টাকা – স্থলে ।।০ আট আন [য] মাত্র, ডা: মা: ৶০ আনা।

টীকা ও উল্লেখপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছিন্নপত্রাবলী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮ব, পত্র সংখ্যা ১৮২, পৃ. ২০০

২. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৫ব, পৃ. ২৯১

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ব, পত্র নং ১১৭, পৃ. ১১০-১১

৪. প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১১৪, পৃ. ১০৪

৫. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮ব, পৃ. ৩৬

৬. প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯ব, পৃ. ৩৬

৭. পুলিনবিহারী সেন, 'সম্পাদক ও কবি', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮ব, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ. ৩৫-৬৬

৮. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ৪৩, ডিসেম্বর ২০০৫ পত্র সংখ্যা ১, পৃ. ৮

৯. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮ব, পৃ.৪৪

১০. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ৪৩, ডিসেম্বর ২০০৫, পত্র সংখ্যা ৪, পৃ. ১৩

১১. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮ব, পৃ.৪৪

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১৩. প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক ১৩৪৯ব, পৃ. ২২৪

১৪. পুলিনবিহারী সেন, 'সম্পাদক ও কবি', সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৮ব,, পৃ.৪৫

১৫. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ৪৩, ডিসেম্বর ২০০৫, পত্র সংখ্যা ১১, পৃ. ২৬

১৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২ব, পৃ. ৪

১৭. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ৪৩, ডিসেম্বর ২০০৫, পত্র সংখ্যা ৩, পৃ. ১২

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দশম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৪০২ব, পত্র নং ১৬, পৃ.১৮

১৯. সুশীল রায় সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩ব, পৃ. ৩

২০. দীনেশচন্দ্র সেন,*ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য,* কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২২৬

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দশম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৪০২ব, পত্র সংখ্যা ২১, পৃ.২১

২২. প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ২২, পৃ. ২২

২৩. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ১৮০

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, মার্চ ১৯৯২, পত্র নং ৩৯, পৃ. ৫৪

২৫. প্রাগুক্ত, পত্র নং ৪৫, পৃ. ৬৪

২৬. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৩৩০

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* দশম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৪০২ব, পত্র সংখ্যা ৩৫, পৃ.৩৬

২৮. গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত, *রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা,* আগরতলা : ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি, ১৯৬১, পৃ. ৪৬৬

২৯. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৩৬৯

৩০. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৩ব, পৃ. ১৯৭

৩১. শারদীয়া প্রতিক্ষণ, ১৩৯৩ব, পৃ. ৩০

৩২. সুশীল রায় সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩ব, পৃ. ১৮৯

৩৩. শারদীয়া প্রতিক্ষণ, ১৩৯৩, পৃ. ৩০

৩৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence (Bengali), File no. 612

৩৫. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৩ব, পৃ. ১৯৮

৩৬. প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯ব, পৃ. ৩০-৩১

৩৭. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ১৫১

৩৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence (Bengali), File no. 34

৩৯. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ভক্ত ও কবি,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৭, পত্র নং ২৪, পৃ.৩৭

৪০. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence file(Bengali), serial no. 169(ii)

৪১. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ২১৩

৪২. রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন সংগ্রহ। Correspondence file(Bengali), serial no. 124

৪৩. রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন সংগ্রহ। Correspondence file(Bengali), serial no. 440. অপিচ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব, পৃ. ১৭১। তবে চিঠিটি এখানে আংশিক মুদ্রিত।

৪৪. রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন সংগ্রহ। Correspondence file(Bengali), serial no. 440. এ চিঠিও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত *চিঠিপত্র* পঞ্চম খণ্ডে (পৃ. ১৭২-৭৩) আংশিক মুদ্রিত। বর্জিত অংশের জায়গায় বর্জন চিহ্নও (...) দেওয়া নেই !

৪৫. প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও অভীককুমার দে সম্পাদিত, *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ মাসিক বসুমতী*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ২০১৩, এই বইটির ‘চোদ্দ’ পৃষ্ঠায় মূল চিঠিটির ছবি মুদ্রিত।

৪৬. প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তারিখের উল্লেখহীন, [প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পত্র নং ৮৮, পৃ. ৭৭

চতুর্থ অধ্যায়

‘ইন্ডিয়ান প্রেস’-পর্ব (১৯০৮-১৯২২)

ক. যোগাযোগ ও চুক্তি

চিন্তামণি ঘোষ (১৮৫৪-১৯২৮) ছিলেন জর্জটাউন, এলাহাবাদের বাসিন্দা, প্রবাসী বাঙালি। প্রথম জীবনে চাকরি করতেন বিখ্যাত ‘পাওনিয়র’ (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৫) কাগজে। এই চাকরির অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে ১৮৮৪-র ৪ জুন প্রতিষ্ঠা করলেন নিজস্ব ছাপাখানা, ‘দি ইন্ডিয়ান প্রেস’।[১] একেবারে গোড়ার দিকে এখানে ছাপা হত হিন্দী আর ইংরাজি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক। সাহিত্যানুরাগী চিন্তামণি চাইছিলেন মৌলিক সাহিত্যকর্ম প্রকাশের মাধ্যমে নিজের প্রকাশনাকে ভিন্নস্তরে নিয়ে যেতে। তাঁরই পরিকল্পনা ও উদ্‌যোগে ১৯০০ সালের ১ জানুয়ারি ‘ইন্ডিয়ান প্রেস’ থেকে প্রকাশিত হল ভারতবর্ষের প্রথম হিন্দী মাসিক পত্রিকা ‘সরস্বতী’।[২] এই কাগজের উন্নত মান চিন্তামণি ও তাঁর প্রকাশনাকে খ্যাতি এনে দিল।

চিন্তামণি ঘোষ আদতে হাওড়ার বালি অঞ্চলের বাসিন্দা, কিন্তু বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। বাংলা ভাষায় বই বা পত্রিকা প্রকাশ করবার কোনো পরিকল্পনাও তাঁর শুরুতে ছিল না। কিন্তু সেই ইচ্ছা অল্পে অল্পে জেগে উঠল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের(১৮৬৫-১৯৪৩) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের পর। এলাহাবাদ-স্থিত ‘কায়স্থ পাঠশালা’র অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে রামানন্দ এলাহাবাদে পৌঁছন ১৮৯৫ সালে।[৩] চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে রামানন্দের কবে থেকে পরিচয় শুরু হয় তা বলা শক্ত, তবে সেটা যে ‘সরস্বতী’ প্রকাশের আগে থেকে তা নিশ্চিত করে বলা যায়, কেননা রামানন্দ নিজেই একটি স্মৃতিকথায় জানিয়েছিলেন, “চিন্তামণিবাবুর সহিত হিন্দীতেও সচিত্র মাসিকপত্র বাহির করা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতাম; হয়তো এই কথাবার্ত্তা হইতে উৎকৃষ্ট হিন্দী পত্রিকা ‘সরস্বতী’র উদ্ভব হয়।”[৪] এইসময়েই একটি সচিত্র বাংলা পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও দুজনের আলোচনা হতে থাকে, তার জন্যে আলাদা করে প্রস্তুতিও নেওয়া হয়, কেনা হয় নতুন বাংলা টাইপ, এবং ‘সরস্বতী’ প্রকাশের পরের বছরই ১৯০১-এর এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩০৮ব) ‘ইন্ডিয়ান প্রেস’ থেকে প্রথমবার

ছাপা হয়ে বেরোয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকা ‘প্রবাসী’। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ‘ইন্ডিয়ান প্রেস’-এর যোগাযোগের প্রথম সূত্রটি রামানন্দ ও তাঁর পত্রিকা ‘প্রবাসী’।

‘প্রবাসী’ প্রকাশের আগে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘প্রদীপ’ পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩০৪ব) নিয়মিত লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অবশ্য চাক্ষুস পরিচয় তাঁদের ছিল না সে সময়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদে পৌঁছোন দেবেন্দ্রনাথের আদেশে অকালপ্রয়াত ভাইপো বলেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী সাহানাকে পিতৃগৃহ থেকে পুনরায় জোড়াসাঁকোয় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। এই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। (অবশ্য চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ তখনও ঘটেনি। তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও ৮ বছর।) এরপর ‘প্রবাসী’র প্রকাশ শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন সেই পত্রিকারও নিয়মিত লেখক।

‘ইন্ডিয়ান প্রেস’-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যোগাযোগের সূত্র রবীন্দ্র-অনুরাগী ও *রবি-রশ্মি* গ্রন্থের লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৭৭-১৯৩৮)। ১৯০১-এর ১৭ ডিসেম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মজুমদার লাইব্রেরির অফিসে এক সান্ধ্যবৈঠকে কীভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয় সে বিবরণ চারুচন্দ্র এক লেখায় বেশ বিস্তারিতভাবেই জানিয়েছেন।[৫] এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মোটামুটি নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ১৯০৬-এর ৩১ ডিসেম্বর চারুচন্দ্র ‘ইন্ডিয়ান প্রেস’-এর প্রুফ রিডারের চাকরি নিয়ে এলাহাবাদ গিয়ে পৌঁছোন, এবং ওঠেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি।[৬] দুই রবীন্দ্র-অনুরাগীর বন্ধুত্বের সূচনা হয় এভাবে।

১৯০৮-এর গোড়ায় ‘ইন্ডিয়ান প্রেস’ কলকাতায় তাঁদের একটি শাখা খোলেন, তার নাম দেওয়া হয় ‘ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস’। চারুচন্দ্র সেই শাখার ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এর আগে, ১৩০৯ব থেকেই, এলাহাবাদে ইন্ডিয়ান প্রেস-এ বাংলা কম্পোজিটরের অভাবে ‘প্রবাসী’ ছাপার দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়েছে কলকাতার কুন্তলীন প্রেসে, রামানন্দও ১৩১৫ব থেকে সপরিবারে চলে এসেছেন কলকাতায়।[৭] চারুচন্দ্র লিখছেন, “আমি রবিবাবুকে দিয়ে বউনি কর্‌ব সঙ্কল্প করে রামানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রবিবাবুর কাছে গেলাম। রামানন্দবাবু আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত কর্‌লে রবিবাবু বললেন – “এর জন্য আপনার কোনো সুপারিশ আন্‌বার আবশ্যক ছিল না। কেউ যদি আমার এই সমস্ত কুকর্মের ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করেন সে তো আমার

পরম উপকার করা হবে। আপনি যবে বল্‌বেন আমার সব বই আপনার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো"।"[৮]

ইন্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সম্পর্কের এই হল সূচনাপর্ব।

১৯০৮-এর ১৪ জুলাই এবং ১৯০৯-এর ২১ জুন, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারীর পক্ষে ম্যানেজার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে মোট তিনটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে ১৯০৯-এর চুক্তিটিতে[৯] চারুচন্দ্রের পক্ষ থেকে লেখা হয়, "I agree to pay to the said B. Rabindranath Tagore, his heirs, executors or assigns, a royalty on every copy of the book sold according to the scale above prescribed, namely 25 percent, of the actual price of at which each copy sold". অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে জানানো হয়, "the Indian Publishing House shall not only publish and store the books but shall also make arrangements for the sale of those books, shall submit to me in the month of January and July of each year an account of all sales effected during the preceding six months".

নিজের বই-এর বিক্রির সংক্রান্ত যে নানা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে এতদিন মাথা ঘামাতে হয়েছে বলে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে লক্ষ করেছি, অবশেষে তার সাময়িক অবসান হল।

এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রথম চুক্তিপত্রটি (১৯০৮-এর ১৪ জুলাই) সম্পাদিত হবার আগেই ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়ে গেছে। *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র ১০ম ভাগের অন্তর্গত হয়ে 'রাজা প্রজা' বইটির প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী ১৯০৮-এর ৩০ জুন। এমনকী, আগে প্রকাশিত পুরোনো বই-এর হস্তান্তরও শুরু হয়ে গেছে, প্রশান্তকুমার পাল ৩ জুলাই ১৯০৮ তারিখের 'ক্যাশবহি'র একটি হিসেব উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন[১০], ২৩ জুনের আগেই মজুমদার লাইব্রেরি প্রকাশিত *গদ্যগ্রন্থাবলী* ও *কাব্য-গ্রন্থ*-র অবিক্রীত যাবতীয় কপি ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কলকাতায় ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের ঠিকানা ছিল ৭৩/১ সুকিয়া স্ট্রিট, বই-তেও এই ঠিকানাই লেখা থাকত। কিন্তু তাদের বিক্রয়কেন্দ্র ছিল পৃথক ঠিকানায়, প্রথমে ২০/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, পরে উঠে যায় ২২ নম্বরে। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রথম বই *রাজা প্রজা* আমরা ছাপা হতে দেখি 'দিনময়ী প্রেস' থেকে মুদ্রাকর হরিচরণ মান্না। প্রেসের ঠিকানা ২০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি এই প্রেস থেকেই 'মজুমদার লাইব্রেরি'-র বই ছাপা হত এবং 'মজুমদার লাইব্রেরি'র অফিসের ঠিকানাও ছিল এইটাই, ২০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট। আসলে ঋণভারে জর্জরিত শৈলেশচন্দ্র এইসময়ে তাঁর প্রেস বিক্রি করে দিচ্ছেন, নিজের প্রকাশনার ঠিকানাও তাই বদল করে ফেলতে হচ্ছে তাঁকে। ১৮ আগস্ট ১৯০৮-এ দাদা শ্রীশচন্দ্রকে ভাই শৈলেশচন্দ্রর উদ্দেশে একটা চিঠিতে লিখতে দেখি, "প্রেস বিক্রয় করিয়া এবং বঙ্গদর্শনের অগ্রিম মূল্য পাইয়া...অন্যান্য দেনার কিছু কিছু দিয়াছিলে,...লাইব্রেরির কোন কথা তো একেবারে জানিতে পারি না। আমায় অমন কথা গোপন করিয়া কি সুবিধা বোধ কর বুঝিতে পারি না। প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলে প্রতিকারের উপায় চিন্তা ত করিতে পারি।"[১১] এই চিঠি থেকে 'দিনময়ী প্রেস' বিক্রির খবর এবং শৈলেশচন্দ্রের চূড়ান্ত আর্থিক দুরবস্থার কথা জানা যায়। শ্রীশচন্দ্র লিখলেন বটে 'প্রতিকারের উপায়' চিন্তা করার কথা, কিন্তু তিনি নিজে তখন অসুস্থ, এই বছরেরই ৮ নভেম্বর মৃত্যু হয় তাঁর। তাছাড়া শ্রীশচন্দ্র নিজেও শেষজীবনে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথে লেখা একটি চিঠিতে সে খবর পাওয়া যায়, ১৫ নভেম্বর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "তিনি [শ্রীশচন্দ্র] ত ঋণ ছাড়া আর কিছুই জমাইয়া যাইতে পারেন নাই – আর রাখিয়া গিয়াছেন চারটি অবিবাহিত কন্যা..."[১২]। ফলে 'মজুমদার লাইব্রেরি'র অবস্থা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। আর্থিক অনটনে কয়েকটা বছর কাটাবার পর বসন্তরোগে শৈলেশচন্দ্রেরও মৃত্যু হয় ১৯১৪ সালের ২ জুন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়(১৮৮৮-১৯২৯) শৈলেশচন্দ্রের কাছ থেকে 'দিনময়ী প্রেস'টি কিনে নেন। আগেই বলা হয়েছে, 'রাজা প্রজা' মুদ্রিত হয় এই দিনময়ী প্রেস থেকেই। তারপরেই এই প্রেসের নাম বদল করা হয়। নতুন নাম হয় 'কান্তিক প্রেস', নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকাটির কথা জানা যায়, '১৯০৮ সালের আষাঢ় মাসে মণিলালের কান্তিক প্রেসে ছাপার কাজ শুরু হলো।...মনে আছে তাঁর [রবীন্দ্রনাথ] কাছে বসে প্রেসের নামকরণ নিয়ে আলোচনা

চলছিল...অনেকে অনেক নাম বলছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, কান্তিক প্রেস। নামটি বলে তিনি প্রশ্ন করলেন – ‘কান্তিক’ কথার অর্থ কি? প্রশ্নটা নিক্ষিপ্ত হল আমাদের দলের উপর (সত্যেন্দ্রনাথ, চারু বন্দ্যো, মণিলাল, আমি, কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। কান্তি কথা ধরে আমরা নানাজনে নানা অর্থ বলতে লাগলুম। হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন, না। ‘কান্তিক’ কথার অর্থ লোহা। কান্তিক প্রেস মানে লোহার যন্ত্র।’[১৩]

‘ইন্ডিয়ান প্রেস’ পর্বে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বইপত্র ছাপা হয়েছে এই ‘কান্তিক প্রেস’ থেকেই।

খ. ছাপার উৎকর্ষ বনাম প্রকাশনার উৎকর্ষ

‘রবীন্দ্রনাথের কোনো ইন্ডিয়ান প্রেস-সংস্করণ ব্যবহার করার বা চোখে দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন যে মুদ্রণের পারিপাট্যে শুধু নয়, পৃষ্ঠাসজ্জায় ও কবিতার পঙ্‌ক্তি ও স্তবকবিন্যাসে তাতে প্রকাশকের রুচি ও সাহিত্যবোধের পরিচয় কীরকম উজ্জ্বল ছিল।’[১৪]

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু ইন্ডিয়ান প্রেস সংস্করণের বইগুলির শিল্পীত রূপের জন্যে মূল কৃতিত্বটা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আর চারুচন্দ্রকে, বলেছেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যেই এমন ‘চারুতা সাধন’ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই প্রকাশনা শুরু থেকেই নির্ভুল ছাপা ও মুদ্রণ পারিপাট্যের উপর প্রায় আপোসহীন জোর দিয়েছে, সেদিক থেকে অন্তরালবর্তী চিন্তামণি ঘোষের ভূমিকা বিস্মৃত হলে ভুল হবে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে সেই ‘আপোসহীনতার’ দুটি চমকপ্রদ উদাহরণ আমরা উল্লেখ করতে পারি। চিন্তামণি ঘোষের মৃত্যুর পর ‘প্রবাসী’র পাতায় তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রামানন্দ লিখছেন :

> মডার্ন রিভিউ যখন ইন্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত তখন আমি উহার সম্বন্ধে নানা সংবাদপত্রের মত সংকলন করিয়া প্রবাসীর আকারের একটি ৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা বিতরণের জন্য পাঁচহাজার ছাপিতে দি। উহা ছাপা সেলাই ও ছাঁটা হইয়া যাইবার পর প্রেসে গিয়া আমি একখানা হাতে লইয়া দেখিলাম, একটি পৃষ্ঠায় দুটি পংক্তি উল্টাপাল্টা হইয়া গিয়াছে : অর্থাৎ যেটি আগে বসিবে সেটি পরে বসিয়াছে।....তাহা চিন্তামণিবাবুকে দেখাইবামাত্র তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, এই পুস্তিকাগুলি কি আজই আপনার চাই ? আমি বলিলাম, না। তখন তিনি ম্যানেজারকে

> আবার ৫০০০ পুস্তিকা নির্ভুল করিয়া ছাপিয়া এক দিন পরে আমাকে দিতে বলিলেন, এবং পূর্ব্ব মুদ্রিত পুস্তিকাগুলি সমস্ত নষ্ট করিয়া দিতে বলিলেন। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, পুস্তিকাগুলি বিজ্ঞাপন-মাত্র, এবং বিতরিত হইবে; তাহার জন্য এত লোকসান করিবার দরকার নাই। তিনি বলিলেন, না মশায়, এতে আমার প্রেসের বদনাম বদ্‌নাম হবে। সুতরাং উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ছাপা ৫০০০ পুস্তিকা নষ্ট করিয়া তিনি নিজের ব্যয়ে সেইরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে তাহা ছাপাইয়া দিলেন।[১৫]

এই কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল মুদ্রণব্যবস্থার যুগে এ কথা বুঝে ওঠা একটু মুশকিল যে, সেই লেটার প্রেসের যুগে শোভন এবং বৈচিত্র্যময় ছাপা কতখানি কঠিন ছিল ! ছাপতে ছাপতে ‘টাইপ’ ক্ষয়ে যায়, নতুন ‘টাইপ’ কেনার জন্যে লাগে নতুন-করে পুঁজির সংস্থান। হরফের ধরন বিভিন্ন রকমের, তার সবগুলো ধরন কোনো প্রেসের পক্ষেই জোগাড় করে রাখা সম্ভব না — অর্থ এবং স্থান-সংকুলানের প্রশ্ন — কোনো দিক থেকেই সম্ভব না। সর্বোপরি আছে, বিভিন্ন ভাষার ‘টাইপ’এর প্রশ্ন। বাংলা ভাষায় ছাপা বইতেও থাকতে পারে রোমান কিংবা দেবনাগরী হরফের ব্যবহার, ফলে একজন বাংলাভাষার মুদ্রাকরকে আরও একাধিক-ভাষার সমস্ত ‘টাইপ’ সংগ্রহ করে রাখতে হয়। ফলে শুধুমাত্র ‘টাইপ’-এর সংগ্রহ বাবদেই মুদ্রাকরকে নিরন্তর পুঁজির যোগান অব্যাহত রাখতে হত সেকালে। আর এইখানেই ‘আপোস’ করা ছাড়া অধিকাংশ প্রকাশক তথা মুদ্রাকরের কিছুই করার থাকত না। ঠিক এইজায়গায় চিন্তামণির ভূমিকা ছিল প্রায় বৈপ্লবিক, লাভ-লোকসানের কথা বিবেচনা না-করে তিনি খরচ করতেন এই বাবদে। ফলে বৈচিত্র্যময় হরফের সংগ্রহে তাঁর প্রকাশনা ছিল সেকালে অদ্বিতীয়। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে এই প্রসঙ্গে আরও একটি ‘ঘটনা’র কথা আমরা জেনে নিতে পারি :

> রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলী যখন এলাহাবাদের পাণিনি আফিস ইন্ডিয়ান প্রেসে ছাপাইয়া বাহির করেন, তখন আমি উহার প্রুফ দেখিয়াছিলাম ও ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। রামমোহনের সহিত খৃষ্টীয় মিশনারীদের তর্কবিতর্ক ছাপিবার সময় দেখা গেল আরবী গ্রীক ও হীব্রূ অক্ষরের দরকার। আরবী অক্ষর ইন্ডিয়ান প্রেসেই ছিল। গ্রীক ও হীব্রূ অক্ষরের জন্য কলিকাতার ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে লেখা হইল; কেননা উহাতে ঐ দুই ভাষাতেও বহি ছাপা হয় এবং টাইপ ঢালাইও হয়। কিন্তু উক্ত প্রেস টাইপ বিক্রী করিতে রাজী হইল না। তখন

চিন্তামণিবাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি নিজের টাইপ ঢালাই বিভাগে গ্রীক ও হীব্রু টাইপের ছাঁচ কাটাইয়া টাইপ ঢালাইয়া বহি ছাপিলেন।[১৬]

ফলে, রবীন্দ্রনাথের বই ছাপার অধিকার অবশেষে যে সেকালের সবচেয়ে দায়িত্ববান প্রকাশকের হাতেই গিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের *গদ্যগ্রন্থাবলী* খণ্ডে খণ্ডে বেরোচ্ছিল ‘মজুমদার লাইব্রেরি’ থেকে, দায়িত্ব নেওয়ার পর ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রথম কাজ হল সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। তাঁরা জুন থেকে সেপ্টেম্বর (১৯০৮) এই চার মাসে পরবর্তী ৪টি খণ্ড (১০ম থেকে ১৩শ) প্রকাশ করেন। শেষ তিনটি খণ্ড বেরোয় যথাক্রমে নভেম্বর, ও পরবর্তী বছরের জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে। মজুমদার লাইব্রেরি-প্রকাশিত খণ্ডগুলির মূল পরিকল্পনা ও বিন্যাসে এক্ষেত্রে কিছুই বদল করা হয় নি, বস্তুত ছাপাখানারও বদল হয় নি বলে (কেবল নাম ও স্বত্বাধিকারী বদলে গেছে), বাহ্যত দেখে বোঝার উপায় নেই যে শেষ চারটি খণ্ড ভিন্ন প্রকাশকের ঘর থেকে প্রকাশ হচ্ছে। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের একেবারে নিজস্ব পরিকল্পনায় প্রথমদিকে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশের উদ্‌যোগ শুরু হল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *শারদোৎসব* (সেপ্টেম্বর ১৯০৮), *গান* (১৯০৯), *শান্তিনিকেতন* ভাষণমালা (প্রথম খণ্ড জানুয়ারি ১৯০৯) এবং অবশ্যই বহু-আলোচিত *চয়নিকা* (অক্টোবর ১৯০৯)। *শারদোৎসব* বইটি নির্মাণের পিছনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কতটুকু তা নির্ণয় করা দুরূহ। এইসময় পর্বে চারুচন্দ্র, মণিলাল রামানন্দ বা সংশ্লিষ্ট কাউকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠি পাওয়া যায় না। যদিও, *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র খণ্ডগুলো বাদ দিলে এই বইটিই ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই, ফলে বইটি খুবই যত্ন নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়। ম্যাপলিথো কাগজে হাফ-রয়াল সাইজে বইটিকে অনেকটা পুঁথির আকার দেওয়া হয়। চারুচন্দ্র জানান, “আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া ইহার প্রচ্ছদের ও মুখপাতের জন্য দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লই।”[১৭]

‘মুখপাত’-এর কথা বলেছেন বটে, তবে ছবিদুটি ব্যবহৃত হয় প্রথম ও চতুর্থ প্রচ্ছদে। সাধারণ ব্লক করে এই ছবি ছাপা সম্ভব ছিল না বলে হাফ-টোন ব্লকে ছাপা হয় এই ছবি। কান্তিক প্রেসে তখন হাফ-টোন ব্লক ছাপার উপযুক্ত পরিকাঠামো ছিল না। তাই প্রচ্ছদদুটি ছাপিয়ে আনতে হয় কুন্তলীন প্রেস থেকে। অন্তত চারটি

আকারের বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয় বইয়ের ভিতরে। মূল টেক্সট ছাপা হয় 'স্মল পাইকা'-য়, দৃশ্য-সংখ্যাশব্দ 'ইংলিশ'-এ, গান 'বর্জইস', এবং বেদমন্ত্র 'পাইকা'-য়। সব মিলিয়ে অতীব শোভন ও অভূতপূর্ব নানা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে *শারদোৎসব* প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ-ও ঠিক, বইটিতে বানান ও প্রুফ দেখার ভুল ছিল চোখে পড়ার মতো। 'সন্ন্যাসী' বানানটি প্রায় সর্বত্র 'সন্যাসী' দেখাটা বড়োই দৃষ্টিকটূ। সেইজন্যেই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এর প্রুফ দেখে থাকলে এতটা ভুল হতে পারত না হয়তো। মুশকিল হল, এই বই-এর পরিকল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কতখানি তা যেমন জানা যায় না তেমনই বই প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া কী ছিল তা বলার মতো তথ্যও আজ পাওয়া যায় না। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের (সংগৃহীত) চিঠিপত্রের সংখ্যা খুবই কম।

১৯০৯ সাল জুড়ে এই প্রকাশনী থেকে রবীন্দ্রনাথের যতগুলি বই প্রকাশিত হয় (দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট) তার মধ্যে দুটি বাদে সবগুলি বইই ছাপা হয় কান্তিক প্রেস থেকে। ব্যাতিক্রম দুটি বই হল, *গান* ও *চয়নিকা*। এই বইদুটি ছাপা হয়ে আসে এলাহাবাদে ইন্ডিয়ান প্রেস-এর নিজস্ব ছাপাখানা থেকে। বইদুটিকে এলাহাবাদ থেকে ছাপিয়ে আনার কারণ সম্ভবত কান্তিক প্রেসের ভার খানিক লাঘব করার চেষ্টা। ১৩১৬-র ফাল্গুন মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের যে ৮ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তার থেকে জানা যায়, এক বছরের অল্প বেশি সময়ের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথের নতুন ও পুরোনো মিলে তাঁরা প্রকাশ করেছেন অন্তত ৩৩টি টাইটেল ! সঙ্গে অন্য লেখকের বই তো আছেই। আর, মনে রাখা দরকার, 'ভারতী' পত্রিকার ছাপার কাজও হয় এই কান্তিক প্রেসেই। এই বিপুল পরিমাণে বই ছাপানো করা যেকোনো মুদ্রাকরের পক্ষেই দুরূহ। সেই কারণেই কিছু কিছু বই ছাপা হয়ে আসত একেবারে এলাহাবাদের প্রেস থেকে। আগেই বলা হল,*গান* আর *চয়নিকা* এলাহাবাদ প্রেস-এ ছাপতে দেওয়া হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই বইদুটোকে ঘিরেই কবির মনে দেখা দেয় কিছু অসন্তোষ !

চয়নিকা ও *গান*

চারুচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের আদানপ্রদান শুরু হয় ১৯০৪ থেকে। প্রথমদিকে দেখি রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত 'সবিনয় নমস্কার'-গোত্রের সম্বোধন করছেন, কথা বলছেন 'আপনি' করে। আমাদের আলোচ্য পর্বে

সেই সম্বোধন বদলে হয়েছে ‘প্রিয়বরেষু’, ১৯০৯-এর ২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন চারুচন্দ্রকে, ‘“সখি প্রতিদিন হায়” গানটির জন্য এত খোঁজাখুঁজি করিতেছে কেন? এ গান ত আমার কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে আছেই। সে বই কাছে না যদি থাকে তবে যোগীন সরকারের গানের মধ্যে নিশ্চয়ই পাইবে।’[১৮] উদ্ধৃতির প্রথমবাক্যে ‘করিতেছেন’ লিখে তারপর ‘ন’ কেটে দেবার ফলে যে অসংলগ্নতা সৃষ্টি হয়েছে তা লক্ষণীয়। কিন্তু চারুচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে একধরণের ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, এ তারই প্রমাণ।

উপরের উদ্ধৃত পত্র থেকে এ-ও বোঝা যায় যে *গান* প্রকাশের তোড়জোড় চলেছে। বস্তুত, একই সঙ্গে চলছিল *চয়নিকা*-রও কাজ। আমরা দেখব, রবীন্দ্রনাথ এই দুটি বই-এর জন্যে চারুচন্দ্রকে বেজায় তাড়াও দিচ্ছেন, ‘তোমাদের বইগুলি এখনো ছাপাখানার জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্চে না দেখে সকলেই বিস্মিত। কিন্তু প্রকাশক নামক প্রাণীর চালচলন আমি জানি বলেই আমি বিস্ময় বোধ করচি নে।’[১৯]

চয়নিকা-ই প্রকাশ পেল আগে, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। এলাহাবাদে ছাপা বলে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে এর প্রকাশ তারিখ পাওয়া যায় না। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর চারুচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি থেকে প্রকাশ-সময়টা অনুমান করা যায়, ‘চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কিনা তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জানাব।’[২০]

চয়নিকা-র প্রথম সংস্করণ আজও রবীন্দ্রনাথের বই-প্রকাশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। খয়েরি রেক্সিনে বাঁধানো প্রচ্ছদ, তার উপরে সোনার জলে লেখা কবির হস্তাক্ষরে গ্রন্থনাম ও কবির ‘শ্রী’-যুক্ত স্বাক্ষর। পুটেও অনুরূপ সোনার জলে ছাপানো নাম ও অলঙ্করণ ! এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নির্বাচিত কাব্য-সংকলন গ্রন্থ। (কাব্যসমগ্র অবশ্য আগে একাধিক বেরিয়েছে) মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত *কাব্য-গ্রন্থ*-এর মতো এখানেও নানা বিষয়ক্রমে কবিতাগুলি বিন্যস্ত হয়েছে। ‘কবিমানস’, ‘উতলা’ ‘রসরূপ’, ‘রূপক’, ‘বিশ্বপ্রকৃতি’, মানব’, ‘কণিকা’, ‘অতীত’, ‘কথা’, ‘ভূমা’ ও ‘পরিণাম’ ও ‘গান’ এই বারোটি পর্যায়ে মোট ২৫৮টি কবিতা এই বইতে সংকলিত। প্রতিটি পর্যায় শুরুর আগে একটি করে পৃথক উড়োপত্র, তাতে শুধু পর্যায় নামটি লেখা। প্রতিটি কবিতা শুরু স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায়। আমরা জানি, এ-ধরণের কবিতা সংকলন বইগুলিতে কবিতার স্তবক বিন্যাসে কিছু গুরুতর অসুবিধা দেখা দেয়, বিশেষত স্তবকের মধ্যিখানে পৃষ্ঠার বদল হলে স্তবকটিকে ঠিক মতো

বোঝা যায় না। এই বইতে কোথাও স্তবকের মাঝখানে যাতে পৃষ্ঠার বদল না ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে, ফলে স্তবক সবসময় অবিকল ও অভঙ্গ থেকে গেছে। কবিতা-সংকলন গ্রন্থ হিসেবে এই বইটি বাংলা প্রকাশনার ধারায় একটি আদর্শ প্রকাশনা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে বলে আমরা মনে করি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বইটি প্রকাশ হবার অব্যবহিত পরে 'প্রবাসী', 'ভারতী'-সহ যে সমস্ত পত্রিকায় এর 'রিভিউ' বেরোয়, তাতেও এর মুদ্রণসৌকর্যের প্রভূত প্রশংসা করা হয়। যেমন, 'ভারতী'তে সত্যব্রত শর্মা নামে জনৈক সমালোচক লেখেন, 'গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই এমন চমৎকার হইয়াছে যে বাঙলা কোন বই ইহার তুল্য নয়। 'চয়নিকা'র সংস্করণটি সাহিত্য-রসজ্ঞের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় হইয়াছে।'[২১]

এটি একটি সচিত্র গ্রন্থও বটে। এই বই নির্মাণের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬)-র।

চয়নিকা-র পরিকল্পনা যখন শুরু হয়েছে সেই সময়েই অবনীন্দ্রনাথের কাছে নন্দলালের কোনো একটি ছবি দেখেন রবীন্দ্রনাথ। ডাক পড়ে নন্দলালের। প্রথম সেই সাক্ষাতের বিবরণ নন্দলাল নিজেই জানিয়েছেন এইভাবে, 'কবি বললেন, 'তোমার তারামূর্তি আমি দেখেছি। বেশ হয়েছে। তা, তোমাকে এখন আমার কবিতার বই ইলাসট্রেট্ করতে হবে।' শুনে প্রথমটা আমি চমকে গেলুম।...কবিকে আমি বললুম, 'আমি আপনার বই পড়িনি বললেই হয়। পড়লেও মানে কিছু বুঝিনি।' কবি বললেন, 'তাতে কি, তুমি পারবে ঠিক। এই আমি পড়ছি, শোনো।' বলে, তিনি তাঁর চয়নিকার কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন – পরশপাথর ঝুলন মরণমিলন – এইসব কবিতা। আর দেখ, তাঁর পড়বার ভঙ্গিতেই আমার মনে যেন নানান ছবি বসতে লাগলো।'[২২]

চয়নিকা-য় মুদ্রিত হল রবীন্দ্রনাথের সাতটি কবিতার সাতটি লাইন অবলম্বনে নন্দলালের আঁকা সাতটি ছবি। সেই লাইনগুলি হল:

১। 'কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া'

২। 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'

৩। 'যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও'

৪। 'খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর'

৫। 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ'

৬। 'ভূমির পরে জানু পাতি তুলি ধনুঃশর'

৭। 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়'

এর আগে রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২)-র মতো বইতে ইলাস্ট্রেশন দেখেছি, কিন্তু এই কাজের শিল্পগত দাবি স্বভাবতই বেশি, কেননা কাহিনিমূলকতার সহজ চাহিদা থেকে বেরিয়ে এখানে গীতিকবিতার সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে কবিতার সত্য। 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ'-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নন্দলাল যখন আঁকেন নৃত্যরত শিবের ছবি তখন সেটা সহজবোধ্য হয় , কিন্তু 'কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া' আঁকা নিশ্চয়ই অনেক শক্ত ছিল। নন্দলাল অ্যাবস্ট্রাক্ট আঁকেন না, নিটোল রূপের ভিতর দিয়েই একধরণের অরূপকে, সুদূরতাকে ধরার চ্যালেঞ্জ তাঁর উপর যেন ন্যস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। নন্দলাল এঁকে দেন কাঁধে বাঁক নিয়ে চলা দুজন নরনারীর ছবি, যাদের সামনে অনেকটা ছড়ানো স্পেস, যেন অনেকটা রাস্তা চলা এখনও বাকি। ছবির ক্যানভাসের একেবারে বাঁদিক চেপে আঁকা হয় 'ফিগার'দুটি, বাকি ছবির মধ্য ও ডানদিক-জোড়া সাদা ক্যানভাস বাঁদিকের সঙ্গে এক বিচিত্র ভারসাম্য রক্ষা করে চলে ! এই টানাপোড়েনের মধ্যেই ফুটে ওঠে কবির আকাঙ্ক্ষিত সুদূরতার মূর্তি। (দ্রষ্টব্য : চিত্র-২০) এইভাবে বাংলা কবিতার ইলাস্ট্রেশনের যথার্থ সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথ-নন্দলালের যুগলবন্দীতে।

কিন্তু বইতে ছবিগুলো দেখে ভালো লাগেনি রবীন্দ্রনাথের। নন্দলালের আঁকা সাতটি ছবি ছাড়াও ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি ফোটোগ্রাফের প্রিন্ট। এই মোট আটটি ছবি খুশি করতে পারল না কবিকে। চারুচন্দ্রকে সে কথা স্পষ্ট করেই জানালেন তিনি, 'কিন্তু ছবি ভালো হয় নি সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জন্যই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম কারণ এগুলি আমার রচনা নয়। নন্দলালের পটে যেরকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না'। এমনকী নিজের ফোটোগ্রাফটি নিয়েও বেশখানিক কড়া করে লিখলেন, 'এখনো যদি বাঁধা না হয়ে থাকে এই ছবি বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্তত আমাকে যে আরো ৯খানা বই দেবে তাতে আমার ছবি দিও না।'[২৩]

আগেই বলা হয়েছে, বইটি ছাপা হয়েছিল এলাহাবাদ প্রেসে। কিন্তু ছবিগুলি কোথায় ছাপা? অন্তত চারটে ছবির ব্লকে স্পষ্টই দেখা যায় খোদাই করা আছে "SEYNE", এর থেকে বোঝা যায় কলকাতার 'Seyne & Bros." (৬৭, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট ছিল এঁদের ঠিকানা) থেকে হাফটোন ব্লকগুলো করা হয়েছে। হয়তো ছবি ছাপানোও

হয়েছে এখান থেকেই। আমরা খুব গর্ব করেই বলতে পারি, স্বদেশীয় কুন্তলীন প্রেস বা বিশেষত ইউ রায় এন্ড সন্স সেকালে অনেক বিদেশী ছাপাখানার থেকে ভালো হাফটোন ব্লক তৈরি করতে জানত। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রকাশনা যখন তৈরি হবে (‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’) তখন তিনি অন্তত দেশী মুদ্রণ-প্রযুক্তির উপরেই নির্ভর করতে চাইবেন, সে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব।

রবীন্দ্রনাথের মতকে মান্যতা দিয়ে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ওঁর নিজের ফোটোগ্রাফটিকে বদলে দেয়। ২ কার্তিক[১৯ অক্টোবর] চারুচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ জানান, “ছবির নূতন প্রুফ আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেছেন।”

বই ব্যাপারটাকে একটা সামগ্রিক ‘প্রোডাকশান’ হিসেবে দেখতে চাইতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ বারবার তার অলংকরণ, বিজ্ঞাপন ও বিপনন নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন। *চয়নিকা*র অলংকরণে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ভূমিকার কথা আমরা দেখলাম। এর বিজ্ঞাপনের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ কীভাবে নজর রাখছিলেন, সেটা খেয়াল করবার মতো। বই প্রকাশের আগে বইয়ের বিজ্ঞাপন বের করা যে কোনো মতে যুক্তিসম্মত না, সে পরামর্শ চারুচন্দ্রকে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, “শৈলেশ বলছিল তোমাদের বিজ্ঞাপন পড়ে অনেকে বই কিনতে এসে ফিরে যাচ্ছে – সেটা ক্ষতিজনক। শুনছি তোমরা মণিলালের কাছে, বিতরণের জন্য, কতকগুলি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছ – কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞাপন বিলি করা আমি শ্রেয় বোধ করি নে।”[২৪]

চিত্রশোভিত মোট ৪৯২ পৃষ্ঠার *চয়নিকা*-র দাম করা হয়েছিল ৪টাকা। সেকালের পক্ষে এ দাম যথেষ্ট বেশি। রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করেছিলেন, এই দামে বই কেনার ক্রেতা কম। ২৬শে আশ্বিন [১২ অক্টোবর] একটি চিঠিতে তাই চারুচন্দ্রের প্রতি নির্দেশ যাচ্ছে সুলভ সংস্করণ বের করবার, “একটা শস্তা দামের চয়নিকা ছাপিয়ে যদি কেবল ১০০ খণ্ড বেশি দামের বই স্বতন্ত্র রাখ্‌তে তাহলে পাঠকদেরও উপকার হত, ব্যবসায়ীরও লাভ হত।... আমি যদি পাঠক হতুম তবে চার টাকা দিয়ে চয়নিকা কিনতুম না।”[২৫] রবীন্দ্রনাথের এই আবদারও মেনে নেয় ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কয়েকমাসের মধ্যেই ২টাকা দামের একটি ‘সাধারণ সংস্করণ’ *চয়নিকা* প্রকাশ করা হয়।

গান বইটি ঠিক কবে প্রকাশিত হয় জানা যায় না, কেননা *চয়নিকার* মতো এটিও এলাহাবাদে ছাপা বলে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে এর উল্লেখ নেই। তবে ৩০ আশ্বিন ১৩১৬ [১৬ অক্টোবর ১৯০৯]-এ রচিত 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ' গানটি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে অনুমান করে নেওয়া যায় অক্টোবরের শেষে বইটি প্রকাশ হয়ে থাকবে। মাত্র একবছর আগে (২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮) যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকে বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম গীতিসংকলন-গ্রন্থ *গান*। এই একবছরে তার ১০০০কপি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া, এবং পুনরায় একটি গানের সংকলন প্রকাশের উদ্‌যোগ গ্রহণ করা নিশ্চয়ই সেকালেও রবীন্দ্রনাথের গানের জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ।

কিন্তু, যেকোনো কারণেই হোক, এই বইটিতে রয়ে যায় অনভিপ্রেত কিছু ছাপার ভুল। কী ধরণের ভুল তা বলা কঠিন, কেননা রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারেও এর কোনো কপি নেই। কিন্তু ভুলের প্রসঙ্গটি প্রথমে চারুচন্দ্রকে না-জানিয়ে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখে জানালে চারুচন্দ্র ব্যথিত হন। মণিলালকে লেখা চিঠিটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু ব্যথিত চারুচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এরপর যে চমৎকার চিঠিটি লেখেন সেটি থেকে পুরো প্রসঙ্গটা অনুমান করে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> তোমাকেই লেখা আমার কর্ত্তব্য ছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই – তুমি মনে যে বেদনা পেয়েছ বিধাতা সেইটেকেই আমার সকলের চেয়ে গুরুদণ্ডস্বরূপ বিধান করেচেন – আমি অত্যন্ত অনুতাপ ভোগ করচি তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।
>
> গানের বই যদি সংশোধন করা সম্ভব হয় তাহলে ভালই হয় – এ জন্যে যতগুলি পারি নূতন গান তোমাকে পাঠানো যাবে।...
>
> নিজের বই সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বভাবতই অধীর ও অসহিষ্ণু – প্রকাশক হয়ে আজও যদি সেটা সহ্য করার শক্তি তোমার না হয়ে থাকে তাহলে তোমার কি দশা হবে আমি তাই ভাবছি। চিত্তকে পর্বতের মত কঠিন করতে না পারলে গ্রন্থকার সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাতে তুমি টিঁকতে পারবে না।...
>
> যদি মণিলালকে ছাপতে দেওয়ায় কোনো সুবিধা থাকে তাহলেই দিয়ো নতুবা যদি বিরক্ত হয়ে দাও তাহলে আমার প্রতি নির্দ্দয়তা করা হবে— কখনো তা কোরো না।[২৫]

রবীন্দ্রনাথের আপত্তি মেনে এক্ষেত্রেও বইটি 'সংশোধন' করা হয়। সেই সংশোধিত সংস্করণটি প্রথম সংস্করণ হিসেবেই প্রকাশ পায়। এই সংস্করণটি আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছে। স্পষ্টই নতুন পাতা জুড়ে দেবার কিছু চিহ্ন এই বইটিতে দেখা যায়। এর মধ্যে লেখা অতিরিক্ত ১৫টি গান এই 'সংস্করণে' যুক্ত হয়, বইয়ের একেবারে শেষে 'নূতন গান' শিরোনামে। অবশ্য, এটাও মণিলালের কান্তিক প্রেসে ছাপা হবে না, এলাহাবাদ থেকেই ছাপা হয়ে আসবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হল, এই সংশোধিত সংস্করণটিতেও রয়ে গেছে বিচিত্র ভুলের সমাহার! তার কয়েকটি এইরকম :

এক। নিম্নলিখিত ১৬টি গান বইতে দুবার করে আছে !

আমার পরাণ যাহা চায় : পৃষ্ঠা ২৮ এবং পৃষ্ঠা ১৭৬

আর কেন, আর কেন : পৃষ্ঠা ৫৬ এবং পৃষ্ঠা ৭৭

আহা, আজি এ বসন্তে : পৃষ্ঠা ৫৫ এবং পৃষ্ঠা ৭৭

এস এস বসন্ত ধরাতলে : পৃষ্ঠা ৫২ এবং পৃষ্ঠা ৭৮

ওহে জীবন-বল্লভ : পৃষ্ঠা ২৭২ এবং পৃষ্ঠা ৩১৪

কে রে ওই ডাকিছে : পৃষ্ঠা ২৬০ এবং পৃষ্ঠা ৩৭৬

ঘোর রজনী এ : পৃষ্ঠা ১০২ এবং পৃষ্ঠা ৩৮৫

জীবনে আজ কি প্রথম এল : পৃষ্ঠা ২৬ এবং পৃষ্ঠা ৭০

তোমারে জানিনে হে : পৃষ্ঠা ২৮৯ এবং পৃষ্ঠা ৩৬৮

দুখের মিলন টুটিবার নয় : পৃষ্ঠা ৫৭ এবং পৃষ্ঠা ২১৩

প্রেম পাশে ধরা পড়েছে : পৃষ্ঠা ৩৯ এবং পৃষ্ঠা ৪১

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে : পৃষ্ঠা ৩১ এবং পৃষ্ঠা ৩৩

বাজাও তুমি কবি : পৃষ্ঠা ৩৪১ এবং পৃষ্ঠা ৩৬২

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে : পৃষ্ঠা ৫০ এবং পৃষ্ঠা ২১৪

মহাবিশ্বে মহাকাশে : পৃষ্ঠা ২৯৯ এবং পৃষ্ঠা ৩২৫

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই : পৃষ্ঠা ৩০০ এবং পৃষ্ঠা ৩২৬

দুই । নিম্নলিখিত পাঁচটি গানের সূচিপত্রে উল্লেখ আছে কিন্তু বইতে নেই। প্রসঙ্গত, পাঁচটি গানই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। ভুলক্রমে বইতে ছাপা হয়ে থাকবে। সংশোধনের সময় বই থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাড়াহুড়োয় সুচিপত্রে গানগুলি রয়ে গেছে !

ভব-ভয়-হর প্রভু তুমি তারণ-গুরু : সূচিপত্রে উল্লিখিত পৃষ্ঠা ৩৬৬

প্রভু দয়াময় কোথা হে দেখা দাও : সূচিপত্রে উল্লিখিত পৃষ্ঠা ৩৭৮

তোমা বিনা কে আর করে উদ্ধার : সূচিপত্রে উল্লিখিত পৃষ্ঠা ৩৬৬

তুমি আদি অনাদি অনন্ত অবিনাশী : সূচিপত্রে উল্লিখিত পৃষ্ঠা ৩৬৬

জীবন বৃথায় চলে গেল রে : সূচিপত্রে উল্লিখিত পৃষ্ঠা ৩৬৬

কত দিন, গতিহীন, অতি দীন ভাবে : সূচিপত্রে উল্লিখিত পৃষ্ঠা ৩৬৭

এই ধরণের ভুল দেখার পর বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের জন্য, কেন আমাদের প্রয়োজন হবে একজন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বা পুলিনবিহারী সেনের। রবীন্দ্রনাথের বিপুল ও বৈচিত্র্যময় রচনাকে যথাযথভাবে গ্রন্থবদ্ধ করতে হলে ভালো ছাপাখানার থেকেও কেন জরুরি একজন যোগ্য সম্পাদকের, সেকথা এইসমস্ত সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে আরও ভালো করে টের পাওয়া যায়।

তিন। সেইসঙ্গে এই 'সংশোধিত' সংস্করণে রয়ে গেছে অজস্র ছোটখাট ছাপারও ভুল। 'চয়নিকা'র ওইরকম অসামান্য নির্মাণের পর এই ছোট ভুলগুলোকে বেশ বিস্ময়কর লাগে। 'সংশোধিত' সংস্করণটির ভূমিকায় প্রকাশকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, "তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিতে গিয়া বহু ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি অনিবার্য্য হইয়াছে"। কিন্তু তাহলে 'সংশোধন' করার কী তাৎপর্য রইল, তা বোধগম্য হওয়া মুশকিল। কী ধরণের ভুল তার গোটা চারেক উদাহরণ আমরা দেখে নিতে পারি।

পৃষ্ঠা ২৭০ : 'এখনো আঁধার রয়েছে ষে নাথ' [হবে 'যে']

পৃষ্ঠা ১৯১ : ‘তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে’ [হবে, ‘নিমেষের’]

পৃষ্ঠা ১০৮ : ‘প্রতিদিন দেখত যারে আরত তারে দেখতে না পায়’ [‘আর’ এবং ‘ত’-র মধ্যিখানে একটি ‘স্পেস’ বাঞ্ছনীয়।]

পৃষ্ঠা ৯৫ : ‘রিক্ত যারা সর্ব্বহারা/ সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা,/ গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর/ নয়কো তারা ক্রীতদাস?’ [পঙ্‌ক্তির শেষে ?-চিহ্নটি হবে না]

‘সংশোধিত’ সংস্করণেও এত বিচিত্র ধরণের ভুলের সমাবেশ দেখে রবীন্দ্রনাথের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায় না। তবে এরপর বছর-দুয়েক রবীন্দ্রনাথের কোনো বই আর এলাহাবাদ থেকে ছাপা হবে না। এই দু বছরে যাবতীয় প্রথম সংস্করণ ছাপা হবে ‘কান্তিক প্রেস’ থেকেই। অবশ্য পুরনো বইয়ের অন্য সংস্করণগুলি ছাপা হত কলকাতারই বিভিন্ন প্রেস থেকে, একা ‘কান্তিক প্রেস-এর পক্ষে এত দায়িত্ব নেওয়া স্বভাবতই অসম্ভব ছিল।

এইখানে আরও একটা কথা বলে নেওয়া যায়। আমরা বলছিলাম কেন ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের মুদ্রণগত মুন্সীয়ানা ও সুরুচি সত্ত্বেও রবীন্দ্রগ্রন্থ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের জন্যে। আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গেও সেই কথাটা বুঝে নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প পাঠকের সামনে হাজির করবার দায় থেকে ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁরা প্রকাশ করতে শুরু করেন খণ্ডে খণ্ডে ‘গল্পগুচ্ছ’। মোট পাঁচটি খণ্ড-এর এই সিরিজ। খুবই শোভন এই প্রকাশনা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বইগুলিও সম্পাদনার বিচিত্র খামখেয়ালে পরিপূর্ণ !

এই *গল্পগুচ্ছ*-এর পাঁচ খণ্ডে সবসুদ্ধ ৫৭ টি (১৩+১৮+৯+১৩+৪) গল্প ছাপা হল। অথচ ১৯০৮ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ লিখিত মোট গল্পের সংখ্যা ৬৮। বাকি যে ১১টি গল্প ছাপা হল না সেগুলি হল : ‘ভিখারিণী’(১২৮৪ব), ‘ঘাটের কথা’(১২৯১ব), ‘রাজপথের কথা’ (১২৯১ব), ‘গিন্নি’(১২৯৮ব), ‘রীতিমত নভেল’(১২৯৯ব), ‘অসম্ভব কথা’(১৩০০ব), ‘একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প’(১৩০০ব), ‘ইচ্ছাপূরণ’ (১৩০২ব), ‘পুত্রযজ্ঞ’ (১৩০৫ব), ‘দর্পহরণ’(১৩০৯ব) ও ‘মাল্যদান’(১৩০৯ব)।

কোন যুক্তিতে এই গল্পগুলো বাদ পড়ল তা বুঝে ওঠা খুবই মুশকিল। এর জন্যে প্রকাশক বা লেখকের পক্ষ থেকে কোনোরকম টীকা বা মন্তব্যও পাওয়া যায় না বইতে। অন্যদিকে ছাপা হল যে ৫৭টি গল্প তারও সজ্জারীতির কোনো পারম্পর্য নেই। উদাহরণ হিসেবে আমরা প্রথম খণ্ডটির সূচিপত্রে উল্লিখিত গল্পগুলি অবিকল-বানানে উদ্ধৃত করছি, সঙ্গে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল গল্পগুলির পত্রিকার প্রকাশকাল:

জীবিত না মৃত [সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯], শুভদৃষ্টি [প্রদীপ, আশ্বিন ১৩০৭], সমস্যা-পূরণ [সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০০], যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ [সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না], প্রায়শ্চিত্ত [সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১], শুভা [সাধনা, মাঘ ১২৯৯], বিচারক [সাধনা, পৌষ ১৩০১], একটি আষাঢ়ে গল্প [সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯], মধ্যবর্ত্তিনী [সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০], উলুখড়ের বিপদ [সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না], ক্ষুধিত পাষাণ [সাধনা, শ্রাবণ ১৩০২], মেঘ ও রৌদ্র [সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১], ফেল্ [ভারতী, আশ্বিন ১৩০৭]

এই সূচিপত্র নানা কারণে বিস্ময়কর ! সুচিপত্রে আছে ‘জীবিত না মৃত’, যদিও ভিতরে ঠিক নামটাই আছে, ‘জীবিত ও মৃত’। সুচিপত্রে দেখা যাচ্ছে ‘শুভা’, যদিও ভিতরে সর্বত্র ‘সুভা’। ‘একটা আষাঢ়ে গল্প’ সুচিপত্রে হয়ে আছে ‘একটি আষাঢ়ে গল্প’। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এই গল্পগুলো প্রথম খণ্ডে একত্রে জায়গা পাওয়ার পিছনে কোনো সুদূরতম যুক্তিও খুঁজে বের করা সম্ভব না। বাকি ৪টি খণ্ডরও একইরকম অবস্থা।

কে সাজিয়েছেন গল্পগুলোকে, এইভাবে? কিংবা, ১১টি গল্প যে বাদ যাচ্ছে, সেটা কখন কীভাবে ঠিক হল? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো তথ্য আজ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু মনে হয়, সম্পাদনার কোন ন্যূনতম রীতিই আসলে বাংলা প্রকাশনা জগতে তখন ছিল না। ভালো প্রকাশনা বলতে বোঝা হত ভালো ছাপা, ভালো কাগজ, এইটুকুই মাত্র। ফলে রবীন্দ্রনাথের বিপুল লেখনীকে ধারণ করার উপযুক্ত প্রকাশনাই আসলে তৈরি হয়ে ওঠেনি বাংলায়, আর তারই জন্য প্রয়োজন পড়বে বিশ্বভারতী প্রকাশনার। কেন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় শুধু রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশে নয়, সামগ্রিক বাংলা প্রকাশনার জগতে হয়ে থাকবে দিক্‌নির্ণায়ক, তা এইসব উদাহরণ মনে রাখলে বোঝা যায়।

চারুচন্দ্র ‘ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস’-এর দায়িত্বে থাকাকালীন সেখান থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ বই *গোরা* (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০)। এরপর ‘প্রবাসী’র সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে ‘ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস’-এর চাকরি ছেড়ে দেন চারুচন্দ্র। অবশ্য এই প্রকাশনার সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, এমন নয়। ১৯০৯ থেকে ১৯১২, এই চার বছরে চারুচন্দ্র রচিত অন্তত ৯টি বই ছাপা হয়েছে এই ইন্ডিয়ান প্রেস বা ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে। ফলে, রবীন্দ্রনাথ এরপরও তাঁর নিজের বই ছাপার জন্যে চারুচন্দ্রকেই নানান নির্দেশ পাঠাচ্ছেন, সে উদাহরণও আমরা পরে দেখব।

চারুচন্দ্র-র চলে যাবার পর ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-এর কর্মাধ্যক্ষ্যের দায়িত্ব পান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। অবশ্য একমাত্র *ডাকঘর* (জানুয়ারি ১৯১২) বাদ দিয়ে আর কোনো বইয়ের প্রকাশক হিসেবে আমরা মণিলালের নাম পাব না, চারুচন্দ্র-র পর সতীশচন্দ্র মিত্র আর প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত-র নামই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রকাশক হিসেবে মুদ্রিত হবে। যদিও, প্রকাশনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের মূল মাধ্যম যে হয়ে উঠবেন মণিলালই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গ. *গীতাঞ্জলি* ও পরবর্তী টানাপোড়েন

চারুচন্দ্র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার পর ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বইটির নাম *গীতাঞ্জলি*। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী এর প্রকাশকাল ৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০ (২০ ভাদ্র ১৩১৭ব)। বইতে শিরোনামযুক্ত মোট ১৫৭টি কবিতা। প্রতিটি কবিতা নতুন পাতায়। কবিতাশেষে রচনাকাল মুদ্রিত। এবং, বই-এর উন্মুক্ত তিনটি ধার সোনার জলে ছোপানো ! এই বই-এর ক্ষেত্রে এই অলংকারটি বাহুল্য হয়েছে কি না সে প্রশ্ন অবশ্য তোলাই যায়।

গীতাঞ্জলি প্রকাশের অল্প আগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য অনুরোধ করেন : ‘নিম্নলিখিত গানটি এইবারকার প্রবাসীর প্রান্তে স্থান পাবে কি? গীতাঞ্জলিতে এ গান অত্যন্ত অশুদ্ধ আকারে বেরিয়েছে – গীতাঞ্জলি এখনো প্রকাশ হয় নি – অর্থাৎ আশ্বিনের পূর্ব্বে মণিলাল তাকে বাজারে

দেবে না। বিশুদ্ধ পাঠটিকে কোথাও রক্ষা করবার জন্যেই আমার এই ব্যাকুলতা।'[২৬] এরপর 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' গানটি পুরোটা তিনি উদ্ধৃত করেন।

এটা ঘটনা যে, *গীতাঞ্জলি*-তে এই গানের প্রথম দুটি স্তবকে দুটি শব্দ খুবই বিপর্যস্ত হয়ে ছাপা হয়েছিল। সেই ভুল-শব্দ সহ ওই দুটি স্তবক ছিল এইরকম :

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানিহে জানি তাও
হয়নি সারা। [হারা]
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারাল ধরা [ধারা]
জানিহে জানি তাও
হয়নি হারা।

'প্রবাসী'-র আশ্বিন সংখ্যায় 'গান' শিরোনামে শুদ্ধ পাঠটি প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর বই এলাহাবাদে ছাপা না-হয়ে যেন কান্তিক প্রেসেই ছাপা হয়, তাতে যোগাযোগের সমস্যা মেটে। কিন্তু তারপরেও এরকম ভুল থেকে যাওয়ার কারণ বোঝা কঠিন। বিশেষত যেখানে বই প্রকাশ হবার আগেই সে ভুল ধরা পড়ছে, তখন তা সংশোধন করে নেওয়া হচ্ছে না কেন, সেটা আরও বিস্ময়কর। এসব খবর কি এলাহাবাদে চিন্তামণি ঘোষের কাছে পৌঁছোচ্ছিল ?

এইসব কারণে এবং কিছু টাকাপায়সার লেনদেন সংক্রান্ত ভুল বোঝাবুঝির কারণে রবীন্দ্রনাথ এই সময়টায় ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের উপর যে অনেকটা আস্থা হারাচ্ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। আমরা আগেই দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথকে শতকরা ২৫টাকা হারে উপস্বত্ব দিতে ইন্ডিয়ান প্রেস চুক্তিবদ্ধ হয় এবং এই হিসেব প্রতি ছ'মাস অন্তর দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কত টাকা পেতেন রবীন্দ্রনাথ ? **১৯১১**-র সেপ্টেম্বর মাসে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি তারিখহীন চিঠি থেকে সে বিষয়ে খানিকটা অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন

সেখানে, 'এবারে তোমাদের কাছ থেকে ঊনসত্তর টাকা পেয়েছি। ৬০ থেকে ৮০ পর্যন্ত ওঠে নামে। একবার কেবল ১০০টাকা পেয়েছিলাম।'[২৭] নিতান্ত 'স্টেটমেন্ট' হিসেবে নয়, এই বাক্যটি মণিলালকে লিখে জানানোর মধ্যে দিয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের খানিকটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগই ফুটে ওঠে। কোনো কারণে তাঁর এই ধারণা হচ্ছিল যে তাঁর যা প্রাপ্য তা পাচ্ছেন না তিনি। এই ধারণা হবার কারণ কী তা বলার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্তু বছরখানেক পরে ইংলন্ড থেকে লেখা একটা চিঠিতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে স্পষ্ট করেই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর অসন্তোষ জানাবেন :

> ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস আমাদের কাছ হইতে বারো আনা লাভ লইয়া থাকেন কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রায় দেন না বলিলেই হয়। তাহার পরে কবিতাগুলোর এক সংস্করণ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাহার লাভ তাঁহাদেরই – কিন্তু সেই সংস্করণ আজ পর্যন্ত তাঁহারা ছাপা শেষ করিলেন না। কবিতাগুলো সম্বন্ধে চিন্তামণিবাবুর সঙ্গে আমার শেষ কথাটা কি তাহা আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করিয়া জানিই না। যে লেখাপড়া হইয়াছিল সেটা শুনিতে পাই আপোসে বাতিল হইয়াছে কিন্তু তাহার পরে কথাটা যে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। চারুকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং এ সম্বন্ধে চিন্তামণিবাবুর কাছ হইতে পত্রযোগে যদি কোন কথা চূড়ান্ত করিয়া লইতে পারেন চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।[২৮]

যে 'লেখাপড়া' হয়েছিল সেটা তিনি 'শুনেছেন' আপোসে বাতিল হয়ে গেছে, এই বাক্যটা বেশ রহস্যময়। রবীন্দ্রনাথকে না-জানিয়ে কার সঙ্গে আপোস করে চুক্তিটি বাতিল হতে পারে তা ভেবে পাওয়া যায় না। মনে হয় এ রবীন্দ্রনাথের খেয়ালী অনুমান-মাত্র। তবে এইসমস্ত সন্দেহ ও অনুমানের কারণেই তিনি এইসময়ে কয়েকটি বই অন্য প্রকাশককে দিয়ে ছাপার কথাও ভাববেন। (বস্তুত ১৯১২ সালে প্রকাশিত মোট ৬টি বইয়ের মধ্যে ৪টি বই ইন্ডিয়ান পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হবে না। এই চারটি বই হল *গল্প চারিটি, জীবন-স্মৃতি, ছিন্নপত্র* ও *অচলায়তন*)। বিশেষত ১৯১২ সালে ইংলন্ডে যাবার পাথেয় জোগাড় করার জন্যে নতুন-লেখা বইয়ের স্বত্ব আলাদা করে কিছু প্রকাশককে বিক্রি করে তাঁকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে দেখা যায়। ১৯১১-র আগস্টের শেষে ঢাকার প্রকাশনা অতুল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী অতুলচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৮ কার্তিক (১৯১১-র ২৫ অক্টোবর) অতুলচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে লোভনীয় এক প্রস্তাব-সহ একটি চিঠি পাঠান :

শুনিতে পাইলাম আপনি আরও চারিমাস কাল দেশে আছেন। তৎপর বিলাত যাইবার কথা। আপনি যদি কপিরাইট বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। তাহা এই, — আমি নিজ ব্যয়ে এবং নিজের দায়িত্বে আপনার "জীবনস্মৃতি"খানি অতি অল্পকাল মধ্যে মুদ্রিত করিতে চাহি। অর্থাৎ যদি আপনি ইহাতে সম্মত হয়েন তবে Manuscript পাইবার তিনসপ্তাহের মধ্যে আমি অন্ততঃ ২০ ফর্ম্মা মুদ্রিত করিয়া বাহির করিতে পারিব। সমগ্র পুস্তক যদি ইহার কিছু বেশিও হয়, তাহাও এই সময়ে পারিব।... আমি মুদ্রিত পুস্তক সমস্ত আপনার নিকট অর্পণ করিব। আপনি বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে খরচ দিবেন এবং লভ্যাংশ হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবেন আমি তাহাই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিব।... আপনার বাকি নূতন পুস্তকের বিষয়েও সেই কথা।[২৯] (নিম্নরেখ পত্রলেখকের দেওয়া)

এরকম অত্যাশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে কোনো প্রকাশক আগে-পরে কখনই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসেন নি। খরচ করবেন প্রকাশক, প্রকাশিত সব বই তুলে দেবেন লেখকের হাতে, তারপর লেখক 'ইচ্ছাপুর্ব্বক' প্রকাশককে যা লভ্যাংশ দেবেন তাই তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, ঠিক এই প্রস্তাব নিয়েই যে অতুলচন্দ্র একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সেই ১৯১১তেই (নোবেল পুরস্কার লাভের আগেই) রবীন্দ্রনাথকে 'নিজেদের' লেখক হিসেবে পেতে বাংলার প্রকাশকেরা প্রায় যে-কোনো অবাস্তব মূল্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে শুরু করেন। শুধু *জীবন-স্মৃতি* না, অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশের ভারও অতুলচন্দ্রের প্রকাশনাকে দেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

এইসময় মণিলালকে লেখা তারিখহীন তিনটি চিঠি থেকে এই ভাবনাচিন্তার অগ্রগতির কিছু খবর পাওয়া যায়। চিঠিগুলি ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। তিনটি চিঠিই তারিখহীন।

পত্র নং ১ :

ঢাকার অতুল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ এখানে এসেছিলেন তাঁকে এই গল্পটার ['রাসমণির ছেলে'] কপিরাইট বিক্রি করে ৫০০টাকা পেতে পারি। সেটা এবং অচলায়তনের কপিরাইট বিক্রি করে আমি বহুদূরে কোথাও গিয়ে আয়ুর প্রদীপকে আর একবার উস্কিয়ে নিতে পারি তার উপায় করব।

পত্র নং ৭ :

তাহলে অতুল লাইব্রেরিকে আজই লিখে দিচ্ছি। আমার জীবনস্মৃতিটাও তাদের হাতে দিতে হবে নইলে যথেষ্ট টাকা পাব না – ওটা বোধ হয় কিছু পরিমাণে দামী বলে গণ্য হতে পারে।

পত্র নং ৮ :

আমি ত সেই প্রকাশককে লিখে দিয়েছি। সে ঢাকা থেকে এখানে ছুটে আসবার ব্যবস্থা করচে। আমি ২৫০০ টাকা চাইব। আর যদি ওর সঙ্গে "ছিন্নপত্র" (আমার চিঠি) জুড়ে দিই তাহলে ৩০০০টাকা। এর কমে আমার ভ্রমণ হবেই না।

আমরা আজ জানি, অতুল লাইব্রেরি থেকে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোনো বই-ই প্রকাশিত হয় নি। কেন হল না, তা আজ বলা অসম্ভব কেননা অতুলচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের আর কোনো চিঠি রক্ষিত হয় নি। তবে মনে হয়, উপরে উদ্ধৃত শেষ চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ যে টাকাপয়সা সংক্রান্ত প্রাক্-শর্ত জুড়ে দেবার কথা ভাবছেন সেই বিষয়ে অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী রাজি হতে পারেন নি। একটি বই প্রকাশের অধিকার লাভের জন্যে ২৫০০ টাকা দেওয়া সেকালের অনেক প্রকাশকের পক্ষেই অসম্ভব ছিল। মনে রাখতে হবে, অতুলচন্দ্রের প্রস্তাবক চিঠিটিতে অগ্রিম কোনো অর্থ দেওয়ার কথা ছিল না, অগ্রিম বই ছেপে বইগুলি রবীন্দ্রনাথকে হস্তান্তরিত করার কথা ছিল। ১৯১১-র ৮ নভেম্বর কবি মণিলালকে যে চিঠি লিখবেন সেখান থেকে বোঝা যায়, অতুল লাইব্রেরির সঙ্গে কথাবার্তার পর ততদিনে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন সেই চিঠিতে :

ভয় নেই মণিলাল — হঠাৎ ঢাকা অঞ্চলেই আমার উদয়াচল ফেঁদে বসব না। কথা হচ্চে নগেন ও রথী জীবনস্মৃতি ও চিঠিগুলো বের করবে। নগেনের idea আছে ও খুব পুশ করতে জানে — সেটা যত শীঘ্র সম্ভব অপ্রমাণ হয়ে যাওয়াই ভাল — নইলে এ ধারণা ওর ঘুচবে না যে, যে রকমটি হওয়া উচিত জগতে তা হচ্চে না...।[৩০]

'ভয় নেই মণিলাল' এই বাক্যাংশ থেকে মনে হয় ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হয়তো আশঙ্কা করছিল যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বই প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বত্ব অন্য কোনো প্রকাশককে দিয়ে দেবার কথাটি বিবেচনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত করছেন এখানে যে, এতটা ভাবনা তাঁর নেই। এমনকী নগেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথকে যে *জীবন-স্মৃতি* ছাপার ভার দিচ্ছেন, সেই বাবদে কিছু অনাবশ্যক 'কৈফিয়ৎ'-এর সুরও চিঠিতে শোনা যায়। কিন্তু এটাও ঠিক, উপরের চিঠিগুলোয় যেকটি বই-এর উল্লেখ আছে তার কোনোটিই ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসকেও

ছাপার জন্যে দিয়ে দেন নি রবীন্দ্রনাথ। *জীবন-স্মৃতি* আর *ছিন্নপত্র* ছাপা হয় কবির জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৯-১৯৫৪) উদ্যোগে, প্রকাশক হিসেবেও তাঁরই নাম থাকবে বইদুটোয়। মুদ্রিত হবে রণগোপাল চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে। *অচলায়তন*-এর প্রকাশক ও মুদ্রাকর উভয় দায়িত্বেই থাকবেন রণগোপাল। আর *গল্প চারিটি*-র প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসমাজেরই জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়(১৮৮৫-১৯৫৬), এবং মুদ্রাকর রণগোপাল তথা আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস। অর্থাৎ, এ কার্যত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে নিজের উদ্যোগে বই প্রকাশের অনুরূপ। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় নিজের দায়িত্বে বই প্রকাশের এইসব ঘটনা প্রকাশকের উপর লেখকের অনাস্থাকে স্পষ্ট করে তোলে।

এত জল্পনার অবশ্য দরকার ছিল না, এই সময়কালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের উপর রবীন্দ্রনাথের অনাস্থার একটা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতের কাছেই আছে। সেইটা এবার বলা যাক। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৫ ভাদ্র (১৯১২-র ১০সেপ্টেম্বর) লন্ডন থেকে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে খুব স্পষ্ট করেই রবীন্দ্রনাথ লিখবেন এই কথাগুলো:

> এখন থেকে আমি ত আর ইন্ডিয়ান পাব্লিশিং হৌসকে আমার বই দিতে চাইনে। তোমরা যদি ওর ভার নিতে পার সে ত ভালই। ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানাকে বেশ বড় করে তুল্‌তে পারলে যে লাভজনক হতে পারবে আমার তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় ছাপাখানার সঙ্গে Type foundry এবং book binding যদি যুক্ত করতে পার তাহলে ভাল হয়। আমাদের দেশে ছাপার অক্ষরের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে লেশমাত্র চেষ্টা দেখি নে। আমার ইচ্ছা এই সম্বন্ধে কেউ এখান থেকে ভাল করে শিখে গিয়ে যদি ওখানে কাজে লাগে তাহলে উপকার হতে পারে। এ দেশে এ বিষয়ে খুব ভাল ইস্কুল আছে।[৩১] (নিম্নরেখ আমাদের)

মনে রাখতে হবে এবার ইংলন্ডে যাবার আগে নগেন্দ্রনাথকেই জমিদারি ও সংসারের মুল ভার দিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টিরা নগেন্দ্রনাথকেই সমাজের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য, এতে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ছিল। ফলে নগেন্দ্রনাথকে তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ প্রেসকে নতুন করে গড়ে তোলার পরামর্শ দিচ্ছেন, সেটা নিতান্ত কথার-কথা মনে করার কোনো

কারণ নেই। শুধু ছাপাখানা নয়, রবীন্দ্রনাথের মনে একটা পূর্ণাঙ্গ ও নিজস্ব প্রকাশনার স্বপ্ন এইসময় থেকেই রূপ নিতে শুরু করে। যার পরিণতি পরবর্তীকালের বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

'ইন্ডিয়ান পাব্লিশিং হৌসকে আমার বই দিতে চাইনে', বলেও যে সেই সিদ্ধান্ত তখনই কার্যকর করা গেল না, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের মতো নিজস্ব প্রকাশনা গড়ে উঠতে যে লেগে গেল আরও প্রায় ১১ বছর, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে ১৯১৩র নোবেল পুরস্কার তাঁকে আক্ষরিক অর্থেই নিয়ে যাবে বিশ্বভুবনের পথে পথে, তাঁর সেই প্রবল ব্যস্ততায় এই প্রকল্পের স্বপ্নটিকে তিনি স্থগিত রাখতে বাধ্য হবেন। এটা যদি মুখ্য কারণ হয়, এর একটা ছোট কারণও আছে। যে চারটে বই বিলেতে যাবার আগে তিনি নিজ উদ্‌যোগে প্রকাশের ব্যবস্থা করে গেছিলেন, তার প্রতিটিরই বিপননগত ব্যর্থতা বিমর্ষ করে তুলেছিল রবীন্দ্রনাথকে।

সে কথা আমরা বলছি, কিন্তু তার আগে সংক্ষেপে জানানো প্রয়োজন যে, এই চারটি বইকে কীভাবে নিজস্ব দায়িত্বে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সুশোভন করে তৈরি করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই একনিষ্ঠ দায়িত্ব ও পরিশ্রমের কিছু ছবি আমরা তৎকালীন আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দু-একটি চিঠি থেকে সাজিয়ে তুলতে পারি। বিখ্যাত 'মেয়েলি ব্রত'(১৩০৩ব) বইটির লেখক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের(১৮৬১-১৯৩২) পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন, পরে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতও হন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কলকাতায় আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেসের দায়িত্ব নিতে ডেকে পাঠান। 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রকাশ ও মুদ্রণকার্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে তাঁকে একটি তারিখহীন চিঠিতে লিখছেন কবি, 'জীবনস্মৃতির কপি পাঠাই। ইহার মধ্যে কতক অংশ ছাপা গেলি – কতক অংশ হাতে লেখা। গেলির মধ্যে (চতুর্থ গেলিতে) যেখানে (ক)* দেওয়া আছে সেইখানে এটা বসিবে।'[৩২] ছাপাখানার খুঁটিনাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কত স্বচ্ছ, তা 'গেলি'-র মতো 'টেকনিক্যাল' শব্দ এভাবে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে খানিক বোঝা যায়। আর লক্ষণীয় এইটা যে, *জীবন-স্মৃতি*-র প্রুফ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই দেখছেন। বইটি প্রকাশিত হবে তিনি বিলেতে থাকাকালীন (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশকাল ২৫ জুলাই ১৯১২)। কিন্তু যাওয়ার আগে গ্রন্থনির্মাণ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের তদারকি করে যাচ্ছেন তিনি নিজে, অনেক ব্যস্ততার

মধ্যেও। বিলেতে গিয়েও সংশ্লিষ্ট নানাজনকে এই ছাপা বিষয়ে তাগাদা ও পরামর্শ দিতে দেখা যায় তাঁকে। জ্ঞানেন্দ্রনাথকে লেখা আর-একটি চিঠিতে এ বিষয়ে তাঁর অধীরতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> রথীরা জীবনস্মৃতিটা না কি একটু বিশেষ যত্ন করে খরচ করে ছাপ্‌চে সেই জন্যে ওতে কোনো ত্রুটি থাকলে সেটা অতিরিক্ত পরিমাণে আঘাত করে। নইলে শৈলেশের কল্যাণে এবং অন্যান্য প্রকাশকদেরও আশীর্ব্বাদে আমার গ্রন্থাবলী একেবারে আপাদমস্তক ভুলের শরশয্যায় শয়ান। তারপরে আমি থাকতেই যখন এই দশা তখন আমার অগোচরে কি হবে সেই কথা স্মরণ করলেই গ্রন্থকারের মন স্বভাবতই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই জন্যেই সমুদ্রের এপারে থাক্‌তে থাক্‌তেই বইগুলো ছাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে মনের মধ্যে খুব একটা তাড়া আছে – অথচ তোমাদের ছাপাখানায় সে তাড়াটা দেখ্‌তে পাইনে তাতেই শরীরের বায়ু প্রকুপিত হয় এবং পিত্তটাও উত্তাপ দিতে থাকে...'[৩৩]

উপরের উদ্ধৃতিতে 'শৈলেশ' মানে শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, 'মজুমদার লাইব্রেরি'র কর্ণধার। এতদিন পরেও, দেখা যাচ্ছে, 'মজুমদার লাইব্রেরি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা ঘোচেনি ! যাইহোক, *জীবন-স্মৃতি* ও অন্য তিনটি বই সম্পর্কে তাঁর এত উদ্‌যোগ সত্ত্বেও বইগুলো কি ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছিল সেকালে? সত্যের খাতিরে সেকথা বলা যাবে না। যেমন, *গল্প চারিটি* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২-র ১৮ মার্চ, তার প্রায় ৯ মাস পরে বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্র রায়কে লেখেন, '"গল্পচারিটি" এই বিদ্যালয় স্বহস্তে লইল অথচ তাহার বিক্রয়ের কোনো ব্যবস্থা হইল না ইহাতে বিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে মণিলাল আমাকে এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছে। বিক্রয়ের যে টাকা জমিয়াছে তাহাতে বোধ করি এখনো বই ছাপিবার দাম উঠে নাই। এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, অবশ্য এখনো publishing House-এর দ্বার খোলা আছে।'[৩৪] (নিম্নরেখ আমাদের)

অন্যদিকে, *জীবন-স্মৃতি* ও *ছিন্নপত্র* বইদুটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গভীরভাবে সংবেদনশীল। ১৯১২-র ২৫ জুলাই *জীবন-স্মৃতি* ও ২৮ জুলাই *ছিন্নপত্র* প্রকাশিত হয়। সেসময় রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ দুজনেই বিলেতে। *জীবন-স্মৃতি* বইটিতে অনেকগুলি ছবি যুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল। সম্ভবত পরিকল্পিত ছবিগুলি সব যুক্ত করার আগেই বইটি বাঁধিয়ে বিলেতে পাঠানো হয়। সেই 'অসমাপ্ত' বই পেয়ে রথীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে নগেন্দ্রনাথকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২-তে লেখা একটি চিঠিতে জানান :

"জীবনস্মৃতি"র যখন সব ছবি হয় নি তখন অতগুল কপি ভাল করে বাঁধিয়ে কেন পাঠালেন বুঝলুম না – ও কপিগুল ত সব নষ্ট হবে – কোনও কাজে লাগবে না।... "চিঠি"র চেয়ে "জীবনস্মৃতি" ভাল ছাপা হয়েছে – বড় typeএর জন্যে ভাল দেখাচ্ছে না? বাবা বললেন ভুলগুল এখনও সংশোধন হয় নি। গগনদাদার নাম সামনে থাকা উচিত না? বাবা বলছিলেন Rothenstein এর আঁকা ছবিটা সব পিছনে দিলে কেমন হয় – প্রথমে ছেলেবেলারটাই ভাল হবে।[৩৫]

এই চিঠিটি অবশ্য কিঞ্চিৎ সমস্যা তৈরি করে। উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের (১৮৭২-১৯৪৫)-এর কোনো ছবি *জীবন-স্মৃতি* বইতে নেই। এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, পরিকল্পনা-স্তরে তাঁর ছবিও দেওয়ার কথা ছিল। প্রকাশিত বইটিতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২৪টি ছবি ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি। এই চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় হল গগনেন্দ্রনাথের নাম সামনে (আখ্যাপত্রে?) দেওয়া হোক। সেই ইচ্ছা পালিত হয় নি। এক্ষেত্রেও, লেখক প্রকাশকের মধ্যে (তাঁরা নিকটাত্মীয় হলেও) অনেকটা যোগাযোগহীনতা কাজ করছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই চিঠি থেকে এটা বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ বিলেতে বসেও বইটি বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি চিঠি পাওয়া যায়, প্রথমটি রথীন্দ্রনাথের চিঠিটির কাছাকাছি সময়ে লেখা, ২ আশ্বিন ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১২) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি লিখছেন, 'জীবনস্মৃতিতে গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার হয়েছে। এঁরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করচেন।'[৩৬] এই *জীবন-স্মৃতি* নিশ্চয়ই রথীন্দ্রনাথ-কথিত 'অসমাপ্ত' বইটি। কিন্তু এর পরের চিঠিটি বেশ গোলমেলে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সেই চিঠি কবি লিখছেন আরও মাস-দুয়েক পর, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৪ ডিসেম্বর ১৯১২)। সেখানে লিখলেন কবি :

জীবনস্মৃতির বাঁধানো বই এখনো আমার হাতে আসে নি। আলগা অবস্থায় যখন এসেছিল তখনই ওর ছবিগুলো দেখেছি। যাঁরা দেখেছেন সকলেরই খুব ভাল লেগেছে।... গগনের এই ছবিগুলি যে আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে জড়িত হয়ে রইল এতে আমি ভারি আনন্দ বোধ করচি।[৩৭]

পুত্র রথীন্দ্রনাথ বলছেন 'ভাল করে বাঁধিয়ে' পাঠানোর কথা, পিতা রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন 'আলগা অবস্থায়' পাঠানোর খবর, এই দুই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করা আজ অসম্ভব। বিশেষত,

রথীন্দ্রনাথের চিঠিটি যখন আগে লেখা। আর, যে-বই কলকাতায় জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়ে গেছে, সেপ্টেম্বরে তা আমেরিকায় পৌঁছে যাচ্ছে না, সেটা বোঝা যায়, কিন্তু ডিসেম্বরেও সেই বই তার যথাযথ-রূপে আমেরিকায় এসে পড়ছে না কেন, এর সদুত্তর দেওয়াও খুবই মুশকিল !

যাইহোক, নিজের উদ্‌যোগে এর যথাসাধ্য প্রচারের ব্যবস্থাও রবীন্দ্রনাথ করে এসেছিলেন। বই বেরোবার আগে থেকেই 'তত্ত্ববোধিনী'র আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় এর বইদুটির দীর্ঘ বিজ্ঞাপন বেরোয়। সঙ্গে অগ্রিম মূল্য দিলে ছাড়ের ঘোষণা-সহ আলাদা 'আদেশপত্র'। বই প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্বোক্ত ২ আশ্বিন ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১২) তারিখের চিঠিতে কবি লেখেন, 'ও বইটা [*জীবন-স্মৃতি*] কি বিক্রি হবার আশা আছে ? বিপরীত রকম খরচ করেছে। জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রের একটা বড়সড় ভদ্র রকম সমালোচনা কোরো – সরাসরি বিচার করে দু লাইনে সেরে দিয়ো না।' রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ মেনে 'প্রবাসী' অগ্রহায়ণ ১৩১৯ সংখ্যায় আলাদা করে দুটি বই-এর বড়ো সমালোচনাও প্রকাশিত হয়।[৩৮] কিন্তু ঘটনা হল, এই বই দুটির বিক্রিও সেকালে আশানুরূপ ছিল না ! *জীবন-স্মৃতি*-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৯ বছর পর, ১৯২১ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে। আর *ছিন্নপত্র*-র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোবে ১৬ বছর পর, ১৯২৮-এ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে ! মজার কথা হল, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো নিকটজন কিন্তু বইদুটির ব্যবসায়িক সাফল্যের ব্যাপারে প্রথম থেকেই সন্দিহান ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬৭-১৯৩৮) আঁকা ২৪টি ছবিতে শোভিত ও অত্যন্ত মুল্যবান কাগজে ছাপা *জীবন-স্মৃতি*-র প্রথম সংস্করণের দাম করা হয় ৫ টাকা! এত দামের বই কেনার লোক কম, মনে হয়েছিল কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৪২-১৯২৩)। নগেন্দ্রনাথকে লেখা একটা চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন এই সংশয়, 'তোমার প্রেরিত জীবনস্মৃতি পেয়ে খুসী হলুম। যে দাম তাতে বেশী বেশী বিক্রী হবার আশা হয় না। দেখা যাক কি হয়।'[৩৯]

এইসমস্ত ব্যবসায়িক 'অসাফল্যে'র কারণেই, ইচ্ছে থাকলেও, নিজের উদ্‌যোগে প্রকাশনায় ভরসা পাচ্ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের কোনো নতুন বাংলা বই প্রকাশিত হয়নি। ১৯১২ সালের ২৪ মে কলকাতা থেকে ইংলন্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন তিনি। ফেরেন প্রায় ১ বছর ৪ মাস পর, ১৯১৩-র ২৯ সেপ্টেম্বর। এই সময়কালে 'তত্ত্ববোধিনী' 'ভারতী' 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার জন্য তিনি যে ধারাবাহিক ভ্রমণকথা লিখবেন

(অনেক পরে, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে যা *পথের সঞ্চয়* গ্রন্থভুক্ত হবে) সেটা বাদ দিলে তাঁর বাংলা লেখালেখির পরিমাণ খুবই কম। অবশ্য, ভ্রমণপর্বের একেবারে শেষবেলায়, ১৯১৩-র আগস্টের শেষ থেকে, যতই নিজের মটির কাছাকাছি ফেরার সময় হয়ে আসবে, তাঁরও মনে লাগবে সুদূরের টান, অল্পে অল্পে শুরু হবে *গীতিমাল্য*-র গান রচনার পালা। আর শেষপর্যন্ত নিজভূমি শান্তিনিকেতনে ফিরে খুলে যাবে গানের ঝর্ণাধারার যাবতীয় আগল, প্রমথ চৌধুরীকে একটা চিঠিতেও সেকথা জানাবেন তিনি, '...অনেকদিন চাপা থেকে হঠাৎ এখানে [শান্তিনিকেতন] এসেই মনের আনন্দে আমার মধ্যে গানের উৎসটি খুলে গেছে – সেইজন্যে কিছুতেই নড়াচড়া করতে ভরসা হচ্চে না।'[৪০] ১৯১৪ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হবে *গীতিমাল্য*-সহ চারটি বই, সেগুলি যথাক্রমে : *উৎসর্গ* (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশকাল ২৮.৫.১৯১৪), *গীতিমাল্য* (০২.০৭.১৯১৪), *গান* (২৩.০৯.১৯১৪) এবং *ধর্মসঙ্গীত* (২৭.১২.১৯১৪)। আর একটি বই, *গীতালি*, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে, সে কথায় আমরা পরে আসব।

এর আগে *গীতাঞ্জলি*-সহ নানা বইতে নানা বিচিত্র ভুলের সমাহার দেখে আমরা অনুমান করতে চাইছিলাম যে সেইসব বই তৈরি হয়ে ওঠার সময়ে প্রুফ দেখা ও সম্পাদনার কাজে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ঠিক কতখানি ছিল ! যদিও কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার মতো তথ্য আমাদের হাতে কমই ছিল। বিলেত থেকে ফেরার পর কিন্তু আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার প্রুফ চেয়ে একাধিকবার তাগাদা দিচ্ছেন মণিলালকে। সেইসঙ্গে বইয়ের সম্পাদনা ও সজ্জারীতি বিষয়েও লিখিত নির্দেশ পাঠাচ্ছেন তাঁর কাছে। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের শারদীয়া 'দেশ'-এ প্রকাশিত মণিলালকে লেখা দুটি চিঠি থেকে প্রাসঙ্গিক দুটি বাক্য আমরা উদ্ধৃত করছি।

> 'প্রুফ যেদিন পেয়েছি সেইদিনই পাঠিয়েছি – বিশেষ কোনো পরিবর্তন করিনি—কেবল ছাপার ভুল সেরে দিয়েছি।' (তারিখহীন চিঠি, পত্র নং ২৪)
>
> 'আজকের ডাকে ফাল্গুনীর প্রুফ পাঠালুম। বদলগুলো ভালো করে মিলিয়ে ঠিক করে নিও।' (তারিখহীন চিঠি, পত্র নং ২৭)

কান্তিক প্রেসের প্রুফ রিডারের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে ছেড়ে দিচ্ছেন না তিনি আর, এটা এবার নিশ্চিত করেই বলা যায়। *গান* ও *ধর্মসঙ্গীত* বইদুটির মুদ্রণ প্রসঙ্গে অবশ্য এর চেয়ে অতিরিক্ত দু-একটা কথাও বলা যায়। ১৯০৯-এ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকেই *গান* নামের যে বইটি বেরিয়েছিল তারই গানগুলোকে মোটামুটি

দুটি খণ্ডে ভাগ করে এবারের *গান* আর *ধর্মসঙ্গীত* বেরোল। এবারের গান বইটির প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল, 'এই সংস্করণে "গান" গ্রন্থের সঙ্গীতগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ সঙ্গীতের খণ্ডটার নাম হইয়াছে "গান", অপর খণ্ডটি "ধর্ম্ম সঙ্গীত" ।' এই বইদুটির সূত্রেই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠির প্রায় পুরোটাই এখানে উদ্ধৃত করা যাক[৪১] :

> মণিলাল, বোধ হচ্চে যেন প্রজাপতির নির্বন্ধের একটা গান ছাড়া আর কোনো গান গানের বইয়ে স্থান পায়নি। জানিনে পরে সেগুলো যাবে কিনা। এবারকার প্রুফে কেবল "কেন সারাদিন ধীরে ধীরে" এই গানটা দেখলুম। অন্যগুলোর পত্রাঙ্ক দিয়ে দিই :--
>
> মনোমন্দির-সুন্দরী – ৯৭ পৃ: শেষ Stanza বাদ দিও
>
> নিশি না পোহাতে – ১১৪
>
> ওরে সাবধানী পথিক – ১১৭
>
> অলকে কুসুম না দিয়ে – ১৭২
>
> ভুলে ভুলে আজ – ১৮২
>
> নিম্নলিখিত গানটি এই সঙ্গে বসবে :--
>
> প্রাণ চায় চক্ষু না চায় [পুরো গানটিই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এখানে]
>
> নিম্নলিখিত গানটি ধর্মসঙ্গীতে যাবে :--
>
> দুঃখের বর্ষায় চক্ষের জল যেই নামল – [পুরো গানটিই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এখানে]
>
> যেখানে এইবারকার প্রুফে "কেন সারাদিন ধীরে ধীরে" গানটি গেছে সেইখানেই এই গানগুলি বসিয়ো। অবশ্য ধর্মসঙ্গীতেরটা স্বতন্ত্র।
>
> তোমার রবিদাদা
>
> নিম্নলিখিত গানটি বিবিধ সঙ্গীতে যাবে—
>
> তোমার রঙীন পাতায় লিখ্ব প্রাণের [পুরো গানটিই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এখানে]

উপরে উদ্ধৃত চিঠিটি গুরুত্বপূর্ণ। 'জানিনে পরে সেগুলো যাবে কিনা', এই বাক্যটি পড়লে রবীন্দ্রনাথের একধরণের অসহায়ত্বই যেন ফুটে উঠতে থাকে। তাঁকে প্রুফ পাঠানো হচ্ছে, তিনিও চেষ্টা করছেন তাঁর মতো

করে সাজিয়ে তোলার, কিন্তু কোথাও একটা যোগাযোগহীনতা রয়ে গেছে, যেন সবটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই, সবটা তাঁর ইচ্ছে মতো হবার নয় !

আর একটা কথা। রবীন্দ্রনাথ এখানে যতগুলো গানের কথা বলেছেন তার সবগুলোই এই সংস্করণের দুটো খণ্ডের মধ্যে স্থান পাবে। কিন্তু ঘটনা হল, 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে' গানটি বাদ দিলে বাকি গানগুলো ১৯০৯-এর *গান*-এও ছিল না। কেন ছিল না, তার যেমন কোনো যুক্তি নেই, এবার কেন রইল, তারও পিছনে কোন সুনির্দিষ্ট গ্রন্থনির্মাণ-গত যুক্তি নেই, শুধু রবীন্দ্রনাথের এই কটা গানের কথা যথাসময়ে মনে পড়েছে, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক যুক্তিটি ছাড়া। কেননা, বলা বাহুল্য, এই সংস্করণেও দুটো খণ্ডের বাইরে রয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের লেখা অনেক গান।

এইরকম অসম্পূর্ণ বইগুলোর সামনে দাঁড়িয়েই বোঝা যায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এবং তার সঙ্গে জড়িত মানুষজন পরবর্তীকালে ঠিক কী ভূমিকা পালন করবেন, অন্তত করতে পারেন। কতটা পারলেন তাঁরা, সেটা আমরা পরের অধ্যায়ে বোঝবার চেষ্টা করব।

ঘ. নিজস্ব প্রকাশনার দিকে...

১৯১৪-র মে মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ বেড়াতে যান নৈনিতালের কাছে রামগড়ে, ছিলেন মাসখানেক। এখানেই, ২ জুন, ইন্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে তাঁর একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৪২] এর আগে ১৪ জুলাই ১৯০৮ এবং ২১ জুন ১৯০৯ তারিখে দুটি চুক্তি হয়, সে দুটি আইনত পাঁচ বছরের জন্য বলবৎ ছিল, ফলে নতুন চুক্তি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মনে কিছু সন্দেহ দেখা দেয় যে, পুরোনো চুক্তি মোতাবেক কাজ হচ্ছে না। তাই নতুন করে চুক্তিতে তাঁরও বিশেষ আগ্রহ থাকবার কথা। গতদুবার ইন্ডিয়ান প্রেসের তরফে চুক্তি হয়েছিল চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, সই-ও করেছিলেন চারুচন্দ্রই, এবার সই করলেন চিন্তামণি নিজে। এবং অবশ্যই, রবীন্দ্রনাথ। এই চুক্তি অনুসারে মোট ৮৭টি বই (তার মধ্যে তখনও-অবধি-অপ্রকাশিত *গীতিমাল্য*-ও আছে) ছাপা ও বিক্রি করার অধিকার লাভ করে ইন্ডিয়ান প্রেস।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ আগের মতই বিক্রয়মূল্যের ২৫ শতাংশ উপস্বত্ব-র অধিকারী হন, এবং তার সঙ্গে এবারের চুক্তিতে নতুন যুক্ত হয় এই কথাগুলি : 'The Publisher shall submit monthly a true and faithful account of the copies of the said several works published and sold by him during the month preceding and such account shall be settled and adjusted each month as aforesaid by cash payment...'। আগেকার ছমাস অন্তর হিসেব বুঝে নেবার চুক্তি যে এবার একমাস-অন্তরে বদলে গেল, এবং প্রতিমাসে 'ক্যাশ পেমেন্ট'-এর মাধ্যমে সেই হিসেব মিটিয়ে দেবার কথা আলাদা করে লেখা হল, এর পিছনে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত 'সন্দেহ'-র কিছু ভূমিকা আছে।

অবশ্য ইন্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিছু-বা (টাকাপয়সা-সংক্রান্ত)-অবিশ্বাস বছরের শেষে বদলে গেল একধরণের মুগ্ধতায়, *গীতালি* বইটি প্রকাশকে উপলক্ষ্য করে। ১৯১৪ সালের ১৩ অক্টোবর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছোন এলাহাবাদ। তার আগের প্রায় দুমাস ধরে চলেছে *গীতালি*-র গানগুলি লেখার পালা। এলাহাবাদে আসার পরের দিন রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ চলে যান চিন্তামণি ঘোষের কাছে এবং তাঁকে অনুরোধ করেন *গীতালি* বইটি ছেপে দিতে হবে সাতদিনের মধ্যে ! ইন্ডিয়ান প্রেসের প্রুফ রিডার নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায়[৪৩] এরপরের ঘটনার চমৎকার বিবরণ আছে।

সাতদিনের মধ্যে বই প্রকাশ সহজ নয়। চিন্তামণি তবু দায়িত্ব নিলেন। প্রেসের বাংলা ডিপার্টমেন্টে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ গেল, 'কম্পোজিটরদের বলে দাও – তারা একদিনের জন্যে তিনদিনের মাইনে পাবে – সকালে জলখাবার, দুপুরে খাবার, বৈকালে ৫টায় জলখাবার, রাত্রে ৮টার সময় যে যা খায় তাই পাবে।' এরপর কীভাবে দুদিনের মধ্যে সমস্তটা কম্পোজ হল তার বিস্তারিত গল্প বলেছেন নয়নচন্দ্র। দুদিন পর চিন্তামণি রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'দুএক ফর্মার প্রুফ এনেছেন কি?' গোটা বইএরই প্রুফ নিয়ে এসেছেন চিন্তামণি, এ কথা শুনে প্রবল বিস্মিত হয়েছিলেন কবি, এতটা তিনিও আশা করেননি। তারপর চলল প্রুফ সংশোধনের পালা। এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখছেন (ততদিনে এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় চলে গেছেন চারুচন্দ্র), 'গীতালির প্রুফ দেখা হয়ে গেছে। অনেক বদল করেছি। কিছু বাদ পড়েছে – ততোধিক বেড়ে গেছে।'[৪৪] ছাপা শেষ হবার পর বাঁধাই হয়েছিল নাকি পাঁচ রকমে : মরক্কো লেদার, সিল্ক-কাপড়, বাইন্ডিং

ক্লথ, বোর্ড বাইন্ডিং আর পেপারব্যাক। সবকিছু হয়ে গেলে পাঁচ রকমের পাঁচখানা বই রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তৃপ্ত চিন্তামণি। অভিভূত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে আপনার ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে আমি যে কত খুশি হয়েছি তা আর বলে প্রকাশ করতে পারিনে।'

এত তাড়াতাড়ি সবটা তৈরি হয়ে উঠলেও, *গীতালি*-তে কিন্তু একটিও মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়ে না। সব মিলিয়ে এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস-এর উপর রবীন্দ্রনাথের নির্ভরশীলতা অনেকখানি ফিরে এল, সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর এই নির্ভরশীলতার ফলেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী গ্রন্থগুলির অধিকাংশ ছাপা ও প্রকাশিত হবে এলাহাবাদ থেকেই, সে তথ্যও এখানে স্মরণীয়। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত বই একটি, *শান্তিনিকেতন* চতুর্দশ খণ্ড। ১৯১৬ সালে এই সংখ্যাটি ১০। (দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট) এই এগারোটি বই-এর প্রতিটিই প্রকাশিত হবে এলাহাবাদ থেকে চিন্তামণি ঘোষেরই তত্ত্বাবধানে। এবং, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'প্রোডাকশন', ১৯১৫-১৬ সাল জুড়ে প্রকাশিত হবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ও নাটকগুলির সমাহার, দশখণ্ডে সুবিশাল, *কাব্যগ্রন্থ*। এখনও পর্যন্ত এটাই কবির সর্ববৃহৎ রচনাসংগ্রহের আয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ ও তার ফলস্বরূপ অনিবার্য খ্যাতির কারণে এই 'কাব্যগ্রন্থ' প্রভূতব্যবসায়িক সাফল্যও পায়। ১৯১৬-র শেষদিক থেকে এর একটি অধিকমূল্যের 'শোভন সংস্করণ' প্রকাশেরও উদ্‌যোগ নেওয়া হয়। ১৯১৭-র নভেম্বরের গোড়ায় সেটি প্রকাশিত হয়। ২২ কার্তিক ১৩২৪ব (৮ নভেম্বর ১৯১৭) তারিখে বইগুলি হাতে পেয়ে তৃপ্ত রবীন্দ্রনাথ ছেলে রথীন্দ্রনাথকে(১৮৮৮-১৯৬১) লেখেন, 'শোভন সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ আমাকে পাঁচ সেট পাঠিয়েচে। ১০ খণ্ডে খুব প্রকাণ্ড আর ভারি জিনিস্‌ হয়েচে তাই তোদের ওখানে আর পাঠালুম না।'[৪৫] এই বইও, *গীতালি*-র মতোই বাঁধাই করা হয়েছিল নানাভাবে, নানা দাম অনুযায়ী। (এর মধ্যে দুটি ধরনের জন্যে দ্রষ্টব্য : চিত্র-১২ ও চিত্র-১৩)

প্রশ্ন হল, এলাহাবাদে ছাপার কাজ হত, ফলে প্রুফ দেখা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজে কি রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা থাকত, নাকি পুরো দায়িত্ব ছিল এলাহাবাদ প্রেসেরই কাঁধে? এই প্রশ্নের একটা সদুত্তর পাওয়া সম্ভব রথীন্দ্রনাথকে লেখা আর-একটি চিঠির থেকে। তারিখহীন সেই চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন তিনি, 'কয়েকদিন পূর্ব্বে Indian Press থেকে চিঠি পেয়েছি যে তাঁরা রেজেষ্ট্রিপোষ্টে প্রুফ কলকাতার ঠিকানায়

পাঠিয়েছেন আজ পর্য্যন্ত পাইনি। সেটা কি ওখানেই পড়ে রয়েচে ?'[৪৬] স্পষ্টই বোঝা যায়, রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠানো হত প্রুফ, সেটা দেখে আবার হয়তো রেজিস্ট্রি করেই ফেরত যেত। এ পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও খানিক ঝুঁকিপূর্ণও বটে, তবে চিন্তামণি ঘোষের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত এই বইগুলির সামগ্রিক মান যে খুবই উন্নত ছিল, তা অনস্বীকার্য। বস্তুত, আমাদের নিজস্ব মত হল, ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে রবীন্দ্রনাথের যত বই প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন প্রকাশনা এই *কাব্যগ্রন্থ*-ই। নান্দনিকতার বিচার সবসমসয়ই আপেক্ষিক বিচার হতে বাধ্য, তবু বিপুলাকার এই বইগুলি আজও হাতে নিয়ে দেখতে গিয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি, নিখুঁত বাঁধাই একশো বছর পরও অটুট, দামি ও মোটা অ্যান্টিক কাগজ শতাব্দী পার করেও যেন নতুনের মতো ঝকঝকে, বইয়ের পাতা বেড়ে যাবে সেই 'আশঙ্কায়' বই-এর উন্মুক্ত-স্পেস নিয়ে কোথাও আপোস করে ফেলা হয় নি। এরকম সুবৃহৎ এবং সুশোভন কাব্য-সংগ্রহ বাংলা প্রকাশনার জগতেই বিরল বলে আমাদের ধারণা।

কিন্তু, ১৯১৮ থেকে আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছিল ইন্ডিয়ান প্রেস-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক দশকের উপরের সম্পর্ক ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে চলেছে, নানাকারণে। ১৯১৭-র জানুয়ারি মাসে আমেরিকার লিঙ্কন প্রেসের তরফ থেকে কবিকে একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার দেওয়া হয়। ১৯১৮-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে সেই যন্ত্রটিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে 'শান্তিনিকেতন প্রেস'। (এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে অলোচনা করা হবে।) একে 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' প্রতিষ্ঠার পূর্বপ্রস্তুতি বলা যায়। *গীত-পঞ্চাশিকা* (আশ্বিন ১৩২৫ব), *বৈতালিক* (চৈত্র ১৩২৫), *গীত-বীথিকা* (বৈশাখ ১৩২৬) প্রভৃতি রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি গ্রন্থ ছাপা হল এই প্রেস থেকে, অবশ্য প্রকাশক হিসেবে নাম রইল চিন্তামণি ঘোষের। ১৯১৯-এর ২১ জুলাই প্রকাশিত হল *জাপান-যাত্রী*, সে-ও চিন্তামণি ঘোষ তথা ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশনার পক্ষ থেকে মুদ্রিত হল শান্তিনিকেতন প্রেসে।

হয়তো রবীন্দ্রনাথও ইন্ডিয়ান প্রেস কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে কিছু আন্তরিকতার অভাব লক্ষ করছিলেন। ১৯১৮ থেকে ইন্ডিয়ান প্রেসকে একটি পুরোদস্তুর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করার কথা ভাবছিলেন চিন্তামণি, পরের বছর তা কার্যে পরিণত করা হবে। সেই কারণেই 'অলাভজনক' গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর কোনো কুণ্ঠা হয়তো কবি খেয়াল করে থাকবেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ২৬ পৌষ (১৯১৮, ১০ জানুয়ারি) রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায়কে একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করবেন, '"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ছাপতে যদি ইন্ডিয়ান প্রেস নারাজ হন তা হলে আপনি ওগুলি ছাপিয়ে নেবেন।'[৪৭] কাছাকাছি সময়ে 'গুরু' নাটকটির প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই সংশয় খেয়াল করব আমরা। ৫ ফেব্রুয়ারি ভবিষ্যৎ-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটা চিঠিতে তার হদিশ পাওয়া যায়, 'চিন্তামণিবাবু যদি স্বয়ং ছাপেন তবে তাঁরই অধিকার অগ্রগণ্য। তিনি রাজি না হলে তবে আমি স্বয়ং প্রকাশ করতে পারি। অতএব মণিলালের যোগে অর্থের জোগান চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি তিনি জবাব দেন তবেই আমার ঘর থেকে টাকা পাবে।'[৪৮] রাজি না-হবার একটা সম্ভাবনার কথাটা এর আগে কখনও উঠতে দেখিনি আমরা। 'গুরু' নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ এর আগেই 'ব্রাহ্মমিশন প্রেস'-এ ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছাপার কাজ এগিয়েও গেছে খানিক। তারপর তিনি প্রকাশকের খোঁজ করছেন, যিনি খরচটা বহন করবেন মাত্র, এবং সেইসূত্রেই তাঁর ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসকে প্রয়োজন পড়ছে। প্রভাতকুমারকে চিঠি লেখার আগের দিন রথীন্দ্রনাথকেও এই নির্দেশই দিতে দেখা যাবে, 'অচলায়তন সংক্ষিপ্ত করে "গুরু" নাম দিয়ে রামানন্দবাবুর ওখানে ছাপতে দিয়েচি। সবসুদ্ধ ৫/৬ ফর্ম্মার বেশি হবেনা। তার কাগজের দাম চাচ্চেন। মণিলালকে জিজ্ঞাসা করিস্ ওটা যদি পাব্লিশিং হৌস্ থেকে প্রকাশ হয় তাহলে ওর খরচের ভার যেন নেন্ — নইলে আমার টাকা থেকে দিস্।'[৪৯] পাবলিশিং হাউস-ই শেষপর্যন্ত বইটা ছাপার দায়িত্ব নেন অবশ্য। কিন্তু নেবে কিনা আদৌ, সে সংশয় যে ১৯১৮তে তৈরি হয়েছে, এইটা লক্ষণীয়।

১৯১৯-এর ১৯ জুন কাদম্বিনী দেবী (দত্ত) কে লেখা একটি চিঠি থেকেও পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে বিশ্বভারতীর অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কথাটা খানিক স্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অনুরাগিনীকে লিখছেন :

> ইণ্ডিয়ান প্রেস আমার বাংলা বইয়ের প্রকাশক। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হৌস তাহাদের একমাত্র এজেন্ট। আমরা কমিশন সেলে বিক্রয়ের অধিকার পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোনোমতেই রাজি করিতে পারি নাই। আর কাহাকেও বেচিতে দিলে উহাদের এজেন্টের যে অল্প ক্ষতি হয় তাহা উহারা স্বীকার করিতে দিতে রাজি হয় না।[৫০]

স্পষ্টতই ইন্ডিয়ান প্রেস এবং বিশ্বভারতীর নিজস্ব স্বার্থের টানাপোড়েনের একটা ছবি এখানে ফুটে ওঠে। বিশ্বভারতী যে বইগুলি নিজেরা বিক্রি করতে চেয়েছেন, তার নির্দিষ্ট উল্লেখ একমাত্র এই চিঠি থেকেই জানা

যায়। সেইসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো শব্দটি হচ্ছে ‘ক্ষতি’-র বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত ‘অল্প’ শব্দটি। ‘অল্প’ ক্ষতি সত্ত্বেও ইন্ডিয়ান প্রেস যে বিশ্বভারতীর প্রয়োজনটাকে একেবারেই আমল দিচ্ছে না, এই চিঠির ছত্রগুলোয় সেই আক্ষেপের সুর স্পষ্টই টের পাওয়া যায়।

১৯১৯-এই, দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে চিন্তামণি ঘোষ হারালেন তাঁর স্ত্রী, জ্যেষ্ঠপুত্র হরিপদ এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা হরিপ্রিয়াকে! এরপর থেকে তাঁর প্রকাশনার কাজকর্ম দেখতে শুরু করেন তাঁর মধ্যম পুত্র হরিকেশব। স্বজনবিয়োগে কাতর চিন্তামণি নিজের দায়িত্বে আর কিছুই রাখতে চাইছিলেন না। ফলে প্রকাশনাটিকে পাকাপাকিভাবে ‘কোম্পানী’তে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯১৯-এর শেষদিক থেকে। ওই বছরের ১৮ নভেম্বর এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চিঠিটি লেখেন চিন্তামণি। চিঠিটি আমরা পুরোটা উদ্ধৃত করছি :

> বহুসম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন – বোধহয় অবগত আছেন, আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হওয়ায় অধিক প্রেসের কার্য্যভার হইতে অবসর লইয়াছি।
>
> আমার অবর্ত্তমানে ইন্ডিয়ান প্রেসের ভবিষ্যিৎ সম্বন্ধে আমার চিন্তার কারণ হইয়াছে। হইতে পারে, ভবিষ্যতে আমার পুত্রগণ আমা অপেক্ষা অধিকতর শক্তি লইয়া আমার প্রতিষ্ঠিত প্রেসটির পরিচালনা করিবে। কিন্তু পুত্রগণের প্রতি স্নেহান্ধ দৃষ্টিতেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক ইন্ডিয়ান প্রেসের অনুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া আমার জীবদ্দশায় প্রেসটিকে একটি private joint stock company করিয়া দিয়াছি। জানিনা এই ব্যবস্থাই তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথোচিত কিনা।
>
> আপনাকে আমার পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইন্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী এখন এক ব্যক্তি নহেন। একটি কোম্পানীর হস্তে ইহা এখন হইতে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং অতঃপর কোন পুস্তকাদি প্রকাশ করিবার সময় কোম্পানীর তাহার লাভালাভ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইতেছে।
>
> এ পর্যন্ত আপনার সমস্ত পুস্তক লাভ লোকসানের বিচার না করিয়াই আমি সানন্দে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এখন হইতে আপনার নূতন কোন বই ছাপিতে হইলে কোম্পানি তাহার লাভালাভ দেখিবেন। এই জন্য আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার নব লিখিত কোন পুস্তক প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইলে তাহা

ছাপিবার পূর্বে অনুগ্রহ করিয়া একবার ইন্ডিয়ান প্রেসের বর্তমান পরিচালকগণকে তাহার লাভ লোকসানের হিসাব করিবার সুযোগ দিয়া বাধিত করিবেন।

আশাকরি এই ব্যবস্থায় আপনার কোন অসুবিধা হইবে না।[৫১]

রবীন্দ্রনাথ এর কী উত্তর দিয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথের উত্তর পেয়ে পুনরায় চিন্তামণি তাঁকে লেখেন, 'কোম্পানী জিনিসটা একটা হৃদয়হীন পদার্থমাত্র। সে লাভ ছাড়া অন্য কিছুরই খাতির রাখে না। এই বুঝিয়া অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন।' ফলে, বোঝাই যায়, এই শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই চিঠি লেখার পরও চারটি বই (*অরূপরতন, ঋণশোধ, শিশু ভোলানাথ* ও *লিপিকা*) প্রথমবার প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়ান প্রেসেরই তরফ থেকে। এমনকী, আমরা দেখি, ১৯২১ সালের শুরুর দিকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 'গদ্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশেরও উদ্‌যোগ নেওয়া হয় ইন্ডিয়ান প্রেস-এর তরফে। ১৯২১-এর ২ জানুয়ারি গিরিডিতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কাছে পাঠানো একটা চিঠিতে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'তোমার কিন্তু একবার এখানে আসা দরকার। আজ নয়নবাবু(Indian Press) এসেছেন। তিনি গদ্যগ্রন্থাবলী ছাপাবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তাগাদা দিচ্ছেন। এর detail সম্বন্ধে এক্ষুণি ঠিক করে ফেলা দরকার। প্রথম volumeএর কপিও তিনি চাচ্ছেন।'[৫২] এই 'গদ্যগ্রন্থাবলী' শেষপর্যন্ত পরিকল্পনার স্তরেই থেকে গেছিল অবশ্য। অপ্রীতিকর শর্তের আবহ তো ছিলই, তার উপরে 'কোম্পানী জিনিসটা'র সঙ্গে আরও কিছু অরুচিকর টানাপোড়েনে কবি-প্রকাশকের সম্পর্ক খুবই মলিন হয়ে উঠছিল।

সেরকম একটি প্রসঙ্গের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি এখানে।[৫৩] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের প্রকাশিত *ব্রহ্মসংগীত* বই-এর দশম সংস্করণে বিনা অনুমতিতে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গান ছাপিয়ে দেন। চিন্তামণির পুত্র হরিকেশব রবীন্দ্রনাথকে অন্যতম 'পার্টি' করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে মামলা করেন। দ্বিধান্বিত রবীন্দ্রনাথ জানান, এই মামলায় তাঁর নাম ব্যবহার না-করলেই ভালো হয়। কিন্তু হরিকেশব ১৯২২-এর ১৪ আগস্ট তাঁকে একটা পাল্টা চিঠিতে আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেখেন যে চুক্তিপত্রের ৭নং ধারা অনুসারে তাঁরা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের নাম ব্যবহার করতে পারেন। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হন অনুমতি দিতে। মামলাটি সম্ভবত আদালত পর্যন্ত গড়ায় নি শেষপর্যন্ত, আপোষেই রফা হয়েছিল, কিন্তু এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করেছিল নিশ্চয়ই।

আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রকাশনার স্বপ্ন বহুকালের। এইসব ঘটনা তার সম্ভাবনাকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করছিল। ১৯২২-এর ১৮ সেপ্টেম্বর চিন্তামণি ঘোষকে একটি চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেন তাঁর সমস্ত বই-এর স্বত্ব বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দিতে। চিঠিটি পাঠানো হয়নি, তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে নেপালচন্দ্র রায়(১৮৬৭-১৯৪৪), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৭২-১৯৪০)এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এলাহাবাদে গিয়ে এ-সংক্রান্ত যাবতীয় কথাবার্তা ও বন্দোবস্ত পাকা করে আসেন। নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবরণে এই মৌখিক আলাপচারিতার খবর জানা যায়।[৫৪] চিন্তামণি প্রতিনিধিদলকে জানান, রবীন্দ্রনাথের বই ছাপতে তাঁর খরচ পড়ে বইয়ের দামের শতকরা ৩৩$\frac{১}{৩}$% হারে। শতকরা ২৫ ভাগ ট্রেড কমিশন, ২৫ ভাগ রয়্যালটি, শতকরা ১০ ভাগ খরচ হয় বিজ্ঞাপন বাবদ। আর তাঁর লভ্যাংশ মাত্র শতকরা ৬$\frac{২}{৩}$ টাকা। ফলে বই বিশ্বভারতী নিতে চাইলে ওই খরচটুকু, অর্থাৎ বইয়ের মোট দামের ৩৩$\frac{১}{৩}$ শতাংশ টাকা ইন্ডিয়ান প্রেসকে দিতে হবে। এই শর্তেই রফা হয়। সমস্ত হিসেব করে বিশ্বভারতীর তরফে দেয় অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬,৬০৪ টাকা। ১৯২২-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রাথমিক হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর ডায়ারিতে ১৪ ডিসেম্বর এ প্রসঙ্গে লিখছেন, 'আজকাল বিশ্বভারতী নিয়ে এমন ব্যস্ত রয়েছি যে, একটু অবসর সময় যেন করে উঠতে পারছিনা। ইন্ডিয়ান প্রেসের কাছ থেকে বাংলা বই আজ সব গুণে বুঝিয়ে নিতে আরম্ভ করা হয়েচে – রথীবাবু কাল টেলিগ্রাম করেছিলেন আসতে পারবেন না জ্বর হয়েচে ব'লে – আজ তাই সমস্ত ঝুঁকি আমার ঘাড়েই পড়েছিল – ভাগ্যিস বিকালবেলা রথীবাবু এসে পড়েছেন, তাই একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে।'[৫৫]

এইভাবে শেষ হল ইন্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ এক যুগেরও অধিককালের সম্পর্ক। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, এই সম্পর্কের ইতিহাসে নির্ভরতা, মুগ্ধতা যেমন ছিল তেমনি ছিল কিছু-বা অবিশ্বাস ও অনাস্থা। কিন্তু এই শেষবেলায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই অবসান ঘটল এই সম্পর্কের। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১৯২২-এর ১৯ ডিসেম্বর নবগঠিত বিশ্বভারতী সংসদের (Governing Body) বৈঠকে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে চিন্তামণি ঘোষ তথা 'ইন্ডিয়ান প্রেস' নিয়ে দুটি পৃথক 'Resolution' নেওয়া হল।[৫৬] তার প্রথমটি এই :

The Secretary reported that Babu Chintamoni Ghose, Proprietor, Indian Press, has agreed to transfer the publishing rights of the Bengali books of the President

together with the stock in hand for one-third of the retail value of the stock plus Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) to be paid at 90(ninety) days sight.

Resolved that... the secretaries be authorized to invest (if necessary by borrowing) the required amount not exceeding Rs. 38,000/- (Rupees thirty eight thousand) for this purpose.

দ্বিতীয় 'Resolution' থেকে জানা যায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। প্রায় ১৪ বছরের সুদীর্ঘ 'সম্পর্কের' সম্মানে চিন্তামণি ঘোষ দশ হাজার টাকা দান করছেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগকে। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই দান গ্রহণ করল বিশ্বভারতী :

The Secretary reported that Chintamony Ghose, had promised a donation of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) for the Publishing Department.

Resolved that the donation be gratefully accepted and the best thanks of the samsad be conveyed to him.

এইভাবে 'Best thanks' আদানপ্রদানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। রবীন্দ্রনাথ এবার পেলেন একেবারে নিজস্ব প্রকাশনা। সেই প্রকাশনা তাঁর গ্রন্থনির্মাণ-গত তাত্ত্বিক ধারণার কতটা পুরণ করে তুলতে পারল সেকথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বুঝে দেখার চেষ্টা করব।

টীকা ও উল্লেখপঞ্জি

১. চিন্তামণি ঘোষের একমাত্র জীবনীটি ইংরাজি ভাষায় লেখা। দ্রষ্টব্য : N.G.Bagchi. *Chintamoni Ghosh & the Saga of Indian Press.* 1984.

২. 'সরস্বতী' পত্রিকাটি সম্পর্কে উপরোক্ত N G Bagchi-র বইটি ছাড়াও দুটি আন্তর্জালিক পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে। ১. https://en.wikipedia.org/wiki/Saraswati_(magazine) এবং ২. ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-এর ওয়েবসাইট, www. Indianpublishinghouse.in

৩. শান্তা দেবী, 'প্রবাসীর কথা', *প্রবাসী ষষ্ঠীবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*, কলকাতা : প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭ব, পৃ.৪

৪. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'চিন্তামণি ঘোষ', প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৫ব, পৃ. ৮৮৬

৫. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-পরিচয়', *চিঠিপত্র* চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭ব, পৃ. ১৯৮-২০১

৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বর্গীয়া মনোরমা দেবী', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫০ব, পৃ. ২৬৬

৭. শান্তা দেবী, 'প্রবাসীর কথা', *প্রবাসী ষষ্ঠীবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*, কলকাতা : প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭ব, পৃ.৯

৮. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-পরিচয়', *চিঠিপত্র* চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭ব, পৃ. ২০৫-২০৬

১০. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১৮

১১. শারদীয়া প্রতিক্ষণ, ১৩৯৩ব, পৃ. ৩১

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, মার্চ ১৯৯২, পৃ.৭৩

১৩. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রস্মৃতি*, কলকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউস, পৌষ ১৩৬৪ব, পৃ. ৯২-৯৩

১৪. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩ব, পৃ. ১৯৬

১৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'চিন্তামণি ঘোষ', প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৫ব, পৃ. ৮৮৪-৮৫

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬

১৭. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবি-রশ্মি*, ২য় খণ্ড, কলকাতা : এ মুখার্জি এন্ড কোং, পঞ্চম সংস্করণ (তারিখ অনুল্লিখিত), পৃ.৮৮

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২২ শ্রাবণ ১৪০৭ব, পৃ. ৬।

চিঠিটি তারিখহীন। পোস্টমার্ক দেখে সম্পাদক তারিখ বসিয়েছেন '৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৯'। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠি লেখার 'বার'টি উল্লেখ করেছেন, 'বৃহস্পতিবার'। ফলে ৩ নয়, চিঠি লেখা হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২১. ভারতী, কার্তিক ১৩১৬ব, পৃ.৪০৫

২২. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, প্রথম খণ্ড, বীরভূম : রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, ১৯৬৮, পৃ. ৩৭৭

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৭ব, পৃ. ৮-৯

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭,

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৭. অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, শারদীয় দেশ, ১৩৭৩ব, পত্র সংখ্যা ৭, পৃ. ১৯

২৮. চিত্রা দেব,*অনালোচিত রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : মডার্ন কলাম, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৮০। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত চিঠিপত্র দ্বাদশ খণ্ডে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিগুলি সংকলিত হলেও এই চিঠিটি সেখানে নেই!

২৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial No. 555

৩০. শারদীয় দেশ, ১৩৭৩ব, পৃ. ২০

৩১. শারদীয় দেশ, ১৩৯৮ব, পত্র সংখ্যা ২৫, পৃ. ৩৫

৩২. শারদীয় দেশ, ১৪১৪ব, পত্র সংখ্যা ৫, পৃ. ৩৮

৩৩. প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১২, পৃ. ৪২

৩৪. বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ব, পত্র সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৩৮-৩৯

৩৫. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial No. 625(vi)

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৭ব, পৃ. ৬০

৩৭. শারদীয় দেশ, ১৩৭৩ব, পত্র নং ১৫, পৃ. ২২

৩৮. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ব, পৃ. ২১৯-২২০

৩৯. শারদীয় দেশ, ১৪০১ব, পৃ. ৪৭

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব, পৃ. ১৬৭। চিঠিটির তারিখ ৩০ আশ্বিন ১৩২০ব [১৬ অক্টোবর ১৯১৩]

৪১. শারদীয় দেশ, ১৩৭৩ব, পত্র সংখ্যা ২৩, পৃ. ২৬-২৭

৪২. পুরো চুক্তিটি পাওয়া যাবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত *চিঠিপত্র* (শ্রাবণ ১৪০৭ব) চতুর্দশ খণ্ডের ২৭৮-২৮৭ পৃষ্ঠায়

৪৩. নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'ইন্ডিয়ান প্রেস ও কবি রবীন্দ্রনাথ', *তরুণ রবি*, কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬১, পৃ. ১৩৭-১৪৪

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৭ব, পত্র সংখ্যা ৫৯, পৃ. ৬৯-৭০

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পত্র সংখ্যা ৪৩, পৃ.৭৭

৪৬. প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ২০, পৃ. ৪৩

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯৩ব, পত্র সংখ্যা ৫৬, পৃ. ৬৮

৪৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial No. 435

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পত্র সংখ্যা ৪৬, পৃ.৮১

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, সপ্তম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৩৯৯ব, পৃ. ১৭৩ ('সংযোজন' অংশ)

৫১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial No. 230

৫২. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র-রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

৫৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : চিত্রা দেব, *অনালোচিত রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : মডার্ন কলাম, ১৯৮৫

৫৪. নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'ইন্ডিয়ান প্রেস ও কবি রবীন্দ্রনাথ', *তরুণ রবি*, কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬১, পৃ. ১৪২-৪৪

৫৫. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ৩২, পৃ. ৫৭

৫৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র-রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

পঞ্চম অধ্যায়

‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’-পর্ব (১৯২২-১৯৪১)

ক. ‘শান্তিনিকেতন প্রেস’

১৯১৭-র জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার মধ্য অঞ্চলের একটি রাজ্য নেব্রাস্কার রাজধানী লিঙ্কনে (Lincoln) এসে উপস্থিত হন। এই শহরের অধিবাসীদের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি ছাপার মেশিন উপহার দেওয়া হয়। মেশিনটির গায়ে লেখা ছিল ‘THE LINCOLN PRESS/PRESENTED TO THE/ BOYS OF SHANTINIKETAN/ BY THE PEOPLE OF/ LINCOLN NEBRASKA, U.S.A/ JANUARY 8, 1917’।[১] অবশ্য ততদিনে আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছে বলে এই যন্ত্র ভারতবর্ষে আসতে খানিক দেরি হয়ে যায়, প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন[২], ১০ জুলাই ১৯১৭ তারিখে ‘Kasama’ নামের জাহাজে চড়িয়ে যন্ত্রটিকে পাঠানো হয়। যন্ত্রটি শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ একে অবিলম্বে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে উদ্‌যোগী হয়ে ওঠেন, এ প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকারকে ২০ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (৬ ডিসেম্বর, ১৯১৭) রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> আমেরিকার Lincoln সহর আমাদের বিদ্যালয়কে একটি ভাল ছাপাখানা উপহার দিয়াছেন। চালাই কি করিয়া? আর কিছু নয় ছেলেদের শিক্ষা ও আমোদ হয় অথচ আমাদের খরচ উঠিয়া যায় এমন উপায় কিছু বলিতে পারেন? চিন্তামণিবাবুকে বলিয়াছিলাম এই প্রেসকে তিনি তাঁর ব্যবসায়ের অন্তর্গত করিয়া লন তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই। তিনি পারিয়া উঠিবেন না লিখিয়াছেন। এখানে এমন তৈরি ছাপাখানা এবং বিনা ভাড়ায় ঘর লইয়া কি কোনো ব্যবসায়ী ইহার ভার লইতে পারেন না? আপনি কাহাকেও জানেন?... এই ছাপাখানায় বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশ ছাপাইবার ব্যবস্থা করা যায় না কি?[৩]

এই চিঠি থেকেই স্পষ্ট, যন্ত্রটির ভার অন্য কারোর হাতেই তুলে দিতে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেসব সম্ভাবনা বাস্তবায়িত না-হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিজের দায়িত্বেই কিছু করার কথা ভাবতে শুরু করতে হয়। কিন্তু এই কাজটি সহজ হয় নি। ছাপাখানা খোলার জন্যে তখন সরকারের অনুমতি লাগত, সেই অনুমতি চাওয়া হলে সরকার তা দিয়ে গড়িমসি করতে থাকে, হতোদ্যম রবীন্দ্রনাথ একসময় যন্ত্রটিকে আমেরিকায় ফেরত পাঠিয়ে

দেবার কথাও ভাবতে শুরু করেন। বন্ধু উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ারসন (১৮৮১-১৯২৩)কে ১৯১৮র ৬ মার্চ বীতশ্রদ্ধ কবি লেখেন :

> The printing press is still rusting in Shantiniketan. I have not yet received permission to use it. I shall wait a few more weeks and then I shall ask the good citizens of Lincoln, who made a present of it to my school, to take it back. Each one of us in this unfortunate country is looked upon suspicion – and our authorities cannot see us clearly through the dust which they themselves raise.[8]

এ চিঠি লেখার পরেও প্রায় মাস তিনেক লেগে যায় সরকারের তরফ থেকে অনুমতি আসতে, জুন মাসের আগে যন্ত্রটির কাজ শুরুই করা যায় নি। অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নতুন করে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ বঙ্গাব্দে (৬ জুন ১৯১৮) লেখেন,

> ছাপাখানাটাকে খাড়া করা গেছে। একজন লোকের দরকার যিনি বলে দিতে পারেন কি কি জিনিসের প্রয়োজন এবং তার খরচ কত। সুকুমারের ভাই শুনেছি ওস্তাদ। কিন্তু বড় ওস্তাদ না হলেও চল্‌বে – একজন লোক যাঁর ছাপাখানা চালাবার অভিজ্ঞতা আছে যিনি দরদস্তুর ও আইনকানুন জানেন এমন কাউকে দিন দুয়েকের জন্যে কি পাওয়া যায় না।[৫]

সুকুমার, অর্থাৎ সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) ভাই, সুবিনয় রায়ের উপর তখন দায়িত্ব ছিল বিখ্যাত 'ইউ রায় এন্ড সন্স' নামের ছাপাখানাটির পরিচালনার। তবে শেষপর্যন্ত তাঁকে ডাকা হয় নি। সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত ও স্নেহধন্য, তিনি মুদ্রণ বিশেষজ্ঞও বটে, তিনি স্বয়ং এই সূত্রে শান্তিনিকেতনে আসেন। কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬) তাঁর 'ডায়েরি'র ১৫ জুন ১৯১৮ তারিখের 'এন্ট্রি'তে লিখলেন, 'আমিও বোলপুর যাত্রা করলুম। সুকুমার, অজিত, চারুবাবু, নির্মল প্রমুখ।'[৬] অর্থাৎ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায় প্রমুখের পরামর্শে জুন মাসের মাঝামাঝি থেকেই মুদ্রাযন্ত্রটি চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হল। 'শান্তিনিকেতন প্রেস'-এর মূল দায়িত্ব দেওয়া হল অন্যতম আশ্রমিক জগদানন্দ রায়ের(১৮৬৯-১৯৩৩) উপর। শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের

উদ্‌যোগে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' নামের পত্রিকাটির জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ব সংখ্যায় এর সম্পর্কে অনেকটা খবর পাওয়া গেল :

> গুরুদেবের আমেরিকাবাস কালে Lincoln সহরের অধিবাসিগণ আশ্রমের বালকদের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। ইহাতে আশ্রমের যাবতীয় ছাপার কাজ ও গুরুদেবের সঙ্গীত পুস্তকাদি ছাপা হইতেছে। দুটি আশ্রম বালক ছাপার কাজ শিখিতেছে। সাঁওতাল বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে কলকাতায় পাঠাইয়া বই বাঁধাইবার কাজ শিখাইয়া আনা হইয়াছে।[৭]

'শান্তিনিকেতন প্রেস' থেকে ছাপা প্রথম বইটির নাম *গীত-পঞ্চাশিকা* (দ্রষ্টব্য : চিত্র-৭)। মোট ৫১টি রবীন্দ্রসংগীত ও তার মধ্যে ৫০টি গানের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত স্বরলিপি মিলিয়ে তৈরি হল এই বই। তখনও প্রকাশনা হিসেবে 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' আত্মপ্রকাশ করেনি। এই বইয়ের প্রকাশক হিসেবে 'ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস'-এর নামই মুদ্রিত হল।

'ইন্ডিয়ান প্রেস' থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ বইটি হল *শিশু ভোলানাথ*। প্রকাশকাল ১৯২২-এর সেপ্টেম্বর। তারপর রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বই প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বত্ব একা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু তার আগেও, ১৯১৮ থেকে ১৯২২, এই প্রায় চার বছর ধরে, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠার আগে, শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে রবীন্দ্রনাথের একাধিক বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। *গীত-পঞ্চাশিকা* ছাড়াও পরপর মুদ্রিত হল বেশ কয়েকটি স্বরলিপি-সহ গীতিসংকলন গ্রন্থ। *গীতবীথিকা, বৈতালিক* ও *কেতকী* (তিনটি গ্রন্থই ১৩২৬ বঙ্গাব্দে)। মুদ্রিত হল *জাপান যাত্রী* (প্রকাশ ২১ জুলাই ১৯১৯), *অনুবাদচর্চা* (১৯১৯), *অরূপরতন* (ফেব্রুয়ারি? ১৯২০)।

ধীরে ধীরে এই প্রেসের কলেবর বৃদ্ধিতেও সক্রিয় হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'রই অগ্রহায়ণ ১৩২৬ব সংখ্যায় লেখা হল, 'আশ্রমের ছাপাখানা ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। সম্প্রতি আর একটি বড় Machine press আসিয়াছে, তাহাতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী ছাপানো আরম্ভ হইবে।'[৮] ইন্ডিয়ান প্রেস-এর সঙ্গে সম্পর্ক যত আলগা হয়ে এসেছে, তত 'শান্তিনিকেতন প্রেস'-কে কেন্দ্র করে নিজস্ব প্রকাশনা শুরু করার স্বপ্ন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের মনে।

খ. গ্রন্থালয়ের সূচনাপর্ব

আমরা জানি, ১৯১৮ সালে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠিত হলেও সরকারিভাবে তার 'সংবধান' রেজিস্ট্রি করা হয় ১৯২২ সালের ১৬ মে। এরপরই তার সংসদ (Governing Body), ন্যাসিক সভা (Board of Trustees), কর্মসমিতি (Executive Council)-সহ অনেকগুলি পরিচালন-সভা গঠন করা হয়। বিশ্বভারতীর যুগ্ম-কর্মসচিব হন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। এই কর্মসচিবদ্বয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেই বিশ্বভারতীর একটি নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ খোলার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোন রবীন্দ্রনাথ। আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে ২৬,৬০৪ টাকার বিনিময়ে নতুন-পুরনো সব বইয়ের স্বত্ব ইন্ডিয়ান প্রেস বিশ্বভারতীকে দান করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ১৪ ডিসেম্বরের(১৯২২) দিনলিপি থেকে উদ্ধৃত করে আমরা দেখিয়েছি, ওই দিন ইন্ডিয়ান প্রেসের থেকে বইপত্র বুঝে নিচ্ছেন প্রশান্তচন্দ্র। যদিও এই কাজটি চলবে আরও অনেকদিন ধরে। যেমন ১৯২৩ সালের ৩ জুলাই কিশোরীমোহন সাঁতরা(১৮৯৩-১৯৪০) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বিষয়েই লিখছেন, 'Indian Press এর সঙ্গে এখনই একটা বইএর হিসাব করে ফেলা দরকার। আমার এখানে সব কাগজপত্র নাই। যা আছে তা থেকেই একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করেছি। আপনি হঠাৎ চলে যাওয়াতে সেটা আপনাকে দেখাতে পারি নি।'[৯] কী ধরণের 'হিসাব' সেটা আরও খানিকটা বোঝা যায় এর কাছাকাছি সময়ে রথীন্দ্রনাথকে লেখা কিশোরীমোহনের আরও একটি তারিখহীন চিঠি থেকে :

> Indian Publishing Houseএ গিয়ে সন্ধান নিয়ে জানলুম যে আমাদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি একেবারে ছাপা নাই :—
>
> (১)রাজর্ষি (২) ছিন্নপত্র (৩) চয়নিকা (৪) প্রাচীন সাহিত্য (৫) গল্পগুচ্ছ ২য় ভাগ (৬) গীতলিপি ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ (৭) পলাতকা (৮) গীত পঞ্চাশিকা (৯) ডাকঘর (১০) শান্তিনিকেতন ৭, ৮, ১৩শ ভাগ।[১০]

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের দপ্তরেই তাঁদের ছাপা বইগুলি পড়েছিল। সব একসঙ্গে বিশ্বভারতীর কাছে হস্তান্তরিত হয় নি। বিক্রির পরিমাণ অনুসারে প্রায় এক বছর ধরে কিছু-কিছু করে সেই সব বই নিয়ে আসা হত বিশ্বভারতীর কলকাতাস্থ বিক্রয়কেন্দ্রে।

অন্যদিকে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে ১৯২২-এর ২৮ জুন 'প্রবাসী কার্য্যালয়' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *মুক্তধারা* নাটকটি। রামানন্দ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এর স্বত্ব বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়কে দান করেন এবং সেইসঙ্গে

৩৭৫০ কপি *মুক্তধারা* বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩-এর ২১ জানুয়ারি রামানন্দকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি দেন। 'হিতবাদী'ও রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক ও কয়েকটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার অনেকদিন থেকে ভোগ করছিল। এই সময়ে তাঁদের থেকেও অর্থের বিনিময়ে ছাপানো বই বিশ্বভারতী কিনে নেন। ('মজুমদার লাইব্রেরি' পর্বে 'হিতবাদী' প্রসঙ্গে এটি আলোচিত হয়েছে।)

তবে, ঘটনা হল, 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' ব্যাপারটা তখন পরিকল্পনার স্তরে থাকলেও, ১৯২২-এর ডিসেম্বরে তা মোটেই কার্যকরী কোনো রূপ পায় নি। ১৯২৩-এর ১৫ এপ্রিল, বিশ্বভারতী সংসদের (Governing Body) একটি অধিবেশনে সরকারিভাবে একটি 'গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি' গঠিত হয়।[১১] এর সদস্য মনোনীত হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। এর পর থেকেই প্রকাশনা বিভাগটি রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের ব্যাপারে অল্পে অল্পে কাজ শুরু করে। অবশ্য, এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই সমিতিতে অনেকের নাম থাকলেও রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ে নির্ভর করতেন শুধুমাত্র প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উপর। ফলে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গঞ্জনাও তাঁকে সামলাতে হয়েছে প্রায় একাই।

কিন্তু 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' কবে থেকে সরকারিভাবে কাজ শুরু করল, এই নামটিই বা কবে গৃহীত হল, তা নিয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। *রবীন্দ্রজীবনী*-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বিশ্বভারতী প্রকাশনীর অঙ্কুর উপ্ত হইল ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে।'[১২] কিন্তু কোন তথ্যের ভিত্তিতে এই *জুলাই* মাসটি নির্দিষ্ট হল তা প্রভাতকুমার জানান নি। প্রভাতকুমারের এই বাক্যটির ভিত্তিতেই বিশ্বভারতী এই জুলাই মাসকেই তাঁদের গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল বলে ধরেন। *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ পরিক্রমা* নামে যে বিখ্যাত পুস্তিকাটি বেরিয়েছিল গ্রন্থনবিভাগের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে, সেখানেও প্রভাতকুমারের এই বাক্যটির সাক্ষ্যে জুলাই মাসকে গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল বলা হয়েছে।[১৩] আমাদের এ ব্যাপারে কোনো সরকারি নথি চোখে পড়েনি। এ সময়ের সংসদ বা কর্মসমিতির সভার বিবরণেও 'গ্রন্থালয়' নিয়ে আলাদা কোনো প্রস্তাব গৃহীত হতে দেখা যায় না। প্রশান্তকুমার পালের *রবিজীবনী*-তে জুলাই মাসে 'গ্রন্থালয়' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো উল্লেখ নেই।

যাইহোক, ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ শব্দবন্ধটি প্রকাশনার নাম হিসেবে কবে থেকে ব্যবহার করা শুরু হল সে বিষয়ে এখানে খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে।

দিনক্ষণ ধরে এর উত্তর দেওয়াটা একটু কঠিন, কেননা কোন বই কবে প্রকাশিত হচ্ছে নিশ্চিত করে তা অনেকক্ষেত্রেই বলা যায় না। বইতে যা প্রকাশকাল লেখা থাকে তার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত প্রকাশকাল মেলে না। এই দুয়ের মধ্যে কোনো-একটাকে নিশ্চিতভাবে ভরসা করাও যায় না। আলোচনার সুবিধের জন্যে আমরা ১৯২৪-এর গোড়ার দিকে অল্প-সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত পাঁচটি বই-এর নাম ও প্রকাশকাল নিচে জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক, এর সবকটি বইই পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী থেকে অবশ্য প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে এইসময়ে :

বইয়ের নাম	(বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত) প্রথম বিশ্বভারতী-সংস্করণের প্রকাশকাল
চারিত্রপূজা	১০মে ১৯২৪
শিশু	১৬ মে ১৯২৪
চিত্রা	২০মে ১৯২৪
গদ্যগ্রন্থাবলী ১৩ (‘সমাজ’)	২০মে ১৯২৪
কথা ও কাহিনী	*২৫ জুন ১৯২৪*

এই পাঁচটি বইয়ের একটিতেও প্রকাশকের নাম হিসেবে ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ কথাটি লেখা নেই। উদাহরণ হিসেবে এর মধ্যে থেকে *কথা ও কাহিনী* বইটির আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ উল্লিখিত হল :

আখ্যাপত্র : ‘কথা ও কাহিনী/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / সপ্তম সংস্করণ (উপরে ও নিচে লম্বা রেখা)/ ১৯২৪/ মূল্য ১।০ আনা’।

আখ্যাপত্রের পরের পৃষ্ঠা : ‘শান্তিনিকেতন প্রেস,/ শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।’

যেমন বলা হল আগে, ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ নামটি এখানে কোথাও উল্লিখিত নেই। কিন্তু, উপরোক্ত বইগুলি কি বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত তারিখেই প্রকাশিত হয়েছে? সেটা জোর দিয়ে বলা শক্ত। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে ১৯২৪-এর ৪ মার্চ একটি চিঠিতে কিশোরীমোহন সাঁতরা জানাচ্ছেন, “কথা ও কাহিনী’ এসে

গেছে। দপ্তরী আজকালের মধ্যে দেবে – সব ব্যবস্থা করে এসেছি।’[14] ৪ মার্চ ‘সব ব্যবস্থা করে’ আসার পর, এমনকী দপ্তরীও ‘আজকালের’ মধ্যে দিয়ে দেবে এই আশ্বাসের পর, বইটি বেরোচ্ছে ২৫ জুন, এটা স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব। এই ধরণের নানা কারণে আমাদের মনে হয়, উপরের সবকটি বই-ই ১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদই প্রকাশিত হয়ে থাকবে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে ‘এন্ট্রি’ হয়েছে মে-জুনে। যাইহোক, এই বইগুলোতে ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ নাম নেই।

সেক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত : ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আগে (১৯২৪-এর এপ্রিল) ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ নামটি কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। আমরা খেয়াল করেছি, প্রথম বিশ্বভারতী-সংস্করণ (আদতে পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ) *চয়নিকা* বইটিতেই প্রথমবার ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার হচ্ছে। (দ্রষ্টব্য : চিত্র-৮) কবে প্রকাশিত হল এই*চয়নিকা* ? বইটির আখ্যাপত্রের পরের পৃষ্ঠায় প্রকাশকাল লেখা আছে ‘বৈশাখ ১৩৩১’। সেই হিসেবে ১৯২৪-এর এপ্রিল-মে নাগাদ বইটির বেরোনোর কথা। বইটি যে উপরোক্ত *কথা ও কাহিনী*-র পরেই বেরিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, *চয়নিকা*-র এই সংস্করণটির একেবারে শেষ তিনটি পৃষ্ঠা জুড়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপনে অন্য বইয়ের সঙ্গে উক্ত *কথা ও কাহিনী*র বিজ্ঞাপনও আছে।

সেই সঙ্গে এ-ও জানিয়ে রাখা যাক যে, প্রকাশনার নাম হিসেবে ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ শব্দবন্ধটিকে বিজ্ঞাপনে ও পত্রিকার প্রতিবেদনে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখেছি ১৩৩১-এর বৈশাখের পর থেকেই। যেমন, ‘প্রবাসী’ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সংখ্যায় (মে-জুন ১৯২৪) ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’-এর তরফ থেকেই একটি বিজ্ঞাপন বেরোয়, এবং সেই বিজ্ঞাপনকে সামনে রেখে ওই একই সংখ্যায় ‘প্রবাসী’ একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করে যেখানে লেখা হয়, ‘রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে দুই শত শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় পাঁচটি পুরস্কার দিবেন...’ ইত্যাদি।[15] (নিম্নরেখ আমাদের)

যাইহোক, বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে প্রথম নতুন বই প্রকাশিত হল ফাল্গুন ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (ফেব্রুয়ারি ১৯২৩), রবীন্দ্রনাথের লেখা গীতিনাট্য *বসন্ত*। বইটির সঠিক প্রকাশ তারিখটি জানা যায় না। উৎসর্গপত্রের তলায় রবীন্দ্রনাথের দেওয়া তারিখটি ছিল ১০ ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি)। বইটির **অখ্যাপত্রে** লেখা হল : ‘বসন্ত/

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ফাল্গুন/ ১৩২৯'। **আখ্যাপত্রের পরের পৃষ্ঠায়** অন্যান্য বিবরণ জানানো হল এইভাবে, 'শান্তিনিকেতন প্রেসে/ শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত/ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।' লক্ষণীয়, প্রকাশক হিসেবে জগদানন্দ রায়ের নাম উল্লিখিত হলেও প্রকাশনার কোনো নাম নেই। তখনও সরকারিভাবে 'গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি' গঠিত হতেও প্রায় মাস-দুয়েক দেরি আছে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের কাজ শুধু শান্তিনিকেতন থেকে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না, সেটা প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। কেননা মূল দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের অধিকাংশই আশ্রমিক নন। তাছাড়া প্রকাশনার যাবতীয় বই ছাপার দায়িত্ব শান্তিনিকেতন প্রেস-এর পক্ষে নেওয়া সম্ভব না। বিপননের ব্যবস্থাও কলকাতা থেকে করা ছাড়া উপায় নেই। ফলে ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণী) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের অদূরে একটি বাড়িতে বিশ্বভারতীর দপ্তর খোলা হল। (এখনও এই বাড়িটি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অন্যতম বিপনন কেন্দ্র) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বিভাগের (অর্থাৎ, কলকাতার দপ্তরের) দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ।'[১৬] তা যদি হয়েও থাকে, তবুও, এই দায়িত্বে তিনি নিশ্চয়ই বেশিদিন ছিলেন না। কেননা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩১ব সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২৪) এই খবর পাওয়া যায় যে, 'আশ্রমের একাউন্টান্ট শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় সুরুল বিভাগের একাউন্টান্ট নিযুক্ত হইয়া সুরুলে গিয়াছেন।'[১৭]

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের একেবারে প্রথম পর্বে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যে মানুষটিকে তাঁর মূল সহায়ক হিসেবে ডেকে নিয়েছিলেন তিনি কিশোরীমোহন সাঁতরা। কিশোরীমোহনের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র-এর কীভাবে পরিচয় হয় তা বলা শক্ত, তবে ১৯২২-এর শেষ দিকে তিনি বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন। ৩০ বছর বয়সী কিশোরীমোহনকে প্রশান্তচন্দ্র দায়িত্ব দেন গ্রন্থালয়ের কলকাতা অফিসের কাজকর্ম সামলানোর। শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথের পুরোনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, নতুন সংস্করণ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হতে থাকে। তবে যেহেতু 'ইন্ডিয়ান প্রেস'-এর থেকে অবিক্রীত সমস্ত বই বিশ্বভারতীর হাতে এসেছে সদ্য, ফলে ১৯২৩-এ খুব বেশি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ তাঁদের করতে হয় নি। আমাদের অনুসন্ধান মতো, মাত্র তিনটি বই এই বছরে ছাপতে হচ্ছে বিশ্বভারতীকে, সেগুলি হল, *রাজর্ষি*, *গদ্যগ্রন্থাবলী* দ্বিতীয় ভাগ ('প্রাচীন সাহিত্য') এবং *পলাতকা*। বলাবাহুল্য, সবকটিই পুনর্মুদ্রণ।

১৯২৪-এর শুরুতে দেখা যায় অনেকগুলি গ্রন্থের জন্যে একসঙ্গে কাজ চলছে। এ বিষয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা কিশোরীমোহন সাঁতরার পূর্বোল্লিখিত অপ্রকাশিত চিঠিটি আর-একটু বিস্তারে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি। চিঠিটি লেখার তারিখ ৪ মার্চ ১৯২৪।

> ‘চয়নিকা’র জন্য একটু তাড়া দেওয়া দরকার। শনিবার আমি তাড়া দিয়ে এসেছি। যতীনবাবু বলেছেন এখন থেকে তিনি প্রত্যেকদিন ২/১ ফরম্ এর proof পাঠাবেন। আপনি যাবার পথে একটু যদি বলে যান তবে ভাল হয়। ‘চয়নিকা’ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ করে দেবার কথা ছিল। ‘কথা ও কাহিনী’ এসে গেছে। দপ্তরী আজকালের মধ্যে দেবে – সব ব্যবস্থা করে এসেছি। ‘গীতাঞ্জলীর’[য] cover ছাপ্‌তে দিয়ে এসেছি। দপ্তরী আজ নিয়ে আস্‌বে – approval এর জন্য। আপনি দেখে দেবেন। গীতাঞ্জলী এখন মাসে ৪০০ আন্দাজ বিক্রি হচ্ছে। Stock এ বাঁধান আর ১৭৫ খানা আছে। এক সপ্তাহের মধ্যে আরো কিছু বাঁধিয়ে ফেল্‌তে হবে। একটু তাড়াতাড়ি approval করে দেবেন।

বিশ্বভারতী *গীতাঞ্জলি*-র সংস্করণ বের করেছিল ১৯২৪-এর জানুয়ারি মাসে, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশ তারিখ ২৫ জানুয়ারি। কিন্তু এই চিঠি অনুযায়ী, মার্চ-এর গোড়াতেই দেখা যাচ্ছে ‘stock’ প্রায় শেষ, নতুন করে বাঁধানোর প্রয়োজন পড়ছে। *গীতাঞ্জলি*-র চাহিদা সম্পর্কে এর থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

চয়নিকা-প্রসঙ্গে খানিকটা কথা আমরা আগেই বলেছি। *চয়নিকা*-র এই মুদ্রণটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রর গুরুত্বপূর্ণ একটি তর্ক শুরু হবে, যেটা রবীন্দ্রনাথের অবশিষ্ট জীবৎকাল-জুড়ে বজায় থাকবে। সে বিষয়ে তাই আর-একটু বিস্তারিতভাবে বলা আবশ্যক। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে রবীন্দ্রকবিতা-সংকলন-গ্রন্থ *চয়নিকা* প্রথমবার প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সালে। এরপর ওই একই প্রকাশনী আরও কয়েকবার বইটি পুনর্মুদ্রিত করে। ১৯২৪-এর প্রথম দিকে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে *চয়নিকা*-র পুনর্মুদ্রণের উদ্‌যোগ নেওয়া হলে রবীন্দ্রনাথ এর কবিতানির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, বিশেষত ততদিনে নিজের প্রথম যুগের লেখালেখি নিয়ে তাঁর বিস্তর অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, ফলে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব দেন তিনি একটি নতুন ‘ভূমিকা’ বইটির সঙ্গে জুড়ে দিতে চান যেখানে প্রথমযুগে লেখা কবিতাগুলি নিয়ে তাঁর আপত্তি তিনি পাঠককে জানিয়ে রাখবেন। প্রশান্তচন্দ্র সম্ভবত তাঁকে বোঝাতে যান যে, এবারের উদ্‌যোগটি পুনর্মুদ্রণ মাত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে সেই প্রেক্ষিতে ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯২৪) একটি চিঠি লিখে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন :

হোক্ না reprint– এই উপলক্ষে আমি পাঠকদের কাছে আমার বক্তব্য জানাতে ছাই। আমার কবিতা সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কোথায় আরম্ভ হয়েচে সে কথা স্পষ্ট করে যদি না জানিয়ে রাখি তাহলে আমার নিজের পরে অবিচার করা হবে। আমি আমার গ্রন্থ্ থেকে ভাল ও মন্দ কবিতাকে বেছে আলাদা করতে চাই নে কিন্তু অকবিতা ও কবিতাকে আলাদা করতে চাই। যাঁরা ঐতিহাসিক বিকাশ দেখতে চান তাঁদের মালমশলার অভাব হবে না – কিন্তু আমি যাকে আমার কাব্য বলে স্বীকার করি নে তাকে বারেবারে আমার কাব্যসংগ্রহের মধ্যে স্থান দিতে চাই নে।...আমি সঙ্কীর্ণ সময়ের মালিক। আমাকে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে নিতে হবে। অতএব সেই ভূমিকাটা চয়নিকার এই সংস্করণেই দিয়ো। তোমরা প্রকাশকরূপে নীচে একটুখানি নোট করে দিতে পার যে এই চয়নিকা কেবলমাত্র পুনঃসংস্করণ – এটা পরিবর্ত্তন করবার সময় হাতে নেই। তাছাড়া আমার মতের সঙ্গে তোমাদের মতের যদি অনৈক্য থাকে তাও তোমরা জানাতে পার – কিন্তু আমার কথাটা আমাকে বলে নিতে দাও।[১৮]

অবশ্য, এই *চয়নিকা*-র মুদ্রণটিতে শেষপর্যন্ত কোনো ‘ভুমিকা’ যায় নি, ধরে নেওয়া যায় প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবারের মতো। কিন্তু এই ‘যুক্তি’ রবীন্দ্রনাথ এরপর থেকে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ্ প্রকাশের আগেই সামনে আনতে থাকবেন, বিশেষ করে *রবীন্দ্ররচনাবলী* প্রকাশের কালে এই ‘বিরোধ’ খুবই জোরদার হয়ে উঠবে, আমরা যথাস্থানে সেসব দেখব। তবে, প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যাক যে, উল্লিখিত ‘ভুমিকা’টি প্রকাশিত না-হলেও সেটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত সেই ‘ভুমিকা’য় তিনি জানিয়েছিলেন, ‘“কড়ি ও কোমল” হইতে আমার কবিতার পূর্ব্বপ্রান্তের আরম্ভ। তার আগের কোনো লেখাকেই আমি কাব্য বলিয়া স্বীকার করি না। কেবলমাত্র গোত্র ধরিয়া আমার কাব্যপংক্তিতে তাহাদিগকে স্থান দেওয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিককে সাজে, কাব্যরসিককে কদাচ নহে। এইজন্য সেই সকল ভূতপূর্ব্ব লেখার সম্বন্ধে সর্ব্বসমক্ষে আমি কবির দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছি।...অন্ধ মুদ্রাযন্ত্রের কালী সাহিত্যে সজীব ও নির্জ্জীবকে একই দাগে দাগিয়া দেয় বলিয়াই এত উৎপাত বাড়ে, এত জঞ্জাল জমিয়া ওঠে।’[১৯] (দ্রষ্টব্য : চিত্র-২১, ভূমিকাটির পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য : এই অধ্যায়ের ‘সংযোজন’ অংশ) মুদ্রণব্যবস্থাকে সেই ‘লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী’ প্রবন্ধের (‘ভারতী’, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০) যুগ থেকেই নানান কটূভাষণে তিরস্কৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এইবার তাকে তিনি বললেন ‘অন্ধ’। এই ‘অন্ধ’ মুদ্রাযন্ত্রকে সামনে রেখেই অতঃপর ‘বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক’

প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে ‘কাব্যরসিক’ রবীন্দ্রনাথের রোমাঞ্চকর টানাপোড়েনের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে পরের অনেকগুলি বছর।

আরও একটি কারণে *চয়নিকা*-র এই সংস্করণটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বভারতীর যাবতীয় বই এতদিন ছাপা হচ্ছিল শান্তিনিকেতন প্রেস থেকেই। সেজন্য বইগুলির প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে শান্তিনিকেতন প্রেস-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত জগদানন্দ রায়ের নামই লেখা থাকত। কিন্তু ১৩৩১-এর শুরু থেকে আমরা দেখি, বই ছাপা হচ্ছে কলকাতার কোনো-না-কোনো ছাপাখানা থেকে। যেমন, *চয়নিকা* ছাপা হল ‘১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার’-এ অবস্থিত ‘আর্ট প্রেস’ থেকে, মুদ্রাকর হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই নাম রইল ঐ প্রেসটির স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ মুখার্জির। আর প্রকাশক হিসেবেও, এই প্রথমবার, জগদানন্দ-র নাম বাদ গেল, তার পরিবর্তে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের কলকাতা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কিশোরীমোহন সাঁতরার নাম যুক্ত হল। কলকাতার ছাপাখানা থেকে বই ছাপা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের কিছু টানাপোড়েন দেখা দেবে, এবং ১৯২৬ থেকে কলকাতা থেকে ফের ব্যবস্থাটা ফিরে আসবে শান্তিনিকেতনে। সেকথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

এইভাবে, ১৯২৪-এর শুরু থেকেই এই *চয়নিকা*-সহ নানান বইয়ের পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা জোরকদমে শুরু হল। কিন্তু, বৈশাখ মাসে (১৯২৪ এপ্রিল-মে) *চয়নিকা* প্রকাশিত হয়ে যাবার পর দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস কোনো বই ছাপা হওয়ার খবর আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। ফের ১৯২৪-এর নভেম্বরে বের হচ্ছে *নৌকাডুবি*-র প্রথম বিশ্বভারতী সংস্করণ। *নৌকাডুবি* বইটিতে বিশ্বভারতী প্রকাশনার একটি জরুরি বাঁকবদল লক্ষ করা সম্ভব। *নৌকাডুবি*-র এই সংস্করণটি থেকেই বইয়ের মধ্যে তার প্রকাশনার ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য যুক্ত করা শুরু হল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করেছে। আমাদের মতে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বিস্তারিত ‘গ্রন্থপরিচয়’-সহ *সম্পাদিত* গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্বভারতী বাংলা প্রকাশনার পথপ্রদর্শক। এই বইটি থেকে তার যেন একটা আলগা সূচনা হল। অবশ্য বিস্তারিত সম্পাদনা দেখা যাবে আরও কিছু পরে।

প্রসঙ্গত জানানো যাক, *নৌকাডুবি* বইটিতে প্রথমবার প্রকাশক হিসেবে পাওয়া যাবে জনৈক হরিহর চন্দ্রের নাম। দ্বিতীয় কোনো বইতে এই নামটি আর ফিরেও আসে নি কখনও। এঁর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে ইনি প্রশান্তচন্দ্রের পরিচিত, তাঁর সূত্রেই নিযুক্ত হন গ্রন্থালয়ের দায়িত্বে।

আসলে, এই সময়ে সাধারণভাবে কলকাতা-অফিস এবং বিশেষভাবে গ্রন্থালয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজছিলেন প্রশান্তচন্দ্র। ব্যস্ততার কারণে এই দায়িত্ব তাঁর নিজের পক্ষে সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না। হরিহর চন্দ্রকে গ্রন্থালয়ের দায়িত্ব দিয়ে আনবার পর তাঁকে সাধারণভাবে অফিসের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার কথাও যে ভাবা হচ্ছিল সেটা জানা যায় রথীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্রের ২ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখের একটি চিঠি থেকে, 'Publishing ও General Office নিয়ে ভাবনায় পড়েচি। হরিহর পুরোপুরি charge নিতে পারবে কিনা এখনো বুঝতে পারচিনে। আরেকটু দেখে আপনাকে লিখব।'[২০] অবশ্য আমরা দেখব, অচিরেই হরিহর চন্দ্রের উপর ভরসা হারিয়ে ফেলছেন প্রশান্তচন্দ্র, ফলে *নৌকাডুবি* প্রকাশের পরই বিশ্বভারতী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে।

প্রশান্তচন্দ্রের নব-উদ্‌যোগ ও করুণাবিন্দু বিশ্বাস

১৯২৪-এর শেষদিক থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ নিজে গ্রন্থালয়ের ব্যাপারে আরও বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করেন। তিনি বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, ফলে সামগ্রিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের অনেক বড়ো দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। তার মধ্যেও যে গ্রন্থালয়ের কাজ অন্য অনেক কাজের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর্থিক ও বৌদ্ধিক – উভয় কারণেই, সেটা বুঝে প্রশান্তচন্দ্র গ্রন্থালয়ের অধিক উন্নতিকল্পে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন এইসময়ে। ১৯২৪-এর ৬ নভেম্বর অপর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন, 'Publishing Departmentটা ধরেছি – এতদিন বড় neglect করা হয়েছে, এবার উঠে পড়ে লেগেছি ওটাকে ভাল করে খাড়া করতে। গতবছরের চেয়ে এবার sales অবশ্য বেশি হয়েছে – অর্থাৎ এখনও steadily বাড়চে – কিন্তু যা হতে পারে, তার তুলনায় কিছুই নয়।'[২১] ঠিক কী ধরণের ভাবনাচিন্তা করছেন তিনি, সে বিষয়েও আগে-পরে অনেকগুলি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে নানা কথা জানাচ্ছেন প্রশান্তচন্দ্র। যেমন ২১ অক্টোবর গিরিডি থেকে লিখেছিলেন :

> Reprint সম্বন্ধে ৩ বছরের মতন programme তৈরি করেচি। কলকাতায় ভাল ভাল প্রেসও যদি ৬ মাস আগে copy পায় ত খুব সস্তায় কাজ করতে রাজি আছে – ২।৩ টে প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। Advertisement সম্বন্ধেও একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করেচি। একটা series খাড়া করে পর পর কয়েকমাস

ধরে বের করব – নন্দবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ওঁরা advertisementএর জন্যও design করছেন। আর এছাড়া কয়েকখানা illustrated edition – যে-সব বইগুলি বেশি বিক্রী হবে।[২২]

ঠিক এইসময় থেকেই গ্রন্থনবিভাগের কাজে যে অনেকটা গতি আসবে তাতে সন্দেহ নেই। পুনর্মুদ্রণ ও নতুন গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে এর পর থেকেই গ্রন্থালয় তার কাজের পরিধি অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতে পারবে। তবে 'Illustrated' বই কিছু এই সময়ে বেরোয় নি। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম অলংকৃত বই *রক্তকরবী* বেরোবে অনেক পরে ১৯২৬ সালে।

অবশ্য শুধু এইটুকুই নয়, প্রশান্তচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল আরও অনেক বড়ো মাপের। ১ জানুয়ারি ১৯২৫-এর একটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর প্রস্তাব ছিল আরও সুদূরপ্রসারী, তিনি চেয়েছিলেন কলকাতাতেই বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে একটি ছাপাখানা খোলা হোক। শান্তিনিকেতনের প্রেসটি আছে বটে, কিন্তু এই সময়ে যেহেতু মুদ্রণকার্য যাবতীয় পরিচালিত হচ্ছে কলকাতা অফিস থেকে, বই ছাপানোও হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে কলকাতার বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে, তাই প্রশান্তচন্দ্রের প্রস্তাব ছিল, 'কিন্তু শুধু এইটুকু নয় নিজেদের Press করতেই হবে, press করতে যত দেরি তত লোকসান। আমার প্রস্তাব যে General Fund থেকে আরও ২০,০০০ টাকা ১০% সুদে ধার নিয়েও press করা উচিত।'[২৩] অর্থনৈতিক নানা টানাপোড়েনে এই প্রস্তাব অবশ্য কখনই কার্যকর হয় নি। তাছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রেসটিকেই বড়ো করে তোলবার পক্ষপাতী ছিলেন, সেই কারণে পরবর্তীকালে ছাপার কাজও কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনেই সরে আসবে। তবে এই সমস্ত চিঠিগুলি থেকে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের শুরুর দিনগুলিতে তার উন্নতিকল্পে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আন্তরিক মনোযোগের কথাটি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে আসে।

যাইহোক, এই সূত্রেই প্রশান্তচন্দ্রের মনে পড়বে গ্রন্থনির্মাণে দক্ষ একজন মানুষের নাম : করুণাবিন্দু বিশ্বাস। ইনি বিখ্যাত মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ, বেশ কিছুকাল কর্মরত ছিলেন বিখ্যাত 'ইউ. রায়. এন্ড সন্‌স'-এর ম্যানেজার পদে। তাঁর সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রর আলাপ ও তাঁর সম্পর্কে প্রাথমিক বিবেচনার কথাগুলি জানিয়ে প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে ৩০ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখে লেখেন :

General office আর Publishing Department সম্বন্ধে গোটা কয়েক definite প্রস্তাব আছে — আপনার মতামত জানাবেন। হরিহরকে দিয়ে চল্‌বে না, খাটতে গর্-রাজি নয়, interestও আছে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে

sense of responsibility নেই, অর্থাৎ এর উপর নিশ্চিন্ত মনে business ফেলে দেওয়া যায় না।... গত একমাস frantic ভাবে লোক খুঁজে বেড়িয়েছি — ঠিক সুবিধা করতে পারিনি। তারপর কাল রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে করুণাবিন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে সব ভেঙ্গে বল্‌লাম — আসচে বছর যে বিলাত যেতে চাই, general sideএর কাজ ইত্যাদি সব কথা। করুণা রাজি আছে, কিন্তু ১৫০৲র কমে আসা অসম্ভব। আমার নিজের মত যে ১৫০৲য় যদি পাওয়া যায় ত খুবই লাভ। ইতিমধ্যে মণির (সুবিনয়ের) সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে করুণাকে আবার U.Rayতে ফিরে যাবার জন্য বলচে, আগে যা-ছিল তার চাইতে অনেক ভাল conditionএ, অর্থাৎ নিজের departmentএ সম্পূর্ণ independence থাকবে, detail নিয়ে interference হবে না ইত্যাদি সর্তে।... এইরকম অবস্থায় করুণাকে Deputy Secretary করলেই সুবিধা। করুণা, business এবং administrationএর পুরো ভার নিতে পারবে — আমি whole-time দিয়ে যা করতে পারব, তার চাইতে করুণা অনেক ভালই পারবে।... এখন difficulty হচ্ছে এই যে হরিহরের জন্য ৬০৲ টাকা Budgetএ sanction করা আছে, সেই জায়গায় লাগবে ১৫০৲ অর্থাৎ ৯০৲ কম পড়চে। এই টাকাটা পাব কোথা থেকে।[২৪]

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে করুণাবিন্দুকে নিয়ে 'ইউ.রায় এন্ড সন্‌স'-এর সঙ্গে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের টানাটানির একটি উপভোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, চিঠিতে উল্লিখিত সুবিনয় হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র, সুকুমার রায়ের ভ্রাতা, সেইসময়ে 'ইউ.রায় এন্ড সন্‌স'-এর কর্ণধার সুবিনয় রায়। এই চিঠি থেকে সেকালে কর্মচারীদের প্রতি গ্রন্থালয়ের আর্থিক দায়ের কথাটিও খানিক স্পষ্ট হয়। যাইহোক, জরুরি প্রশ্নটা ছিল এই যে, ১৫০ টাকায় করুণাবিন্দুকে রাখাটা বাহুল্য হবে কিনা, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ে কী মত। আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাই রথীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্রের পরবর্তী একটি চিঠি থেকে, এই চিঠি লেখা হল ৬ নভেম্বর :

করুণাকে ১৫০৲য় Deputy Secretary বা ঐরকম একটা Responsible postএ appoint করলে General Administration সম্বন্ধে আর ভাবতে হবে না। শুধু ১৫০৲দিলে চলবে না – বিশেষত যদি Press করা যায় – নতুন লভ্যাংশ [?] (অর্থাৎ এখন যা লাভ হচ্ছে তার উপর ১৫০৲ allowance বাদ দিয়ে যা বাড়টি লাভ হবে তার উপর) উপর[য] একটা bonus দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। নইলে ওরকম লোককে পাওয়া অসম্ভব। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বললেন যে ১৫০৲টাকায় করুণাকে পাবে কি করে? করুণা ওর অন্তত

দুতিনগুণ মাসে রোজগার করে, তবে bonus ইত্যাদির ব্যবস্থা করে’ যদি ১৫০্য় ওকে পাও ত এখনি appoint করো।[২৫]

এই নিয়োগে রথীন্দ্রনাথের খুব যে সায় ছিল তা নয়, কিন্তু এই চিঠিই প্রমাণ, করুণাবিন্দুর দক্ষতাকে বিশ্বভারতীর কাজে লাগানোর প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের গভীর আগ্রহ ছিল। ফলে রথীন্দ্রনাথও আপাতত ব্যাপারটি মেনে নেন। করুণাবিন্দুর সম্মতিও পাওয়া যায় অচিরেই। প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে সেই খবর দিয়ে খানিক আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে লেখেন যে এই নিয়োগ একেবারে স্থায়ী না, কিছুদিন দেখে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ১১ ডিসেম্বরের (১৯২৪) চিঠিতে কবিপুত্রকে প্রশান্তচন্দ্র জানালেন :

করুণা আপিসের charge নেবে কাল থেকে। ভরসা হচ্ছে যে এবার সব গুছিয়ে নিতে পার্‌ব। করুণাকে বলেছি যে highly paid asst. secy. রাখাটা একটা experiment; করুণাও অবশ্য সেভাবেই দেখ্‌ছে – ও বল্‌ছে ৬।৭ মাস – না হয় একবছর দেখ্‌ব, দেখে বল্‌ব যে কিভাবে business চালানো উচিত অর্থাৎ highly paid asst. secy. রাখা advisable কি না।...করুণা নিজের সম্বন্ধেও impartial opinion দেবে এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ১৫০্র চাকরি ওর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য নয়... আপাতত ৬ মাসের জন্য appointment, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।[২৬]

ঠিক ‘কাল থেকে’ অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর থেকে নয়, ‘অফিসিয়ালি’ করুণাবিন্দু কার্যভার গ্রহণ করেন ২০ তারিখে। সে খবর পাওয়া যায় বিশ্বভারতী সংসদের (Governing Body) ১৯ ডিসেম্বরের বৈঠকের সিদ্ধান্ত থেকে। তার 4(ii) নম্বর ‘রেজোলিউশন’-এ লেখা হয়, ‘Resolved further that Karunabindu Biswas be appointed as Assistant Secretary for 6 months on a salary of Rs. 150/- with effect from 20th December, 1924.’[২৭]

নৌকাডুবি প্রকাশের পর মাঘ ১৩৩১-এ [জানুয়ারি ১৯২৫, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের এন্ট্রি ২ জুন ১৯২৫] যখন *রাজর্ষি* বইটির একটি বিশ্বভারতী সংস্করণ প্রকাশিত হল, তাতে দেখা গেল হরিহর চন্দ্রের বদলে বইটির প্রকাশক হিসেবে নাম আছে করুণাবিন্দু বিশ্বাসেরই।

প্রসঙ্গত, করুণাবিন্দুর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত এই প্রথম বইটিই গ্রন্থালয়ের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে গণ্য হওয়া উচিত। *রাজর্ষি* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উদ্‌যোগে, ‘আদি

ব্রাহ্মসমাজ’ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে। তারপর বইটি একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বিশ্বভারতী ছাপার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরই (তখনও ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার হওয়া শুরু হয় নি) ১৯২৩ সালে এর ‘দ্বিতীয় সংস্করণ’ প্রকাশিত হয়। ‘সংস্করণ’ বললেও তা কার্যত আগের বইগুলিরই পুনর্মুদ্রণই ছিল। কিন্তু ১৯২৫-এ করুণাবিন্দুর তত্ত্বাবধানে যে ‘তৃতীয় সংস্করণ’টি প্রকাশিত হল তা যথার্থই একটি ‘সংস্কৃত’ প্রকাশ। অবশ্য এর পিছনের মূল উদ্‌যোগী মানুষটির নাম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সেই সময়ে সজনীকান্ত দাস ১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বিশ্বভারতী প্রকাশনার অফিসের একটি ছোট ঘরে থাকছেন, তার বদলে প্রশান্তচন্দ্র তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন বইয়ের ‘প্রুফ’ দেখার। আর এই সূত্রেই তাঁকে এবং কবি ও ডাক্তার জীবনময় রায়কে প্রশান্তচন্দ্র দায়িত্ব দিলেন ১২৯২ বঙ্গাব্দে ‘বালক’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসটির সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থপাঠ মিলিয়ে উপন্যাসটির একটি আদর্শ পাঠ খাড়া করতে। সজনীকান্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, ’১০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে রাত্রি নয়টা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কপি মিলাইয়া রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখিতাম। এখানেই ১২৯২ সালের বালক হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ মিলাইয়া বিশ্বভারতী-সংস্করণ ‘রাজর্ষি’ (জানুয়ারি ১৯২৫) প্রকাশ করি। জীবনময় রায়ের সহযোগে ইহাই আমার সর্বপ্রথম পুস্তক-সম্পাদন।[২৭ক] ‘প্রকাশ করি’-জাতীয় সজনীকান্ত-সুলভ অহমিকাটুকু ছেড়ে দিলে এই বিবরণ যথার্থ। পূর্বাপর পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি পাঠ মিলিয়ে ‘সম্পাদিত’ গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্বভারতী অচিরেই বাংলা প্রকাশনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে, তার সূচনা হল প্রশান্তচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রাজর্ষি-র এই সংস্করণটির মধ্যে দিয়ে। ঐতিহাসিক এই সংস্করণটি প্রকাশ পেল করুণাবিন্দুর মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে, সেই তথ্যও এখানে স্মরণীয়।

<u>(‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’-এর নামে প্রকাশিত) ‘প্রথম বই’ : *পূরবী*</u>

বসন্ত ছিল বিশ্বভারতীর তরফ থেকে প্রকাশিত প্রথম বই (কার্যত পুস্তিকা)। কিন্তু সেই বইতে ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’ কথাটি ব্যবহৃত হয় নি। করুণাবিন্দু বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৯২৫-এর জুলাই) প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের নতুন কবিতার বই *পূরবী*। এইটিই ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়’-এর নামে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নতুন বই। বইটির আখ্যাপত্রের বিবরণ নিম্নরূপ :

পূরবী / শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতীর 'লোগো'/ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এটি ছাপা হল কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর মুদ্রণ-তত্ত্বাবধানে 'ইউ. রায়. এণ্ড সন্স' থেকে।

পূরবী 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়'-এর নামে প্রকাশিত প্রথম (নতুন) বই, কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে এই বই প্রকাশকে ঘিরে জড়িয়ে ছিল একরাশ উদ্বেগ। ১৯২৪-এর ১৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা যাবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেন। দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে ফের কলকাতায় ফেরেন ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। এই যাত্রাকালে তিনি ডায়ারি লিখেছেন, লিখেছেন কবিতা। রবীন্দ্রনাথের প্রথমিক পরিকল্পনা ছিল, সেই ডায়ারি ও কবিতাগুলিকে একসঙ্গে কোনো একটি বইতে প্রকাশ করতে। সেই প্রস্তাবিত গ্রন্থটির নাম তিনি ঠিক করেন 'বৈকালী'। ৩ অক্টোবর ১৯২৪-এ প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা রথীন্দ্রনাথের একটা চিঠিতে প্রথম এই খবর জানা যায়, 'বাবা বল্লেন নতুন কবিতার বইয়ের নাম দিতে "বৈকালী"। অনেকগুল কবিতা ছড়িয়ে আছে সবগুল সন্ধান করে সংগ্রহ করে রেখো। Shillong থেকে দুটি মেয়েকে যে বেশ লম্বা চিঠির ধরণে কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন — আছে ত?'[২৮] কবিতাগুলোর সঙ্গে যে গদ্যও একত্রিত করে ছাপতে হবে সেই খবরটা দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৪-এর ১১ অক্টোবর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে চিঠি লিখে তাঁর পরিকল্পনাটি তিনি জানান :

> হালের কবিতাগুলো নিয়ে যদি বই ছাপাও নাম দিয়ো "বৈকালী"। সমুদ্রে যেগুলো লিখেচি তার গদ্য অংশ সুদ্ধ যেন ছাপানো হয়, সেটা নিয়মবিরুদ্ধ হতে পারে কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ নয় — কারণ, কথাই আছে, দেবতা যাদের একত্র করেচেন মানুষ তাদের যেন পৃথক্ না করে।[২৯]

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মেনে এ ব্যাপারে উদ্‌যোগও শুরু হয়ে যায় গ্রন্থালয়ের পক্ষ থেকে। ২১ অক্টোবর (১৯২৪)-এ রথীন্দ্রনাথকে প্রশান্তচন্দ্র লেখেন, '"বৈকালী" ও ডায়ারি ছাপানর কথা note করে নিয়েচি; কবির যেমন ইচ্ছা ঠিক সেইরকমভাবেই ব্যবস্থা করব। এখন mss. এসে পৌঁছলে হয়।'[৩০] অবশ্য গদ্য ও কবিতা একসঙ্গে ছাপানোর বিষয়টা নিশ্চয়ই অচিরেই পরিত্যক্ত হয়, সেটি প্রথম জানা যায় ১৯২৫-এর ২০ জানুয়ারি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'গ্রন্থ পরিচিতি' বিভাগে প্রকাশিত একটি সংবাদে। সেখানে 'বৈকালী'কে শুধুমাত্র কবিতার বই হিসেবেই ঘোষণা করে লেখা হয় :

> কিছুদিন হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার নবরূপান্তরে যে অপূর্ব্ব কবিতাগুলি আমরা পাইতেছি, সেগুলি একত্র করিয়া ‘বৈকালী’ নাম দিয়া গ্রন্থাকারে বিশ্বভারতী প্রকাশ করিবেন।...তাঁহার আধুনিক কবিতাগুলির সহিত ‘অরবিন্দের প্রতি’ ‘শিবাজী’ প্রভৃতি কয়েকটি ভাল কবিতা, যাহা ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও থাকিবে। কিন্তু ‘বিশ্বভারতী’, ‘বৈকালী’ নামটা কেন নির্বাচন করিলেন? আমরা এখনো বিশেষ আধুনিক কবিতাগুলিতে কবি-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-কিরণ-দীপ্তিই দেখিতেছি এবং ইহা ‘বৈকালী’ নহে, — তাহা আশা করি বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিবেন।[৩১]

আনন্দবাজারের এই ‘আপত্তি’র কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণে, ‘বৈকালী’ নামটাও পরিত্যক্ত হবে এরপর। কিন্তু সংবাদপত্রে খবর বেরিয়ে যাওয়ার পরে আরও ছ’মাস লাগল বইটি শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হতে, এর থেকে বোঝা যায় তখনও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের কর্মপদ্ধতিতে কিছু সমস্যা ছিল, আমরা পরে তা নিয়ে আলোচনা করব। জুন মাসের পর থেকে অধৈর্য রবীন্দ্রনাথ একের পর এক চিঠিতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে তাগাদা দিতে শুরু করলেন *পূরবী*-র আশু প্রকাশের ব্যাপারে। প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত প্রশান্তচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রের সংকলন *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত* (প্রথম সংস্করণ) বইটি থেকে সেরকম কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করতে পারি আমরা। ৭ জুন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘পূরবীর প্রুফ একটুখানি উঁকি মেরেই গা ঢাকা দিয়েছে।’(পত্র নং ৬১) ১৫ জুন লিখলেন শুধু ‘পূরবী?’(পত্র নং ৬২) ! ৬ জুলাই বললেন, ‘পূরবীর প্রুফ দিচ্চ না কেন?’(পত্র নং ৬৪)। এর মধ্যিখানে অধৈর্য রবীন্দ্রনাথ ছেলে রথীন্দ্রনাথের কাছেও খোঁজখবর নিয়েছেন বইটির ব্যাপারে, ১৮ মে ছেলের কাছে জানতে চেয়েছেন, ‘নতুন কবিতার বই ছাপাবার কি কোনো ব্যবস্থা হয়েছে?’[৩২] রবীন্দ্রনাথের এর উপর্যুপরি তাগাদার ফলেই বইটি শেষপর্যন্ত বেরোল শ্রাবণ মাসে মাঝামাঝি।

বইটি বেরোবার পর রবীন্দ্রনাথের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছি, সে ব্যাপারে সজনীকান্ত দাস তাঁর স্মৃতিকথায় একটা দিনের বিবরণ জানান। প্রতিক্রিয়াটি বিস্ময়কর। সজনীকান্ত লিখছেন, ‘কলিকাতা বিশ্বভারতী আপিসের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়া শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ‘পূরবী’ বাহির হইল। যথাসময়ে এক কপি হাতে পাইয়া পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। অসংখ্য ভুল এবং বিশ্রী ভুলেভরা বইখানি আমার শিরঃপীড়ার কারণ হইল। রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন। অবিলম্বে সংশোধিত কপিখানি লইয়া সরাসরি তাঁর নিকট দাখিল করিলাম। তিনি অতি সংযত ধীরস্থির পুরুষ; সেদিন দেখিলাম, রাগে আত্মবিস্মৃত

হইলেন এবং তখনই কাহাকে যেন ডাকিয়া বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের মুণ্ডপাত করিতে করিতে হুকুম দিলেন, সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলে নতুন ক'রে ছাপাও।'[৩৩]

আমরা *পূরবী* বইটির প্রথম সংস্করণে যে ভুলগুলি লক্ষ করতে পেরেছি সেগুলি নিম্নরূপ :

১। পৃষ্ঠা ১২ : 'আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে ষাড়া [সাড়া] দিয়ে,' ('পঁচিশে বৈশাখ')

২। পৃষ্ঠা ১৩ : 'কালের বাঁশরী হ'তে উচ্ছসি [উচ্ছ্বসি] যেন রে' ('পঁচিশে বৈশাখ')

৩। পৃষ্ঠা ৩১ : 'মুছিলে, [কমাটি হবে না] চুম্বন-রাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা' ('তপোভঙ্গ')

৪। পৃষ্ঠা ৪৪ : 'আনন্দেরে [আনন্দের] হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিত ক্ষণে ক্ষণে' ('উৎসবের দিনে')

৫। পৃষ্ঠা ৭৬ : 'আহ্বান' কবিতাটি শেষ হয়েছে এই পৃষ্ঠায়। কবিতার শেষে তারিখ দেওয়া আছে '১ অক্টোবর, ১৯৪২'। বলা বাহুল্য, সালটি ১৯২৪ হবে।

অর্থাৎ, প্রুফ দেখার কিছু ত্রুটি ছিল। শেষ মুহূর্ত অবধি রবীন্দ্রনাথ প্রুফ দেখার জন্যে তাড়া দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই সবগুলো প্রুফ রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে দেখানো সম্ভব হয় নি, তাই ভুল কিছু থেকেই গেছিল। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ প্রুফ দেখার পরেও বইতে ভুল থেকে গেছে এমন আগেও হয়েছে, পরেও হবে। সেটা বাংলা প্রকাশনায় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। যদিও, এই ভুলগুলিকে ঠিক এতখানি ভুল বলা যায় না যাতে করে 'সব আগুনে পুড়িয়ে' ফেলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী প্রায় সব বইতেই এইরকম বা এর চেয়ে অনেক বেশি ভুলই লক্ষ করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, শেষপর্যন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় নি কিছুই, প্রথম সংস্করণটিকে বাজার থেকে তুলে নেওয়াও হয়নি। অবশ্য সজনীকান্তর বিবরণে অল্পকিছু অতিরেকও থাকা সম্ভব। 'বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ', বিশেষভাবে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রতি সজনীকান্তর তীব্র বিদ্বেষ তাঁর *আত্মস্মৃতি* বইটির নানা ছত্রে একেবারেই প্রকাশ্য হয়ে আছে। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের নামে প্রকাশিত প্রথম বই বললেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের আশা খানিক বেশিই ছিল।

বানান ও বর্ণমালা সংস্কার

সজনীকান্ত-বিবৃত মুহূর্তটিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বকলমে প্রশান্তচন্দ্রের যতই 'মুণ্ডপাত' করুন, গ্রন্থালয়ের একেবারে প্রথম যুগ থেকেই প্রশান্তচন্দ্র চাইছিলেন নানা ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু প্রাতিষ্ঠানিক-রীতি স্থির

করে নিতে। যাকে আজকাল প্রকাশনা-মহলে 'হাউস-স্টাইল' বলা হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের ক্ষেত্রে সেই 'হাউস-স্টাইল' গড়ে তোলার পিছনে প্রশান্তচন্দ্রই যে প্রথম উদ্‌যোগী, সেই কথাটাও এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার। তার মধ্যে একটির কথা আমরা আগেই বলেছি, বইগুলির প্রকাশতথ্য, বিস্তারিত 'গ্রন্থপরিচয়' নির্মাণের যা প্রথম ধাপ, তা গ্রন্থালয়-প্রকাশিত বইগুলিতে দেওয়া শুরু হয়েছে প্রায় প্রথম থেকেই। *পূরবী* নতুন বই বলে অবশ্য পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির প্রকাশতথ্য সম্বন্ধে কিছু জানাবার কথাটা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এই বইতে, আখ্যাপত্রের পরের পৃষ্ঠায়, প্রথম ঘোষণা করে জানানো হল :

> প্রত্যেকটি কবিতার নীচে লেখার তারিখ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে তারিখ ঠিক জানা নাই অথচ মোটামুটি ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় সেখানে একটি *-চিহ্ন দেওয়া হইল। যেখানে লেখার তারিখ জানিবার কোনো উপায় নাই সেখানে "প্র"-চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া প্রথম প্রকাশের তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, এর জন্যে প্রশান্তচন্দ্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছিল, মিলিয়ে দেখতে হচ্ছিল কবিতাগুলির পত্রিকাপাঠ। এবং রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গঞ্জনার মুখোমুখিও হতে হচ্ছিল তাঁকেই! কিন্তু কবির প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের জন্যে প্রশান্তচন্দ্র কখনই কবির পাশ থেকে সরে যাননি। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য, প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারীর উপর ব্যক্তিগতক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে আমৃত্যু নির্ভরশীল ছিলেন।

পূরবী প্রকাশকালে বইগুলির বানান ও চিহ্নের বৈজ্ঞানিক সমতাবিধানের ব্যাপারেও প্রশান্তচন্দ্র গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। ১৯২৪-এর ২১ নভেম্বর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটা চিঠিতে সেই পরিকল্পনার কথা লিখে জানালেন প্রশান্তচন্দ্র :

> রবিবাবুর সমস্ত বাংলা লেখার একটা standard spelling করবার কথা ঠিক হয়েছে। কবি এ সম্বন্ধে আমাকে এই কথা বলে' গেছেন যে সুনীতি চাটুয্যেকে জিজ্ঞাসা করে' একটা standard list যেন আমি তৈরি করে' ফেলি। নিজে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে ওঁর মত বলে' গেছেন, সেগুলি note করে নিয়েছি। বাকি সব কথা নিয়ে সুনীতির সঙ্গে বসে' কালিদাস আর আমি একটা list তৈরি কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে [য], তিনচারদিন আমরা অনেক কাজ এগিয়ে এনেছি। যে-সব বিষয়ে কি করা ঠিক বুঝতে পারছিনে, সেগুলি এখন রেখে দিচ্ছি, কবিকে

জিজ্ঞাসা করে’ স্থির করব। এসব বিষয়ে আপাতত কবি original mss. যেমন লিখেছেন ঠিক তেমনি ছাপা হবে।[৩৪]

বানানের সমতাবিধানের কাজ সহজে হয় নি। বস্তুত একদশক পরে কলকাতা বিশ্ববদ্যালয়ের উদ্‌যোগে গঠিত বানান সংস্কার সমিতির (১৯৩৫) প্রস্তাবই কালক্রমে বিশ্বভারতী মেনে নেবে, এবং সেটাই হয়ে উঠবে বিশ্বভারতীর বানানবিধি। শুধু এইটা মনে রাখার যে, সেই বানান সংস্কার সমিতি গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথেরই সুনির্দিষ্ট পরামর্শক্রমে, এবং এরকম সমিতি গড়ে তোলার ভাবনাটির অন্তরালে প্রশান্তচন্দ্রের এই সমস্ত চেষ্টার প্রভাব ছিল অনেকখানি।

বানানের সমতাবিধান সঙ্গে সঙ্গে না-করা গেলেও বাংলা বর্ণমালার সংস্কারের প্রয়াস দেখা গেল *পূরবী* বইটি থেকেই। *পূরবীর* আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে জানানো হল :

> শব্দের প্রথমে “্যা”-উচ্চারণ দেখাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ অনুসারে “ে”-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা– ‘দেখো’ (দেখিও) আর ‘দেখো’ (দ্যাখো = দেখহ); ‘ফেলো’ (ফেলিও) আর ‘ফেলো’ (ফ্যালো = ফেলহ) প্রভৃতি।
>
> অ-কারেরও -ধ্বনি ’-চিহ্ন (ইলেকচিহ্ন) দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন – “করে” আর “ক’রে” (কোরে – করিয়া অর্থে); “দলে” (দলন করে) আর “দ’লে” (দলন করিয়া)।

এই বইটির পর থেকে আজও পর্যন্ত বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এই বন্দোবস্তটি মেনে চলে। বাংলায় শব্দের আদিতে এ-ধ্বনিটি উচ্চারণের সমস্যা নিয়ে এর পর নানা মাত্রায় চর্চা হয়েছে। কিন্তু এখনও অবধি কোনো প্রকাশনী বা সংস্থা তার একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান স্থির করতে পারেননি। কণাপদার্থবিদ ও ভাষাচিন্তক শ্রীপলাশবরন পাল তাঁর বিভিন্ন বইতে “ ্যা”-উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে ইদানীং পেট-কাটা এ [এ] অথবা [ে] ব্যবহার করেন। সেই চিহ্নও সর্বত্র গৃহীত হয় নি। ফলে আজও, ধরা যাক, ‘বেলা পড়ে গেছে’ বাক্যটির মানে যে ঠিক কী, বেলা নামে একটি মেয়ের পড়ে যাবার কথা বলা হচ্ছে নাকি দিন ফুরিয়ে আসার কথা, তা বাক্যটির পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষিতটি জানার আগে আমাদের বোঝবার উপায় নেই ! আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর আগে

এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের দিকে যাত্রা করতে চেয়েছিল বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, এটা দেখলে বিস্ময় জাগে।

‘গ্রন্থালয়’ ও পাঠকের সংযোগ

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ১৯২৪এর শেষদিক থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ গ্রন্থালয়ের প্রসার ও উন্নতির জন্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করার দিকে তৎপর হন। কিন্তু তার কিছু আগে থেকেই সম্ভাব্য পাঠকের সঙ্গে গ্রন্থালয়ের সংযোগ বাড়িয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে প্রশান্তচন্দ্রেরই উদ্‌যোগে দুটি অভিনব পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সে দুটি, অভিনবত্বের কারণেই, পৃথকভাবে আলোচনা-যোগ্য।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সংখ্যা (মে-জুন ১৯২৪) ‘প্রবাসী’ ও অন্য কয়েকটি পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকের কাছ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার মধ্যে থেকে ২০০টি কবিতা বেছে দেবার আহ্বান জানানো হয়। ওই একই সংখ্যার ‘প্রবাসী’র ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’তে এ বিষয়ে লেখা হয় :

> রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে দুই শত শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় পাঁচটি পুরস্কার দিবেন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনের পাতায় ছাপা হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সমুদয় কবিতা পড়িয়াছেন, এবং কবিতার উৎকর্ষ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের নির্ব্বাচনই উৎকৃষ্ট হইবে। যাঁহারা সমস্ত কবিতা পড়েন নাই, তাঁহাদের পক্ষেও পড়িয়া নির্ব্বাচন করিবার যথেষ্ট সময় আছে। যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাও আর একবার পড়িলে ঠিক্ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।...পুরস্কার পাওয়া অপেক্ষা বেশী লাভ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ-লাভ।[৩৫]

পাঁচটি পুরস্কার এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ, আমরা হালকা চালে বলতে পারি, বিশ্বভারতী সেকালেই আধুনিক বিজ্ঞাপন-ভঙ্গিমার চালচলনগুলো খানিকটা রপ্ত করতে পেরেছিল বটে ! এই প্রতিযোগিতার ফল বেরোল ডিসেম্বরে, রথীন্দ্রনাথকে লেখা ১১ ডিসেম্বর(১৯২৪) তারিখে লেখা পূর্বোল্লিখিত চিঠিটিতে প্রশান্তচন্দ্র জানালেন, ‘কবিতা-নির্ব্বাচন প্রতিযোগীতার[য] ফল আজ বের করছি। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দুজন মেয়ে! একজন ফরিদপুর, একজন ভবানীপুর; দু’জনের কাউকেই আমরা চিনি না।’ পুরস্কার

প্রাপকদের নাম অবশ্য এই চিঠিতে নেই। সেটি জানা যায় ১৯২৪-এর ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির বৈঠকের (‘*Karma-samiti Proceedings*’) ‘রেজলিউশন’ থেকে।[৩৬] (প্রসঙ্গত, এই একই দিনে অনুষ্ঠিত একটি সংসদ বা Generral Body-র বৈঠকের ‘রেজলিউশন’-ও আমরা একটু আগে উদ্ধৃত করেছি। কর্মসমিতির বৈঠকটি হয়েছিল সকালে, সংসদের বৈঠকটি সন্ধে ৭.৩০-এ। দুটিরই স্থান ১০, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ঠিকানার বিশ্বভারতীর দপ্তর)। কর্মসমিতির বৈঠকটিতে অনুমোদিত হয় যে, প্রথম পাঁচটি পুরস্কার পাচ্ছেন যথাক্রমে চপলা বিশ্বাস, নীলিমা দেবী, ভবাণীচরণ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাকি দুটি অতিরিক্ত (‘Additional’) পুরস্কার পাচ্ছেন হরিগোপাল সরকার ও রামমোহন চক্রবর্তী। পাঠকের দ্বারা নির্বাচিত কবিতাগুলিকে অবলম্বন করে ১৯২৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হবে *চয়নিকা* কাব্যসংকলনের তৃতীয় সংস্করণ। সেকথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কবিতা নির্বাচনের এই প্রতিযোগিতার ঘোষণার পর ফের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ঘোষণা করা হল গল্প-বাছাই প্রতিযোগিতার। ‘প্রবাসী’র অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সংখ্যায় পূর্বের মতোই লেখা হয় :

> গল্প নির্ব্বাচনের জন্য পুরস্কার/ “বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়” বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, রবি-বাবুর ছোট গল্পের বইগুলি হইতে ১৫টি ছোট গল্প নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য তিনটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রবিবাবু নিজে একটি তালিকা করিয়া দিয়াছেন। সেই তালিকাভুক্ত গল্পগুলির নামের সঙ্গে যাঁহাদের তালিকার নামগুলি ঠিক্ মিলিয়া যাইবে, কিম্বা অনেকটা মিলিবে, তাঁহারা মিলের পরিমাণ-অনুসারে পুরস্কার পাইবেন।[৩৭]

১৯২৫-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি রথীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্রের আর-একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, ‘গল্পের competitionএ ৫৫০ জন লোক ভোট পাঠিয়েছে। গোনা চল্‌ছে।’[৩৮]

এই প্রতিযোগিতার ফল অনুমোদিত হয় ১৯২৫-এর ৩ এপ্রিলের কর্মসমিতির বৈঠকে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে ইন্দুলেখা দাসী, মন্মথনাথ সিংহ এবং নির্মলকুমারী মহলানবিশ। আরও চারজনকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। জানতে কৌতুহল হয়, রবীন্দ্রনাথের বাছাই করা ১৫টি গল্প কোনগুলি ছিল? প্রশান্তকুমার পাল বলেছেন যে, ‘মনোনীত গল্পের তালিকাটি এখনও পাওয়া যায় নি।’[৩৯], কিন্তু রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ১৫টি গল্পের একটি তালিকা আমরা দেখতে পেয়েছি।[৪০] (দ্রষ্টব্য : চিত্র-২২)

পৃষ্ঠাটিতে কোনো তারিখ দেওয়া নেই, কিন্তু এই প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতেই এই তালিকা বলে আমাদের মনে হয়। সেই তালিকাটি এইরকম :

১. ‘কাবুলিওয়ালা’ ২. ‘নিশীথে’ ৩. ‘জয়পরাজয়’ [৩ ও ৪ নম্বরের মধ্যে ‘ঠাকুর্দা’ লিখে কেটে দেওয়া আছে] ৪.’জীবিত না মৃত’ [জীবিত ও মৃত] ৫. ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ ৬. ‘মেঘ ও রৌদ্র’ ৭. ‘নষ্টনীড়’ ৮. [‘পোষ্টমাষ্টার’ লিখে কেটে দেওয়া] ‘রাসমণির ছেলে’ ৯. [‘অতিথি’ লিখে কেটে দেওয়া] ‘দৃষ্টিদান’ ১০. ‘হৈমন্তী’ [১০ ও ১১ নম্বরের মাঝে কোনো একটি গল্পের নাম লিখে কেটে দেওয়া আছে, নামটি পড়া যাচ্ছে না] ১১. ‘স্ত্রীর পত্র’ ১২. ‘শেষ রাত্রি’ [শেষের রাত্রি] ১৩. ‘অপরিচিতা’ ১৪. ‘কঙ্কাল’ ১৫. ‘ক্যালকাটা রোড’ [আমরা জানি, এই নামে রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প নেই। ‘দুরাশা’ গল্পটিতে ক্যালকাটা রোড-এর কথা আছে বলে এই গল্পটির কথাই এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে বলে মনে করা যায়। আমাদের দেখা পৃষ্ঠাটিতেও কেউ-একজন ‘দুরাশা’ কথাটি পাশে লিখে রেখেছেন।]

গল্পের শিল্পরূপের আলোচনা আমাদের বর্তমান গবেষণায় অপ্রাসঙ্গিক, তবু ‘পোস্টমাস্টার’(‘হিতবাদী’ ১২৯৮) কেটে দিয়ে ‘রাসমণির ছেলে’(‘ভারতী’ ১৩১৮)-কে বেছে নেওয়া এবং ‘অতিথি’(‘সাধনা’ ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২)-র বদলে ‘দৃষ্টিদান’(‘ভারতী’ পৌষ ১৩০৫) দেখে একটু বিস্ময় জাগে বৈকি। তবে মনে হয়, গল্পগুলি যাতে তাঁর সারাজীবনে লেখা গল্পধারার মধ্যে (১৯২৪-২৫ সালের কোনো-একসময় এই তালিকা তৈরি হচ্ছে এটা খেয়াল রাখতে হবে) সমস্বত্বভাবে বিন্যস্ত থাকে এটা খেয়াল রাখতে ছেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘শেষের রাত্রি’(‘সবুজপত্র’ আশ্বিন ১৩২১) বা ‘অপরিচিতা’ (‘সবুজপত্র’ কার্তিক ১৩২১)-র মতো গল্পগুলির অন্তর্ভুক্তির পিছনে হয়তো এই যুক্তিই কাজ করে গেছে।

তবে, সবটাই হচ্ছে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের প্রসার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, পাঠকের সঙ্গে প্রকাশনার আরও নিবিড় যোগাযোগ ঘটিয়ে তোলার লক্ষ্যে, এই কথাটা আমাদের বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষিতে মনে রাখা প্রয়োজন।

আরও কিছু বই

পূরবী-র প্রায় সমকালে, একেবারে পাশাপাশি, আরও অন্তত চারটি বাংলা বই প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেগুলি হল, *সঙ্কলন (নভেম্বর ১৯২৫)*, *প্রবাহিণী (নভেম্বর ?১৯২৫)*, *চিরকুমার সভা (এপ্রিল ১৯২৬)* ও *চয়নিকা*

(সেপ্টেম্বর ১৯২৬)। প্রথম দুটি বই প্রথমবার বেরোচ্ছে, পরের দুটি একই নামে আগে বেরিয়েছে, এবার তাদের 'রূপ'(form) একেবারে নতুন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থগুলো থেকে বাছাই করা কিছু লেখা মিয়ে তৈরি হল *সঙ্কলন*। *চয়নিকা*-র মতো কাব্যসংকলন-গ্রন্থ আগে বেরিয়েছে, তার একাধিক সংস্করণও হয়েছে, গদ্যসংকলনের পরিকল্পনা এই প্রথম। বইটির নাম কী হবে তাই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটু দ্বিধা ছিল, ১৫ জুন(১৯২৫) প্রশান্তচন্দ্রকে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানান তিনি, 'অবচয়ন কথাটার অর্থ selection। সঙ্কলন কথাটার অর্থ collection। দুটোই কানে ভালো ঠেক্‌চে না। সংগ্রথন বল্লে কেমন হয়? তাতে সংগ্রহ করা এবং সাজানো দুই বোঝায়। সাহিত্য-সংগ্রথন শুন্‌তে খারাপ লাগে না। শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে কমিটিতে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে নিয়ো।'[৪১] নিশ্চয় 'শাস্ত্রী মশাই' অর্থাৎ ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল। হয়তো সেই আলোচনার সূত্রেই 'সঙ্কলন' নামটিই রাখা হয়। ৪+৩৮৫ পৃষ্ঠার বৃহদায়তন এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে প্রশান্তচন্দ্র জানান, 'গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। কোনো বইতে এখনও গ্রথিত হয় নাই এমন লেখাও "সঙ্কলনে" দেওয়া হইল। লেখাগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো হইয়াছে।' 'ভূমিকা'টি লেখার তারিখ ৯ আগস্ট ১৯২৫। প্রকাশনার আয়বৃদ্ধির জন্যেই এই ধরণের বই বের করা হয়। ১৯৩৩ সালের ১৩ জানুয়ারি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লেকচারার') লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, 'আপনার চয়নিকা, চিত্রা, মানসী আর সঙ্কলন, সাহিত্য, গল্পগুচ্ছ, বি-এতে পাঠ্য আছে।'[৪২] *চয়নিকা* (পরবর্তীকালে *সঞ্চয়িতা*) বা *সঙ্কলন*-এর মতো বইগুলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচিতে গৃহীত হয়েও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের আয় বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

প্রবাহিণী বইটি প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (নভেম্বর? ১৯২৫)। বইটি রবীন্দ্রনাথের 'সাম্প্রতিক' গানের সংকলন। মোট ২৩৫টি গান, পর্যায়বিন্যাস একটু নতুন ধরণের, যথাক্রমে 'গীতগান'(গানের সংখ্যা ৩৫), 'প্রত্যাশা'(৩৩), 'পূজা'(৩০), 'অবসান'(২১), 'বিবিধ'(৩৩), 'ঋতুচক্র'(৮৩)। এ যেন ১৩৪৮ সালের বিখ্যাত *গীতবিতান*-এর উপপর্যায়ভাগগুলিকে মনে করিয়ে দেয়, যেখানে গানগুলিকে সাজানো হচ্ছে 'ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে'। যথাস্থানে সে আলোচনা আমরা করব। এখানে অন্য একটি কৌতুহলজনক তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌যোগে তৈরি 'বিচিত্রা : বৈদ্যুতিন রবীন্দ্ররচনা-সম্ভার' প্রজেক্টে

(bichitra.jdvu.ac.in) *প্রবাহিণীর* যে স্ক্যান-কপিটি 'আপলোড' করা হয়েছে তা কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পাওয়া। সেই বিশেষ কপিটিতে বইটির ১৮০ পৃষ্ঠার পর থেকে একটি আস্ত ফর্মা জুড়ে *পূরবী* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি পাতা আর *চয়নিকা*-র কয়েকটি পাতা ঢুকে গেছে ! একইসঙ্গে একই ঘরে যে এই বইগুলি তৈরি হয়ে উঠছিল, তার একটি কৌতুকময় 'প্রমাণ' দপ্তরীর ভুলে এইভাবে রক্ষিত হল ইতিহাসের গর্ভে!

চিরকুমার সভা নাটকটি প্রকাশিত হল ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। কিন্তু এর একটু প্রাক-ইতিহাস বলে নিলে কতকগুলি জটিলতা এড়ানো যাবে।

'চিরকুমার সভা' নামে একটি আখ্যান কবি লিখেছিলেন প্রায় ২৪ বছর আগে, সেটি বৈশাখ ১৩০৭ব থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ব পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় সেই লেখাটির শেষদিকের কোনো-কোনো অংশ পড়ে বন্ধু প্রিয়নাথ সেন কিছু বিরূপ সমালোচনা করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি তারিখহীন চিঠিতে [১৯০১, মার্চ] লেখেন, 'তার পরে যখন তোমার কাছ থেকে শুন্‌লুম [*চিরকুমার সভা*-র] শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আস্‌চে — তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে।... যখন বই বেরবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে।'[৪৩] বই হয়ে 'চিরকুমার সভা' প্রথম প্রকাশিত হল ১৯০৪-এর ২৯ আগস্ট 'হিতবাদী' প্রকাশনী থেকে সুবৃহৎ *রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী*-র অন্তর্গত হয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশ্বাস সত্ত্বেও এতে বদল হল না কিছুই।

অনেকখানি বর্জন ও কিছুটা সংশোধন করে এর একটি সংস্কৃত রূপ প্রকাশিত হল ১৯০৮-এ, কিন্তু তখন পাল্টে গেল এর নামও ! *গদ্যগ্রন্থাবলী* অষ্টম ভাগ হিসেবে প্রকাশিত হওয়া সেই রচনার নাম হয়ে গেল 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ এই 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর একটি নাট্যরূপ দিলেন সম্ভবত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে। সেই নাট্যরূপটির নাম হয়ে উঠল, ফের, 'চিরকুমার সভা' ! আমাদের আলোচ্য সময়ে বিশ্বভারতীর তরফে এই নাটকটিকেই ছাপবার আয়োজন করতে দেখা যায়। ১৯২৪-এর ২৬ অক্টোবর পেরু যাবার পথে জাহাজ থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কবি লিখছেন, 'চিরকুমার সভা কি ছাপবার আয়োজন করচ?'[৪৪]

আগেই বলা হয়েছে চার-পাঁচটি বই একেবারে একই সঙ্গে ছাপার আয়োজন চলছিল, তার কোনোটিই ঠিক রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে ছাপা হয়ে উঠতে পারে নি। ফিরে এসে ১লা আষাঢ় ১৩৩২ (১৫ জুন ১৯২৫) প্রশান্তচন্দ্রকে বইগুলির জন্যে তাগাদা দিয়ে লিখলেন, 'পূরবী? Talks in Japan? চিরকুমার সভা? প্রবাহিণী?'[৪৫] রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি বই আমাদের গবেষণার আলোচ্য বিষয় নয়, তবু প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা যাক, 'Talks in Japan' নামে কোনো বই কখনও বের হতে পারে নি। তবে জাপানে প্রদত্ত বক্তৃতাবলির অনুলেখন এলম্‌হার্স্ট রক্ষা করেছিলেন। এই চিঠি থেকে জানা যায়, সেইটিই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এইসময়ে। যাইহোক, আমাদের মনে হয়, বাকি গ্রন্থগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে *চিরকুমার সভা*-র প্রকাশ ইচ্ছে করেই পিছিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৫-এর ৭ জুন প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে আমরা দেখব *প্রবাহিণী*, *পূরবী*, 'Talks in Japan', *চয়নিকা* বইগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনর্বার তাগাদা দিচ্ছেন কিন্তু সেখানে *চিরকুমার সভার* উল্লেখ নেই ! খেয়াল রাখা দরকার, এর অনেক আগেই, মার্চ মাসে, 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই নাটকের ছ-মাসের অভিনয়-স্বত্ব ক্রয় করেছেন। এর প্রথম অভিনয় হচ্ছে ১৮ জুলাই ১৯২৫। ফলে গ্রন্থাকারে প্রকাশের আশু প্রয়োজন হয়তো অনুভব করেন নি রবীন্দ্রনাথ। *চিরকুমার সভা* প্রকাশিত হয় আরও প্রায় একবছর পর, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী ১২ এপ্রিল ১৯২৬।

আমরা আগেই বলেছি, *চয়নিকা*-র প্রথম বিশ্বভারতী সংস্করণটি বেরোয় ১৯২৪-র এপ্রিল-মে নাগাদ। তার কথা আমরা বিস্তারিত আলোচনাও করেছি। ১৯২৫-এর মে থেকে ফের একটি *চয়নিকা* প্রকাশের কথা ভাবা হতে থাকে (১৯২৫-এর ৭ জুন প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা চিঠিটিতে এই 'নতুন' *চয়নিকার*ই উল্লেখ আছে)। তবে এর পরিকল্পনা ও বিন্যাস আগের সব *চয়নিকা*-র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা দেখেছি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ব সংখ্যা 'প্রবাসী' ও অন্য কয়েকটি পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকের কাছ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার মধ্যে থেকে ২০০টি কবিতা বেছে দেবার আহ্বান জানানো হয়। মূলত পাঠক-পছন্দের সেই কবিতাগুলো নিয়ে *চয়নিকা*-র এই নতুন সংস্করণটি বের করার উদ্‌যোগ নেওয়া হয়। প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭ জুন ১৯২৫-এর চিঠিটিতে *চয়নিকা* প্রসঙ্গেও কথা ছিল, কবি জানিয়েছিলেন, 'চয়নিকার এক অংশ এখনো এখানেই

পড়ে আছে।' অর্থাৎ এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এর কাজ শুরু হয়ে গেছিল। সজনীকান্ত দাস তীর্যক-সুরে এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে কিছু কথা জানিয়েছেন :

> ...আর একটি কৌতুককর কাজে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলিকাতার বিশ্বভারতী আপিসেই হাত দিয়াছিলেন – গণভোটের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-বিচার। তাঁহার অদম্য স্ট্যাটিস্টিক্স্-বুদ্ধি এই ধরণের "একটা নতুন কিছু করা"র দিকে তাঁহাকে এই কালে অবিরত প্ররোচিত করিতেছিল; তিনি বিশ্বভারতীর উপর দিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। এই পরীক্ষা যদি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারেই শেষ হইত তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। তিনি ভোট-মাহাত্ম্য বিচারে তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ 'চয়নিকা' ছাপিতে বসিলেন। আমরা প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম, কিন্তু স্ট্যাটিস্‌টিক্স্ কখনও যুক্তি মানে না। ফাল্গুন মাসে (১৩৩২) সেই বিপুলাকায় বিচিত্র 'চয়নিকা' বাহির হইয়া রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করিয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রতিকার করিতে তাঁহাকে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে তাঁহার 'স্বয়ং'-নির্বাচিত 'সঞ্চয়িতা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া কবি গণ-'চয়নিকা'র সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করেন।[৪৬]

এই বিবরণে অবশ্য সজনীকান্তর স্বভাব-সিদ্ধ কটূক্তিপ্রবণতার অনেকটা প্রভাব আছে বলেই মনে হয়। 'তিনি বিশ্বভারতীর উপর দিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাইতেছিলেন' এই বাক্যটি যে নেতিবাচক তাৎপর্যে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা সম্পূর্ণ অন্যায্য। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কার্যত একক প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের প্রথম যুগে তাকে বিশ্বমানের প্রকাশনা-সংস্থায় পরিণত করতে পেরেছিলেন, এই তথ্য কোনো ক্ষুদ্র কটূক্তিতেই অস্বীকৃত হবার নয়। আর বিশেষ এই ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ 'বিচলিত' হয়েছিলেন, এবং কার্যত 'গণ-চয়নিকা'র প্রতিপক্ষ হিসেবেই 'সঞ্চয়িতা'কে হাজির করলেন, এই দাবি মানাও খুব শক্ত। আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মূল আপত্তি ছিল তাঁর প্রথম যুগে লেখা কবিতাগুলি বিষয়ে। ১৯২৪-এ *চয়নিকা*-র যে মুদ্রণটি বিশ্বভারতীই প্রকাশ করে তার সূচনায় তিনি এই আপত্তির কথা জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বর্তমান *চয়নিকা*-র ভূমিকাতেও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখতে হয়, 'শেষে কবির নির্দ্দেশ অনুসারে একটি কথা জানাইতেছি। কবির নিজের ইচ্ছা ছিল না যে "মানসীর" আগেকার (অর্থাৎ ১২৯৩ সালের পূর্ব্বের) লেখা কোনো কবিতা চয়নিকায় স্থান পায়। কবি মনে করেন যে সে সময়ের লেখা অত্যন্ত কাঁচা এবং জন-সমাজে প্রচলিত থাকিবার যোগ্য নয়।' আর ১৯৩১-এর *সঞ্চয়িতার* ভূমিকাতেও এই একই কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন, 'যাঁরা

আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেকদিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করচি যে, আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিত পদে চল্‌তে আরম্ভ করেচে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার-মধ্যে এসে পৌঁছয়নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।' এখানে বহুবচন 'যাঁরা' শব্দটির মধ্যে দিয়ে একবচন প্রশান্তচন্দ্রই কবির লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানেও তর্কটা নিশ্চয়ই নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ে নয়, কোন কবিতা নির্বাচন করা হবে তাই নিয়েই।

যাইহোক, এই *চয়নিকা* প্রকাশিত হল (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী) ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬-এ। এটি হয়ে রইল বাংলা কবিতা-সংকলনের ইতিহাসেই একটি স্বতন্ত্র (unique) নির্মাণ। সূচিপত্রে কবিতার নামের পাশে জানিয়ে দেওয়া হল সেই কবিতা কত 'ভোট' পেয়েছে। অবশ্য পাঠকপছন্দের বাইরের কবিতাও রাখা হল সামগ্রিকতা বজায় রাখার জন্যে। বইয়ের একেবারে শেষে 'পাঠ পরিচয়' অংশে প্রশান্তচন্দ্র জানালেন, 'আমরা কিন্তু শুধু ভোট সংখ্যা দিয়া বাছাই করি নাই। প্রত্যেকটি প্রচলিত বই হইতে যাহাতে কিছু কিছু কবিতা থাকে, এবং কোনো বিশেষ সময় বা বিশেষ ধরণের লেখা যাহাতে একেবারে বাদ না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই জন্য ভোট কম পাইয়াছে এমন কোনো কোনো কবিতাও রাখা হইল। আবার একই বই হইতে যাহাতে খুব বেশী কবিতা না যায় এই জন্য ভোট বেশী পাইয়াছে এমন কবিতাও বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানাভাবের জন্য খুব দীর্ঘ কবিতাগুলিও রাখা যায় নাই।' প্রসঙ্গত বলা যাক, *চয়নিকা* প্রবল জনপ্রিয়ও হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই, অর্থাৎ শেষ ১৫ বছরে এটি অন্তত ৭ বার পুনর্মুদ্রিত হয়। *সঞ্চয়িতার* (১৯৩১) প্রকাশ সত্ত্বেও চয়নিকার এই জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে পরিকল্পক হিসেবে প্রশান্তচন্দ্রের দূরদর্শিতা !

অসন্তোষ

অবশ্য, একথাও ঠিক যে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের কাজকর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং রথীন্দ্রনাথ উভয়ের ভিতরেই কিছু অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল। সেই অসন্তোষের সূত্রে গ্রন্থালয়ের সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তনও সাধিত হবে এই সময়ে। ফলে বিষয়টি বিস্তারিতভাবেই আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথম তর্কটা উঠেছিল, গ্রন্থালয়ের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে কোথা থেকে? কলকাতা, না শান্তিনিকেতন? বইগুলি ছাপাই বা হবে কোথায়? শান্তিনিকেতন প্রেস, নাকি কলকাতার কোনো নামী প্রেস? বৈশাখ ১৩৩১ (১৯২৪ এপ্রিল) থেকে আস্তে আস্তে ছাপার কাজটা সরে যায় কলকাতায়। প্রশান্তচন্দ্র আর করুণাবিন্দু, দুজনেই কলকাতার বাসিন্দা, ফলে এই সময় থেকে 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়'-এর পুরো কাজটাই নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে কলকাতা অফিস থেকে। কিশোরীমোহন সাঁতরাও কলকাতা অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। আমরা দেখেছি, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কলকাতায় একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা খোলারও প্রস্তাব রাখেন রথীন্দ্রনাথের কাছে। সবমিলিয়ে শান্তিনিকেতন প্রেসকে কার্যত পাশ কাটিয়ে কলকাতার নামী প্রেসগুলো থেকে এইসময়ে গ্রন্থালয়ের সব বই ছাপা হচ্ছিল। এই ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ নিজে যে খুব খুশি ছিলেন না তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। *পূরবী* ছাপা চলাকালীনই, ১৯২৫-এর ১৮ জুন, কলকাতায় ছাপা বিষয়ে তাঁর আপত্তি জানিয়ে প্রশান্তচন্দ্রকে তিনি লেখেন, 'এখানকার ছাপাখানা বেচারার প্রতিই তোমাদের যত অবিচার – তাতে করে নিজেদের লোকসান করচ কাজও ভাল হচ্চে না। এখানকার ছাপা যে বিশেষ খারাপ তা আমি মনে করি নে—যদি তুলনায় ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ পরিমাণ খারাপও হয় আর সব বিষয়ে এত বেশি সুবিধে যে আমি মনে করি যে এর প্রতি তোমাদের বিমুখতা নিতান্তই অব্যবসায়ীর লক্ষণ।'[৪৭] *পূরবী* প্রকাশিত হয়ে যাবার মাস দুয়েক পরেও, ১৯২৫-এর ২৭ সেপ্টেম্বর প্রশান্তচন্দ্রকে ফের একই কথা তিনি লিখবেন আর-একটা চিঠিতে :

> রামানন্দবাবু শাস্ত্রীমশাইকে [=ক্ষিতিমোহন সেন] বলেছেন যে শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা পাকা হলে সকল রকমেই আমাদের সুবিধার কারণ হয় এই কথাটা বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষ কেন বুঝচেন না তা তিনি আন্দাজ করে উঠতে পারচেন না। তিনি বলেন সাধারণভাবে ছাপখানা ও বিশেষভাবে কলকাতার ছাপাখানা সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর মতে শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা করা ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অনেক দুঃখ পেয়ে একদিন হয়ত সেই প্ল্যানই ঠিক করবে, কিন্তু ইতিমধ্যে?[৪৮]

ঘটনা হল, রবীন্দ্রনাথের এই উপর্যুপরি পরামর্শ সত্ত্বেও আরও বছরখানেক শান্তিনিকেতন প্রেস কিন্তু 'ব্রাত্য'ই থেকে যাবে 'কর্ত্তৃপক্ষ'-এর কছে। ১৯২৬-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ফের গ্রন্থালয়ের যাবতীয় মুদ্রণকাজ ফেরত আসবে শান্তিনিকেতন প্রেসে।

আর-একটি বিষয়েও প্রশ্ন উঠছিল ভিতরে ভিতরে। সে হল করুণাবিন্দু বিশ্বাসের উপর প্রশান্তচন্দ্রের অতিরিক্ত আস্থায় কাজের কাজ কিছু হচ্ছে কি? এ বিষয়ে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা রথীন্দ্রনাথের একটি চিঠিকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করা যেতে পারে। চিঠিটি লেখা ৪ নভেম্বর। সালটি রথীন্দ্রনাথ লেখেন নি, তবে চিঠির বয়ান থেকে অনুমান করে নেওয়াই যায়, এটি ১৯২৫-এ লেখা। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> আমি যতটুকু জানি তাতে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে ছাপাখানার চেয়ে আমাদেরই অপরাধ বেশি। ১১ ফর্ম্মার প্রুফ কান্তিক প্রেস থেকে গত ২৩ ভাদ্র এসেছিল। সেটা সংশোধন হয়ে আমাদেরই অফিসে ইস্তক নাগাদ পড়ে আছে – প্রেসে ফিরে যায়নি।... সব বইয়ের ব্যবস্থা হল "চয়নিকা" সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা না করেই করুণাবাবু চলে গেলেন – অথচ যাবার দিনও কমলবাবুকে আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে প্রুফ দেখার বন্দোবস্ত করে যাবেন। প্রত্যেক দিনই "চয়নিকার" জন্য লোক দোকান থেকে ফিরে যাচ্ছে। এতে বিশ্বভারতীর prestige ও যাচ্ছে – আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে।
>
> [গ্রন্থালয়ের কাজে] যে রকম mismanagement হয়েছে – সে আর তোমার অজানা নেই।...তার কারণ তুমি একজনের উপর সমস্ত বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছ।...আমি কাজ হাতে নিয়েই দেখলুম "কথা ও কাহিনী"র প্রথম ২ ফর্ম্মায় এত ভুল থেকে গেছে যে আবার ছাপতে হবে।...
>
> Secretarial কাজ এ পর্য্যন্ত করুণাবাবুর দ্বারা কিচ্ছু হয় নি – সে তুমি ভালো করেই জানো। তোমাকে বাধ্য হয়ে সে দিকের কাজ সমস্তই নিজের হাতে তুলে নিতে হয়েছে।...চিঠিপত্র সম্বন্ধে অসাবধানতা, ফাইল কাগজপত্র হারান ইত্যাদি দৈনন্দিন ঘটনা। এখন কেবল publishingএর কাজটা ওঁর উপর ভার রয়েছে। Publishingএর দুটো দিক আছ – বই ছাপান ও বই বিক্রি। বই বিক্রি সম্বন্ধে তুমিও স্বীকার করেছ যে উনি খুব উপযুক্ত নন। সেটা আমি বাদ দিচ্ছি। তাহলে বই ছাপানর কাজ। ছাপানর মধ্যে editing ও printing। editing ওঁর দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। Printingএর কাজ খুব যে efficiently হয়েছে – তা আমি বলতে পারি না। তার উদাহরণ "চয়নিকা"।[৪৯]

চিঠিটি অপ্রকাশিত বলে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হল। চিঠিটি রথীন্দ্রনাথ লিখছেন বটে, কিন্তু অনুমান করে নেওয়া যায়, তাঁর বাবাকে এ বিষয়ে অন্তত খানিকটা অবহিত করেই তিনি এই সব অভিযোগ করছেন। এই চিঠিতে *চয়নিকা* এবং *কথা ও কাহিনীর* মুদ্রণ নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ জানাচ্ছেন রথীন্দ্রনাথ। *কথা ও কাহিনী* মানে এখানে ১৯২৬-এর ১০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী) বইটির অষ্টম

পুনর্মুদ্রণের কথা বলা হচ্ছে। বইটির 'প্রকাশক' করুণাবিন্দু বিশ্বাস। ছাপা হচ্ছে কলকাতার 'নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস' থেকে। আমরা *কথা ও কাহিনী*র এই বিশেষ সংস্করণটি দেখেছি। তাতে ভুলের পরিমাণ খুবই কম। বস্তুত, এই চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ যে বলেছেন 'দেখলুম "কথা ও কাহিনী"র প্রথম ২ ফর্ম্মায় এত ভুল থেকে গেছে যে আবার ছাপতে হবে।', অনুমান করা যায় অন্তত *কথা ও কাহিনী*-র ক্ষেত্রে সেরকমই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে ভুলের পরিমাণ পূর্বে কেমন ছিল তা আজ আর বলা সম্ভব না।

করুণাবিন্দুর কাজকর্মে রথীন্দ্রনাথ এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে প্রশান্তচন্দ্রকে উপরোক্ত ব্যক্তিগত চিঠিটি লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি। ১৫ নভেম্বর ১৯২৫-এ তিনি একটি দীর্ঘ 'অফিসিয়াল' চিঠি লিখলেন বিশ্বভারতী কর্মসমিতির উদ্দেশে, সেখানে বিশ্বভারতীর সামগ্রিক কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর অভিমত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থালয় বিষয়ে লিখলেন নিম্নলিখিত কঠোর সব মন্তব্য :

> এই বিভাগ সবচেয়ে mismanaged হয়েছে বলে ধারণা। তার কারণ ম্যানেজারের উপযুক্ত লোকের অভাব, supervisionএর অভাব এবং যে policyতে চালান হইতেছে তাহার দোষ। অধিকাংশ বই যা বাজারে বেশি কাটতি তা ছাপান নাই – এমন কি "চয়নিকা" না পাইয়া রোজ লোক ফিরিয়া যাইতেছে এবং তাহাতে বিশ্বভারতীর prestige ও অর্থ দুয়েরই সমূহ ক্ষতি হইতেছে। "চয়নিকা" সময়মত না ছাপান এই বিভাগের গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। এই বিভাগ বিশ্বভারতীর একটি প্রধান income earning department – অথচ ইহার ব্যবস্থা business চালাইতে গেলে যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হয় নাই।[৫০]

করুণাবিন্দুই এই চিঠির উষ্মার মূল লক্ষ্য, কিন্তু প্রশান্তচন্দ্রে প্রতিও এই সময়ে রথীন্দ্রনাথের অনাস্থা এইসব ব্যক্তিগত ও 'অফিসিয়াল' চিঠিতে খুব অস্পষ্ট হয়ে নেই। ফলে অভিমানাহত প্রশান্তচন্দ্র তাঁর সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কথাও বিবেচনা করতে শুরু করেন। ১২ নভেম্বর(১৯২৫) রথীন্দ্রনাথকে সেই বিবেচনার কথাটি জানিয়ে লেখেন তিনি :

> ছুটির আগে আমি resign করা একরকম mind make up ক'রেছিলুম। আপনাকে কিছু আভাস দিয়েছিলুম কি না ঠিক মনে নেই। তবে তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত হবে না ভেবে তখন formal চিঠি লিখিনি। এ সম্বন্ধেও আমার কিছু বলবার আছে — ব্যক্তিগত দিক থেকে। নানা কারণে (প্রধানত আমার সময়াভাব) — কাজের ক্ষতি হচ্ছে তা আমি ভালো করেই জানি। আমার পক্ষে ছেড়ে দেওয়ায় বিশ্বভারতীর লাভ না লোকন

> এটা ঠিক হিসাব ক'রে উঠতে পারছিলুম না ব'লে resign করি নি।... রাগ বা অভিমান করে বল্‌ছি না — কাজের দিক থেকেই বল্‌ছি।[৫১]

আমরা জানি, প্রশান্তচন্দ্রকে শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয় নি, হয়তো রবীন্দ্রনাথও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে থাকবেন। যদিও ঠিক এই সময়েই তাঁদের দুজনের পারস্পরিক চিঠিপত্র রক্ষিত হয় নি। কিন্তু ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের গোড়াতেই করুণাবিন্দু বিশ্বাসকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আমরা খেয়াল করতে পারি যে, ১৩৩২ব-এর ফাল্গুনে (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী তারিখটি অবশ্য ১২ এপ্রিল ১৯২৬, অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ) প্রকাশিত *চিরকুমার সভা*-র 'প্রকাশক' হিসেবে করুণাবিন্দুর নাম থাকলেও ১৯২৬-এর জুনে প্রকাশিত নাটক *শোধ-বোধ*-এ পাল্টে যাচ্ছেন প্রকাশক। এই বই, এবং এর পরে দীর্ঘকাল যাবৎ 'প্রকাশক'-এর দায়িত্ব পালন করবেন এতকাল 'শান্তিনিকেতন প্রেস'-এর দায়িত্ব পালন করে আসা জগদানন্দ রায়। অবশ্য, *শোধ-বোধ* ছাপা হয়েছিল কলকাতারই 'ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস' নামের ছাপাখানায়। তবে *নটীর পূজা* (প্রকাশ ১৩৩৩ব শ্রাবণ) বইটি থেকে, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেকে মান্যতা দিয়ে, ছাপার কাজটিও মোটের উপর শান্তিনিকেতন প্রেসেই হতে থাকবে।

একইসঙ্গে বানান ও চিহ্নের সংস্করণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল প্রশান্তচন্দ্রর উদ্‌যোগে, তাতেও দাঁড়ি পড়ল আপাতত। এর পিছনের কার্যকারণটিও খুঁজে পাওয়া যাবে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা রথীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত ৪ নভেম্বরের চিঠিটিতেই। করুণাবিন্দু সম্পর্কে অসন্তোষ জ্ঞাপনের পাশাপাশি সেই চিঠিতে বানান প্রসঙ্গেও এই আপত্তি জানান কবিপুত্র :

> Publishing Dept-এর business দিকের mismanagement ছাড়াও policyর দিকেও আপত্তি করার আছে। যে বই বিক্রি বেশি হয় না সে বই ছাপান হবে না — এই policy অন্যায় মনে করি। তা ছাড়া editing হয় নি বলে বই reprint করার দেরি করতে হবে এটাও অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করি। বানান সম্বন্ধেও আমার আপত্তি এই যে, যে বিষয় সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে, কাগজে ছাপিয়ে, সমালোচিত হয়ে Introduce করা চলতে পারে সাব্যস্ত হয়ে গেছে সেইটুকুই কেবল ছাপা বইতে চলন করা উচিত। দুএকজনের মাথায় যেটা কেবল আছে – যে বিষয়ে রোজই মতামত বদল হচ্ছে – তা চালাতে যাওয়া অনুচিত। এতে এখন যে edition

গুলি বেরোচ্ছে তা ভুলে — anomalyতে পরিপূর্ণ। আমি দেখাতে পারি "চয়নিকা"র যে ১১ ফর্ম্মা ছাপা হয়েছে — তাতে কত inconsistencies থেকে গেছে। এতে কি লাভ হচ্ছে ?

আমরা বলেছিলাম, পূরবী থেকে প্রতিটি বইয়ের শুরুতেই বর্ণমালা-র সংস্কারসূচক কিছু নির্দেশ দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়েছিল। যেমন শব্দের প্রথমে " ্যা"-উচ্চারণ দেখাবার জন্য "ে'"-চিহ্ন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশ। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শুরু থেকে প্রকাশিত বইগুলিতে সেই নির্দেশ বাদ গেল। বানানের সমতাবিধানের দিকে কিছু কিছু যে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র সেসবও রথীন্দ্রনাথের এই চিঠির পর স্থগিত হল।

গ. 'বিশিষ্ট' কিছু গ্রন্থ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে যত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে তার মধ্যে কিছু গ্রন্থকে আমরা বিশিষ্ট প্রকাশনা হিসেবে চিহ্নিত করে এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। এ কথার মানে এই নয় যে, বাকিগুলিকে আমরা দায়সারা নির্মাণ বলছি। বস্তুত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে সেই আমলে প্রকাশিত যেকোনো বই আজ হাতে তুলে নিলে একধণের রোমাঞ্চ হয়, রবীন্দ্রপ্রেমী হিসেবে নয় শুধু, গ্রন্থপ্রমী হিসেবেও, এত যত্ন এত সুরুচি এত ঔজ্জ্বল্য প্রতিটি বইয়ের পাতায় পাতায় লগ্ন হয়ে আছে যে এই ডিজিট্যাল মুদ্রণের যুগেও তা বিস্ময় জাগায়।

পাশাপাশি 'যত্ন' 'সুরুচি' এবং 'ঔজ্জ্বল্য'– এই তিনটি বিশেষণ ব্যবহারের প্রসঙ্গটি একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় বাংলা রুচিশীল প্রকাশনার একটা দিগন্ত, একথা সকলেই মানেন। কিন্তু, আমাদের মনে সেই রুচিশীলতার ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একধণের জৌলুশহীনতারও ধারণা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের 'হাউস স্টাইল' বলতে মনে হয় একধণের পেপারব্যাক বই, নিরাভরণ হাল্কাগেরুয়া রঙের মলাট, রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লেখা গ্রন্থ ও লেখকনাম, যেন 'সকল অলংকার' ছেড়ে রাখা গানের মতো সমস্ত 'সাজের অহংকার' ঝরিয়ে ফেলেই সে সুন্দর হয়ে উঠতে চায়। আমরা স্পষ্ট করে বলতে ছাই, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের 'হাউস স্টাইল' হিসেবে এই জমকহীন সৌন্দর্যকেই একমাত্র পরিচয় হিসেবে গড়ে

তুলতে চাওয়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বিশ্বভারতী প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলিকে সামনে রেখে আমরা 'গ্রন্থালয়'-এর সাধারণ 'হাউস স্টাইল' ঠিক কী ছিল, সেটা বুঝে নিতে পারি।

গ্রন্থালয়ের 'হাউস-স্টাইল'

১। প্রথম সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় যখনই রবীন্দ্রনাথের কোনো নতুন কাব্যগ্রন্থ ছেপেছে, তা তৈরি করে তুলতে চেয়েছে অর্থের দিক থেকে কোনো কার্পণ্য না-করেই। *পূরবী* থেকে শুরু করে *জন্মদিনে* [রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ] পর্যন্ত যে কোনো কবিতার বই হাতে নিলে তাদের বৈভবের দ্যুতি আর প্রকাশকের রুচিমানতা একসঙ্গে মিশে যে মুগ্ধতা সৃষ্টি করে তা আক্ষরিক অর্থেই আজকে দুর্লভ। ধরা যাক, মরোক্কান লেদার জ্যাকেটে মোড়া সুবিশাল রয়্যাল সাইজের *বিচিত্রিতা* হাতে নিয়ে দেখলে (দ্রষ্টব্য : চিত্র-১৪) সাধারণভাবে কবিতার জন্যেই একধরণের বস্তুগত গর্ব হতে থাকে, আজকের বাংলা প্রকাশনার কখনও কোনো কবিতার বইয়ের জন্যে এত খরচ করে না, তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

এই পর্যায়ের (প্রথম সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ) উদাহরণ হিসেবে আমরা *বীথিকা* (ভাদ্র, ১৩৪২) কাব্যগ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের বাহ্যরূপের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি। এটি 'সাধারণ' একটি উদাহরণ। বিভিন্ন বইতে কিছু ভিন্ন মাপও পাওয়া যাবে।

প্রচ্ছদ : বোর্ড-বাঁধাই

বইয়ের মাপ : ২৫ সে.মি. X ১৯ সে.মি.

হরফ : মূল Text – ইংলিশ, কবিতানাম – গ্রেট, সূচি – স্মল পাইকা

কাগজ : মোটা অ্যান্টিক ওভ্ (antique wove)। (অনেক বইতে অ্যান্টিক লেইড্ পেপারও ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন *বিচিত্রিতা*)

প্রতিটি কবিতা নতুন পাতায় শুরু।

বইয়ের মাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বড়ো মাপের বই, হরফও বড়ো বড়ো ('ইংলিশ')। হরফ বড়ো হওয়া সত্ত্বেও, বইটিও এত বড়ো যে মুদ্রণক্ষেত্র-র দুপাশে ফাঁকা জায়গা প্রচুর। চোখের আরাম দেওয়ার জন্যে উপর-নিচে

ফাঁকা জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছে অনেকখানি করে। যেমন, আমরা মেপে দেখেছি, যে কোনো পৃষ্ঠার নিচের দিকে – সবচেয়ে কম হলেও - অন্তত ৭ সেন্টিমিটার (প্রায় ৩ ইঞ্চি!) জায়গা ফাঁকা রাখা আছে ! তার সঙ্গে খুবই উন্নতমানের কাগজ। সবমিলিয়ে প্রতিটি প্রথম সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ শুধু রুচিশীল 'প্রোডাকশন' তাই না, বৈভবময়ও বটে।

অবশ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কাগজ ও অন্যান্য মুদ্রণ-সরঞ্জামের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই বইয়ের আয়তন ও কাগজের মানের সঙ্গে কিছু আপোস করতেই হয়, ফলে *সেঁজুতি* (প্রকাশ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থটি থেকে প্রথম সংস্করণের সব বইয়েই আয়তন কমাতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ। সেই কারণে *সেঁজুতি থেকে শেষলেখা* কাব্যগ্রন্থের বিবরণ এর চেয়ে ভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে আমরা *সানাই* (৩০ আগস্ট ১৯৪০) কাব্যগ্রন্থটির বিবরণ দিচ্ছি :

প্রচ্ছদ : বোর্ড-বাঁধাই বা মোটা- পেপারব্যাক

বইয়ের মাপ : ২২ সে.মি. X ১৪ সে.মি.

হরফ : মূল Text ও সুচি – পাইকা, কবিতানাম – গ্রেট, উৎসর্গ কবিতা– স্মল পাইকা

কাগজ : অ্যান্টিক লেইড (antique laid)।

প্রতিটি কবিতা নতুন পাতায় শুরু হচ্ছে না।

খেয়াল রাখা দরকার, এই আয়তন কিন্তু বিশ্বভারতী-প্রকাশির অধুনা পেপারব্যাক বইয়ের থেকে বড়ো। পাতার মান-ও অনেক বৈভবময়।

২। গ্রন্থালয়-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ : যে কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকেই বেরিয়েছে তাদের দ্বিতীয় সংস্করণ কিন্তু আর প্রথম সংস্করণের চেহারায় বেরোয় নি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সেই বইগুলোকে অধুনা-বিখ্যাত ১৬-পেজি-ক্রাউন সাইজের পেপারব্যাক হিসেবে যে পাব, তা কিন্তু একেবারেই না। উদাহরণ হিসেবে আমরা *শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের বাহ্যরূপের বিবরণ এখানে জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত জানানো যাক, *শ্যামলী*-র প্রথম সংস্করণ বেরোয় ভাদ্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে, আর এই দ্বিতীয় সংস্করণটি (আসলে পুনর্মুদ্রণ) শ্রাবণ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (জুলাই-আগস্ট ১৯৩৮)।

প্রচ্ছদ : বোর্ড-বাঁধাই বা মোটা-পেপারব্যাক

বইয়ের মাপ : ২২ সে.মি. X ১৪ সে.মি.

হরফ : মূল Text ও সুচি – পাইকা, কবিতানাম – গ্রেট, উৎসর্গ কবিতা– স্মল পাইকা

কাগজ : মোটা অ্যান্টিক লেইড (antique laid)।

প্রতিটি কবিতা নতুন পাতায় শুরু।

অর্থাৎ, প্রথম সংস্করণ কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে দ্বিতীয়ের মূল তফাৎ বইয়ের মাপে। বইয়ের মাপ ছোট হল, হরফও তাই ছোট হল। চারপাশে জায়গা কমল (যেমন, এক্ষেত্রে প্রতি পাতার নিচের দিকে ফাঁকা জায়গার সর্বনিম্ন পরিমাণ ৫ সেন্টিমিটার)। অবশ্য, বোর্ড বাঁধাই বহাল রইল, আর আগেকার মতোই মূল্যবান কাগজ ব্যবহারে কার্পণ্য করা হল না।

৩। গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠার আগে বেরোনো কোনো কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থালয়-সংস্করণ : এইসব ক্ষেত্রে দেখা দিল বইয়ের তৃতীয় এক ধরন। এই ধরনটিকেই আজ সাধারণভাবে আমরা বিশ্বভারতীর 'হাউস স্টাইল' হিসেবে জানি। উদাহরণ হিসেবে আমরা *চৈতালি* কাব্যগ্রন্থটির (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬, 'কাব্যগ্রন্থাবলী'-র অন্তর্গত হয়ে) প্রথম বিশ্বভারতী সংস্করণের (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ব, ডিসেম্বর ১৯২৭) বাহ্যরূপের বিবরণ নিচে জানানো হল :

প্রচ্ছদ : পাতলা পেপারব্যাক

বইয়ের মাপ : ১৮ সে.মি. X ১২.৫ সে.মি.

হরফ : মূল Text – পাইকা, কবিতানাম – গ্রেট, সূচি – স্মল পাইকা

কাগজ : সাধারণ হোয়াইট ওভ্

প্রতিটি কবিতা নতুন পাতায় শুরু নয়।

দেখাই যাচ্ছে, বইয়ের মাপ সবচেয়ে ছোট। হরফ ছোট। কবিতাগুলি নতুন পাতায় শুরু হচ্ছে না। কাগজ অপেক্ষাকৃত কম দামি। বোর্ড বাইন্ডিং নয়। মুদ্রণক্ষেত্রের চারপাশে ফাঁকা জায়গাও স্বাভাবিকভাবে সবচেয়ে কম। আমাদের নেওয়া মাপ অনুযায়ী, নিচের দিকে ফাঁকা জায়গার সর্বনিম্ন মাপ ২.৫ সেন্টিমিটার। রুচিশীল, কিন্তু নিরাভরণ, বৈভবহীন।

এই তিনটি ধরণের বই আমাদের সামনে আছে বলেই, আমরা বলতে পারি, আজ যাকে আমরা সাধারণভাবে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের 'হাউস স্টাইল' বলে জানি (তৃতীয় ধরনটি), সেটিই রবীন্দ্রনাথ অভিপ্রেত একমাত্র ধরন মোটেই ছিল না। বৈভবকে গ্রন্থশরীরে কীভাবে ওতপ্রোত করে জড়িয়ে দিতে হয়, গ্রন্থনির্মাতা রবীন্দ্রনাথ তা-ও জানতেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ তার সাক্ষী।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশিত বইয়ের এই সাধারণ ধরনগুলিকে মনে রেখে এবার আমরা কিছু বিশিষ্ট প্রকাশনা নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত বইগুলিকে বেছে নিতে চাই :

১। *লেখন* (১৯২৭) এবং 'বৈকালী'

২। *মহুয়া* (১৯২৯) এবং 'রাখী' বা 'বরণডালা'

৩।*সহজপাঠ* (১৯৩০)

৪। *বিচিত্রিতা* (১৯৩৩)

৫। *খাপছাড়া* (১৯৩৭), *সে* (১৯৩৭) ও *ছড়ার ছবি* (১৯৩৭)

সংকলন-গ্রন্থ :

৬।*গীতবিতান* (১৯৩১)

৭।*রবীন্দ্র-রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড ১৯৩৯)

গ্রন্থমালা :

৮। লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা

আলোচনার কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে এই বইগুলি নিয়ে কথা বলার মাঝে মাঝে আমরা এই সময়পর্বের বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে সামগ্রিকভাবেও কথা বলব। **'মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা'** উপশিরোনামায় এই আলোচনা পাওয়া যাবে।

১। *লেখন* (১৯২৭) এবং 'বৈকালী'

২২ বছর বয়সে লেখা **'লেখাকুমারী ও ছাপাসুন্দরী'** নামের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন যে হাতের লেখায় লেখকের ব্যক্তিগত **'ভাবের একটা চেহারা দেখতে পাওয়া যায়',** ছাপা-অক্ষরে তা হারিয়ে গিয়ে লেখাটি

হয়ে ওঠে **'সীসার কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা, ভাবশূন্য'**। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'ওরে, তোদের সে কাটাকুটিগুলি গেল কোথায়। তোদের সে কালির দাগগুলা যে দেখি না। পূর্বে তো তোদের এমনতরো নিখুঁত ভদ্রলোকটির মতো চেহারা ছিল না। ঘরের ছেলের মতো গায়ে ধুলো-কাদা মাখা, কাপড়ে দাগ, সেই তো তোকে শোভা পাইত। আর আজ সহসা তোদের এমনতরো পরিপাটি বিজ্ঞভাব দেখিলে যে জ্যাঠামি বলিয়া মনে হয়।'[৫২] এই আক্ষেপের যেন আক্ষরিক অবসান ঘটল যখন রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬-এর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি কবি পৌঁছোলেন জার্মানির বার্লিন শহরে। সেখানে তিনি দেখলেন এক মুদ্রণযন্ত্র, যার সাহায্যে হাতের লেখাকে অবিকৃতভাবে ছাপার অক্ষরে ধরে রাখা যায়। এটা দেখামাত্র উৎসাহিত হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। বার্লিনে কবির যাত্রাসঙ্গী তখন প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ। নির্মলকুমারীর স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথের এই উৎসাহের খবর এবং লেখন বইটি তৈরি হয়ে ওঠবার প্রেক্ষাপটটি বিস্তারিতভাবে জানা যায় :

> সেবারে যখন আমরা বার্লিনে ছিলাম, একদিন প্রশান্তচন্দ্র কবিকে বললেন : বাজারে একটা খুব নতুন প্রিন্টিং মেশিন বেরিয়েছে দেখলাম, ভারি চমৎকার। জিনিসটা ছোট্ট; পাতলা-পাতলা য়্যালুমিনিয়ামের পাত, ফুলস্ক্যাপ কাগজের মাপে কাটা। তাইতে হাতে ক'রে লিখতে হয়, আর সেইটা দিব্যি হাতের অক্ষরে ছাপা হয়ে যায়। বেশী বড় বা ভারীও নয়, কবি ইচ্ছে করলে অনায়াসেই একটা দেশে নিয়ে যেতে পারেন।
>
> কবির তো চিরকালই নতুন জিনিস পরীক্ষা ক'রে দেখতে বেজায় উৎসাহ। তখনই হুকুম হল, কালই ঐ যন্ত্র কিনে ফেল।
>
> এল পরদিন সেই 'রোটা প্রিন্ট' মেশিন এবং একগোছা য়্যালুমিনিয়ামের কাগজ, লিখবার জন্যে। আমার কাজ হল, বসে বসে সেই পাতলা পাতের উপরে পেন্সিলে রুলটানা, যাতে কবির লেখার লাইন বেঁকে না যায়।
>
> আর রবীন্দ্রনাথ যখনই সময় পান, সেই রোটা প্রিন্টে ছাপাবার জন্যে ছোট ছোট বাণী রচনা করেন। খুব খুশী যে ছাপাখানার উপর নির্ভরতা অনেকখানি কমিয়ে ফেলতে পারবেন। সমস্ত 'লেখন' বইখানাই যে রবীন্দ্রনাথের হাতের অক্ষরে বেরিয়েছে, সেটা রোটা প্রিন্টের দৌলতে।[৫৩]

লেখন তৈরি হয়ে ওঠবার ভিতরকার খবর অনেকটাই পরিষ্কার হয় নির্মলকুমারীর এই স্মৃতিচারণে। অবশ্য দুটি ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলার অবকাশ আছে এখানে। নির্মলকুমারীর লেখা থেকে ভ্রমক্রমে মনে হতে পারে *লেখন*-এ প্রকাশিত 'ছোট ছোট বাণী'-গুলি বুঝি সবই সেইসময়েই রচিত হল। তা নয় অবশ্যই। *লেখন* প্রসঙ্গে

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা প্রকাশিত হয় ‘প্রবাসী’ কার্তিক ১৩৩৫ব সংখ্যায়।[৫৪] সেখানে রবীন্দ্রনাথই জানিয়েছেন, ১। ‘যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত।...সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে একদিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর।...এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।’ আর, ২। ‘গেলবার যখন ইটালিতে গিয়েছিলুম, তখন স্বাক্ষরলিপির খাতায় অনেক লিখতে হয়েছিল। লেখা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল ইংরেজি লেখার দাবি।’ রবীন্দ্রনাথ চীনে-জাপানে গেছিলেন ১৯২৪-এ। কবির ইতালি ভ্রমণ ১৯২৬। অবশ্য, *লেখন*-এ প্রকাশিত অনেক কবিতাকণাই এর বহু আগে লেখা। ১৯১৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের এক নার্সিংহোমে কবির একটি অস্ত্রোপচার হয়, সেখানেই ১৯১৩-র ৪ জুলাই থেকে *গীতামাল্য*-র গানগুলি যে খাতায় পরপর লেখা হচ্ছিল (রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, Ms. 229) তারই উল্টো দিকে কবি লিখতে শুরু করেন দু-লাইনের কিছু কিছু কবিতা। তারপর আগস্ট মাসে, দেশে প্রত্যবর্তনের পথে, জাহাজেও এরম কিছু কবিতাকণা লেখা হয়। এইগুলি এরপর ১৩২০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে (পৃষ্ঠা ২০৩) ‘দ্বিপদী’ শিরোনামে মুদ্রিতও হয়। *লেখন* বইতে ‘একা এক শূন্যমাত্র নাহি অবলম্ব’ কবিতাটি থেকে শেষপর্যন্ত প্রায় সবটা এই সময়কার লেখা। ইংরেজি অনুবাদগুলি অবশ্য পরবর্তীকালের।

কথাটা হল, বইটা ছাপা হল কবে? রোটা প্রিন্ট মেশিনটা জার্মানিতে তখনই আনা হয়েছিল, নির্মলকুমারীর এই কথাটিতে থেকে মনে হতে পারে, ছাপার কাজটাও তখনই হয়ে গেছিল। বস্তুত, *লেখন*-এর যে আখ্যাপত্রটি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাতেই লেখা হয়, তাতে লেখা আছে **‘লেখন/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বুডাপেস্ট্ / ২৬ কার্ত্তিক / ১৩৩৩’**। জার্মানি থেকে ভিয়েনা হয়ে রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট-এ আসেন ২৬ অক্টোবর ১৯২৬। সেখানেও নিশ্চয়ই ঐ অ্যালুমিনিয়ামের পাতগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তার উপর লেখার কাজটা চলছিল। ২৬ কার্তিক, অর্থাৎ, ১০ নভেম্বর লেখা হয়েছিল প্রকাশিতব্য *লেখন*-এর জন্য উক্ত আখ্যাপত্রটি। সেই কারণেই অনেকদিন পর্যন্ত *লেখন*-এর প্রকাশকাল হিসেবেও নভেম্বর মাসটাকেই গণ্য করা হয়েছে। সেটা অবশ্য সত্যি নয়।

সেবার ইউরোপ থেকে ফেরার পথে জাহাজ থেকে ১৯২৬-এর ২৭ নভেম্বর প্রশান্তচন্দ্রকে কবি লিখছেন, 'Rota Print এর কথা নিশ্চয় মনে আছে। সবসুদ্ধ সাড়ে পাঁচশো ছাপানো ভালো – কেননা পঞ্চাশখানা বিতরণেই যায়।'[৫৫] সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র এইবারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই গিয়েছিলেন ইউরোপ ভ্রমণে, কিন্তু নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেও প্রশান্তচন্দ্র-নির্মলকুমারী ইউরোপেই রয়ে যান আরও কয়েকমাস। ১৯২৭-এর ১১ জানুয়ারি বার্লিন থেকেই প্রশান্তচন্দ্র ছাপার কাজের অগ্রগতির খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিস্তারিতভাবে জানান :

> Rota-print-এর কাজ যতোটা পারলুম শেষ করেছি। কালিতে লেখা সবগুলোই ভালো হয়েছে। পেন্সিলে লেখা অনেকগুলি নষ্ট হলো। প্রধান কারণ অনেক জায়গায় লেখা ভাল ফোটেনি, যথেষ্ট চাপ দিয়ে না লেখায় দাগ বসেনি, তার উপর অতিরিক্ত ফিক্সিং সলিউশন দেওয়ায় দাগ মুছে গেছে। নতুন অ্যালুমিনিয়াম শিটের উপর ইমপ্রেশন তুলে আমার হাতের লেখার সারতে চেষ্টা করেছিলুম, ভালো পড়া যায়, কিন্তু আপনার হাতের চেহারা ঠিক রাখতে পারলুম না তাই ছেড়ে দিলাম।[৫৬]

এই চিঠি থেকেই স্পষ্ট যে *লেখন*-এর মুদ্রণ রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে থাকার সময় হয় নি, তা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের তত্ত্বাবধানে পরবর্তীকালে সংগঠিত হয়েছে। বস্তুত, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বই *রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী*-র দীর্ঘ সমালোচনা (দ্রষ্টব্য, 'প্রবাসী', ১৩৩৯ব বৈশাখ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৪০-৪৫০) লিখতে গিয়ে প্রশান্তচন্দ্র ফের একবার মনে করিয়ে দেবেন, 'আমি বইখানা নিজে Berlinএ ছাপাই, ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে। এই বই ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয় নি, ১৩৩৪ সালে বাহির হয়।'[৫৭] অবশ্য, মনে রাখা দরকার ইউরোপে ছাপানো হলেও, বই বাঁধানো ও অন্যান্য কাজকর্ম হয়েছিল কিন্তু কলকাতাতেই। ছাপানো পাতাগুলি সেসময়ে প্রশান্তচন্দ্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায়, সঙ্গে বার্লিন থেকে ১৮ জানুয়ারি ১৯২৭-এ রথীন্দ্রনাথকে লেখা এই চিঠি :

> Rotaprint এর ছাপানো sheetগুলি postal packetএ শান্তিনিকেতন পাঠানো হ'য়েছে, সম্ভবত এই চিঠির আগেই কিংবা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছবে। এখানে বাঁধালুম না, খরচ বেশি প'ড়বে; দেশে বাঁধিয়ে নিতে পারবেন। "লেখন" বইখানার খরচ (৬০০ কপি) আন্দাজ ২০০ মার্ক (পাঠাবার খরচ বাদে) প'ড়বে, ধরুণ [য] ১৫০৲—তা হ'লে এক একখানা বই (সাধারণ ৪ গুণ হিসাবে) ১৲ দাম ক'রলে খুব সহজেই বিক্রী হবে, হয়তো বেশি দামও

ক'রতে পারবেন। এখানে ১০০ কপি আন্দাজ বই করিয়ে বেশ বেশি দামে বিক্রী করবার চেষ্টা কর্‌তে পারেন।[৫৮] (নিম্নরেখ প্রশান্তচন্দ্রেরই দেওয়া)

১৯২৬ সালের ইউরোপ ভ্রমণের অনেকটা ব্যয় রবীন্দ্রনাথকে নিজেকেই বহন করতে হয়েছিল। ইতালি, যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া প্রভৃতি দেশের সরকার সেই দেশে কবির আতিথেয়তার ভার নিলেও বাকি দেশগুলিতে অনেকটা নিজের খরচেই ঘুরতে হয়েছিল কবি ও তাঁর দলবলকে। সেকারণে তাঁকে বেশ কিছু টাকা ধারও করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল *লেখন* পাঠকমহলে গৃহীত হলে সেই দেনার অনেকটা শোধ হতে পারবে। অবশ্য, এরকম কবিতাকণা আদৌ পাঠক পছন্দ করবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর সংশয়ও ছিল অনেকটা। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটা তারিখহীন চিঠিতে এই সংশয় ও আশার কথাগুলি ব্যক্ত হয়েছে, 'আমার সেই স্বাক্ষরিত লেখাগুলি কিছু অধিকসংখ্যায় জর্ম্মনিতে ছাপিয়ে মনে করেছিলুম আমাদের ভ্রমণের দেনা কতকটা পরিমাণে শোধ করতে পারব। কিন্তু তোরা আপাতত পাঁচশোর বেশি ছাপাতে চাস্‌ নে। যাইহোক পরীক্ষা করে দেখা যাবে কতটা ফল পাওয়া যায়।'[৫৯] পাঁচশো-, বা প্রশান্তচন্দ্রকে যেমন লিখেছিলেন সাড়ে পাঁচশো-, কপি ছাপালে তার থেকে নিশ্চয়ই 'ভ্রমণের দেনা' শোধ হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কথিত এই 'পরীক্ষা' কি সফল হয়েছিল? ১৯২৮ সালের বিশ্বভারতীর 'Annual Report'-এ লেখা হয়েছিল, 'The most notable publication this year was a facsimile edition of "Lekhan", a book of short poems by Rabindranath Tagore which was specially printed in Germany from the original manuscript in the poet's own handwriting. We are glad to note that this book has had a very favourable reception"[৬০] ১৯২৭-এ প্রকাশিত বইকে ১৯২৮-এর Annual Report-এ কেন 'publication this year' বলা হচ্ছে তা আমরা জানি না। তবে 'favourable reception' কথাটিও হয়তো একেবারে অতিরেক নয়। ১৯৩১ সালের ১৫ জুলাই হেমন্তবালা দেবীকে একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, '"লেখন" বইটা নিঃশেষিত। সংগ্রহ করে তোমার ছেলেকে দেব প্রতিশ্রুত ছিলুম। একখানা জীর্ণ মলিন বই পেয়েছি। অগত্যা এইটেই পাঠাতে হবে'।[৬১] অবশ্য, নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই বই রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কেন আর কখনই পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হল না, সেটা একটা বিস্ময়ের কথা বটে। সকলেই জানেন, এই প্রথম সংস্করণে ভুলবশত প্রিয়ম্বদা দেবীর পাঁচটি কবিতা ছাপা হয়ে গেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবী নিজে

চিঠি লিখে সেটা ধরিয়ে দেবার পর বিব্রত রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ-সহ নিজের ভুল প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, *লেখন*-এর দ্বিতীয় কোনো সংস্করণ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ তথা গ্রন্থালয় আর আগ্রহী হন নি।

এই সময়কাল জুড়ে কিন্তু এক *লেখন*-এরই প্রকাশ-প্রস্তুতি চলছিল, তা নয়। দ্বিতীয় আর-একটি বইও তৈরি হয়ে উঠছিল এর পাশাপাশি, যার নাম 'বৈকালী'। এর আগে আমরা দেখেছি, *পূরবী* বইটির নাম প্রথমে ভাবা হয়েছিল 'বৈকালী'। ফের 'বৈকালী' নাম দিয়েই আর-একটি গ্রন্থ প্রকাশের কথা উঠছে, এতে প্রমাণিত হয় নিজের আয়ুর দিকে ইঙ্গিত করা এই নামটি রবীন্দ্রনাথের বেশ পছন্দের ছিল। অবশ্য আমরা জানি, তাঁর জীবৎকালে এই নামে শেষপর্যন্ত কোনো বই প্রকাশিত হয়ে উঠতে পারে নি। ১৯২৬ সালের মে মাসে ইউরোপ ভ্রমণে বের হবার আগে, ১২ মে কবি তাঁর একটি গান-লেখা-খাতা 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে তাঁকে লেখেন, '"বৈকালী" লোকহস্তে পাঠাচ্ছি। কালিদাসের চিঠিতে এর বিবরণ পাবেন। যেমন ইচ্ছা ছাপাবেন। পরে এগুলো বই আকারে বের করব।'[৬২] বর্তমানে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় খাতাটি রাখা আছে, অভিজ্ঞান সংখ্যা ২৭। রামানন্দকে উপরোক্ত চিঠিটি লেখার দিন কয়েক আগে কালিদাস নাগকে ব্যাপারটা বিস্তারিত জানিয়ে তিনি লেখেন :

> ইদানীং প্রায় ৪০টা ছোট গীতিকাব্য লিখে তার নাম দিয়েছি "বৈকালী"। সবগুলো একটা খাতায় কপি ক'রছিলুম – মনে ছিল প্রবাসীতে পাঠাব – তাঁদের কাজ হয়ে গেলে ছোট একটি বইয়ে ছাপাব। অনেকগুলো করে কবিতা ছাপানো ভুল – তাছাড়া বারবার মনে হয় আমার বেশি দিনের মেয়াদ নয় তাই জমাবার দূরাশা রাখি নে, হাতে হাতে খরচ করে যাওয়াই ভালো। হয় ত খাতাটা তোমার কাছে পাঠাবো, যদি রামানন্দবাবু প্রসন্নমনে সেগুলি গ্রহণ করতে পারেন তাঁকে দিয়ো – যদি তা অসম্ভব হয় তাহলে রথীর কাছে খাতাটা ফেরৎ দিতে ভুলো না। যে লেখাগুলো আগেই ছাপা হয়েছে তাতে X চিহ্ন দিয়েছি। তোমরা যদি এগুলো ছাপবার যোগ্য বোধ কর তাহলে কপি করে নিয়ে ছাপিয়ে খাতাটা বই ছাপবার জন্যে ফিরে দিয়ো।[৬৩]

এই চিঠিটি কবে লেখা তাই নিয়ে কিছু সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তারিখ দিয়েছেন '১৮ বৈশাখ ১৩৩৩' অর্থাৎ ১ মে ১৯২৬। *চিঠিপত্র* দ্বাদশ খণ্ডের সম্পাদক এই তারিখের পাশে '?' লিখে তাঁর সংশয়

জানিয়েছেন, এবং এই চিঠির তারিখ হিসেবে জানিয়েছেন '**১৩ মে ১৯২৬***'। *-চিহ্নটি পোস্টমার্ক সূচক। তবে **১৩** তারিখের আগের দিনই কবি ইউরোপ যাত্রার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ের দিকে পাড়ি দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে 'হয় ত খাতাটা তোমার কাছে পাঠাব' ইত্যাদি কথার কোনো মানে থাকে না। এ চিঠি নিশ্চয়ই রামানন্দকে লেখা চিঠিটির আগেই লেখা। যাইহোক, রামানন্দ অবশ্যই খাতাটি 'প্রসন্নমনে' গ্রহণ করেছিলেন। 'প্রবাসী'র **১৩৩৩** বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে কার্তিক এই পাঁচটি সংখ্যায় এই পাণ্ডুলিপি থেকে বাছাই করে মোট ৩২টা গান ছাপিয়েছিলেন রামানন্দ।

ইউরোপে *লেখন*-এর কাজ যখন চলছে তখন এই গানগুলিও অ্যালুমিনিয়াম শিটের উপর লেখা হতে থাকে, *লেখন*-এর মতোই এই 'বৈকালী'-র জন্যেও তৈরি হয় একটি আখ্যাপত্রও : **'বৈকালী/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ১লা অগ্রহায়ণ/১৩৩৩/ বেল্‌গ্রেড্'**। ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর ১৯২৬। *লেখন*-এর আখ্যাপত্রটি রচনা করবার (১০ নভেম্বর) ৭ দিনের মধ্যে এটি রচিত হচ্ছে, এর থেকে বোঝা যায় একেবারে পাশাপাশিই তৈরি হয়ে উঠছিল কবির-হস্তাক্ষরে দু-দুটি বই। কিন্তু, আমরা সবাই জানি, কবির জীবৎকালে 'বৈকালী' কখনই প্রকাশিত হয় নি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের লেখা **১১** জানুয়ারি **১৯২৭**-এর পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটিতেই নিহিত আছে। পেনসিলে লেখা হবার কারণে যে অংশগুলি মুদ্রিত করা যায় নি, সেটা এই 'বৈকালী'রই অংশ ছিল। কবিপুত্রকে লেখা **১৮** জানুয়ারির চিঠির পরবর্তী একটা অংশে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায় :

> "বৈকালী" (পেনসিলে-লেখা) অনেক চেষ্টা ক'রেও সব ছাপাতে পারলুম না; চেষ্টার ত্রুটি হয়নি — ৬।৭ দিন রোজ Rotaprint officeএ ব'সে ব'সে চেষ্টা করেছি। ওগুলি ওখানে আবার ফিরে ছাপাতে হবে। পেন্‌সিলে একটু জোর দিয়ে লেখা দরকার যাতে যথেষ্ট দাগ পড়ে, এবং fixing solution যেনো[য] খুব বেশি ব্যবহার করা হয়।

'বৈকালী' ফের ছাপাবার চেষ্টা করা হবে কলকাতায় ফিরে, লিখলেন প্রশান্তচন্দ্র, কিন্তু সেরকম কোনো চেষ্টা হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। উপরিল্লিখিত চিঠিটিতে কিন্তু এ-ও জানানো হয়েছিল যে, 'Rotaprint machine এই সপ্তাহে dispatch ক'রবে বলেছে। আমি complete equipment পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রেছি — যাতে এখনি কাজ আরম্ভ করা হতে পারে।' এই মেশিন আদৌ শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছিল কি না, সে

বিষয়েও কোনো সংবাদও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে ঘটনা হল, ‘বৈকালী’ বা অন্য কোনো গ্রন্থই আর পরবর্তীকালে Rotaprint-এর সাহায্যে ছাপা হবে না।

কবির জীবনাবসানের পর ১৯৫১-র ২৩ ডিসেম্বর *বৈকালী*-র একটি স্বল্পপ্রচারিত ও খণ্ডিত রূপ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৯৭৪ সালে কানাই সামন্তের সম্পাদনায় বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়-সহ পূর্ণাঙ্গ *বৈকালী* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তবে এগুলির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের গবেষণার অন্তর্গত নয়।

মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা/১ : করুণাবিন্দু বিশ্বাসকে ১৯২৬-এর মাঝামাঝি গ্রন্থালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এরপর থেকে জগদানন্দ রায়ের নামই ‘প্রকাশক’ ও ‘মুদ্রাকর’ হিসেবে উল্লিখিত হচ্ছিল। কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের (Publishing Department) ‘সচিব’(Secretary) পদটি একটি পৃথক পদ, করুণাবিন্দু চলে যাবার পর সেই পদটিতে একজন যোগ্য মানুষের প্রয়োজন ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সহকর্মী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে(১৮৮৩-১৯৬১) ১৯২৭-এর কোনো-এক সময়ে এই দায়িত্বে আনা হয়। দীর্ঘদিন এই পদে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন চারুচন্দ্র, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* প্রকাশে তাঁর উদ্‌যোগ ছিল সর্বাধিক। অবশ্য ‘প্রকাশক’ হিসেবে তাঁর নাম কোনো বইতে কখনই উল্লিখিত হয় নি।

১৯২৮ সালে কলকাতার বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। বিশ্বভারতীর ১৯২৮ সালের ‘Annual Report’-এ জানানো হয় :

> The General Office together with the Office of the Publishing Department (at 10, Cornwallis Street) and the Bookshop (at 217, Cornwallis Street) were removed to 210, Cornwallis Street, Calcutta from September, 1928. This change has led to a considerable improvement in the efficiency of management and supervision.[৬৪]

যদিও আমরা আগেই বলেছি, এই সময়ে ছাপার কাজ হচ্ছে মূলত শান্তিনিকেতন প্রেসে, ফলে গ্রন্থপ্রকাশের ক্ষেত্রে কলকাতা-অফিসের মূল দায়িত্বটা ছিল বিপননের এবং প্রাক-মুদ্রণ প্রস্তুতির, অর্থাৎ শান্তিনিকেতন প্রেসকে কাগজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম যোগান দেওয়ার।

দপ্তরের ঠিকানা বদলানোর খবর দেওয়ার পাশাপাশি এরও একটি জরুরি খবর ১৯২৮-এর 'Annual Report'-এর ঐ একই পৃষ্ঠায় জানানো হয় যে, 'Kishorimohan Santra, who had been working as Assistant Secretary three years ago but had been obliged to take leave on account of illness, came back and joined the Calcutta office in August, 1928.' ১৯২৩ থেকে গ্রন্থালয়ের কলকাতা অফিস সামলানোর মূল দায়িত্ব ছিল কিশোরীমোহনের উপর। তবে ১৯২৪-এর ডিসেম্বরে অসুস্থতার কারণে তিনি সে দায়িত্বে অব্যাহতি দিয়ে চলে যান। উপরোক্ত 'রিপোর্ট' থেকে জানা যাচ্ছে ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে কিশোরীমোহন পুনর্বহাল হয়েছেন কাজে। আমাদের পরবর্তী আলোচ্য গ্রন্থ *মহুয়া* প্রকাশের ক্ষেত্রে কিশোরীমোহনের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু কথা এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে কাজে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু ১৯২৯-এর মাঝামাঝি কিশোরীমোহন ফের কাজ থেকে অব্যাহতি চাইলেন, এবার আর অসুস্থতার কারণে নয়, বিশ্বভারতী-প্রদত্ত বেতন নিয়ে তাঁর অসন্তোষের কারণে। ১৯২৯-এর ৩০মে প্রশান্তচন্দ্রকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে সেকথা জানালেন তিনি, 'আমি বিয়ে করে সংসারী হতে চাই। আমার অর্থাভাবই তার পথে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার নিজের এখন যা আয় আছে তাছাড়া বাইরে থেকে এজন্য আমার আরো ১০০টাকা উপার্জ্জন করা প্রয়োজন'।[৬৫] একই কথা রথীন্দ্রনাথকেও জানালে রথীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বাস দেন কিছু-একটা ব্যবস্থা করবার। ১৫ জুন প্রশান্তচন্দ্রকে সেই আশ্বাসের কথা জানিয়ে দেন কিশোরীমোহন, 'রথীবাবু assurance দিয়েছেন ও apply করতে নিষেধ করেছেন। বিস্তারিত পরে লিখ্‌বো। আমি apply করলাম না।'[৬৬] (নিম্নরেখাটি কিশোরীমোহনেরই দেওয়া)। রথীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে অতঃপর তাঁর বেতন ও পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালের 'Annual Report' থেকে জানা যায়, 'Kishori Mohan Santra worked as Assistant General Secretary and was in charge of the

General Office in Calcutta'।[৬৭] শুধু গ্রন্থালয় না, এবার গোটা কলকাতা অফিসেরই দায়িত্বভার ন্যস্ত হল কিশোরীমোহনের কাঁধে।

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত *মহুয়া* কাব্যগ্রন্থটিও প্রকাশিত হবে কিশোরীমোহন সাঁতরারই প্রায়োগিক তত্ত্বাবধানে, প্রকাশক হিসেবে এই প্রথম কোনো বইতে থাকবে তাঁরই নাম।

একেবারে শীর্ষস্তরের কিছু বদলের কথাও এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। ১৯২২-এর ১৬ মে বিশ্বভারতীর 'সংবিধান' রেজিস্ট্রি হবার পর থেকে ১৯২৬-এর মে মাস পর্যন্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ছিলেন বিশ্বভারতীর যুগ্ম-কর্মসচিব (General Secretary)। ১৯২৬-এর মে মাসে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণে সঙ্গী হন রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র উভয়েই। সে কারণে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান। ১৯২৭-এর ৩০ জানুয়ারি কর্মসমিতির অধিবেশনে তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় ও কর্মসচিবের ভার অর্পণ করা হয় রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর হাতে। সহকারী কর্মসচিব মনোনীত হন সুশোভনচন্দ্র সরকার। কিন্তু দেবেন্দ্রমোহন নিজেই বছরের মাঝামাঝি ইউরোপ যাওয়ার জন্যে অব্যাহতি চাইলে ১ জুলাই ১৯২৭-এ এই দায়িত্ব ফিরে আসে প্রশান্তচন্দ্রের একার কাছে, কেননা রথীন্দ্রনাথ দায়িত্বে ফিরতে চাইছিলেন না তখন। ১৯৩১-এর অক্টোবর পর্যন্ত প্রশান্তচন্দ্র এই পদে থাকেন। আভ্যন্তরীণ নানা কুটিলতার কারণে প্রশান্তচন্দ্র দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইছিলেন কিছুদিন ধরেই। তাছাড়া ১৯৩১ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট', তার চাপ তো ছিলই। ফলে প্রশান্তচন্দ্র ইস্তফা দেন। এরপর থেকে এই পদে নিযুক্ত হন একা রথীন্দ্রনাথ।

২। *মহুয়া* (১৯২৯) এবং 'বরণডালা'ও 'রাখী'

১৯২৮-এর মাঝামাঝি থেকে পাশাপাশি দুটি (নাকি তিনটি?) নতুন কাব্যসংকলন গ্রন্থের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। নতুন-লেখা কবিতাগুলি নিয়ে 'মহুয়া' এবং বিবাহে-উপহার-দেবার-যোগ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার একটি সংকলন 'বরণডালা'এবং/অথবা 'রাখী'। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কবি ৩ আগস্ট ১৯২৮-এর চিঠিতে লিখছেন, 'বরণডালার পাণ্ডুলিপিটা একবার পাঠিয়ে দিলে কবিতাগুলি কি পর্য্যায়ে সাজানো উচিত চিন্তা করে দেখ্‌তে

পারি।'[৬৮] ৩০ আগস্ট লিখছেন, 'রাখীর কাপি লোকহস্তে তাড়াতাড়ি পাঠালুম কিন্তু তার পরে তিন দিন কোনোরকম খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম।'[৬৯] এই একই চিঠিতে আছে *মহুয়া*রও উল্লেখ, 'বিবাহ উপলক্ষ্যে যে আটটি কবিতার উল্লেখ করেছ তার মধ্যে "অনন্তের বাণী" ছাড়া বাকি কবিতাগুলি মহুয়ার সমসাময়িক – ওদের একত্র সমাবেশ প্রার্থনীয়। "অনন্তের বাণী" তোমরা রাখীতে নিতে পারো।'

অন্যকথা বলবার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের খানিক সংশয় হয় যে, 'বরণডালা' ও 'রাখী' কি একই গ্রন্থের পৃথক নাম না কি একেবারে প্রথমদিকে এই দুটিকে দুটি পৃথক গ্রন্থ হিসেবেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল? কোনো বিশেষজ্ঞই অবশ্য এই সংশয়টি উত্থাপন করেন নি, *রবীন্দ্রজীবনী*-কার প্রভাতকুমার না, *মহুয়া*-র কোনো গ্রন্থপরিচয়কার-ও নন। আসলে, ১৯২৯ সালের ১৫ নভেম্বর রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে কবি লিখছেন, '"বরণডালা" ওরফে "রাখী" এখানে যদি ছাপানো স্থির হয়...'[৭০] ইত্যাদি। এই বাক্যের 'ওরফে' শব্দটির পর এই সংশয়টিকে অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু, ১৯২৯-এ দুটি একই বইয়ের নাম হয়ে উঠলেও, ১৯২৮-এর আগস্টেও কি ব্যাপারটা এরকমই ছিল? আমাদের মনে হয়, ১৯২৮-এ প্রাথমিক পরিকল্পনার সময়ে উপহারযোগ্য *কবিতার* সংকলন হিসেবে 'বরণডালা' এবং উপহারযোগ্য *গানের* সংকলন হিসেবে 'রাখী' পরিকল্পিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কোনো একসময় গীতসংকলন হিসেবে 'রাখী'র পরিকল্পনা বাতিল হয়। অবশ্য সেটা ১৯২৯-এর জানুয়ারির আগে নয়। কেননা ৯ জানুয়ারি কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লেখা একটা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে কবি লিখছেন, 'গানের ও রাখীর ফাইল শীঘ্র পাওয়া দরকার'।[৭১] 'গানের' ফাইল বলতে ১৯৩১-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানের সংকলন *গীতবিতান*-এর প্রাথমিক কোনো পরিকল্পিত রূপের কথা বলা হচ্ছে এখানে। অনুমান করা যায়, *গীতবিতান*-এর পরিকল্পনা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হবার কারণেই 'রাখী'র পরিকল্পনা বাতিল হয়। ১৯২৯-এর আগস্ট মাসে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা একটি তারিখহীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 'বরণডালার পাণ্ডুলিপি এই সঙ্গে পাঠাই। নামটা "রাখী" দিলে চল্‌তে পারে।'[৭২] 'বরণডালা' আর 'রাখী' যদি একই বইয়ের নাম হিসেবে সেই ১৯২৮-এর আগস্ট থেকেই পরিকল্পিত হয়, তাহলে তার এক বছর বাদে 'বরণডালা'র নাম 'রাখী' দিলে চলতে পারে, এই নির্দেশটির কোনো অর্থই থাকে না! বস্তুত, এই চিঠিতেই প্রথমবার 'বরণডালা' নামের প্রস্তাবিত বইটির উপর 'রাখী' নামটি আপতিত করবার প্রস্তাব করলেন কবি। খেয়াল রাখতে হবে, রথীন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত

চিঠিটি, যেখানে স্পষ্ট করে ‘বরণডালা ওরফে রাখী’ লেখা আছে, সেটি কিন্তু প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা এই চিঠিরও মাস তিনেক (১৫ নভেম্বর) পরে লেখা।

অবশ্য, আমরা সবাই জানি, ‘বরণডালা’ নামের কোনো বইও কোনোদিন প্রকাশিত হয় নি। ‘বরণডালা’ কেন বাতিল হল? মনে রাখতে হবে, ১৯২৯-এর শেষদিক থেকে *সঞ্চয়িতা* কাব্যসংকলনটির পরিকল্পনা শুরু হয়, রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠি তার প্রথম সাক্ষ্য দেয়, ‘“কাব্যগ্রন্থন” নাম দিয়ে আমার নিজের স্বীকৃত কবিতা ছাপতে চাই।’[৭৩] সেই সঙ্গে যদি কাছাকাছি সময়ে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠির এই নির্দেশটি মাথায় রাখা যায় যে, ‘অনেকগুলো বই একসঙ্গে ছাপানো ব্যবসা হিসাবে ভুল’[৭৪], তাহলে হয়তো ‘বরণডালা’ বইটি ছাপানোর কাজও শেষমুহূর্তে স্থগিত করে দেবার একটা কারণ অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

যাইহোক, এবার *মহুয়ার* কথা। *মহুয়া* প্রকাশিত হয় ১৯২৯-এর অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে। বইটি হাতে পাবার পর, ২০ অক্টোবর, প্রশান্তচন্দ্রকে চিঠি লিখে কবি জানান : ‘রাখীর নথীপত্র পৌঁছল। মহুয়া পেয়েছি।’[৭৫] এর থেকে অনুমান করা যায়, সেইদিন বা তার আগের দিন বইটি প্রকাশিত হয়ে থাকবে। তবে সম্ভবত, বইটি এর বেশ খানিকটা আগেই মুদ্রিত হয়ে গেছিল, তাতে নানা ভুল চোখে পড়ায়, ফের খানিকটা নতুন করে ছাপার কাজ করতে হয়। ১৩ অক্টোবর (১৯২৯) রথীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে সেই খবরটি পাওয়া যায় :

> কাল আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি। “মহুয়া”র revised কপি কিশোরীর কাছে, তাকে ব’লেছি আপনার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতে। “শুদ্ধিপত্র” ছাপা না হওয়া পর্য্যন্ত বইখানা কিশোরীর কাছে থাকলেই বোধহয় ভালো হয়, নইলে আবার ভুলচুক হ’য়ে যেতে পারে। কিশোরী ব’লছে যা অধিকাংশ ভুলই কপির ভুল, প্রুফ দেখা বা ছাপাখানার দোষ নেই; তবে প্রুফ দেখ বা ছাপাখানার দরুণ ভুলও কিছু আছে। অনেকগুলি ভুল (punctuationএর) এতই সামান্য যে তার জন্য শুদ্ধিপত্র দেওয়াও দরকার আছে কি না সন্দেহ। যাহোক্ শুদ্ধিপত্র সম্বন্ধে কিশোরীকে ব’লেছি কবিকে লিখে যেন কী করা কর্ত্তব্য স্থির ক’রে নেয়।[৭৬]

এখানে একটু অ-প্রসঙ্গত বলা যাক যে, বই ছাপা নিয়ে সবসময়ই কবির ব্যক্তিগত সহকারী অনিলকুমার চন্দ এবং সুধীর করের সঙ্গে প্রকাশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কিশোরীমোহনের টানাপোড়েন লেগেই থাকত। আমরা তার

অসংখ্য কৌতুকময় নিদর্শন এই গবেষণাকাজটি করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি। এই চিঠির 'কপির ভুল', 'প্রুফের ভুল' আর 'ছাপাখানার দোষ'-এর নিক্তি মাপা হিসেবটিকেও সেই টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতেই দেখতে হবে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রেস-কপি করার মূল দায়িত্বে থাকতেন অনিল চন্দ এবং সুধীর কর। যাইহোক, *মহুয়ার* 'revised' প্রথম সংস্করণে অবশ্য শেষপর্যন্ত কোনো 'শুদ্ধিপত্র' যায় নি। সম্ভবত কিছুটা পুনর্বার ছাপতে হয়েছিল। প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা ২০ অক্টোবরের যে চিঠিতে কবি এই 'revised' *মহুয়ার* প্রাপ্তিস্বীকার করেন, সেখানেই তারপর তিনি জানান, 'মহুয়া পেয়েছি। আরো কিছু শুদ্ধির কাজ করতে হোলো। সংশোধনের জন্যে ভাবী সংস্করণের জন্যে অপেক্ষা করাই শ্রেয়।'

নির্মলকুমারী মহলানবিশের এক স্মৃতিচারণায় *মহুয়া* ও 'রাখী' বা 'বরণডালা' পরিকল্পনার অন্দরমহলের কথাটি অনেকটা বিস্তারে জানা যায় :

> ১৯২৮ সালে একদিন শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কবিকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে কবি যদি তাঁর লেখার মধ্যে থেকে বিবাহে উপহার দেবার যোগ্য কবিতাগুলো চয়ন করে দেন তাহলে বিশ্বভারতী পাবলিশং সোসাইটি একটা আলাদা বই বেশ চক্চকে ঝক্ঝকে করে উপহার দেবার জন্যে বের করতে পারে।...কথাটা কবির পছন্দ হয়েছিল। খুব উৎসাহের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করে স্থির করলেন বইখানার নাম হবে 'বরণডালা', কারণ বিয়ের উপহারের পক্ষে ঐ নামটাই যোগ্য নাম। কিছু পুরোনো প্রেমের কবিতা নিয়ে আর কিছু নতুন নতুন কবিতা যা জমেছে তাই মেলালে বেশ ভালো আকারেরই একখানা বই করা যাবে।...কিছুদিন পরে বললেন, 'আমার কি কবিতা লেখবার ক্ষমতা চলে গিয়েছে যে একখানা নতুন বই বের করবার জন্যে পুরোনো কবিতা ধার করতে হবে? আমি সবকটাই নতুন কবিতা দেব।...' পরে দেখতে দেখতে অনেকগুলো কবিতা লেখা হয়ে গেল এবং 'বরণডালা' নাম বদলে 'মহুয়া' নামে ছাপা হল।[৭৭]

এই স্মৃতিবিবরণে কিছু ত্রুটিও আছে অবশ্য। প্রথমত, 'বরণডালা' নাম বদলে 'মহুয়া' হয় নি, আমরা দেখেছি প্রথম থেকেই ঐ দুটি নামের দুটি পৃথক বইয়ের পরিকল্পনা নেওয়া নেওয়া হয়। একটি বিবাহে-উপহারযোগ্য কবিতার সংকলন, অন্যটি নতুন কবিতার। আর দ্বিতীয়ত, *মহুয়া* প্রকাশিত হয়ে যাবার পরও কিন্তু 'বরণডালা' তথা 'রাখী'র প্রকাশ-পরিকল্পনা স্থগিত করে দেওয়া হয় নি। আরও অন্তত মাসখানেক এই নিয়ে প্রশান্তচন্দ্র-রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবিকে চর্চা করতে দেখা যায়। *মহুয়া* প্রকাশ হয়ে যাবার প্রায় একমাস পরেও, ১৯ নভেম্বর,

রথীন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটিতে দেখা যায় 'বরণডালা' কোথায় ছাপা হবে তাই নিয়ে কথাবার্তা চলছে : '"বরণডালা ওরফে "রাখী" এখানে যদি ছাপানো স্থির হয় তবে সে সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য নির্দিষ্ট করে জানাস। ছবিগুলো হয়তো কলকাতায় ছাপাতে হবে কিন্তু লিখন অংশ সেখানে ছাপানো অন্যায় অপব্যয়। ছবিও এখানকার প্রেসে ছাপান চলে কিনা ভেবে দেখিস।'

মুশকিল হল, *মহুয়া*র প্রথম সংস্করণের সূচনায় 'পাঠ পরিচয়' অংশে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যা লিখলেন তাতেও রয়ে গেল কিছু ভুল বোঝার অবকাশ :

> "মহুয়া"র অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। সেই সময়ে কথা হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল; সেই সব কবিতাই এখন "মহুয়া" নামে বাহির হইতেছে।

'পাঠ পরিচয়'-এর এই অংশটুকু পড়লেও মনে হতে পারে যে 'অনেকগুলি' নতুন কবিতা লিখে ফেলার পরই বুঝি *মহুয়া*-র পরিকল্পনা করা শুরু হল। তা অবশ্যই নয়। প্রশান্তচন্দ্র নিজেই লিখেছেন শ্রাবণ থেকে পৌষ এই ৬ মাস-জুড়ে নতুন কবিতাগুলি লেখা, কিন্তু ঘটনা হল শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্রে আসতে আসতেই আমরা দেখতে পাব *মহুয়া*-পরিকল্পনার নিশ্চিত প্রমাণ। আর কারোকে নয়, স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্রকেই ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ব (৩০ আগস্ট ১৯২৮) লেখা চিঠিতে কবি জানাচ্ছেন (চিঠিটির একটি অংশ আমরা আগে উদ্ধৃত করেছি), 'বিবাহ উপলক্ষ্যে যে আটটি কবিতার উল্লেখ করেছ তার মধ্যে "অনন্তের বাণী" ছাড়া বাকি কবিতাগুলি মহুয়ার সমসাময়িক – ওদের একত্র সমাবেশ প্রার্থনীয়। "অনন্তের বাণী" তোমরা রাখীতে নিতে পারো।' ফলে *মহুয়া* ও 'রাখী' এবং 'বরণডালা'র পরিকল্পনা যে প্রথম থেকেই পাশাপাশি চলছিল, এতে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

যাইহোক, এইখানে আমরা বিস্তারিতভাবে দেখে নিতে চেষ্টা করব *মহুয়া* গ্রন্থটি নির্মাণ করে তোলার পূর্বপটটিকে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ১৯২৯-এর ৭ সেপ্টেম্বরে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে *মহুয়া* (এবং 'রাখী') সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরি কথা পাওয়া যায় :

তোমার কাছে নালিশ করব।...মহুয়ার প্রকাশ ব্যবস্থা একদা ছিল অপূর্বর হাতে, সে আজ দশমাস হয়ে গেল – তার পরে ভার নিলেন প্রশান্ত – এক থাক প্রুফ দেখাও শেষ করে দিয়ে এসেছি – মনে দুরাশা ছিল যে, পূজোর [য] ছুটির পূর্বেই বই বেরবে এবং পূজোর বাজারে কিছু বিক্রিও হবে। আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায় ! আমাদের এখানকার ছাপাখানা দুয়োরানী – তাকে সবাই ঠেলে রেখে দেয় – কিন্তু তেরো ফর্মা তপতী সেই দুঃখিনী দশদিনে সমাধা করেচে। রাখী সম্বন্ধে কী অভিপ্রায় তাও জানিনে – বস্তুত ২১০ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট মানব সংসারের ইতিহাসে কোনো প্রকার নড়াচড়ায় প্রবৃত্ত আছে কিনা সম্প্রতি তার খবর পাইনে। রাখীর আবরণপত্র – যাকে হাল বাঙলায় প্রচ্ছদপট বলে – তাড়াতাড়ি একখানা বানিয়ে দিয়েছিলুম, সেটা কিন্তু আমার পছন্দমতো হয় নি – হুকুম পাবামাত্র চিঠি লিখতে বসে কোনোমতে কলমের আঁচড় কেটে ওটাকে হাতে হাতে এঁকে দিয়েছিলুম – ওটাই যে ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো দায় নেই। কিন্তু বোধ হচ্চে বৃথা সময় নষ্ট করচি। – এখনো অনেক দেরি। বর্তমান যুগে মহুয়ার আবির্ভাবই কামনা করা যাক্।[৭৮]

এই চিঠির অনেকগুলি প্রসঙ্গই কিছু সবিস্তার ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

প্রথমত, উদ্ধৃতির প্রথম লাইনে যে ‘অপূর্ব’র কথা বলা আছে তিনি হলেন অপূর্বকুমার চন্দ(১৮৯২-১৯৬৭)। ইনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, কবির স্নেহভাজন। এই সময়ে ইনি বিশ্বভারতী ‘গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি’র অন্যতম সদস্যও বটে, তবে সবাইকে ছেড়ে এঁর উপরেই কেন যে ‘মহুয়ার প্রকাশ ব্যবস্থা’ ছিল তা বলা মুশকিল। বস্তুত, এই ভার যে একদা এঁর উপরে ছিল, তা নির্মলকুমারীকে লেখা এই চিঠিটি থেকেই কেবলমাত্র আমরা জানতে পারি। অপূর্বকুমার চন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কোন চিঠি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হয় নি। মনে রাখা দরকার, ১৯২৯-এরই ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কবি আমেরিকা-কানাডা-জাপান সফরে অপূর্বকুমার ছিলেন কবির ভ্রমণসঙ্গী। ফলে তাঁর কাছ থেকে প্রশান্তচন্দ্রের কাছে *মহুয়া*-সংক্রান্ত দায়িত্বের হস্তান্তর নিশ্চয়ই এর আগেকার ঘটনা।

দ্বিতীয়ত, এই চিঠিতে কবি লিখেছেন, ‘এক থাক প্রুফ দেখাও শেষ করে দিয়ে এসেছি’। *মহুয়ার* এই প্রুফ কবে দেখলেন কবি? ১৯২৯-এ আগস্ট মাসের মাঝামাঝি তিনি ছিলেন কলকাতায়। প্রতিমা দেবীকে কলকাতা থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ৩ ভাদ্র (১৯২৯, ১৯ আগস্ট) একটি চিঠিতে কবি লিখছেন, ‘আমাকে এখানে আরো দু চারদিন এখানে ধরে রাখবে। প্রথম অনুনয় হচ্চে রাণীর [নির্মলকুমারী] – দ্বিতীয়, আমার বই ছাপার ব্যবস্থা।

মহুয়া এবং সহজপাঠ।’[৭৯] এইসময়েই অন্যকাজের সঙ্গে এই প্রুফ দেখারও কাজ চলছিল। কবি তখন প্রশান্ত-নির্মলকুমারীরই আতিথ্যে তাঁদের বাসগৃহ বেলঘরিয়াতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর অবস্থানকালেই প্রশান্তচন্দ্র কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে *মহুয়া* প্রসঙ্গে নানা কথা লিখে দুটি চিঠি দেন। অপ্রকাশিত ও সুদীর্ঘ এই চিঠি দুটি নানা অজানা তথ্যের আকর। প্রথম চিঠিটি লেখা হচ্ছে ১৭ আগস্ট ১৯২৯। সেখানে প্রশান্তচন্দ্র লিখছেন :

> কী কী কবিতা যাবে তা কবির সঙ্গে দুদিন ব’সে একরকম পাকা ক’রে নিয়েছি। আন্দাজ ১৬০ পৃষ্ঠা হবে, তার মধ্যে ১৩০ পৃষ্ঠা আন্দাজ কম্পোজ হ’য়েছে, আন্দাজ ৬০ পৃষ্ঠা কবি 2nd proof দেখে দিয়েছেন। ইচ্ছা ক’রলে ১৫ দিনের মধ্যে ছাপা শেষ করা যায়। রঙিন Block ৮ খানার মধ্যে ৪ খানা হ’য়ে গিয়েছে, ২।৩ দিনের মধ্যে বাকি ৪ খানা হ’য়ে যাবে। এক রঙের block নিয়ে দুশ্চিন্তা [?] নেই যতো তাড়াতাড়ি দরকার করানো যায়...[৮০]

এ কথা লিখেও অবশ্য প্রশান্তচন্দ্র জানাচ্ছেন যে, তবু বই বের করতে দেরিই হয়তো হয়ে যাবে, কেননা অন্য অনেকগুলি অসুবিধা আছে। চিঠির বাকি অংশ-জুড়ে বিস্তারিতভাবে সেইসব অসুবিধার কথা লিখেছেন তিনি। যেমন, একটি ‘কাগজ’ সংক্রান্ত :

> ৪০ পাউন্ড এন্টিক্ ঠিক ক’রলাম। অপূর্ব্ব বলছে এবং কবিরও ইচ্ছা যে কিছু ভালো কাগজে ছাপা হয়। Idea টা ভালো। কিন্তু এর মধ্যে কাগজ ইত্যাদি খুঁজে বের করার সময় আমার নেই। আপনার কাছে যদি কাগজ থাকে তো ব্যবস্থা করতে পারি।

আর-একটি বইয়ের অলংকরণ-সংক্রান্ত। সেই কথাটা বইয়ের পরিকল্পনাকে আমাদের সামনে পরিষ্কার করে তোলে :

> আমার মতে ছবির selection এখনও ঠিক suitable হয় নি। রঙীন ছবির আরও variety চাই। আমার ইচ্ছা আপনার বিচিত্রার ঘরে যেসব পুরনো ছবি আছে তার থেকে কিছু বেছে নেওয়া, অবনবাবুর অন্তত ২।১ খানা নেওয়া, এবং কবির নিজের অন্তত একখানা (তাতে সব দিক দিয়ে বইয়ের value বাড়বে, সাধারণ পাঠকের কাছে এবং collector দেরও কাছে)। এক রঙের ছবি গগনবাবুর [দুষ্পাঠ্য]খানা দেওয়া হচ্ছে, নন্দবাবুর [দুষ্পাঠ্য]খানা, সুরেনের ১ খানা। আমার মতে এখনও আরেকটু variety দরকার, না হলে সব বেশি একরকম হয়ে যাবে।

প্রশান্তচন্দ্রের লেখা এই সমস্ত পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য অসুবিধার কথা বিস্তারিতভাবে জেনে, পরের দিনই, অর্থাৎ ১৮ আগস্ট, রথীন্দ্রনাথ তাঁর মত লিখে পাঠালেন প্রশান্তচন্দ্রকে। অপ্রকাশিত সেই চিঠিটিও আমরা খানিকটা উদ্ধৃত করছি এখানে। সবমিলিয়ে *মহুয়া* (ও 'রাখী' বা 'বরণডালা') গ্রন্থগুলি নির্মাণের প্রেক্ষাপটটা আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে উঠবে এর ফলে। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> কাগজ খুব ভাল কিছুই কলকাতায় পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করে Thackerদের কাছ থেকে আমি যেটা পেয়েছি antique হিসাবে মন্দ নয় – তার চেয়ে ভালো আর কিছু পাবে না। কিশোরীবাবু জানেন কিরকম কাগজ –Thacker ছাড়া আর কোথাও পাবে না।...
>
> ছবি আরো দিতে চাও বিচিত্রা থেকে নিয়ে নিও। কিন্তু দেখো ছবির album না হয়ে যায়। বই খুব বড় হবে না – তখন তার ভিতরে কত ছবি দেবে? বাবার ছবি ভিতরে না দিয়ে বাইরে কভার এর design হিসাবে একটা দিলে ভাল হয়। তার উপযুক্ত একটা আমি select করে রেখেছি – পাঠিয়ে দিতে পারি। ছবির selection তুমিও কলকাতা থেকেই পারবে – তার জন্যে দেরি হবার কারণ নেই।[৮১]

'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়'-পর্বটির সঙ্গে তার আগের পর্বের রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থনির্মাণের একটা মূল তফাৎ এইসব চিঠিপত্রগুলির মধ্যে দিয়ে অনেকটা বুঝে নেওয়া যায়। এর আগে পর্যন্ত গ্রন্থ-পরিকল্পনার প্রায় সব দায়িত্বটাই রবীন্দ্রনাথকে একাই বহন করতে হয়েছে। ১৯০৩-এ খণ্ডে খণ্ডে *কাব্য-গ্রন্থ* সম্পাদনা ও নির্মাণের সময় তিনি পেয়েছিলেন মোহিতচন্দ্র সেনকে, কিন্তু সেই ব্যতিক্রমটি বাদ দিলে সাধারণ নিয়ম হিসেবে তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর যাবতীয় বইয়ের মূল পরিকল্পক। কিন্তু বিশ্বভারতী-পর্বে তাঁর পাশে আছেন অসংখ্য মানুষ, নিছক কর্মী হিসেবে নয়, পরিকল্পক হিসেবে শিল্পী হিসেবে তাঁদের যাবতীয় মেধা ও মনন নিয়ে।

এখন প্রশ্ন হল, অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের ছবি দিয়ে সাজানো এইসব রঙিন ও একরঙা ব্লক তৈরি হচ্ছে কোন বইয়ের জন্যে? প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ দুটি বইয়ের 'প্রুফ' দেখছেন বলে জানিয়েছিলেন : *মহুয়া* আর *সহজপাঠ*। *সহজপাঠ*-এর সম্ভাবনাটা এক্ষেত্রে আমরা সহজবোধ্য কারণে বাদ দিতে পারি। প্রশান্তচন্দ্রের 'আন্দাজ ১৬০ পৃষ্ঠা' কথাটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এক্ষেত্রে *মহুয়া*রই কথা বলা হচ্ছে হয়তো। প্রসঙ্গত, *মহুয়া* গ্রন্থের শেষ কবিতাটি শেষ হবে ১৭৫ পৃষ্ঠায়। কিন্তু আমাদের অনুমান, এই ছবি পরিকল্পিত 'রাখী'বা 'বরণডালা' বইটিরই জন্যে সাজিয়ে তোলা হচ্ছিল। উপহার দেওয়ার জন্যে নির্মিত বলে তা

চিত্রভূষিত হিসেবে পরিকল্পিত হচ্ছিল, এবং তারই জন্যে বিশেষরূপে 'ভালো কাগজ' খুঁজে বের করার আয়োজন চলছিল। এ সম্পর্কে একটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ আমরা এখানে উপস্থিত করতে পারি। *মহুয়া* ছাপা হয়ে যাবার পর, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রশান্তচন্দ্রের কাছ একটি চিঠির মারফৎ আদেশ এসে পৌঁছোয় যে, 'বরণডালা' ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে শান্তিনিকেতনেই। (রবীন্দ্রনাথের লেখা এই চিঠিটি পাওয়া যায় নি)। বিব্রত প্রশান্তচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে ১৩ অক্টোবর (১৯২৯) রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> কবি কাল লিখেছেন যে "বরণ-ডালা" শান্তিনিকেতনে ছাপতে হবে। এ সম্বন্ধে আমার মত অন্যরকম, তা নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। আমি কিশোরী কে ব'লে দিয়েছি যে cuttings-এর যে প্যাকেটটা শান্তিনিকেতন থেকে আমার হাতে এসেছিলো সেটা ওখানে আবার পাঠিয়ে দিতে। *ছবির ব্লক বোধহয় সব তৈরি হ'য়ে গিয়েছে। কিশোরীকে ব'লেছি করুণাকে লিখ্‌তে সবগুলি ব্লকের প্রুফ আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে।* ছবি কোথায় কীভাবে ছাপাবেন তার ব্যবস্থা আপনি directly ক'রলেই সুবিধা হয়। দুজায়গা থেকে একখানা বই বের করায় বিস্তর অসুবিধা। ব্লকগুলি করুণা ছাপ্‌বে, কিংবা অন্য কোনো প্রেসে পাঠিয়ে দেবে, কিংবা শান্তিনিকেতন প্রেসে পাঠাবে এ সম্বন্ধে আপনি তাকে direct instruction পাঠিয়ে দেবেন। বই ছাপানো সংক্রান্ত ব্যবস্থাও সমস্তই শান্তিনিকেতন থেকে করিয়ে নেবেন, একজায়গা থেকে কাজ না হ'লে অনর্থক দেরি ও অসুবিধা হবে।[৮২]
> (বাঁকানো হরফ আমাদের)

স্পষ্টতই, চিঠিটির মধ্যে প্রশান্তচন্দ্রের অনেকখানি অভিমানের সুর মিশে আছে। জরুরি কথাটা হচ্ছে, এই চিঠি থেকে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায়, ছবি এবং ছবির ব্লক 'বরণডালা'র জন্যেই তৈরি হচ্ছিল। এখানে লেখা আছে একেবারে তৈরি হয়ে যাবারও কথা ! তা সত্ত্বেও যে বইটি কখনই প্রকাশিত হল না সে আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। প্রসঙ্গত, ২০ অক্টোবর প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা পূর্বোল্লিখিত একটি চিঠিতে কবি যে লিখেছিলেন, 'রাখীর নথীপত্র পৌঁছল', তার থেকে বোঝা যায় কলকাতা থেকে সব কিছুই শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। সত্যের খাতিরে, অতএব, 'বরণডালা' বা 'রাখী' না বেরোবার জন্যে অতএব রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথকেই দায়ি করা ছাড়া উপায় থাকে না ! ১৭ আগস্টের চিঠিটি লেখার ২ দিন পর, বেলঘরিয়া থেকেই, রবীন্দ্রনাথের সেখানে অবস্থানকালেই, প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথকে আরও একটি চিঠি দেন। সেই চিঠি থেকে জানা যায়, শুধু যে ছবি তৈরি হয়ে উঠছে তা না, text-এর অলংকরণও করা হচ্ছে, এবং তা করছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ :

নন্দবাবু[নন্দলাল বসু] যদি একবার আসেন, কবি থাক্‌তে থাক্‌তে তো বড়ো ভাল হয়। কবি বুধবার ফিরবেন ভাবছেন, কিন্তু নন্দবাবু এলে হয়তো আরও ২।৩ দিন থাক্‌তে পারেন। নন্দবাবুকে পেলে, cover, end paper, ও ভিতরের text এর design সমস্ত কবির সঙ্গে ব'সে পাকা করিয়ে নেওয়া যায়। কবি তাড়াতাড়ি চ'লে গেলে text এর ছবি হ'য়ে উঠ্‌বে না, কারণ ওটা খুব restraint এর সঙ্গে ক'রতে হবে। আমার ইচ্ছা কবি কলকাতায় থাক্‌তে থাক্‌তে যা-হয়, ঠিক ক'রে নেওয়া। নন্দবাবুর পক্ষে যদি আসা অসম্ভব হয় তো সুরেন[সুরেন্দ্রনাথ কর], কিংবা নিদেন কোনো ছাত্রকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। *কবি নিজে text এর decoration আঁকতে আরম্ভ ক'রেছেন। ৩।৪ দিনের মধ্যে শেষ ক'রতে পারবেন–* এই সময়ে একজন কেউ artist এসে প'ড়লে আর কোনো গোল থাকে না।[৮৩] (বাঁকানো হরফ আমাদের)

রবীন্দ্রনাথ 'নিজে text এর decoration আঁকতে আরম্ভ ক'রেছেন', অথচ এরকম কোনো বই প্রকাশিত হয়ে উঠতে পারল না আদৌ, সমস্ত রবীন্দ্র-অনুরাগীর কাছেই এই খবর গভীর আক্ষেপের। অবশ্য, এক্ষেত্রেও প্রশ্ন ওঠে যে এই অলংকরণ কি অন্য কোনো বইয়ের জন্যে? আমাদের বিচারে, এই কাজও 'বরণডালা' বা 'রাখী'-র জন্যই হওয়া সম্ভব। এবারও *সহজপাঠ*-এর সম্ভাবনাকে আমরা দূরেই রাখতে চাইব কেননা উপরের কথাগুলি লেখবার পরেই প্রশান্তচন্দ্র এ-ও লিখছেন যে, 'তুলোট কাগজে ছাপবার ব্যবস্থা ক'রবো। অপূর্ব্ব ব'ল্‌ছে আগাগোড়া তুলট কাগজে ছাপানো – খবর নিচ্ছি, কিন্তু বোধহয় খরচে পোষাবে না।' আমাদের মনে হয় না যে একটি ছাত্রপাঠ্য 'প্রাইমার' তৈরির জন্যে এত দামি কাগজ ব্যবহারের কথা আদৌ ভাবা সম্ভব।

নির্মলকুমারীকে লেখা চিঠিটি থেকে এ-ও জানা যায় যে, 'রাখী'-র জন্যেও একটি প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন কবি। অবশ্য তাড়াহুড়োয় আঁকা সেই প্রচ্ছদ তাঁর নিজের পছন্দ হয় নি। রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের হাতে আঁকা 'রাখী'র দুখানি প্রচ্ছদচিত্র আছে।[৮৪] এর থেকে বোঝা যায় যে 'অপছন্দের' ছবিটি বাদ দিয়ে, নির্মলকুমারীকে চিঠিটি লেখবার পর, আরও একটি প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা যাক, ১৯৭৮ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে কানাই সামন্তের সম্পাদনায় *রাখী* নামের একটি গানে-কবিতায় মেলানো একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। সেই বইটি রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত 'রাখী' এমন দাবী সম্পাদক করেন নি। প্রচ্ছদ হিসেবেও সেখানে রবীন্দ্রনাথ-নির্মিত 'রাখী'র প্রচ্ছদদুটির মধ্যে থেকে কোনো একটিও ব্যবহার করা হয় নি।

প্রতিমা দেবীকে লেখা পূর্বোল্লিখিত ৩ ভাদ্রের চিঠিটিতে একটি অনুরোধ করছেন কবি, ‘সেই আমার কাঠের Sealগুলো – মহুয়ার এবং আমার bookplateএর, কালীর pad সুদ্ধ কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো।’ এখানে ‘মহুয়ার’ কাঠের Seal মানে? তার মানে কি এই যে *মহুয়ার* জন্যে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদলিপিটি থেকে মুদ্রণের উপযুক্ত কাঠের ব্লকও তৈরি হয়ে গেছিল সে সময়, ৩ ভাদ্র বা ১৯ আগস্টেই? আগস্ট মাসে এতকিছু হয়ে যাবার পরেও *মহুয়া* বই হয়ে বেরোচ্ছে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে, রবীন্দ্রনাথের খানিক অনুযোগ করবার কারণ যে ছিল, তা মানতেই হবে। যদিও, তার জন্যে প্রশান্তচন্দ্রকেই একা দায়ি করাটা (যেমন নির্মলকুমারীকে লেখা চিঠিটায় করেছেন কবি) রবীন্দ্রনাথের স্নেহের অধিকার হিসেবেই ধরতে হবে।

৩। *সহজপাঠ* (১৯৩০)

মহুয়া-র ক্ষেত্রে পরিকল্পনার শুরুর দিনগুলি থেকে গ্রন্থপ্রকাশ পর্যন্ত সময় লেগেছিল মোটামুটি ১ বছর ২ মাস। *সহজপাঠ*-এর ক্ষেত্রে ছবি ও মুদ্রণ নিয়ে প্রভূত গড়িমসির পর বইটি বেরোবে প্রায় দু বছর পার করে। ফলে এই বইটির নির্মাণের ইতিহাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক উদ্বেগ ও হতশ্বাসের কাহিনিও জড়িত হয়ে আছে।

সহজপাঠ বইটি নির্মাণের পরিকল্পনা কবে থেকে শুরু হয় তার স্থির দিনক্ষণ বলা মুশকিল, তবে তা যে ১৯২৮-এর আগস্টের অনেকটা আগেই তা নিশ্চিত করে বলা যায়। ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (১৯২৮এর ৩০ আগস্ট) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কবি যে চিঠিটি লেখেন তার থেকেই বোঝা যায় বইটির কাজ ততদিনে অনেকটাই এগিয়ে গেছে :

> সহজ পাঠের ছবির সাইজ ব্যয়সংক্ষেপের খাতিরে খর্ব্ব করতে চাও এ প্রস্তাবে নন্দলাল দুঃখিত। ঠিক একই কারণেই তোমরা আমার লেখাকে ছেঁটে বইয়ের আয়তন ও মূল্য কমাতে পারতে। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে প্রীতিকর হত না। এখানে দাম-কমানোর দামের চেয়ে অন্য জিনিষটার দাম বেশি। যে ক জন ছেলে চার আনা খরচ করে পড়তে চায় তারাই পড়ুক – যারা চার পয়সার বেশি দিতে না চায় তাদের জন্যে বইয়ের অভাব নেই।
>
> সহজ পাঠ ছাপা হতে আর কতদিন দেরি?[৮৫]

এই চিঠির বয়ান থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের লেখার কাজটি তো সমাপ্ত হয়েছে বটেই, নন্দলাল বসুর (১৮৮৩-১৯৬৬) 'ইলাস্ট্রেশন'-এর কাজটিও শেষ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ধারণা করে আছেন যে, ছবি-লেখায় মেলানো পাণ্ডুলিপি প্রেসে চলে গেছে, ছাপতেই যেটুকু দেরি ! বিমর্ষ কৌতুকে আজ আমরা বলতে পারি, উপরের উদ্ধৃতির শেষ লাইনের প্রশ্নটার ইতিহাসসম্মত উত্তর হচ্ছে : এখনও দু বছর দেরি ! চিঠিটি লেখার কালে সেকথা রবীন্দ্রনাথের (অথবা অন্য কারোরই) জানা ছিল না অবশ্য।

রবীন্দ্রনাথের লেখাটি নিশ্চয়ই হয়ে গেছিল, কেননা এর পর তিনি তাঁর লেখায় সংশোধন বা পরিমার্জন করছেন এমন কোনো সংবাদ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু নন্দলাল বসুর সেই প্রাথমিক 'ইলাস্ট্রেশন'-এর যে পরবর্তীকালে অনেক বদল ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর, *মহুয়া* এবং 'বরণডালা' বা 'রাখী'র মতোই এরপর *সহজ পাঠ*-এর পরিকল্পনাও বাকি বছরটিতে শীতঘুমে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রেও এর উল্লেখ কমে আসে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্রের অধিকাংশ চিঠিই রক্ষিত হয় নি বলে, এই সময়কার ইতিহাসটি আমাদের কাছে অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

১৯২৯-এর জুন মাসে আমেরিকা-কানাডা-জাপান সফর শেষ করে দেশে ফেরার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত বইগুলি নিয়ে ফের খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। তবে বিদেশে যাবার আগে *সহজ পাঠ* প্রসঙ্গে কিছু নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯, বোম্বাই থেকে চিঠি লিখে সেই খবর রথীন্দ্রনাথকে জানান কবি, 'বাংলা সহজ পাঠ দুইখণ্ড কলাভবনকে দিয়েছি। ছবি নন্দলালেরাই করচে। তার উপর ছাপার খরচ অতি সামান্যই হবে। আমি ইচ্ছা করি এটা নন্দলালেরা কলাভবন থেকে ছাপিয়ে এর উপস্বত্ব সম্পূর্ণ নিজের হাতেই নেন।'[৮৬] 'ছবি নন্দলালেরাই করচে', এই বাক্যাংশটি থেকে মনে হয়, 'ইলাস্ট্রেশন'-এর পরিকল্পনায় এর মধ্যেই বড়োসড়ো বদল ঘটে গেছে। তবে এই চিঠিতে লেখা হলেও, শেষপর্যন্ত *সহজ পাঠ*-এর মুদ্রণভার নন্দলাল বা কলাভবনের উপর ছিল না। রথীন্দ্রনাথ ও জগদানন্দ রায়ের তত্ত্বাবধানে তা 'শান্তিনিকেতন প্রেস' থেকে ছাপা হয়। যদিও সম্ভবত 'কলাভবন'-এর তরফেই এই বইয়ের মুদ্রণ-*খরচ* বহন করা হবে। সেটা আমরা পরে দেখব।

ছবি তৈরি করার শুরুর দিনগুলো নিয়ে নন্দলালের স্মৃতিবিবরণ বেশ মজার :

গুরুদেব আঁকতে বললেন। বললেন — সহজপাঠের ওপর ছবি এঁকে দাও। তখন প্রথম ভাগটা লেখা হয়েছে। আমি লিনোকাট্ করে রথীবাবুকে print-গুলো দেখালুম। রথীবাবু দেখে ফেরত পাঠালেন। ফেরত পাঠালেন, — 'বাবামশায় বললেন, ঠিক্ হয়নি', — এই কথা বলে। তখন অবনীবাবু এখানে আছেন। কলাভবনে একটা এগ্‌জিবিশন হচ্ছিল। সেই এগ্‌জিবিশনে টাঙ্গিয়ে দিলুম। অবনীবাবু দেখলেন। দেখে তাঁর কথা হল গুরুদেবের সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ওঁদের মতামত। অবনীবাবু বললেন — 'এ ঠিক হয়েছে।' আমি বললুম, — রথীবাবুর পছন্দ হয়নি। শুনে তিনি জোর দিয়ে বললেন, – 'এই তো ঠিক হয়েছে।' তখন তাঁর অনুমোদন পেতে তবে ব্লক ছাপা আরম্ভ হল।[৮৭]

'তখন প্রথমভাগটা লেখা হয়েছে' ইত্যাদি বাক্য থেকে বোঝা যায় এ হল ১৯২৮-এর আগস্ট বা তার আগেকার কোনো সময়ের কথা। অবশ্য এই ছবিগুলির কতটা শেষপর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল, তা বলা সম্ভব নয়। এর একবছর পরেও, নন্দলাল যে সব ছবি এঁকে উঠতে পারেন নি, তা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকেই জানা যায়। যেমন, ১৯২৯-এর দুর্গাপূজার আগে কোনো একসময়ে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে স্বয়ং নন্দলালকে কবি লিখবেন, 'নন্দলাল, প্রশান্ত অনেকবার আমাকে জানিয়েছে যে, সব ছবিগুলি পায়নি বলে সহজপাঠের ব্লক তৈরি সমাধা হল না – সাম্‌নে পূজোর[য] ছুটি।...অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। সহজ পাঠের দ্বিতীয় খণ্ডের ছবি যদি দীর্ঘকাল দেরি হয় তাহলে এ বই প্রকাশের উপযোগিতা ও উৎসাহ চলে যাবে।'[৮৮] হয়তো, প্রথম ভাগের জন্যে ১৯২৮-এর আঁকা ছবিগুলির অনেকটা ব্যবহৃত হলেও দ্বিতীয় ভাগের ছবি এইসময়েই আঁকা শুরু করেছিলেন নন্দলাল। অবশ্য, যে কোনো কারণেই হোক এই ছবিগুলি আঁকতে অস্বাভাবিক দেরিও করে ফেলছিলেন তিনি। পুজোর আগে চিঠি লিখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও, আমরা দেখব, নভেম্বর মাসেও ছবি শেষ হয়নি। ১৭ কার্তিক ১৩৩৬ (৩ নভেম্বর ১৯২৯) অমিয় চক্রবর্তীকে উদ্বিগ্ন কবি লিখছেন, 'নন্দলালকে মনে করিয়ে দিয়ো সহজ পাঠের ছবিগুলো সেরে ফেলতে। বছর খানেক প্রায় হতে চলল – আর দেরী সয় না।'[৮৯]

যাইহোক, বিদেশ ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে তিনি *সহজ পাঠ* ও ছাপাখানায়-জমে-থাকা অন্যান্য বই নিয়ে প্রশান্তচন্দ্রকেই তাগাদা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর কাছে খবর ছিল না যে কলকাতা থেকে ততদিনে এই বইয়ের দায়িত্ব চলে এসেছে শান্তিনিকেতন প্রেসের কাছে। ফলে *মহুয়া*র মতো *সহজ পাঠ* নিয়েও দীর্ঘ অনুযোগ

ধাবিত হল প্রশান্তচন্দ্রের বকলমে নির্মকুমারীর দিকে, ১৩ সেপ্টেম্বর তাঁকে লিখলেন, 'আর একদফা নালিশ করতে হ'ল। কোনক্রমে মহুয়া ফুল, ফলে পরিণত হবে এমন আশা করা যাচ্চে। কিন্তু সহজ পাঠের প্রুফ না আসাতে দুঃখিত আছি। এতই যখন দেরি করালে ছবির ব্লক নিয়ে ওটা আমাদের ছাপাখানাতেই অতি দ্রুত আমরা শেষ করতে পারতুম তাতে আমাদের মুদ্রাযন্ত্রের তহবিলও পূর্ণ হোত।'[৯০] অবশ্য দুদিন বাদে ঠিক খবরটা পেয়ে প্রশান্তচন্দ্রকেই ১৫ সেপ্টেম্বর ভুল স্বীকার করে লিখলেন, 'আমি জানতুম না, রথীরা ওদের ছাপাখানায় সহজপাঠ ছাপাবার ব্যবস্থা করছিল। তার আয়োজনও অনেকটা এগিয়েচে। মিছিমিছি তোমার উপর চাপ দিয়েচি।'[৯১]

বিশ্বভারতীর ছাপাখানায় মুদ্রণকাজটি চলে আসা সত্ত্বেও ১৯২৯এর মধ্যে *সহজ পাঠ* বেরোতে পারেনি। তার একটা কারণ হয়তো নন্দলাল বসুর ছবি-আঁকা-শেষ-করায় অস্বাভাবিক বিলম্ব। নভেম্বরেও যে তাঁকে আঁকা শেষ করার জন্যে কবি তাগাদা দিচ্ছেন, তা আমরা আগেই বলেছি। আর-একটা কারণ সম্ভবত, কলকাতা থেকে ছবিগুলির ব্লক করিয়ে আনায় বিলম্ব। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কাতরভাবে আনুরোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলা সহজ পাঠের ব্লকগুলো অবিলম্বে উদ্ধার করে যদি পাঠাতে পারো তবে বাঁচি। আর তো দেরি সয় না।'[৯২] তারিখহীন এই চিঠির কাল অনুমিত হয়েছে অক্টোবর মাস। *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত* বইয়ের সম্পাদক *রবিজীবনী*-কার প্রশান্তকুমার পালের এই অনুমান যদি সঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই উদ্ধারের কাজ মোটেই সহজ হয় নি, কেননা নভেম্বরের ১৫ তারিখেও দেখব কবি ছেলেকে লিখছেন, 'বাংলা সহজ পাঠের ব্লকগুলো পেলে অনতিবিলম্বে কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি।'[৯৩] বিলম্ব যে আরও অনেকটাই হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কবি ১৯৩০এর মার্চ-এর শুরুতে কবি ইউরোপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, তার আগে *সহজ পাঠ* বের করা যায় নি।

সহজ পাঠ প্রকাশিত হল ১৯৩০-এর ১০ মে। রবীন্দ্রনাথের এত উদ্বেগ ও আগ্রহ সত্ত্বেও নতুন বছরেরও ৫টি মাস লেগে গেল কেন তা বলা মুশকিল। সংশ্লিষ্ট সবারই চূড়ান্ত অসহযোগিতা ও অনাগ্রহ ছাড়া এর অন্য কোনো কারণ ভেবে ওঠা যায় না! *সহজ পাঠ* প্রথম ভাগের আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

সহজ পাঠ / প্রথম ভাগ / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত/ শান্তিনিকেতন প্রেসে,/রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত/ শান্তিনিকেতন, বীরভুম।/ মূল্য পাঁচ আনা।

প্রথমত লক্ষণীয় যে, প্রকাশনা-সংস্থা হিসেবে এখানে 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়'-এর নাম নেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এই গ্রন্থের উপস্বত্বের একটা অংশ কলাভবনে প্রদত্ত হয়।'[৯৪] রথীন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত ১৯২৯-এর ২৮ ফেব্রুয়ারির চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথের সেরকমই ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল। খুব সম্ভবত কলাভবনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো 'ফান্ড' থেকেই এই বইয়ের মুদ্রণখরচ বহন করা হয়। বিশ্বভারতীর ১৯৩০-এর 'Annual Report'-এ এই প্রসঙ্গে বলা হয়, 'Another book published on behalf of Kalavabana(School of Art), Sahaj Path Parts I and II, written by Poet as an introductory primer in Bengali for children and illustrated by Nandalal Bose, has attracted considerable public notice.'[৯৫]

দ্বিতীয়ত, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এই বইয়ের প্রথম সংস্করণে আখ্যাপত্রে বা বইয়ের অন্যত্র কোথাও শিল্পী নন্দলাল বসুর নাম নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে জুলাই মাসে দুখণ্ড *সহজ পাঠ* যখন পৌঁছোয়, তখন তিনি ইউরোপে। সেখান থেকে চিঠি লিখে কি নন্দলালকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন? অন্তত সেরকম কোনো চিঠি রক্ষিত হয় নি। আমরা আপাতত ভেবে খুশি হতে পারি যে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত *বিচিত্রিতা* নন্দলালকে উৎসর্গ করে শিল্পীর সম্ভাব্য বেদনার খানিক লাঘব করতে পেরেছিলেন হয়তো কবি।

অবশ্য কলাভবনেরই শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ করকে(১৮৯২-১৯৭০) ২৬ জুলাই কবি লিখবেন, 'প্রথম পাঠ প্রভৃতি বইগুলি দেখে খুবই খুশি হয়েছি। ছবিগুলো একেবারে পয়লা নম্বরের। এখানে দেখাব। কিন্তু স্বদেশের বিচারকরা কী রকম বিচার করলেন।'[৯৬] এই চিঠি নন্দলাল দেখে থাকলে তিনি খুশি হয়েছিলেন নিশ্চয়। প্রশান্তচন্দ্রকেও ৮ আগস্ট কোপেনহেগেন থেকে কবি লিখবেন, 'বাংলা পাঠ বইগুলোর ছবি খুব ভালো লাগ্‌ল। কিন্তু ছাপার ভুল দেখে ভালো বোধ হচ্চে না। "কাত্যায়নী"র দন্ত্যন'কে মূর্দ্ধন্য করা হয়েচে তা ছাড়া আরো ভুল দেখলুম।'[৯৭]

ঘটনা হল, *সহজ পাঠ* দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রণ প্রমাদের পরিমাণ ছিল খুবই বেশি। রবীন্দ্রনাথ যে 'কাত্যায়নী'র কথা বলছেন, সেই শব্দটি পাওয়া যাবে দ্বিতীয় ভাগের 'ত্রয়োদশ পাঠ'-এ। ছোট সেই কথিকাতে 'কাত্যায়নী' শব্দটি আছে মোট ৬ বার, এবং প্রত্যেকবারই ভুলবশত 'কাত্যায়ণী'-ই ছাপা হয়েছে ! সহজেই অনুমেয় যে, এটা নিছক মুদ্রণপ্রমাদ নয়, কম্পোজিটর এবং প্রুফ রিডার – কারোরই সঠিক বানানটি জানা ছিল না। আরও

সহজে একথা বোঝা যায় যে, এই দ্বিতীয় ভাগের প্রুফ রবীন্দ্রনাথ দেখে থাকতেই পারেন না। বস্তুত, অযোগ্য কেউ এই প্রুফটি দেখেছেন বলে, শুধু এই বানানটি না, গোটা খণ্ডটি জুড়ে আরও অসংখ্য বানান-ভুল চোখে পড়তে থাকে। শুধু 'ত্রয়োদশ পাঠ'-এই 'বরযাত্রী' হয়ে গেছে 'বরযাত্রি' (পৃ .৪৫) 'স্বত্ব' হয়েছে 'সত্ত্ব' (পৃ. ৪৬) 'দুর্নাম' হয়েছে 'দুর্ণাম' (পৃ. ৪৭) , 'ঠাকরুন' হয়েছে 'ঠাক্‌রুণ' (পৃ. ৪৭), 'শাড়ি' হয়েছে 'সাড়ি' (পৃ. ৪৮) !

মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা/২ : ১৯২৭-এ ইউরোপ থেকে ফিরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এককভাবে বিশ্বভারতীর কর্মসচিবের দায়িত্ব নেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ নানা কূটিলতায় এই পদ ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছেন তিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাধা দিয়েছেন তাতে। ১৯২৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর প্রশান্তচন্দ্রের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাওয়ার প্রসঙ্গে তাঁকে লিখেছিলেন, 'বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেকটা পরিমাণে আমি নিজে নিতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এ সময়ে এ কথার কোনো আভাসও থাকা উচিত হবে না যে তুমি কর্ম্মসচিবের পদ ত্যাগ করতে চেয়েছো। যথা সময়ে যথা নিয়মে যদি তোমাদের পদের পরিবর্ত্তন হয় তাহলে বলবার কোন কথা থাকে না, কিন্তু মাঝখানের থেকে কিছু হওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।'[৯৮] ১৯৩০ সালের গোড়া থেকে বিশ্বভারতীর সাধারণ অফিস এবং গ্রন্থনবিভাগের অফিসও কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে সরিয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৩০-এর 'Annual Report'-এ আলাদা করে 'Removal of the General Office from Calcutta to Shantiniketan' এই শিরোনাম দিয়ে এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য জানানো হয়।[৯৯] সেখানে বলা হয়, ১৯২৫-এর মে মাস থেকে 'for nearly 6 years the whole of the work of the General Office has been conducted from Calcutta.' তবে, এর পরেই স্বীকার করে নেওয়া হল যে, 'There has always been a feeling among many members of the Visva-Bharati, especially among those resident at Santiniketan, that it would be more in keeping with the history of the institution to locate the General Office at Santiniketan'। এই বাক্যটি থেকে স্পষ্টতই শান্তিনিকেতন এবং কলকাতার সদস্যদের মধ্যে খানিক টানাপোড়েনের আভাস পাওয়া যায়। যাইহোক, এরই ফলে গ্রন্থালয়-সহ বিশ্বভারতীর যাবতীয় দপ্তর শান্তিনিকেতনেই কেন্দ্রীভূত করা হল এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কর্মসচিব পদে ইস্তফা দিলেন, তাঁর পরিবর্তে রথীন্দ্রনাথকে নতুন কর্মসচিব মনোনীত করা হল।

স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশে প্রশান্তচন্দ্রের যে অগ্রণী ভূমিকা তারও অনেকটা ইতি পড়ল এইখানে, ১৯৩১ থেকে। অবশ্য ১১ সদস্যের 'Publishing Board'-এর সদস্য তিনি এরপরও থেকে যাবেন। তবে এই সদস্যপদ অনেকটাই আলংকারিক, সেটা জগতের বেশিরভাগ 'কমিটি' সম্পর্কেই সত্য ! ১৯৩১ সালে এই বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সচিব, গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপূর্বকুমার চন্দ, অমল হোম, সুধীরকুমার লাহিড়ী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, হিরণকুমার সান্যাল, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর ভট্টাচার্য এবং কিশোরীমোহন সাঁতরা।

সেইসঙ্গে আর-একজন মানুষের কথাও এখানে বলে নেওয়া ভালো, যিনি এইসময় থেকে রবীন্দ্রগ্রন্থ নির্মাণের অন্যতম নেপথ্য-কারিগর হয়ে উঠবেন আস্তে আস্তে, তাঁর নাম সুধীরচন্দ্র কর(১৯০৬-৭৭)। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কর্মী হিসেবে যোগ দেন। তার মাস ছয়েক পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে তাঁর নিজস্ব সহায়ক হিসেবে ডেকে নেন। এইসময়কার কথা ও অন্যান্য নানা কথা সুধীরচন্দ্র তাঁর স্মৃতিগ্রন্থ *কবিকথা*-য় বিস্তারিতভাবে বলেছেন। সুধীরচন্দ্রকে লেখা ও তাঁর নানাজনকে লিখিত চিঠিপত্র এবং এই *কবিকথা* বইটি আমাদের পরবর্তী ইতিহাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠবে।

৪। *বিচিত্রিতা* (১৯৩৩)

জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ি, অর্থাৎ অধুনালুপ্ত ৫নং বাড়িতে টাঙানো কিছু ছবি দেখে সেই চিত্রভাষাকে কাব্যভাষায় রূপান্তরের কথা ভাবেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩২ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার অদূরে খড়দহের গঙ্গাতীরে এক বাগানবাড়িতে বিশ্রামের জন্যে পৌঁছোন কবি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথ খড়দহে নিয়ে গেছিলেন। সেখানে কবি ছিলেন ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই সময়পর্বে বিভিন্ন ছবি অবলম্বনে অন্তত ১৮টি কবিতা লেখা হয়।[১০০] এরপরেও নানান ছবির প্রেরণায় রচিত হওয়া কবিতার ধারা চলতে থাকে।

বিচিত্রিতা-র পরিকল্পনার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাই আমরা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ব্যক্তিগত দিনলিপিতে। ১৯৩২ সালের ৫ আগস্ট জোড়াসাঁকোয় বসে কবির সঙ্গে সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্রের আলাপচারিতার বিবরণ আছে।

সেদিনই অন্য দু-একটি প্রকাশিতব্য কবিতার বইয়ের নামকরণ প্রসঙ্গে কথা বলার সময়ে কবি বলবেন, ‘ছবি আঁকাসুদ্ধ যেটা বেরুবে তার নাম ‘বিচিত্রিতা’, সেটা ঠিক হবে।’[১০১] অবশ্য, সর্বসাধারণের জন্যে *বিচিত্রিতা*-র খবর প্রথম জানাবে ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ এরও প্রায় মাস তিনেক বাদে। ওই পত্রিকায় কার্তিক ১৩৩৯ব সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কবির ‘প্রাসাদ ভবনে’ নামের একটি কবিতা। কবিতাটির শেষে পাদটীকার মতো করে প্রথমবার জানানো হয়, ‘এই কবিতা নন্দলালবাবুর ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। পঞ্চাশটি নূতন ছবি ও তদ্দৃষ্টে লিখিত কবির পঞ্চাশটি নূতন কবিতা শীঘ্রই “বিচিত্রিতা” নামে বই আকারে বাহির হইবে।’[১০২] পঞ্চাশটি নয় অবশ্য, শেষপর্যন্ত একত্রিশটি কবিতা ও সমসংখ্যক ছবি নিয়ে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাথমিক পরিকল্পনার কবিতা-সংখ্যা পরবর্তীকালে কমে যাওয়ার কারণটি জানা যায় সুধীরচন্দ্র করের স্মৃতিকথায়, ‘এই কাব্যখানির পাণ্ডুলিপিতে আরও অনেক বিচিত্র ধরণের কবিতা ছিল। আকার বড় হয়ে যায়, তাই প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি খণ্ডে ভাগ করে কাব্যখানি প্রকাশের কথা হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ হল না।’[১০৩]

বিচিত্রিতা বইটিতে অনেকগুলি সম্পূর্ণ রঙিন ছবি ছিল বলে বইটি শান্তিনিকেতন প্রেসে ছাপার কথা ভাবা হয় নি। বইটি ছাপা হয় বিখ্যাত ইউ.রায়. এণ্ড সন্স থেকে। করুণাবিন্দু বিশ্বাস তখন এই ছাপাখানাটির ম্যানেজার। তাঁরই তত্ত্বাবধানে বইটি ছাপা হতে থাকে। তবে রবীন্দ্রনাথের অনেক বইয়ের ক্ষেত্রেই যেটা হয়েছে, পরিকল্পনা শুরু আর গ্রন্থপ্রকাশের মধ্যে রয়ে গেছে অস্বাভাবিক সময়ের দূরত্ব, *বিচিত্রিতা*-র ক্ষেত্রেও সেরকমই ঘটছিল। ১৯৩২-এর আগস্টে বইটির লেখা, নামকরণ ও পরিকল্পনার প্রায় সবটা সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখব তার এক বছর পরও রবীন্দ্রনাথ বইয়ের সত্বর ছাপার জন্যে নানাজনকে অসহায়ভাবে তাগাদা দিচ্ছেন। যেমন, ১৯৩৩-এর মে-জুন নাগাদ দার্জিলিং থেকে একটি তারিখহীন চিঠিতে রথীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চাইছেন, ‘করুণাকে কি সেই নতুন দুটো কবিতা বিচিত্রিতার জন্যে আজ পর্যন্ত তুই পাঠাস নি? এখনও প্রুফ এলো না কেন? একেবারে সমস্ত চুপচাপ – মানে বুঝতে পারচি নে।’[১০৪] তেমনি, মে মাসের গোড়ায় ব্যক্তিগত সচিব অমিয় চক্রবর্তীর(১৯০১-১৯৮৬) কাছে জানতে চাইছেন ছাপার কাজের খবর, ১৮ মে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর উত্তর নিশ্চয়ই তাঁকে আশান্বিত করে নি, ‘আমি মধ্যে করুণাবাবুর কাছে...খোঁজ নিয়েছি।...অত্যন্ত ধীরে ধীরে কাজ চলচে – বলচেন আর বেশি দেরি নেই। কিছুই ভরসা পাওয়া যায় না।’[১০৫]

বিচিত্রিতা প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। মুদ্রণ সংখ্যা ১১০০।

মোট ৩১টি কবিতার সঙ্গে ৩১টি ছবি। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬৭-১৯৩৮) ৮টি, নন্দলাল বসুর ৩টি, সুরেন্দ্রনাথ করের ৪টি, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর(১৯০২-১৯৫৫) ২টি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ৭টি ছবি। তার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার(১৮৯১-১৯৭৫), গৌরী দেবী(১৯০৭-১৯৯৮), নিশিকান্ত রায়চৌধুরী(১৯০৯-১৯৭৩), প্রতিমা দেবী(১৮৯৩-১৯৬৯), মনীষী দে(১৯০৬-১৯৬৬) এবং সুনয়নী দেবীর(১৮৭৫-১৯৬২) একটি করে ছবি বইতে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, প্রচ্ছদ এঁকেছেন নন্দলাল, অনুচ্ছদেও ছিল একটি নন্দলালের ছবি। আখ্যাপত্রের ঠিক পরে একটু উড়োপত্রে ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি রেখাচিত্র।

বইটি প্রকাশিত হবার পরে বিভিন্ন পত্রিকায় তার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সর্বত্রই ভুলবশত ৩১-এর জায়গায় ৩০টি ছবির কথা বলা হয়। যেমন আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৩০-এর ১৭ সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ[১০৬] :

পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

- রবীন্দ্রনাথের নূতন বই –

বিচিত্রিতা

অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি চিত্রশিল্পীগণের ত্রিশটি নানা রঙের চিত্রে চিত্রিত ও চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ণিত। নন্দলালের অঙ্কিত প্রচ্ছদ সহ চমৎকার বাঁধাই ৪৲শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ করা চামড়ার বাঁধাই ৬৲।

৪ টাকা ও ৬ টাকা ছাড়াও অবশ্য আরও কয়েকটি দামের এডিশন বেরিয়েছিল, মূলত প্রচ্ছদের রকমফেরে দামের ভিন্নতা হচ্ছিল।

আগেই বলা হয়েছে, বইটির একটি দ্বিতীয় খণ্ডেরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল। *বিচিত্রিতা* প্রকাশের অল্প পরেই ২ সেপ্টেম্বর অসিতকুমার হালদারের কাছে সেই পরিকল্পনাটির কথা লিখেছিলেন কবি, ‘বিচিত্রিতা তোদের ভালো লাগবে বলেই এত যত্ন করে খরচ করে ছাপিয়েছি। বাজারে আজকাল ছবি দেওয়া বই অনেক বেরোয় – শ্যালীর বিবাহ উপলক্ষ্যে লোকেরা সেগুলো কেনে অনেক দাম দিয়ে – পছন্দও করে। ভয় ছিল সেই বাজারে বিচিত্রিতাকে রওনা করতে – মনোমত হবে কিনা জানিনে – শ্যালীর বিবাহ আসরে ওর ডাক পড়বে কিনা এখনও নিশ্চিত বোঝার সময় আসে নি। আরো একখানা বইয়ের মতো ছবি ও কবিতা জমে আছে। বিচিত্রিতার ভাগ্যের পরিচয় পেলে তার পরে যদি উৎসাহ পাই তখন তাকে অন্তঃপুর থেকে বের করব – এই রকম সংকল্প করেচি।’[১০৭] এই চিঠি লেখার বছর দুয়েক পরে দ্বিতীয় খণ্ডটি বের করার জন্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়,

কিশোরীমোহন সাঁতরাকে **১৯৩৫**-এর ২ জানুয়ারি কবি লিখছেন, ‘বিচিত্রিতা সম্বন্ধে কী করা যেতে পারে সে কথা ভেবে দেখো। অনেকগুলো নতুন বই একসঙ্গে না বের হওয়াই ভালো। কিন্তু তবু নিশ্চিত জানতে ইচ্ছে করে কোন্ নাগাদ ওকে ছাপাখানায় চড়ানো সম্ভব।’[১০৮] এরপরে কিশোরীমোহনকেই **১৯** এপ্রিল লেখা একটি চিঠিতে দেখা যায় দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা বাতিল হয়েছে, প্রথম খণ্ডেরই পরবর্তী সংস্করণে বাকি ছবি ও কবিতাগুলিকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কি না সেই প্রস্তাব করছেন কবি, ‘ওর কবিতাগুলি প্রথম খণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ছাপলে ক্ষতি কী ?’[১০৯] অবশ্য আমরা আজ জানি, কোনো দ্বিতীয় খণ্ড তো নয়ই, ‘প্রথম খণ্ডে’রও কোনো স্বতন্ত্র সংস্করণ কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি।[১১০]

<u>মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা/৩ :</u> বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে তাঁর নতুন বইগুলির আলোচনাই করা হয়ে থাকে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলে না যে একেবারে শুরুর দিনগুলো থেকেই গ্রন্থালয়ের সামনে অন্যতম বড়ো দায়িত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় পুরনো বইগুলি পাঠকের দরবারে হাজির রাখা। মনে রাখতে হবে *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-র প্রকাশ শুরু হবার (**১৯৩৯**) আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বই *আলাদা* করেই বাজারে সহজলভ্য করে তোলার দায়ও বিশ্বভারতী নিষ্ঠার সঙ্গেই বহন করতে চেয়েছে। অনেকবছর আগেই, **১৯২৫**-এর ৪ নভেম্বর একটি চিঠিতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, ‘যে বই বিক্রি বেশি হয় না সে বই ছাপান হবে না – এই policy অন্যায় মনে করি।’[১১১] ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত বই নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থালয় থেকে। নতুন বইগুলির মত এত খরচ করে সেগুলো আর ছাপানো হয় নি ঠিকই, বেশিরভাগ পুনর্মুদ্রিত বইই পেপারব্যাক মলাটে ছোট হরফে ছাপা হয়েছে, কিন্তু সেই কাজটা চালিয়ে যেতে হয়েছে নিরন্তর।

যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, **১৯৩৩** সালে গ্রন্থালয় বের করেছে রবীন্দ্রনাথের **৩**টি নতুন বই, যথাক্রমে *দুই বোন, বিচিত্রিতা* ও *বাঁশরী*। কিন্তু **১৯৩৩**-এর বিশ্বভারতী ‘Annual Report’ জানাচ্ছে যে, ‘Besides these, fifteen reprints were issued during this year.’[১১২] বলা বাহুল্য, এই **১৫**টি পুনর্মুদ্রণের জন্যেও গ্রন্থালয় কর্মীবৃন্দ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। মনে রাখা দরকার, সেটা

ডিজিটাল মুদ্রণের যুগ নয়, ফলে পুনর্মুদ্রণ মানে আবার নতুন করে কম্পোজ করা, পাতা সাজানো, নতুন করে প্রুফ দেখা! এরই মধ্যে কোনো কোনো বছরে অভিনিবেশ-সহ ভাবা হয়েছে কোন বই অনেকদিন পুনর্মুদ্রিত হয় নি। ১৯৩৬ সালে সেরকম চারটি বইকে চিহ্নিত করা হল যেগুলি প্রথম প্রকাশের পর স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি আর কখনও। সেগুলি যথাক্রমে, *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* (১৮৮১), *য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি* (১৮৯০), *পঞ্চভূত* (১৮৯৭) এবং *শারদোৎসব* (১৯০৮)। ১৯৩৬-এই সবকটি পুনর্মুদ্রিত হল। প্রথম দুটি ভ্রমণবৃত্তান্ত অবশ্য ঠিক স্বতন্ত্রভাবে নয়, *পাশ্চাত্য ভ্রমণ* শিরোনামের একটি বইতে মুদ্রিত হল সে-দুটি। *পঞ্চভূত* আর *শারদোৎসব*-ও ছাপা হল অত্যন্ত যত্ন নিয়ে। দামি অ্যান্টিক লেইড কাগজে ছাপা হল *পঞ্চভূত*। অন্যদিকে কার্ট্রিজ কাগজের মলাটে আকাশী-নীল ক্ষেত্রের মধ্যে প্রথম সংস্করণের মলাটের চিত্রটিকেই সাদা-নীল রঙে ফুটিয়ে তোলা হল *শারদোৎসব*-এ।

নতুন-পুরনো বই ছাড়াও গ্রন্থালয় নানারকম নবোদ্ভাবিত ছোট ছোট কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে নিজের প্রচার ও প্রসার বাড়াতে চেয়েছে। সেই সব উদ্‌যোগ যে সবসময় বাস্তবায়িত হয়েছে, বা বাস্তবায়িত হলেও ফলপ্রসূ হয়েছে, এমন বলা যায় না। কিন্তু আমাদের জানার পক্ষে যেটা জরুরি কথা তা হল, এইসব ছোট উদ্‌যোগেও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। ১৯৩৬-এর ৫ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার 'বিবিধ সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত একটি খবর থেকে আমরা জানতে পারছি :

> বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ এবার নানারূপ সুন্দর সুন্দর নমুনার বিজয়া-অভিনন্দন কার্ড বাহির করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐ সকল কার্ডে কবিবর রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শান্তিনিকেতনের অন্যান্য চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত চিত্র থাকিবে। শিল্পের দিক হইতে কার্ডগুলিকে যতদূর সম্ভব চিত্তাকর্ষক করার চেষ্টা হইতেছে। উহার মূল্য যাহাতে বেশী না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।[১১৩]

এই খবর প্রকাশিত হয়ে গেলেও কার্ড অবশ্য বেরোয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আরও অনেকদিন পর্যন্ত এর সম্ভাবনাতে উৎসাহ হারান নি, বরং নতুন-নতুন পরিকল্পনায় সাজিয়ে একে পুনর্জাগ্রত করার প্রয়াস করেছেন ! কিশোরীমোহন সাঁতরাকে শারদ-সপ্তমীর দিনে (১৯৩৬-এর ২২ অক্টোবর) সেইসব পরিকল্পনার কথা লিখে জানালেন, 'সেই শারদীয় কার্ড করবার সংকল্প ছিল সেটার কী হোলো। এবার যদি ফাঁক পড়ে থাকে তবে অন্তত আগামী খৃষ্টোৎসব, ইংরেজি নববর্ষের জন্যে প্রস্তুত হলে হইয় নাকি? ভাই ফোঁটা নবান্ন শ্রীপঞ্চমী

প্রভৃতির কার্ড কলাভবন থেকে করালে ওঁদের একটা আয়ের উপায় হয়। একটা জন্মদিনলিপি পঞ্জিকা আকারে করলে কেমন হয়?’’[১১৪] এসব শেষপর্যন্ত বের হতে পেরেছিল কিনা তা বলা শক্ত, তবে আজকের কার্ড-শোভিত শুভেচ্ছাসংস্কৃতির কত আগেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থালয় ও কলাভবনের আয়ের উৎসমূখ খুঁজতে গিয়ে এরকম কিছু কথা ভাবতে পেরেছিলেন, এইটা জেনে বেশ বিস্ময় জাগে বটে !

১৯৩৩-এর কাছাকাছি সময়ে বিশ্বভারতীর সাধারণ ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষভাবে গ্রন্থালয়ের ব্যবস্থাতেও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হল। ১৯২৭ থেকে কবির ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্বে ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৩৩-এর জুলাইতে সেই দায়িত্ব থেকে তিনি অব্যাহতি নিলেন, তাঁর পরিবর্তে নিযুক্ত হলেন বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনের অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ(১৯০৬-১৯৭৬)।

‘শান্তিনিকেতন প্রেস’ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিন থেকেই(১৯১৮) এর দায়িত্বে ছিলেন জগদানন্দ রায়। এই দীর্ঘ সময়ে এই প্রেস থেকে মুদ্রিত সব বইতে মুদ্রাকর হিসেবে তাঁরই নাম ছাপা হয়ে এসেছে। ১৯৩৩ সালের ২৫ জুন সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল জগদানন্দের। এর পরেই বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক এবং (ভবিষ্যৎ)-*রবীন্দ্রজীবনী*-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে(১৮৯২-১৯৮৫) ‘শান্তিনিকেতন প্রেস’-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে আনা হল। দীর্ঘকাল এই দুটি দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করবেন প্রভাতকুমার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রভাতকুমারের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থটি *বাঁশরী*, প্রকাশিত হবে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি (Publishing Board)-এর সদস্যদের তালিকায় কমবেশি বদল প্রতি বছরেই ঘটত। ১৯৩১ সালের সদস্যদের নাম আমরা এর আগে জানিয়েছিলেম। সেই তালিকায় বেশ অনেকটা বদল ঘটল ১৯৩৪-এ। সে-বছর সদস্য হলেন এঁরা :

> চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সচিব), অমল হোম, সুধীরকুমার লাহিড়ী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন সাঁতরা, দেবেন্দ্রমোহন বসু, নীহাররঞ্জন রায়, রাজশেখর বসু, সুশোভনচন্দ্র সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, কালিদাস নাগ, জীবনময় রায়, অনাথনাথ বসু।

প্রসঙ্গত, এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রমোহন বসু ১৯৩২-এর জুলাই থেকে নিযুক্ত হয়েছেন বিশ্বভারতীর অর্থসচিব পদে। রথীন্দ্রনাথ তো কর্মসচিব (General Secretary) আছেনই, কিশোরীমোহন সাঁতরা স্থায়ী সহ-কর্মসচিব

(Permanent Assistant General Secretary) পদে উন্নীত হয়েছেন তখন। অন্যদিকে, ১৯৩৩-এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থনবিভাগের দায়িত্ব ছেড়ে দেবার কথা ভাবেন। কিন্তু ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল ১৯৩৩) একটি সকাতর চিঠি লিখে সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানান :

> ...আমার গ্রন্থপ্রকাশতরণীর হাল ছেড়ে দিয়ে ওটাকে যদি ডুবতে দেন তাহলে সেটা ব্রাহ্মণোচিত হবে না। এ শাস্তি দুঃসহ হবে। – শেষ পর্য্যন্ত আপনার রায় টলবেনা এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। – কেননা আপনার হাতেই এই নালায়েকটি মানুষ – বিস্তর সঙ্কট বাঁচিয়ে স্বহস্তে আপনি একে পোষণ করেছেন – আমার পরে যদি বা ক্রুদ্ধ হন এর পর থেকে আপনার মমতা প্রতিসংহার করবেন না। কন্যার পিতার প্রতি রাগ করে কন্যার স্বামী সেই কন্যাকে কাপড়ে কেরোসিন জ্বালিয়ে আত্মঘাতের মুখে তাড়না করলে আপনি নিশ্চয়ই সেটা সমর্থন করেন না – এক্ষেত্রে সেই অঘটন ঘটতে দেবেন না। আমি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে আবেদন জানাচ্ছি – অনুকূল কর্ণপাত করবেন।[১১৫]

এই চিঠির আন্তরিকতায় সাড়া দিয়ে চারুচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। বস্তুত কবির তিরোধানের পরেও দীর্ঘকাল তিনি গ্রন্থনবিভাগের গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* তো বটেই, কবির জীবৎকালে বিখ্যাত 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' এবং মৃত্যুর পর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালা চারুচন্দ্রেরই উদ্‌যোগে প্রকাশিত হয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের এই সকাতর চিঠিটি থেকে গ্রন্থালয়ের চারুচন্দ্রের অন্তরালবর্তী ভূমিকাটির কথা অনেকটা বোঝা যায়। বিশ্বভারতী তার চলার পথে অনেক গুণী মানুষের সাহচর্য পেয়েছে, আবার কালের নিয়মে অনেকে সরেও গেছেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় চলে যেতে চাওয়ার মুহূর্তে এমন আর্ত পিছুডাক, রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি মানুষকে এভাবে ডাকেন নি, এটা আমারা খুবই নিশ্চিত করে বলতে পারি ! প্রসঙ্গত এ-ও জানানো যাক যে। ১৯৩৭-এ প্রকাশিত *সে* গ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করবেন চারুচন্দ্রকেই। উৎসর্গপত্রে লেখা হবে 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য/ করতলযুগলেষু'। চারুচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথের নির্ভরতার এ-ও এক গভীর প্রমাণ !

'শান্তিনিকেতন প্রেস' প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে, প্রথমবার, ১৯৩৫ সালে, বিভিন্ন ভাষার 'টাইপ' নতুন করে কেনা হয়। 'Annual Report'-এ বিস্তারিত জানানো হয় সেই খবর, 'This year the Press had to purchase types of various kinds for replacing old Bengali typres and English types of various kinds...and for question papers of the Institution with Debnagri types and mathematical

signs. Now the press is equipped with various sorts of types i.e, English, Debnagri, Wood type, mathematical figures and signs in addition to various sorts of Bengali types and can undertake every kind of printing work.'[১১৬] সম্ভবত এরই ফল হল ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৪ ভাদ্র(২১ আগস্ট, ১৯৩৫) কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসাবাক্য, 'মুদ্রাযন্ত্রের কাজে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাচ্চে আমার দেহযন্ত্রের কাজে আজকাল রং অত্যন্ত ফিকে।'[১১৭]

বিশ্বভারতী গ্রন্থলয়ের নিজস্ব দোকান এবং শান্তিনিকেতন প্রেস-এর কর্মচারীবৃন্দ চিরকালই অপরিচয়ের আড়াল থেকে রবীন্দ্রনাথের জগৎবিখ্যাত বইগুলিকে রূপদানে তাঁদের নিরলস শ্রম দান করে গেছেন। আমরা ১৯৩৬ সালের 'Annual Report' থেকে সেই নেপথ্যচারী মানুষদের নাম এখানে তুলে আনছি।[১১৮] 'Annual Report'-এ কর্মচারীদের নির্দিষ্ট 'পদ'(Post)গুলির নাম ইংরেজিতে লেখা আছে। তার অনুবাদে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হবে বলে 'পদ'-নাম ইংরেজিতেই বলা হল।

পুস্তকালয় ('Book Shop') :

সুধীরচন্দ্র কর ('প্রুফ রিডার'), হেরম্বচন্দ্র ঘোষাল ('সেল্‌সম্যান'), বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য ('স্টোরকিপার'), শরদিন্দু বসু ('জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট'), শশিকান্ত পাল ('অ্যাকাউন্ট্যান্ট', অস্থায়ী)

ছাপাখানা ('Printing Press') :

রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ('ম্যানেজার'), হরিপদ পাল ('অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও প্রুফ রিডার'), গৌরীশঙ্কর বসু, শরৎচন্দ্র চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ গড়াই, প্রফুল্লকুমার রায়, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, বলরাম সাহা, হেমন্তকুমার ঘোষ ('কম্পোজিটর'), সীতানাথ দে ('মেশিন ম্যান') কান্তপদ মণ্ডল ('অ্যাসিস্ট্যান্ট'), ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় ('ট্রেডেল মেশিন ম্যান'), রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ('অ্যাসিস্ট্যান্ট'), দুর্গাদাস রক্ষিত ('দপ্তরী'), সত্যানন্দ ঘোষ ('অ্যাসিস্ট্যান্ট')

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম ১৯৩৬-এর Annual Report-এ (ভুলবশত) দেওয়া নেই। তাঁর 'পদ'টির নাম ছিল 'প্রিন্টার'। অন্যান্য বছরের তালিকায় তাঁর নাম যথাস্থানেই ছিল অবশ্য।

৫। *খাপছাড়া, সে, ছড়ার ছবি (১৯৩৭)*

বিচিত্রিতা-য় নিজের আঁকা ছবি অবলম্বনে লেখা হয়েছিল কবিতা, কিন্তু ১৯৩৭-এ এসে, এই প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থ অলংকরণের জন্যে তুলি (এবং কলমও) ধরলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকায় সজ্জিত প্রথম গ্রন্থটির নাম *খাপছাড়া*। দ্বিতীয়টি *সে*। *ছড়ার ছবি*-র অলংকরণ অবশ্য নন্দলাল বসুর।

কবিতার বই *খাপছাড়া* আর কথিকার বই *সে* অবশ্য তৈরি হয়ে উঠছিল একেবারে একই সময়ে। কিশোরীমোহন সাঁতরাকে এইসময় লেখা অসংখ্য চিঠি থেকে এই তৈরি হয়ে ওঠার নেপথ্যভূমিটি অনেকটা স্পষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্র 'আকাদেমি পত্রিকা'র পঞ্চম সংখ্যায়(প্রকাশকাল মে ১৯৯৩) চিঠিগুলি মুদ্রিত হয়েছে। আমরা চিঠির ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করে অতঃপর সেখান থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দেব।

বই দুটি রবীন্দ্রনাথের অলংকরণেই পূর্ণ হয়ে উঠবে, একেবারে প্রথম থেকে সেই পরিকল্পনা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ভেবেছিলেন নন্দলাল বসুর কথা। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন (১৯৩৬-এর ১৬ অক্টোবর) কিশোরীমোহনকে লিখছেন, 'নন্দলাল ওয়ার্দ্ধায় গেছেন। ফিরে এলে খাপছাড়ার পরামর্শ লাগব। এখনও তো প্রেসে চড়াবার অনেক দেরি আছে।'(পত্র নং ২১) এই একই চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে কবি *সে* লেখায় হাত দিয়েছেন, ' "সে" কাহিনীটা শেষ করতে বসেছি – সেটা অনাবশ্যক কিন্তু সাহিত্য – এই কারণে ছুটির দিনে কলম যায় তারই দিকে।' ডিসেম্বর মাসে অবশ্য সিদ্ধান্ত বদলালো, নন্দলাল নন, ছবি আঁকবেন কবি নিজেই। কিশোরীমোহনকে জানালেন সে খবর ডিসেম্বরের ৪ তারিখ, 'খাপছাড়ায় আমার ছাড়া অন্য কারো ছবি নিষিদ্ধ হয়েছে। অগত্যা ছবি বানাতে লেগেছি। অনেকগুলোই হয়েছে। আর গোটাকতক হলেই সম্পূর্ণ হয়। দেরি হবে না।'(পত্র নং ২৬) অর্থাৎ, ৪ ডিসেম্বরের বেশ কিছুদিন আগেই সিদ্ধান্ত বদল হয়েছে, এর মধ্যে অনেকগুলো ছবি আঁকাও হয়ে গেছে ! নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কবি এর আগে ১ তারিখে লিখেছিলেন, 'আজকাল সে ও খাপছাড়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত আছি।'[১১৯] এই 'অত্যন্ত ব্যাপৃত' থাকার বেশিরভাগ সময় হয়তো ছবি আঁকাতেই ব্যয়িত হচ্ছিল। সিদ্ধান্ত বদলে যে নিজেই অলংকরণের কাজে নামলেন, তার পেছনে ছিল সুধীরচন্দ্র করের আগ্রহ, সুধীরচন্দ্রেরই স্মৃতিকথায় সেই খবর অনেকটা জানা যায় :

> তখন কবি বাস করছেন ‘পুনশ্চে’। কবিতা নয়, কবির কলমে আঁকা চলেছে ছবির পর ছবি। ছবিগুলি ভারী মজার। ভরতি হয়ে পড়ে আছে দু’খাতা।... প্রস্তাব করা হল, প্রত্যেকটি কবিতাকেই ওই আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো চাই। কবি বললেন, এ তাঁর নূতন বিদ্যা। আনাড়ির পরিচয়কে প্রকাশ্যে বিজ্ঞপিত করা নিরাপদ নয়। কিন্তু তিনি আপত্তি করে সুবিধে করে উঠতে পারলেন না। ‘সে’ এবং ‘খাপছাড়া’ দুটি বই-ই ভরে উঠল তাঁর নিজের চিত্রালংকারে। অনেক নূতন ছবি এবং কবিতা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠল।...অথচ এই ছবি ছাপাতে একদিন তাঁর কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। কিন্তু সেদিন চরম আনাড়ি একজনের আগ্রহকে সস্নেহে কবি মূল্য দান করেছিলেন।[১২০]

শেষ বাক্যে অপরিচয়ের আড়ালে থাকা ‘চরম আনাড়ি একজন’ যে লেখক সুধীরচন্দ্র নিজে সেটা সহজেই বোঝা যায় অবশ্য। এইভাবেই বইদুটি প্রকাশের পথে এগিয়ে যায়। ১৯৩৭-এর ৬ জানুয়ারি কিশোরীমোহনকে কবি জানালেন, ‘আমার ইচ্ছা “সে” বইটা খাপছাড়ার আগে ছাপা হয়।’(পত্র নং ২৮) তবে কবির এই ইচ্ছাটি পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি কিছু জটিলতায়, তার কথা আমরা একটু পরেই জানাব। *খাপছাড়া* প্রকাশ পেল মাঘ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭। তিনরকমের মলাটে তিনরকমের দামে প্রকাশ পেল যত্ন নিয়ে ছাপা এই বই। পেপারব্যাকের দাম হল ৩ টাকা, কাপড়ের সুদৃশ্য বাঁধাই ৩।।০ টাকা এবং রাজসংস্করণ ৫টাকা। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের অধিকাংশ বই এইরকম নানা দামে নানা বিত্তপর্যায়ের ক্রেতার কথা মনে করেই বের করা হত। আনন্দবাজার পত্রিকার ঠিক পরের দিনের বিজ্ঞাপনে (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭) বইটির সম্বন্ধে জানানো হল নানা তথ্য[১২১] :

খাপছাড়া

বিচিত্র ছন্দে ছড়া-জাতীয় ১০৯টি সরস কবিতার সহিত

১০৯টি মজার ছবির সমাবেশ

—প্রত্যেকটি কবিতা কবি কর্তৃক বিচিত্রিত—

হাফটোন ও তিনরঙা ছবি ১৫ খানা

রঙিন কালিতে চমৎকার ছাপা ও মনোরম বাঁধাই। মূল্য ৩।।০, কাগজের মলাট—৩৲

—রাজ সংস্করণ—

মূল্যবান মোটা অফসেট প্রিন্টিং কাগজে

প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা দুই রকম কালিতে সুদৃশ্য ছাপা, শোভন বাঁধাই মূল্য—৫৲

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখানে ১০৯টি কবিতার কথা বলা হচ্ছে বটে, তবে মূল বইতে কবিতার সংখ্যা ছিল ১০৫টি। তার সঙ্গে একটি 'প্রবেশক' কবিতা ভাঙা ছিল দুটি পৃথক পাতায় (প্রথম পাতায় দুলাইন, পরে চারলাইন), তারপর একটি 'উৎসর্গ' কবিতা এবং তারপর একটি 'ভূমিকা'-র ছড়া যোগ করলেই সংখ্যাটা ১০৯তে দাঁড়ায়।

মাসখানেক কেটে যাবার পর ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের 'দোলপূর্ণিমা'র দিন (১৯৩৭ ২৫ মার্চ) কবি কিশোরীমোহনের কাছে বইটির প্রকাশ-পরবর্তী ভাগ্যেরও খোঁজ নিচ্ছেন, '"খাপছাড়া"র প্রতি সাধারণের দৃষ্টিপাত কী রকম অনুভব করচ?'(পত্র নং ৩২) এই প্রসঙ্গে আমরা প্রবাসী পত্রিকার ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে প্রকাশির 'খাপছাড়া'র সংক্ষিপ্ত সমালোচনাটির কথা বলতে পারি। সংক্ষেপে বইটির একটি যথার্থ পরিচয় 'প্রবাসী' সেখানে দিতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের মনে হয় :

> এই অপূর্ব বহিখানিতে ছড়া-জাতীয় নানা ছন্দে রচিত কবির ১০৯টি সরস কবিতা ও তাহার আনুসঙ্গিক ১০৯টি তাঁহারই আঁকা ছবি আছে। কবিতাগুলি সব বয়সের মানুষেরই উপভোগ্য – তবে অবশ্য যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে অবিমিশ্র অটল গাম্ভীর্য্যের অধিকারী তাঁহারা এগুলির রসে বঞ্চিত হইলেও হইতে পারেন। কতকগুলি কবিতার রস ছোট ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি সম্ভোগ করিতে না পারিলেও সেগুলির ধ্বনি তাহাদিগকে আনন্দ দিবে।
>
> দেয়াল-পঞ্জিকার ছবির রসগ্রাহী ও ভক্ত এবং ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের বিদ্রূপবিশারদ বিজ্ঞ সমালোচকেরা কবির আঁকা সর্ব্বশ্রেণীবিভাগের বহির্ভূত ছবিগুলি বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ও বয়স্কদিগের মধ্যে যাঁহারা থিওরির ধার ধারেন না তাঁহারা এইগুলির রসে মসগুল হইতে পারিবেন।...[১২২]

এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের আশ্বস্ত হওয়ার কথা। এই সমালোচনার একেবারে শেষে লেখা ছিল 'কবি "সে" নামক আর একখানি বহি ছাপাইতেছেন। তাহা বৈশাখে তাঁহার জন্মদিনের উৎসবে প্রকাশিত হইবার কথা।' সেরকমই কথা ছিল বটে, তবে নানা জটিলতায় প্রকাশ পিছিয়ে গেল আরও মাস তিনেক।

২৫ মার্চের যে-চিঠিতে কবি 'খাপছাড়া'র প্রতি 'সাধারণের দৃষ্টিপাতের' খবর জানতে চেয়েছিলেন, সেখানেই কিশোরীমোহনকে লিখেছিলেন, '"সে" এখনও প্রত্যক্ষ গোচর হয় নি। তুমি একবার এসে দম দিয়ে যেতে পারলে ভালো হোতো'। ৩ মে তারিখে তাঁর স্বরে অনেকটা উদ্বেগ, '"সে" বইটার কী দশা হোলো?... "সে" কি ২৫শে বৈশাখের মধ্যে সম্পূর্ণ হতে পারবে?' (পত্র নং ৩৬) ২৫ অথবা ২৬ বৈশাখই বইটি প্রকাশিত হল।

বইয়ের আখ্যাপত্রেও স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশকাল হিসেবে জানানো হল, 'বৈশাখ, ১৩৪৪'। কিন্তু নতুন বইয়ের কপি পেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন কবি। যত ছবি ছাপাবার জন্যে দেওয়া হয়েছিল, তা ছাপা হয় নি। ক্ষুব্ধ কবি কিশোরীমোহনকে ২৬ বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে(৯ মে ১৯৩৭) লিখে পাঠালেন, '"সে" পেয়েছি। বইখানি যে ছবিগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার জন্যে দুঃখ বোধ করি। ফোটোটাইপ কোম্পানির এরকম অভাবনীয় অব্যবস্থা অসীম বিস্ময়ের বিষয়। আমার দোহায় দিয়ে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে যেমন করে পারো ঐ ছবিগুলিকে বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করে তার পরে বাজারে বের কোরো – সে জন্যে যদি জুলাই ছাড়িয়ে যায় তবু অপেক্ষা কোরো। আশা করি সম্পূর্ণ বিলুপ্তির আশঙ্কা নেই।'(পত্র নং ৩৭) এই চিঠিতে জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষার কথা ছিল, ঠিক পরের দিনের চিঠিতে (২৭ বৈশাখ) জানালেন দরকার পড়লে একবছর অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু, 'যতদিন না ছবি পাই প্রকাশ কোরো না। পৌষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি আছি।'

চিঠিতে উল্লিখিত 'ফোটোটাইপ' কোম্পানি'টি হল '৭১/১ কলেজ ষ্ট্রীট'-এ অবস্থিত 'ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও'। এঁরা রঙিন ও সাদাকালো ছবির ব্লক বানানোয় প্রসিদ্ধ। আমরা 'বিচিত্রা' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এঁদের বিজ্ঞাপন দেখেছি। বিজ্ঞাপনে এঁরা রবীন্দ্রনাথেরই নাম ব্যবহার করতেন :

> বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন — "ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও থেকে ছবির প্রতিলিপি দেখে আশাতীত আনন্দ লাভ করেছি।"[১২৩]

এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন ছবিগুলি ছাপা না-হবার জন্যে এই স্টুডিওটিই দায়ি।

সে বইটির আখ্যাপত্র বা অন্যত্র কোথাও 'ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও'র নাম নেই। শুধু বলা আছে 'শান্তিনিকেতন প্রেস' থেকে মুদ্রিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলির প্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া যায়, ছবিগুলি ব্লক প্রস্তুত করা, এমনকী সম্ভবত ছাপারও বরাত দেওয়া হয়েছিল 'ভারত ফোটোটাইপ'কেই। কিন্তু কোন ছবিগুলি? বইটির এই প্রথম সংস্করণে আছে পেন-এ আঁকা ২৬টি রেখাচিত্র (Line Drawing), সাদাকালোয় ছাপানো। সেই ছবিগুলি বইয়ের রচনা-অংশের সঙ্গে জড়ানো, অর্থাৎ যাকে প্রকৃত অর্থেই অলংকরণ বলা যায়। ছাপতে হলে এই ২৬টি ছবি ও রচনা-অংশের একসঙ্গে পেজ-মেক-আপ করেই ছাপতে হয়। নিশ্চয়ই এই ২৬টি ছবির কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন না, কেননা তা না-হলে পুরো বইটিই আবার নতুন করে ছাপতে হত। এই ২৬টি

রেখাচিত্রের বাইরেও আছে ৬টি ছবি যা জলরঙ বা কালিতে আঁকা, ছাপা হয়েছে স্বতন্ত্র ছ'টি পাতায়, গ্লসি আর্ট পেপারে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়া *সে* বইটিতে এই ছ'টি স্বতন্ত্র ছবিই ছিল না।

২৪ মে পুনরায় উদ্বেগ-সহ রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন কিশোরীমোহনের কাছে, 'ফোটোটাইপের ঝুলি থেকে ছবি উদ্ধার কি সম্ভবপরতা থেকে দূরে চলে যাচ্চে? আমি ৭৮তম জন্মদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব যদি ততদিন বাঁচি।'(পত্র নং ৪২) কিন্তু তারপরেই অন্য কোনো সূত্র থেকে খবর পেয়ে ২৬ মে কবির লেখা চিঠিতে পাওয়া গেল সম্পূর্ণ অন্য অভিযোগ :

> ছবিগুলি বুবা লুকিয়ে রেখেছে এই সন্দেহ বরাবর আমার মনে আছে। সে আমার মৃত্যুর অপেক্ষা করবে। আমার স্বদেশীয় অনেক বন্ধুর সততার পরিচয় পেয়েছি, জয়ন্তী এবং অন্য উপলক্ষ্যে। ঘৃণা হয়। যাইহোক তুমি বুবাকে অবিলম্বে স্পষ্ট করে জানিয়ো যে, আগামী সুযোগ থেকে প্রবাসী বা মডার্ন রিভিয়ুতে আমার কোনো লেখা যাবে না। তার পূর্ব্বে রামানন্দবাবুকে একবার জানিয়ে রেখো। বোলো, ছবি না পেলে আমার বই বেরবে না।(পত্র নং ৪৩)

খুবই কঠিন ভাষায় লেখা এই চিঠি। অভিযোগটিও মারাত্মক। অভিযুক্ত ব্যক্তিটি, 'বুবা' হলেন 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়(১৮৯১-১৯৬৫)। রবীন্দ্রনাথের ছবি এর আগেই 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছে। কিছু ছবি হয়তো সেই কারণেই কেদারনাথ চেয়ে নিয়ে থাকবেন। তাছাড়া, এইসময়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে একটি অ্যালবাম করার কথাও হচ্ছিল, কেদারনাথই সে ব্যাপারে উদ্‌যোগী হয়ে উঠছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে সন্দেহ করছেন যে, সেই ছবিগুলিকে আত্মসাৎ করে নিতে চাইছেন কেদারনাথ! কবির মৃত্যুর পর ছবিগুলি বেশি দামে বিক্রি করার ইঙ্গিতটিও আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথকে লেখা কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত চিঠির হদিশ পেয়েছি আমরা (চিঠিটির পুরো বয়ানের জন্যে এই অধ্যায়ের 'সংযোজন' অংশ দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রক্ষিত সেই চিঠিটি লেখার তারিখ ২২ মে ১৯৩৩, রথীন্দ্রনাথেরই একটি চিঠির উত্তরে লেখা সেই চিঠি। তারিখটি লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের কিশোরীমোহনকে লেখা চিঠিটিরও ৪ দিন আগে লেখা এই প্রত্যুত্তর। এর থেকে বোঝা যাবে, কেদারনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি আরও বেশ কিছুদিন আগে থেকেই উঠে আসছিল। যাইহোক, কেদারনাথ এ প্রসঙ্গে সব অভিযোগই অস্বীকার করে জানালেন :

অমিয়বাবুর সঙ্গে ঐ ছবিখানি সম্বন্ধে আমার টেলিফোনে যা কথাবার্তা হয় তাতে ঠিক হয় যে আমি ঐ ছবিখানির দাবী ছেড়ে দেবো এবং ওর বদলে আপনার বাবার কাছ থেকে আর একখানি ছবি চেয়ে নেবো। ব্লকখানি ও ঐ ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্বভারতী কিনে নেবেন।...

তারপর আমি আর এবিষয়ে কিছু শুনি নাই। দিন কয়েক আগে ললিতবাবু আমাকে এসে বলেন যে কিশোরী বাবু তাঁকে ঐ ব্লকখানি U. Ray & Sonsএ পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আমি তাতে তাঁকে বলি যে এ বিষয় আমাকে definite কিছুই জানানো হয়নি সুতরাং আমি তাঁকে কোন order দিতে পারিনা, যদি বিশ্বভারতী ওখানা কিনে নিতে চা'ন তবে আমি কোন আপত্তি কোরবোনা।...

বিচিত্রিতার ছাপায় বাধা পড়ার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু এর জন্য কোন দায়ীত্বই আমি নিতে প্রস্তুত নই, কেননা এবিষয়ে আপনার চিঠি পাওয়ার আগে আমি কিছুই জান্‌তে পাইনি। আমিয়বাবুর সঙ্গেও যা স্থির হয়েছিল সেটারও final কিছুই হয় নি।...[১২৪]

আত্মপক্ষ-সমর্থন-করা এই চিঠি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথও পড়েছিলেন। কিন্তু ২২ তারিখে লেখা এই চিঠির পরেও, দেখা যাচ্ছে ২৬ তারিখ ফের রবীন্দ্রনাথ ঐ মারাত্মক অভিযোগ তুলছেন। এইসব অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা অবশ্য আজ সম্ভব নয়। তবে এর পরেও অন্তত রামানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত যোগাযোগটি আজীবন বজায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিউ'তেও এরপর লিখেছেন। ফলে সম্পর্কের এই ক্ষত নিশ্চয়ই মেরামত হয়েছিল, এইটুকুই আমরা বলতে পারি।

উপরে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে যে ছবিগুলির কথা বলা হচ্ছে সেগুলি শুধু *সে* বইটির জন্যে নির্দিষ্ট ছবি, তা সম্ভবত নয়। তার অতিরিক্ত অনেকগুলি ছবিও হয়তো কেদারনাথের কাছে ছিল। ১৯৩৭-এর ২৯ মে রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহনকে লিখেছিলেন, 'পাঁচটি ব্লকের মধ্যে চারটি যদি পেয়ে থাক আর একটি পাওয়াও দুঃসাধ্য হবে না। অন্য ছবিগুলি সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা? সবগুলিই কি দুষ্প্রাপ্য?'(পত্র নং ৪৫) এই 'অন্য ছবিগুলি' *সে* বইয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছবি নয় বলেই মনে হয়। ১৯৪০-র প্রকাশিতব্য *চিত্রলিপি* বইতে হয়তো এরই এর কোনো কোনো ছবি ব্যবহৃত হবে।

যাইহোক, *সে* বইটির জন্যে নির্দিষ্ট ছবিগুলি উদ্ধার হয়েছিল এবং তার ছাপাও হতে পেরেছিল অচিরেই। *সে* প্রকাশিত হল, (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী) ১৫ জুলাই ১৯৩৭। মুদ্রণ সংখ্যা ২১০০। তবে বইতে প্রকাশকালটি পূর্বের মতোই রয়ে গেল 'বৈশাখ ১৩৪৪'। এর থেকে আরও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে, পুরো

বইটি আগাগোড়া নতুন করে ছাপানো হয় নি। শুধু ওই ছ'টি ছবি (অথবা তার অন্তর্গত কয়েকটি) আলাদা করে ছাপিয়ে যুক্ত করা হয়েছে পরে।

সে বইটি প্রকাশিত হবার পর সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়(১৮৯৯-১৯৭৯) ১৯৩৮-এর ২৪ সেপ্টেম্বর কবিকে চিঠি লিখে তাঁর মুগ্ধতার কথা জানান, 'আসবার সময় রাস্তায় আপনার 'সে' আমার সঙ্গী ছিল। এই দুঃসহ গরমেও পথের কষ্ট জানতে দেয়নি। আমার ধারণা ছিল বইখানি শিশুপাঠ্য। পড়ে দেখলাম এ শুধু শিশুপাঠ্য নয় চির শিশুপাঠ্য। যাদের উদ্দেশ্যে আপনি বইখানি লিখেছেন তাদের শিশুত্ব কোনোকালেই ঘুচবে না।'[১২৫] রবীন্দ্রনাথ, স্বাভাবিকভাবেই, খুশি হয়েছিলেন এই প্রতিক্রিয়ায়।

১৯৩৭-এর শুরুর দিকে বেরিয়েছিল *খাপছাড়া,* মাঝামাঝি এল *সে,* বছরের শেষদিকে অক্টোবরে প্রকাশ পেল ছবিতে-কবিতায় মেশানো আর-এক বই *ছড়ার ছবি* ।

১৯৩৭-এর ২৯ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ গেলেন আলমোড়া। সঙ্গে প্রচুর বিজ্ঞানের বই আর নন্দলাল বসুর আঁকা কতকগুলি ছবি।[১২৬] আলমোড়া বাসের দু মাসে লেখা হল রবীন্দ্রনাথের একমাত্র বিজ্ঞানগ্রন্থ *বিশ্বপরিচয়-*এর(১৯৩৭) অনেকখানি অংশ, নন্দলালের ছবিগুলির অনুপ্রেরণায় অনেকগুলি ছড়া ও অন্যকিছু কবিতা। যে ছবিগুলি সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন তিনি, সেগুলিই শুধু নয়, আলমোড়া বাসকালে ডাকযোগে আরও কিছু ছবি নন্দলাল পাঠিয়েছিলেন। দুটি-একটি ক্ষেত্রে কবিতা আগে লেখা হয়েছিল, ছবি নন্দলাল পরে এঁকেছেন, যেমন 'মাকাল' নামে একটি কবিতা ও তার সংলগ্ন ছবি। যাইহোক, ১৯৩৭-এর ১৭ মে নন্দলালকেই কবি জানাচ্ছেন তাঁর লেখালেখির এই কথা, 'তোমার পোষ্টকার্ডের ছবিগুলির প্রতি মাঝে মাঝে কলমের লক্ষ্য স্থির করি। যে হাল্কা চালের পথ-চলতি লেখা লিখব মনে করেছিলুম সে হয়ে উঠল না। কিছু ওজন-ভারী চাল হচ্চে; সেটা আমার বয়সোচিত কিন্তু আমার বয়সের কবিতার পাঠক সংসারে বেশি নেই।'[১২৭] বেশ কিছু কবিতা লিখে ফেলার পর আস্তে আস্তে সম্ভাব্য বইটিরও একটা রূপ তাঁর কল্পনার গড়ে উঠতে থাকে যখন, তখন, ১০ জুন, সেই খবর তিনি দেন কিশোরীমোহন সাঁতরাকে, 'এবার আমি ছেলেদের জন্যে অনেক কবিতা লিখেছি নন্দলালের ছবি সম্বলিত। একটু নতুন রকমের হবে।'(পত্র নং ৫১)

কবি আলমোড়া থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন ২৯ জুন। কবিতা লেখা চলেছে তার পরেও কিছুদিন। কিন্তু এরপরেই যে ছবিগুলি দেখে কবিতা-লেখা, সেগুলির অধিকাংশকে রেখাচিত্রে (Line Drawing) রূপান্তরিত করার জন্যে নন্দলালকে নির্দেশ দেন কবি। এ প্রসঙ্গে কিশোরীমোহনকে লেখা দুটি চিঠি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। ৯ আগস্ট তাঁকে কবি জানাচ্ছেন, 'নন্দলাল ছবিগুলিকে কালিকলমে সস্তা করে দিচ্চেন।'(পত্র নং ৫৫) আর ২২ আগস্ট আরও স্পষ্ট করে লিখলেন, '"ছড়ার ছবি"র প্রায় সব ছবি লাইনে আঁকা হয়ে গেছে, পাঁচটা মাত্র বাকি, দুই একদিনেই হয়ে যাবে।'(পত্র নং ৫৬) এই দুটি বাক্য থেকেই স্পষ্ট, নন্দলাল ছবিগুলিকে প্রথমে যেভাবে এঁকেছিলেন সেই আদিরূপে *ছড়ার ছবি* বইতে সেগুলিকে আমরা পাই না। বইটির জন্যে বিশেষভাবে ছবিগুলিকে রেখাচিত্রে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল তাঁকে। অবশ্য সব ছবি না, বইটিতে ৩১টি ছবি রেখাচিত্র হলেও, সাতখানি ছবি হাফটোনে বহুবর্ণ-চিত্র হিসেবেই ছাপা হয়েছিল।

ছড়ার ছবি প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী ১৯৩৭-এর ৫ অক্টোবর। বিভিন্ন বই প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথের একটি কাজ ছিল সে বই উপহার হিসেবে কাকে কাকে পাঠাতে হবে তা কিশোরীমোহন ও অন্যান্যদের মনে করিয়ে দেওয়া। এই ক্ষেত্রেও, ঐ ৫ অক্টোবরই কিশোরীমোহনকে তিনি লিখছেন, 'সুরেন্দ্র মৈত্রকে বিশ্বপরিচয় ও ছবির ছড়া পাঠিয়ে দিও।' (পত্র নং ৫৯)। লক্ষ করার ব্যাপার, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য-প্রকাশিত বইটির নাম এক্ষেত্রে ভুল লিখেছেন ! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *বিশ্বপরিচয়* বইটির প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী ৮ অক্টোবর হলেও, এই চিঠি থেকে মনে হয়, ৫ অক্টোবর বা তার দু-একদিন আগেই বইটি প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

আরও প্রায় ৭ মাস বাদে, আনন্দবাজার পত্রিকায় ১মে ১৯৩৮-এ একই সঙ্গে *ছড়ার ছবি* ও *বিশ্বপরিচয়* বই দুটির সমালোচনা বের হয়। *ছড়ার ছবি* প্রসঙ্গে সেখানে লেখা হয়, "ছড়ার ছবি' বইখানি ছড়ায় ও ছবিতে ছেলেদের মন তো ভুলাবেই ছেলেদের বয়স্ক অভিভাবকেরাও ইহার মধ্য হইতে বহুকাল বিগত শৈশব-কৈশোরের আনন্দ রস পুনরায় অনুভব করিতে পারিবেন।'[১২৮] তবে, ঘটনা হল, এই বই আশানুরূপ পাঠক সমাদর লাভ করেনি। সেটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু আক্ষেপও ছিল। সুধীরচন্দ্র করের সামনে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সেকথা কবুলও করেছিলেন কবি, 'দুঃখ করতেন নিজের 'ছড়ার ছবি' বইটির জন্যে। শিশুদের পাঠ্য বলেই ও-বইটি বাজার-চল। কিন্তু 'শিশু' কাব্যটির মতো তা আবালবৃদ্ধ সকলেরই উপভোগ্য হবে বলে

ছিল কবির ধারণা। প্রকাশ হলে বইটির তিনি আদর দেখে যাননি। না কেনায়, না সমালোচনায়, বাজারে জাগেনি তেমন বিশেষ উৎসাহ। বলতেন, যত্ন করে বইটা লেখা ছিল, লোকে বুঝল কই ?’[১২৯]

মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা/৪ : ১৯৩৭ অথবা তার কাছাকাছি সময়ে কিছু মানুষ এসে পৌঁছোলেন বিশ্বভারতীর আঙিনায়, বিশেষত গ্রন্থালয়ের কাজের ডাকে। অতঃপর পরবর্তী বেশ কিছু বছর ধরে গ্রন্থালয়ের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠবেন এঁরাই।

প্রথমজন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত(১৯১০-১৯৮৮)। কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনের কাজে যোগ দেন ১৯৩৬ সালে। ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’-র অন্তর্গত প্রথম বই *বাংলা কাব্যপরিচয়* প্রকাশের কাজ শুরু হয় সেই বছরের এপ্রিল-মে মাস থেকে। এই বই নির্মাণে প্রথম থেকেই নন্দগোপালের উপর রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৭-এর নভেম্বর মাসে গ্রন্থনির্মাণ-সহকারী হিসেবে তাঁকে ‘অফিসিয়াল’ নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। ১৯৩৭-এর ‘অ্যানুয়াল রিপোর্টে’ জানানো হয়, ‘Nandagopal Sen-Gupta, B.A. was appointed from the beginning of November to help the Prsident in the editing of his works’[১৩০] অবশ্য *বাংলা কাব্যপরিচয়*-এর পালা চুকলে তিনি ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।

দ্বিতীয়জন, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়(১৯১১-২০০০)। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন ১৯৩৬-এ। তাঁর সম্বন্ধে ‘Visva-Bharati News’-এর ১৯৩৬-এর অক্টোবর সংখ্যায় লেখা হয়, ‘Kananbehari Mukherjee M.A. has been lately appointed as an additional adhyapaka in Bengali.’[১৩১] *বাংলা কাব্যপরিচয়* নির্মাণে কাননবিহারীও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সহকারী।

তৃতীয়জন সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্তর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের ইতিহাসটি জটিল ও বহুমাত্রিক। জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর *রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত* গ্রন্থে সেই ইতিহাস নিয়ে পূর্বাপর আলোচনা করেছেন। প্রথমে *বাংলা কাব্যপরিচয়*, পরে *রবীন্দ্র-রচনাবলী* প্রকাশের সময় সজনীকান্ত-র ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

চতুর্থজন অবশ্যই পুলিনবিহারী সেন। ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি সময় থেকে কিশোরীমোহনের স্থায়ী অসুস্থতার সূত্রপাত হয়। তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন অবশ্য, কিন্তু তাঁর অন্য লোক নিয়োগের ভাবনাও চলছিল। পুলিনবিহারী বিশ্বভারতীরই প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৩৫ থেকে তিনি কর্মরত 'প্রবাসী'র দপ্তরে। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন তিনি। এই সময়ে তাঁকেই গ্রন্থালয়ের দায়িত্বে আনার কথা ভাবা শুরু হয়। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ রথীন্দ্রনাথ বাবাকে জানাচ্ছেন, 'কিশোরী বাবুর শরীর ভেঙে গেছে — ওঁকে দিয়ে আর চলবে না — তাই তাঁর জায়গায় অল্প বয়সের কর্মিষ্ঠ লোক রাখার চেষ্টা হচ্ছে। খুব সম্ভবত পুলিনকে পাওয়া যাবে।'[১৩২] এই খবরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী হন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর পুত্রকে উত্তরে জানিয়ে দেন, 'গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগে পুলিনকে যদি পাওয়া যায় তাহলে খুবই ভালো হয়।'[১৩৩] ১৯৩৯-এর 'Visva-Bharati Annual Report' থেকে জানা যায় যে, অক্টোবর ১৯৩৯ থেকে পুলিনবিহারী সাম্মানিক(Honorary) 'Assistant Secretary' পদে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে যোগদান করেছেন।[১৩৪]

এইখানে কিশোরীমোহন সম্পর্কেও একটি-দুটি কথা না বললে অন্যায় হবে। রথীন্দ্রনাথ যতই লিখুন, 'ওঁকে দিয়ে আর চলবে না', রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই মানুষটির উপর তাঁর নির্ভরতা কখনই ত্যাগ করেন নি। বস্তুত, ওই ২৬ সেপ্টেম্বরের চিঠিটিতে কবি এ-ও লিখেছিলেন, 'কিশোরীকে কোনোমতে শান্তিনিকেতনে আনান দরকার — তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই।' এই চিঠি লেখার দুদিন আগেই, ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) খোদ কিশোরীমোহনের কাছেই কবির এই আর্জি ছিল, 'তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ শান্তিনিকেতনের ছাপাখানাকে বিনাশ হতে রক্ষা কোরো।'[১৩৫] রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ মেনে পাকাপাকিভাবেই শান্তিনিকেতনে চলে আসেন কিশোরীমোহন। ১৯৩৯-এর 'Visva-Bharati Annual Report' রিপোর্টে লেখা হয় যে নভেম্বরের ১৫ তারিখ থেকে কিশোরীমোহন সাঁতরা শান্তিনিকেতনে এসে 'জেনারেল অফিসে' 'Assistant General Secretary' পদে যোগ দিয়েছেন।[১৩৬] শান্তিনিকেতনেই ১৯৪০-এর ২০ অক্টোবর মৃত্যু হয় এই কর্মনিষ্ঠ মানুষটির।

এই সময় থেকে রবীন্দ্রগ্রন্থ নির্মাণের আলোচনায় বারবার এই মানুষদের বিস্তারিত ভূমিকার কথা আমাদের বলতে হবে।

৬। <u>*গীতবিতান* (১৯৩১)</u>

‘গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলাবিধান করতে পারেন নি।’, *গীতবিতান* দ্বিতীয় সংস্করণের ‘বিজ্ঞাপন’ শীর্ষক ভূমিকায় জানিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঘটনা হল, ‘সত্বরতার তাড়না’ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ছিল স্বয়ং লেখকের। আর সেই সত্বরতার পাশাপাশি বিস্ময়কর অমনোযোগও বটে ! কথাগুলি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

১৯২৩ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে ১৯৩১-এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোনো পূর্ণাঙ্গ গীতিসংকলন প্রকাশ করবার পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৮২-১৯৩৫) সম্পাদনায় প্রকাশত *গীতি-চর্চ্চা* ছিল বিশেষভাবে ‘আশ্রমবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য’ একটি সংকলন। আর ওই বছরেরই অগ্রহায়ণে প্রকাশিত *প্রবাহিণী* নতুন গানের সংকলন। প্রথম বইটিতে গানের সংখ্যা ২০০, দ্বিতীয়টিতে ২৩৫। এর থেকে বোঝা যাবে ১৯১৪ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত দুই খণ্ডে *গান* ও *ধর্ম্ম সঙ্গীত* বই দুটির পর এই প্রথম, ১৯৩১ সালে, রবীন্দ্রনাথের কোনো পূর্ণাঙ্গ গীতিসংকলন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যার নাম *গীতবিতান*।

আশ্চর্য হল, এ হেন গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন সম্পূর্ণ নীরব। গ্রন্থটি প্রকাশের অব্যবহিত আগে লেখা যত চিঠি রক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে *গীতবিতান* প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ গ্রন্থালয় সংশ্লিষ্ট বহু মানুষজনকে এই পর্যায়ে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন তিনি, সেখানে নানা প্রকাশিতব্য বইয়ের খোঁজ খবর নিয়েছেন, শুধু *গীতবিতান* নিয়ে কোনো উল্লেখ অথবা আগ্রহের চিহ্ন বিস্ময়করভাবে কম!

১৯২৮-এর শেষদিক থেকে সম্ভবত গানের সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু হয়। ১৯২৯-এর ৩ জানুয়ারি কিশোরীমোহন সাঁতরাকে কবি লিখছেন, ‘শীঘ্রই বেরিয়ে পড়তে হবে এই জন্যেই তোমাদের তাড়া দিতে বাধ্য হলুম। গানের ও রাখীর ফাইল শীঘ্র পাওয়া দরকার নইলে এগুলো প্রেসে চড়াবার আগে বিলাতে রওনা হব – বৎসর কেটে যাবে।’[১৩৭] এই চিঠির পর আমরা দেখেছি, ‘রাখী’ বিষয়ে বিভিন্নজনের কাছে নানারকম খোঁজখবর নিয়েছেন কবি, পরামর্শও দিয়েছেন ‘রাখী’ প্রকাশের ব্যাপারে। কিন্তু সেই সব চিঠিতে

ফের ‘গানের ফাইল’-এর উল্লেখ আর আমরা কখনই দেখিনি। ফের ১৯৩০ সালে ইউরোপ রওনা হওয়ার আগে গীতিসংকলনের কাজ শুরু হল। সে খবর আমরা পাই যাত্রাপথে জাহাজ থেকে ১৬ মার্চ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা কবির একটি চিঠিতে, ‘নতুন গানের বই ছাপতে দিয়ে এসেছি – একত্রে সব গান পুঞ্জিত হবে। তুই দেখে দিস যাতে প্রমাদ না ঘটে। খুব হাল আমলের গানগুলো অনবধানে বাদ না পড়ে যেন।’[১৩৮] রবীন্দ্রনাথ এবারে ইউরোপ-আমেরিকা সফর শেষে ফিরবেন প্রায় ১০ মাস পরে। এই ১০ মাসে লেখা অসংখ্য চিঠির মধ্যে আমরা আর *গীতবিতান* প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ পাব না, তা আগেই বলেছি। তার চেয়েও বিস্ময়ের হল, তাঁর এত দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময়েই এত গুরুত্বপুর্ণ একটি বই ছাপার নির্দেশ আদৌ দিয়েছিলেন কেন তিনি? বস্তুত তাঁর এই সিদ্ধান্ত থেকেই প্রমাণিত হয়, প্রকাশিতব্য *গীতবিতান* বইটির নির্মাণ-জটিলতাকে অন্তত প্রাথমিকভাবে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে চাননি, নিছক-একটি পুরনো গানের সংকলন হিসেবেই দেখছিলেন।

বইটিকে গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়েছিল সুধীরচন্দ্র করের কাঁধে। সুধীরচন্দ্র টের পাচ্ছিলেন যে এই বই নির্মাণ করে তোলা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের বিস্তর সমস্যা, অজস্র পাঠভেদ, সুরভেদ। দিনেন্দ্রনাথেরই পরামর্শ নিয়ে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন তিনি। যেমন আমরা দেখব, ২৫ এপ্রিল ১৯৩০ দিনেন্দ্রনাথকে একটি সুদীর্ঘ চিঠি লিখে নানা প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজার চেষ্টা করছেন সুধীরচন্দ্র :

> যেরূপ দেখিতেছি ছুটির মধ্যে এই বই ছাপার কাজ সুরু হইবে কি না সন্দেহ। আমি দুই রকম সূচী প্রস্তুত করিয়া এবং যে বই হইতে যে গান ছাপা হইবে, পর পর সেই বইগুলি সাজাইয়া সব ফাইল(file) কালাচাঁদবাবুকে বুঝাইয়া দিয়া...বাড়ী রওনা হইতেছি।...
>
> এই সূচী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ আপনার তৈরী গানের তালিকা দেখিয়াই একরকম এই মূল সুচী তৈরী করিয়াছি। তবে আধুনিক গানের অংশে অমিয়বাবুর “সংগ্রহের” তালিকা ও আপনার তালিকা মিলাইয়া অমিয়বাবুর তালিকা হইতে প্রায় ২০/২৫টি গান অতিরিক্ত নূতন যোগ করিয়াছি। এই সঙ্গে কয়েকটি গানের নাম পাঠাইলাম, যথা :—
>
> ১। দেখা না দেখায়
>
> ২। জয় জয় জয় হে জ্যোতির্ম্ময়
>
> ৩। মন মন্দির স্বামী

৪। যখন তুমি আর আমি

৫। তোমার হাতের রাখী

৬। তোর রস ? — তোর প্রাণের রস → পাওয়া গেছে

৭। দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা

৮। স্বপনপারের ডাক

৯। হে বঁধু

এ গুলির শুধু নামই পাইয়াছি। অমিয়বাবুর সংগ্রহে এই — পুরা গান নাই। আপনি এইগুলি সংগ্রহ করিয়া না দিলে পাওয়া মুস্কিল হইবে।

অনেক গানের প্রথম লাইনে কিম্বা মধ্যে মধ্যে এক আধটু পাঠের (কথার) পরিবর্ত্তন হওয়াতে তালিকায় তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি স্বতন্ত্র গান বলিয়া ধরিয়াছি। আপনি সেগুলি বিশেষভাবে দেখিয়া যে গানগুলি ঐ রূপ মুখবন্ধের কথার পরিবর্ত্তনে একাধিকবার লেখা হইয়াছে, সেগুলির পাশে পাশে * চিহ্ন দিয়া দিবেন। সম্পাদকীয় ভূমিকায় তার বিশেষত্ব বলিয়া দিতে হইবে।

একই গান একটু আধটু বদল হইয়া দুইবার ছাপা হইলেও (অবশ্য এক গান আগাগোড়া একই কথায় কোথাও ছাপা হইবে না – এ বিষয় আমি নিশ্চিন্ত) এই প্রথম সংস্করণে তাদের সবরকম রূপি থাকলে ভাল হয় মনে করি।[১৩৯]

দিনেন্দ্রনাথের পরামর্শ নিয়ে মূলত সুধীরচন্দ্রের দায়িত্বে *গীত-বিতান*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল আশ্বিন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। তৃতীয় খণ্ডটি প্রায় একবছর পরে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে। তিন খণ্ডেরই মুদ্রণসংখ্যা ২২০০। গানগুলি সাজানো হল মোটামুটি গ্রন্থে প্রকাশের কালানুক্রমে। প্রথম খণ্ডটির গানের বিন্যাস এখানে জানানো হল। পার্শ্ববর্তী সংখ্যাগুলি সেই বিভাগে গানের সংখ্যার সূচক।

প্রথম খণ্ড। কৈশোরক(১৮), বাল্মীকি প্রতিভা(৫৪), ছবি ও গান(২), প্রকৃতির প্রতিশোধ(৬), কড়ি ও কোমল(৯), মায়ার খেলা(৬৩), মানসী(১), রাজা ও রানী(৮), বিসর্জ্জন (৫), সোনার তরী(৩), চিত্রা(৯), চৈতালী(১), কাব্যগ্রন্থাবলীর গান(৫৬), কাব্যগ্রন্থাবলীর 'ব্রহ্মসংগীত'(১৩১), কল্পনা(১৬), নৈবেদ্য(১৭), কাব্যগ্রন্থ অষ্টম ভাগ গান (৭৬), চিরকুমার সভা(৩), খেয়া(৮), প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (১), শারদোৎসব (৯), গান ১৩১৫(৯২), প্রায়শ্চিত্ত (১), গীতাঞ্জলি (৫৬)

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ধারাবাহিক। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে ছিল দুটি খণ্ডের সম্মিলিত বর্ণানুক্রমিক সূচি। তৃতীয় খণ্ডের শেষে ছিল তৃতীয় খণ্ডের জন্যে আলাদা করে বর্ণানুক্রমিক সূচি। অবশ্য, এসব সত্ত্বেও, এই তিনটি খণ্ড হাতে নিয়ে কোনো কোনো গান খুঁজে পেতে রবীন্দ্রনাথ কীরকম নাজেহাল হতেন তার বিবরণ জানিয়েছেন সুধীরচন্দ্র কর:

> গান খোঁজবার বেলা দুটি সূচি ঘেঁটেও যখন কোনও কোনও গানের সন্ধান করে উঠতে পারতেন না, মহা বিরক্ত হতেন। ডাক পড়ত লেখকের, কারণ সেটাতে ছিল লেখকের সম্পাদনা। বিরক্তির ঝাঁজ নিয়ে বলতেন জবড়জং একটা সিন্ধুক[য] বানিয়েছ। মাথামুণ্ডু কিছুই খুঁজে পাওয়ার জো নেই। বের করে দাও, দেখি কোথায় পাও তুমি। নিশ্চয়ই এটা বইয়েতে বাদ গেছে। বুক কাঁপত, কিন্তু ভাগ্যগুণে প্রায়বারই গানটা বের করে দিয়ে উদ্ধার পেতুম।...যা হোক, কবি এই বাহ্য কারণটিকে উপলক্ষ করে কেবলি বলতেন, এই বই দিয়ে আমার চলবে না, নূতন বই ছাপতে হবে।[১৪০]

শুধুমাত্র এই ব্যবহারিক 'অসুবিধা'র জন্যেই আসলে নয়, বইটির সামগ্রিক গড়নটিই অপছন্দ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি চাইছিলেন একটি 'বিষয়ানুক্রমিক' গীতসংকলন। ফলে 'নূতন বই ছাপতে হবে'র নির্দেশটি নিছক কথার-কথা হয়ে রইল না, *গীতবিতান*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার তোড়জোড় শুরু হল।

কিন্তু কবে থেকে এই দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ শুরু তা বলা মুশকিল। আমাদের সন্ধান মতো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ১৯৩৫ সালের ৩০ মে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে একটা চিঠিতে কবি লিখছেন, 'গীতবিতানের প্রুফ কিছুদিন থেকে পাই নি'।[১৪১] এই বাক্যটি থেকে মনে হয় যেন এর বেশ কিছুদিন আগেই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার পরিকল্পনা ও কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু ২৯ আগস্ট লেখা আর-একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে কবি লিখছেন, 'গীতচয়নের ছাপা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে গ্রামাফোনে প্রচারিত গানের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া আবশ্যক।'[১৪২] আমাদের মনে হয়, *গীতবিতান*-এর ছাপার কাজ সত্যিই এই সময়ে শুরু হয়েছিল, নইলে রবীন্দ্রনাথ 'প্রুফ'-এর কথা লিখতেন না। কিন্তু ছাপতে শুরু করার পর যথেষ্ট প্রস্তুতির অভাবে সেই ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ আরও গুছিয়ে নিয়ে ছাপতে চাইছিলেন হয়তো। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, এইসময়ে কাজ আর এগোয় নি।

এর প্রায় ২ বছর ২ মাস পর ফের দেখা যায় *গীতবিতান*-এর ছাপা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে। ১৯৩৭-এর ২০ অক্টোবর সুধীরচন্দ্র করকে একটি চিঠিতে কবি লিখছেন, ‘কিশোরী বলেছেন এবার গীতবিতান ছাপায় হাত দিতে হবে। প্রস্তত থেকো।’[১৪৩] কিন্তু এবারের উদ্‌যোগও কোনো অজানা কারণে থমকে যায়। *গীতবিতান*-এর কাজ পিছিয়ে যায় আরও অন্তত ৬ মাস।

১৯৩৮-এর এপ্রিল থেকে ঠিকঠাক শুরু হয় দ্বিতীয় সংস্করণ গড়ে তোলার কাজ। আমরা দেখেছি, ১৯৩৫ সালের চিঠিতেই *গীতবিতান*-এর ‘প্রুফ’-এর প্রসঙ্গ এসেছিল। কিন্তু মনে হয় ১৯৩৮-এ সেই পুরোনো ছাপা সম্পূর্ণ বাতিল করে নতুন পরিকল্পনা ও নতুন ছাপা শুরু হয়। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে, ১৯৩৮) কিশোরীমোহনকে একটা চিঠিতে কবি জানাচ্ছেন, ‘গীতবিতানের প্রুফ দেখে দিয়ে তোমার কাছে পাঠাচ্চি। কী ভাবে ছাপতে হবে সেইটে বোঝাবার জন্যে বারে বারে এই গোড়ার দিকের প্রুফ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে — সুধীর কর এখন বুঝে নিয়েছে, এখন থেকে আশা করি কাজটা চলবে অবাধে।’[১৪৪]

এ-তথ্য আজ বহু-আলোচিত যে এই ‘দ্বিতীয়’ সংস্করণটি যে শুধু প্রথম সংস্করণের কালানুক্রমিক গ্রন্থনা থেকে আলাদা তা-ই নয়, বর্তমানে প্রচলিত *গীতবিতান*-এর থেকেও তার বিন্যাস ছিল অনেকখানি পৃথক। বিভিন্ন সংস্করণের পারস্পরিক তুলনা ও পাঠান্তর আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, তবে এই সংস্করণটি নিয়ে প্রাথমিক দু-একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। এই সংস্করণটি সাধারণভাবে ‘বিরলপ্রচার সংস্করণ’ নামে অভিহিত হয়ে থাকে।[১৪৫] ১৩৪৫ ও ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে এই সংস্করণের যে-দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবে সেখানে গানগুলি ‘পূজা’, ‘স্বদেশ’, ‘প্রেম’ ‘প্রকৃতি’ ‘বিচিত্র’ ও ‘আনুষ্ঠানিক’ এই ৬টি পর্যায়ে যেমন ভাগ হবে, তেমনি পর্যায়গুলিকেও ভাঙা হবে নানা উপপর্যায়ে। যেমন, ‘পূজা’ পর্যায়টি বিভক্ত ছিল নিম্নলিখিত ২১টি উপপর্যায়ে :

> গান ১-৩২, বন্ধু ১-৫৯, প্রার্থনা ১-৩৬, বিরহ ১-৪৭, সাধনা ও সংকল্প ১-১৭, দুঃখ ১-৪৯, আশ্বাস ১-১২, অন্তর্মুখে ১-৬, আত্মবোধন ১-৫, জাগরণ ১-২৬, নিঃশংসয় ১-১০, সাধক ১-২, উৎসব ১-৭, আনন্দ ১-২৫, বিশ্ব ১-৩৯, বিবিধ ১-১৪৪, সুন্দর ১-৩০, বাউল ১-১৩, পথ ১-২৫, শেষ ১-৩৪, পরিণয় ১-৯

উপপর্যায়-নামের পাশের সংখ্যাগুলি বইতে ব্যবহৃত গানের ক্রমিক সংখ্যা। দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি উপপর্যায় নতুন করে শুরু হচ্ছে ‘১’ সংখ্যাচিহ্নিত হয়ে, যাতে পাঠকের পক্ষে উপপর্যায়গুলিকে পৃথক করে বুঝে নিতে কোনোই অসুবিধা না-হয়। বস্তুত, এটা ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নির্দেশ। ১৮ মে লেখা চিঠিতে তিনি যে

লিখছেন, ‘সুধীর কর এখন বুঝে নিয়েছে’, এই বিন্যাসের ধরনটাই নিশ্চয়ই সুধীর করকে বোঝাতে হচ্ছিল বারবার করে। শুধু মৌখিকভাবে বোঝানোই নয়, এর আগে ১৩৪৫-এর ২৩ বৈশাখ (১৯৩৮-এর ৬ মে) একটি চিঠিতে লিখিতভাবেও কথাগুলি সুধীর কর-কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন কবি। চিঠিটি বহু-উদ্ধৃত, তবু আর-একবার ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> গীতবিতানের প্রুফ দেখে দিলুম। ছাপাটায় যথাসম্ভব ঠাসবুনুনির দরকার, কারণ গানের বই সহজে বহন করবার যোগ্য হওয়া চাই, অকারণ ফাঁক বর্জনীয়। প্রত্যেক পর্যায়ের গান সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করতে বলেছি। ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের শিরোনামা দেওয়া সম্ভব হয় নি, অথচ ইঙ্গিতে তাদের ভিন্নতা রক্ষিত হয়েছে। সংখ্যামালার পরিবর্তন নীরবে নির্দিষ্ট হতে পারবে – ভাবুক লোকের পক্ষে সেই যথেষ্ট। পূজা অধ্যায়ে গানের পর্যায় শেষ হলে তার পরবর্তী পর্যায়ে নূতন করে এক দুই বসবে। সূচিতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ছেদ রেখে দেবে – এবং সংখ্যা ও বর্ণানুক্রমিক প্রথম লাইন থাকবে। শিরোনামা হল পূজা, — ছোটো শিরোনামার দরকার নেই, কিন্তু তার স্বতন্ত্র সংখ্যা-ধারা চলবে। ছোটো বিভাগগুলোর নামকরণ যদি সম্ভব হয় তবে সে কাজে নন্দগোপালের সহায়তা নিতে পার। আমার ক্লান্ত বুদ্ধিতে কুলোল না।...
>
> একটা কথা বলে রাখি, অন্য সকল বইয়ের মধ্যে ‘গীতবিতানে’র দিকেই আমার মনটা সবচেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে — নতুন ধারায় ও একটা নতুন সৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পাবে।[১৪৬]

কত মমত্ববোধ নিয়ে, কত অনুপুঙ্খে ও পরিশ্রমে তিনি সাজিয়ে তুলতে চাইছেন তাঁর এই গীতসংকলন-গ্রন্থটিকে, এই চিঠিটি তার আশ্চর্য দলিল। এই চিঠিটি উদ্ধৃত করার পরই *কবি-কথা* গ্রন্থে সুধীরচন্দ্র কর লিখেছেন, ‘নতুন সংস্করণ ছাপা শুরু হল! গানগুলোর বিষয় ভাগ করা এবং বিষয়ানুসারে অনুবিভাগ করা নিয়ে বারবার দু’হাজার গানের খুঁটিনাটি বিচার করে কতরকম ঢালাই-সাজাই করে দেখা, — এতে যে কী পরিশ্রম! দিনের পর দিন সকালবেলায় বাঁধা সময় করে সব ঝক্কিটা একরকম তিনি নিজেই পুইয়ে গেলেন।’ ‘রবীন্দ্রনাথ’ ‘হয়ে ওঠা’ যে কেবলমাত্র প্রতিভা আর মেধা দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না, এর সঙ্গে লাগে প্রবল নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাবৃত নিয়মানুবর্তিতার জোর, এই কথাটি এইধরনের স্মৃতিবিবরণ থেকে টের পাওয়া যায়।

যাইহোক, কবির নির্দেশ মেনেই *গীতবিতান*-এর প্রথম খণ্ডটি ছাপার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, তবে এই সময়ে আরও একাধিক নতুন ও পুরনো বইয়ের কাজ চলছিল বলে খুব আশানুরূপ গতিতে যে কাজ এগোতে পারছিল, এমন নয়। ৫ জুন, ১৯৩৮-এ কিশোরীমোহন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, ‘আমি আপনার চিঠি পাবার পরই

‘গীতবিতান’ ও ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ খুব তাড়াতাড়ি করে করবার জন্য প্রেসে এবং সুধীর কে চিঠি লিখে দিয়েছি। আজ গীতবিতান ৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ছেপে এসেছে। আপনার কাছে file copy পাঠিয়ে দিলাম। এই বই দুটির কাজ যাতে খুব দ্রুত চলে তার জন্য চেষ্টা করব।’[১৪৭] চেষ্টা নিশ্চয়ই করা হচ্ছিল, কিন্তু সময়ও লাগছিল কিঞ্চিৎ বেশিই। এই চিঠি লেখার প্রায় ২৩ দিন পর, ২৮ জুন লেখা কিশোরীমোহনের আর-একটা চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে এই খবর, ‘আজ গীতবিতানের ১৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রুফ পাঠালাম’।[১৪৮]

এখানে, মূল বিষয় থেকে একটু সরে গিয়ে গ্রন্থালয়-প্রাসঙ্গিক বিধিব্যবস্থা বদলের খানিকটা খবর দিয়ে রাখা যেতে পারে। *গীতবিতান* গ্রন্থটি নির্মাণের অন্দরমহলে এই বদলটির কিছু গুরুত্ব আছে। নানাকারণে রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন কিশোরীমোহন সাঁতরা শান্তিনিকেতনে এসে থাকুন এবং সেখান থেকেই গ্রন্থালয়ের কাজকর্ম দেখাশোনা করুন। কিশোরীমোহন অবশ্য পাকাপাকি শান্তিনিকেতন-বাসে গররাজি ছিলেন। ১৯৩৮-এর মে মাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন কিশোরীমোহন যেমন কলকাতার অফিস সামলাবেন তেমনই শান্তিনিকেতনে ছাপার কাজের যে অংশটুকু হয় তারও সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার তাঁর উপরেই দেওয়া হবে। শান্তিনিকেতনে ছাপার কাজের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল সুধীরচন্দ্র কর ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপর। বিশেষত *গীতবিতান* বইটির জন্যে অনেক দায়িত্ব সুধীরচন্দ্রের উপরেই তুলে দেওয়া ছিল। অন্যদিকে সেই সময়ে *বাংলা কাব্যপরিচয়*-ও তৈরি হয়ে উঠছে, তার দায়িত্ব আছে কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপর। রবীন্দ্রনাথ কার্যত এঁদের মাথার উপর চাপিয়ে দিলেন কিশোরীমোহনকে। ১৯৩৮-এর ২৯ মে কালিম্পং থেকে তিনি এই বিষয়ে পরপর তিনটি চিঠি লিখলেন। প্রথমটি কিশোরীমোহনকে এই দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে অনুরোধ করে :

> আমার বই প্রকাশের যে অংশটুকু শান্তিনিকেতনে আছে তাদের চালনা করবার ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত না হওয়ায় সময় এবং অর্থের অপব্যয় বারম্বার ঘটচে।... স্থির করেছি এই ব্যাপারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার উপর দিয়ে আমরা নিষ্কৃতি নেব।... সমস্ত আদেশ নির্দেশ লোকনিয়োগ অর্থব্যয় প্রভৃতি নির্বিচারে তোমার হাতে থাকবে — তোমার সঙ্গে পরামর্শ ব্যতীত কিছুতে আমরা হস্তক্ষেপ করব না।...গীতবিতান এবং পথে ও পথের প্রান্তে এই দুটো বই ছাপা চলচে — তার প্রতি দৃষ্টি রেখো। সুধীর করকেও একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি — তার কপি তোমাকে পাঠাই।[১৪৯]

এই চিঠিতে যেমন লেখা আছে, তেমনই, দ্বিতীয় চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সুধীরচন্দ্র করকে, 'তোমাকে জানাবার জন্যে লিখছি যে আমার গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশের যে ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে আছে তার সমস্ত দায়িত্বভার সম্পূর্ণ বহন করবার জন্যে আজ থেকে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরাকে নিযুক্ত করা গেল।'[১৫০] আর একই দিনে, একই বিষয় নিয়ে, তৃতীয় চিঠিটি কবি লিখলেন গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের সচিব চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে, 'তাঁকেই [কিশোরীমোহন সাঁতরা] সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করবার জন্যে পত্র লিখেচি। আপনি তাঁকে অনুমতি করলে সম্মতি দিতে তিনি দ্বিধা করবেন না।'[১৫১] এই বন্দোবস্তের ফলে শান্তিনিকেতনেরও সব কাজের 'সমস্ত আদেশ নির্দেশ' দেওয়ার অধিকার 'নির্বিচারে' কিশোরীমোহনের উপর বর্তাল বটে, কিন্তু তারই ফলে জন্ম হল কিছু অসন্তোষের, অভিমানের, *গীতবিতান*-সহ পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থের নির্মাণপ্রক্রিয়ায় সেই অসন্তোষের ছায়াপাত স্পষ্টই দেখতে পাব আমরা।

আখ্যাপত্রের বিবরণ অনুযায়ী এই দ্বিতীয় সংস্করণ *গীতবিতান*-এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হল ভাদ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে। যদিও, বইটি আদতে সেপ্টেম্বরের শেষ অথবা অক্টোবরের শুরুতেই সম্ভবত প্রকাশিত হয়ে থাকবে। বিশ্বভারতীর ১৯৩৮-এর Annual Report-এ গুরুত্ব দিয়ে এর সম্পর্কে লেখা হল, '...the songs have been arranged subject-wise and not chronologically as before, so that the present edition will be enjoyed by those readers, who are not conversant with the technicalities of tunes, as a book of lyrical poems. All the songs composed so far will be imcluded in two volumes, the first of which has just been published.'[১৫২]

প্রথম এই খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হলেন দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে, সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ যেমন কিশোরীমোহনকে লিখলেন, 'গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যেও উৎসুক আছি।' দ্বিতীয় খণ্ডের কাজকর্ম অবশ্য খানিক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৮-এর ১৭ সেপ্টেম্বর সুধীরচন্দ্র কর একটি চিঠি লিখলেন কিশোরীমোহন সাঁতরাকে। কিশোরীমোহন *গীতবিতান* ছাপার ব্যাপারে আগেই তাঁকে কিছু নির্দেশ দিয়ে গেছিলেন, সেই নির্দেশগুলির কোনো-কোনোটা সম্বন্ধে কিছু পাল্টা প্রশ্ন করে সুধীরচন্দ্র সেই চিঠিতে লেখেন :

> ২য় খণ্ড গীতবিতানের কপি প্রেসে দেবার আগে কয়েকটি বিষয়ে আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি।

গুরুদেবের নির্দেশ মতো আমি ২য় খণ্ড গীতবিতানের ১ম বড়ো ভাগ "প্রেমে"র গানগুলিকে আবার সাজাচ্ছি; পূর্বপত্রেই সেকথা আপনাকে জানিয়েছি। ২য় গীতবিতানে ১। প্রেম, ২। ঋতু, এবং ৩। বিচিত্র — এই তিনটি বড়ো ভাগ আছে। "প্রেমে"র কপি দেখে গুরুদেব পূর্ব্বের সাজানোর শৃঙ্খলার মধ্যে কিছু অদলবদল করতে বলায়, মনে হচ্ছে, অন্য দুটি ভাগ দেখেও হয়তো এরূপ বলতে পারেন।

গুরুদেবের দেখার পর, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আর সব কপি সাজিয়ে নিয়ে বিষয়ানুক্রমিক সূচী ও শেষের বর্ণানুক্রমিক সূচী তৈরি করে নিলে, কোনো গান ভুলে বাদ পড়ল কি না, গোটা বই ছাপা হয়ে যাওয়ার আগেই, সেটা ধরা পড়তে পারে এবং সে হলে বাদ-পড়া গান সংগ্রহ করে নিয়ে ঠিকমতো জায়গায় কপিতেই তা বসিয়ে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ সংগ্রহের কপি নিশ্চিন্তভাবে প্রেসে দেওয়া যায়। তাতে বোধ করি, ছাপা চলবার সময়ে কোনো বাধা ঘটার সম্ভাবনা থাকেনা, — তা না হলে, বর্ণানুক্রমিক সূচী না তৈরি করে কপি প্রেসে দিলে যদি কোনো গান দৈবাৎ বাদ পড়ে থাকে, তবে পরে তা জানতে পেলেও আর ঠিক জায়গায় বসিয়ে নেবার উপায় থাকবে না।...[১৫৩]

কিশোরীমোহনের নির্দেশ ছিল ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে *গীতবিতান* দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রেস কপি' প্রস্তুত করে তা যেন ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুধীরচন্দ্র চাইছেন, আগে সমস্ত বর্ণানুক্রমিক এবং বিষয়ানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করে তারপর প্রেসে দিলে অনবধানবশত কোনো গান বাদ পড়ল কিনা তা ছাপার আগেই ধরা পড়ে যাবে। অবশ্য, চিঠির শেষে কিশোরীমোহনের 'উঁচু' প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানকে মান্যতা দিয়ে সুধীরচন্দ্র লিখলেন, 'আমি যা ভেবেছি, পূর্বার্থে জানালাম। এরপরে, আপনার যেরূপ নির্দেশ আসবে সেইরূপেই কাজে অগ্রসর হব।' এই চিঠি পাওয়ামাত্র ক্ষিপ্ত কিশোরীমোহন রবীন্দ্রনাথকে নালিশ জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন, সঙ্গে সুধীরচন্দ্রের চিঠিও কবির কাছে পাঠিয়ে দেন। ২১ সেপ্টেম্বর লেখা কিশোরীমোহনের এই চিঠিতে ছিল এইসব কথা :

আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা যে সুধীরবাবু এই ভাবে করলে এতে অনেক দেরী হবে। ২।১ মাসের মধ্যে গীতবিতান, ২য় ভাগ প্রেসে যাবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। গতবারে ১৯শে জুলাই তাঁকে গীতবিতানের (১ম খণ্ড) সূচী করতে বলে এসেছিলাম। তার পরে ৭ই আগষ্ট আবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছু হয় নি দেখে কি ভাবে করতে হবে তা নিজে হাতে লিখে দিয়ে এসেছিলাম। এর পরে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে যখন যাই তখনও দেখি তিনি সূচী কিছুই আরম্ভ করেন নি। অথচ তখন বই ছাপা শেষ হয়ে গেছে। বই প্রত্যেক ফরমা যেমন যেমন ছাপা হবে ঠিক তখনই তখনই সূচী করতে আমি গোড়া থেকে বলেছিলাম। যাহোক, এর পরে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে হরিপদ ও সুধীরের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদেরই কথামত ১০ই

সেপ্টেম্বরের মধ্যে সূচী শেষ করতে আদেশ করেছিলাম। কিন্তু এতেও তাঁরা যথাসময়ে করেন নি। শেষের দুদিন আপনার ঘরের পাশে আলো জ্বেলে পাখা চলিয়ে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত করেছেন। ঠিক এই ভাবে যদি চলে তবে গীতবিতান ২য় ভাগ এর সূচী করতে সুদীর্ঘ কাল দেরী হবে — এই আমার মনে হয়।[১৫৪]

'আলো জ্বেলে পাখা চালিয়ে' কাজ করেছেন সুধীরচন্দ্র, এইসমস্ত নালিশকথার মধ্যে স্পষ্টতই ব্যক্তিগত বিদ্বেষবুদ্ধি কাজ করে যাচ্ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু এই দুটি চিঠি থেকে *গীতবিতান* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের গড়ে ওঠার সময়কালের অনেক খুঁটিনাটি খবর পাওয়া যায়। ১৯ জুলাই থেকে প্রথম খণ্ডের 'সূচি' করার তোড়জোড় শুরু হল, তারপর কীভাবে আগস্ট পেরিয়ে সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখের কাছাকাছি কোনো 'দুদিন' ধরে রাত-জেগে এই কাজ শেষ করা হল, তার বেশ কৌতুহলজনক বিবরণ পাওয়া যায় এখানে। সেইসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজও যে পুরোদস্তুর শুরু হয়ে গেছে সে খবরও সুনির্দিষ্ট করে এই চিঠিদুটিতে পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য, সুধীরচন্দ্র লিখেছিলেন, 'গুরুদেবের নির্দেশ মতো আমি ২য় খণ্ড গীতবিতানের ১ম বড়ো ভাগ "প্রেমে"র গানগুলিকে আবার সাজাচ্ছি', এর থেকে বোঝা যায় যে, এই সেপ্টেম্বর মাস থেকেই নতুন করে এই দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে সজ্জারীতি পাল্টানোর কাজও শুরু হয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আদেশে। খুব সম্ভবত এই কারণেই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ বেশ খানিকটা পিছিয়ে যায়, ২২ নভেম্বরেও রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহনকে লিখছেন, 'এবার গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডে লাগতে হবে', অর্থাৎ তখনও রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে সবটা গুছিয়ে ফেলা সম্ভব হয় নি। অবশ্য, সজ্জারীতি ও অন্যান্য ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে স্থির হয়ে গেলেও, প্রেসে গিয়ে অনেকসময়ই কাজ আটকে থাকে। অন্য বই অগ্রাধিকার পেয়ে যায়। এক্ষেত্রেও যেমন *বাংলা ভাষাপরিচয়, বিশ্বপরিচয়* তৃতীয় সংস্করণ, *আকাশপ্রদীপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী* প্রভৃতি গ্রন্থ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন প্রেস ব্যস্ত হয়ে পড়ে, *গীতবিতান* দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ পিছিয়ে যায়। মাঝে মাঝে এই ব্যাপারে তাড়া লাগান কবি, যেমন ১৯৩৯-এর ২৪ এপ্রিলের চিঠিতে কিশোরীমোহনকে লিখলেন, 'আকাশপ্রদীপ তো হল — এইবার গীতবিতানটাতে একটু তাড়া লাগিয়ো —খুবই মন্থর গমনে চলচে।'[১৫৫]

এই দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশিত হয়েছিল কবে? বইয়ের আখ্যাপত্রের বিবরণ-অনুযায়ী 'ভাদ্র ১৩৪৬', অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ। এই সময়কালের মধ্যে বইটির *মুদ্রণকাজ* যে শেষ হয়ে গেছিল, তার একটি প্রমাণ দেখিয়েছেন সুভাষ চৌধুরী তাঁর *গীতবিতানের জগৎ* বইতে। এই দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল 'পরিশিষ্ট' বলে একটি অংশ,

সেখানে ছিল দুটি গান, 'যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে' আর 'বারে বারে ফিরে ফিরে'। গানদুটি 'পরিশিষ্ট'-এ রাখতে হল কেননা অনুমান করা চলে যে, *মুদ্রণকার্য শেষ হবার মুখে* গানদুটি রচিত, ফলে তাদের বিষয়ানুযায়ী বিন্যস্ত করার সুযোগ পাওয়া যায় নি। সুভাষ চৌধুরী জানাচ্ছেন,[১৫৬] রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত গানদুটির 'মেক-আপ প্রুফ'-এর তলায় তারিখ দেওয়া আছে '5/9/39' (১৯ ভাদ্র ১৩৪৬)। কিন্তু এই প্রায়-অকাট্য প্রমাণটি সত্ত্বেও, আমরা বলতে পারি, সেপ্টেম্বর মাসে এর মুদ্রণকাজ মোটেই শেষ হয় নি। আর 'প্রকাশ' তো নয়ই। অক্টোবর মাসে একটি তারিখহীন চিঠিতে কিশোরীমোহন কবিকে লিখছেন, 'কাল প্রেস খুলবে। এখানে [=গিরিডি] আসবার আগে আমি "বাংলা ভাষা পরিচয়" ও "গীতবিতান["], দ্বিতীয় ভাগের প্রথম ফর্মার প্রুফ দেখে প্রেসে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি।... ছুটির আগেই কাগজ ও কালীর ব্যবস্থা করেছি। কোন দিক থেকেই কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।'[১৫৭] এই চিঠির 'কাল'-টি কবে তা বলা মুশকিল। সেবার বিশ্বভারতীতে পুজোর ছুটি ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ অক্টোবর। কিন্তু গ্রন্থনবিভাগ ও প্রেস-এ এতদিন ছুটি থাকত বলে মনে হয় না। এই চিঠি অক্টোবরের মাঝামাঝি কোনো সময়ের হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ, অক্টোবরের মাঝামাঝিও কেবল 'প্রথম ফর্মা'-র প্রুফই দেখা হয়েছে। ফলে শুধুমাত্র মুদ্রণ শেষ হতে হতেই নভেম্বর গড়িয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়।

আর, বইটি *প্রকাশিত* হল কবে? ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯(৭ আশ্বিন ১৩৪৬ব) অনেক আশা নিয়ে কিশোরীমোহনকে কবি লিখছেন, 'গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ড এখন প্রকাশ হলে কি অনিষ্ট হবে? আমার মনে হচ্চে পূজোর[য] বাজারে একমাত্র আমার রচনাবলীর পরে তোমরা দৃষ্টি রেখেছ আর কোনো বই পাছে তার প্রতিযোগিতা করে এই তোমাদের আশঙ্কা।'[১৫৮] আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি যখন লিখছেন তখন ছাপা শেষ হতেই বিস্তর দেরি আছে। শেষপর্যন্ত আশ্বিন তো নয়ই, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দেই বইটি প্রকাশিত হয়ে উঠতে পারে নি, সম্ভবত অন্য বইকে জায়গা করে দেবার জন্যেই পারে নি। বঙ্গাব্দটি শেষ হয়ে আসবার মুখে, চৈত্রের শেষে, ১৯৪০-এর ১০ এপ্রিল কিশোরীমোহনের কাছে জরুরিভিত্তিতে শান্তিনিকেতন থেকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয় যে ১লা বৈশাখের আগেই দ্বিতীয় খণ্ড বের হওয়া চাই। কিশোরীমোহন ১১ এপ্রিল ১৯৪০-র তাঁর অপারগতা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন :

শ্রীচরণেষু, / গুরুদেব, ১লা বৈশাখের মধ্যে গীতবিতান দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করবার জন্য কাল শান্তিনিকেতন থেকে একটি তার (wire) এসেছে। খবর নিয়ে জানলেম গীতবিতানের ফরমা ছাপা হয়ে এসে দপ্তরীর বাড়ী পড়ে আছে। সেলাই বা বাঁধাই হয় নি। এই ২/১ দিনের মধ্যে তা হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। ৭ দিনের মধ্যে যাতে প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থা করছি। ৭ দিনের মধ্যেই আপনাকে বই পাঠিয়ে দেব।[১৫৯]

এই চিঠির সাক্ষ্যে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ১৯৪০-এর ১৮-১৯ এপ্রিল নাগাদ অবশেষে দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রকাশিত হতে পেরেছিল।

কিন্তু এত চেষ্টা ও উদ্‌যোগের পর যে বই প্রকাশিত হল, রবীন্দ্রনাথ যে বই সম্পর্কে বলেছিলেন, 'অন্য সকল বইয়ের মধ্যে 'গীতবিতানে'র দিকেই আমার মনটা সবচেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে', সেই বই প্রকাশিত হবার পর তেমন করে প্রচারিত হল না কখনই। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থেতিহাসে এইটেই অন্যতম বড়ো এক রহস্য। যে 'প্রবাসী' বা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেকালে রবীন্দ্রনাথের নতুন বইয়ের খবরাখবর প্রদানে ও সমালোচনা প্রকাশে ছিল অক্লান্ত, সেখানেও এই বইয়ের দুটি খণ্ড সম্পর্কে কোনো কথাই উচ্চারিত হল না। এর বিজ্ঞাপনও বেরোল না কোথাও!

কবির মৃত্যুর মাস ছয়েক পর, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে, এই খণ্ডদুটির আখ্যাপত্র বদল করে, প্রথম খণ্ডের 'ভুমিকা'য় 'প্রথম যুগের উদয়-দিগঙ্গনে' গানটি যুক্ত করে, এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা একটি স্বতন্ত্র 'বিজ্ঞপ্তি' যুক্ত করে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' নাম দিয়ে প্রচারিত হল। চারুচন্দ্র সেই 'বিজ্ঞপ্তি'তে লিখলেন, 'গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়া ছিল (১৩৪৫-৪৬), কিন্তু নানা কারণে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তাহা এখন প্রকাশিত হইতেছে।' কিন্তু এই 'নানা কারণ'গুলি যে ঠিক কী তা আজও রহস্যাবৃত।

৭। 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার একটা মূল কথা জনশিক্ষার প্রসারণে জোর দেওয়া এবং বিশেষরূপে সেই কারণেই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ১৯৩৫ সালে বাংলা সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ আজিজুল হকের তরফ থেকে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চাওয়া হয়।

১৯৩৫-এর ১৮ আগস্ট দীর্ঘ একটি চিঠিতে আজিজুল হকের কাছে নিজের মতামত লিখিতভাবে জানান কবি। সেখানে অন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাবের সঙ্গে এই কথাগুলিও লেখেন তিনি :

> আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষাবিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাঁদের জন্য ছোট বড়ো প্রাদেশিক সহরগুলিতে যদি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে ব'সে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতম থেকে উচ্চতন পর্ব পর্য্যন্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সবিহিতভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে।... এই উপলক্ষে পাঠ্য পুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।[১৬০]

এসব ক্ষেত্রে চিরকালই সাধারণত যা হয়, ধরাবাঁধা বন্দোবস্ত থেকে এতখানি ভিন্নধর্মী প্রস্তাব কার্যকর করতে কোনো সরকারই চট্ করে উৎসাহিত হন না, সেকালের ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে এতটা ঠিক আশাও করা যায় না। ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকেই তাঁদের সীমিত ক্ষমতায় স্বল্প পরিসরে এই ভাবনাটিকে কার্যকর করার উদ্‌যোগ গ্রহণ করলেন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে গঠিত হল 'লোকশিক্ষা সংসদ'। ২৫ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় এই নিয়ে বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হল :

> বিশ্বভারতী কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছেন, প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিশ্বভারতী একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। "লোক শিক্ষা সংসদ" নামে বিশ্বভারতীর একটি নতুন বিভাগ প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের কার্য্য পরিচালনা করিবেন।...
>
> যাঁহারা এই বিষয়ে আগ্রহসম্পন্ন তাঁহারা চিঠি লিখিলেই মুদ্রিত বিবরণী তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিবের নিকট চিঠিপত্র লিখিতে হইবে।...
>
> শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, বিশ্বভারতী যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তদনুসারে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হইতেছে। উপযুক্ত লেখকদিগকে পুস্তক লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছে; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম পুস্তক লিখিয়াছেন।[১৬১]

কোনটি এই ‘প্রথম পুস্তক’ ? এর উত্তরটি নানা অকারণ জটিলতায় রহস্যময় হয়ে আছে!

প্রথম কথা হল, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত রথীন্দ্রনাথের এই বিবৃতিতে যে ‘পুস্তক’টির কথা বলা হচ্ছে, সেটি যে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র বিজ্ঞানগ্রন্থ *বিশ্ব-পরিচয়* তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৩৭-এর মে-জুন মাস নাগাদ এক তারিখহীন চিঠিতে কিশোরীমোহনকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, ‘বিশ্বপরিচয় লেখাটা শেষ হয়েছে — সবটাই আমাকে নতুন করে লিখতে হোলো বলে দেরি হোলো। *এই পর্য্যায়ের বই আরো কতকগুলো লেখা দরকার সেইজন্যে তার একটা আদর্শ ঠিক করে দেবার জন্যে আমাকে এত পরিশ্রম করতে হোলো*। বেশি ছবি দিতে হবে না।’[১৬২] (বাঁকানো হরফ আমাদের) স্পষ্টতই, ‘এই পর্য্যায়’ মানে ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’ পর্যায়, তারই প্রথম বই হিসেবে *বিশ্ব-পরিচয়* লিখলেন তিনি। বইটি প্রকাশিত হল বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী ৮ আগস্ট ১৯৩৭। অবশ্য, আমরা আগেই বলেছি, আদতে তার কিছুদিন আগেই প্রকাশ পেয়ে থাকবে। সমস্যা হল, বইটির আখ্যাপত্রে বা অন্য কোথাও একে ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’র অন্তর্গত হিসেবে চিহ্নিত করা হল না। এমনকী, বইটিতে যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখলেন কবি তাতেও এ প্রসঙ্গে কোনো কিছুই জানানো হল না।

বিশ্ব-পরিচয়-এর সমসময়েই কাজ চলছিল আর-একটি বইয়ের, প্রকাশের পর যে বই বহু-বিতর্কের জন্ম দেবে। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত সেই বই, বাংলা কবিতার একটি সংকলন, *বাংলা কাব্যপরিচয়*। এই বইটির নির্মাণ-প্রক্রিয়া ও সেইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের বিড়ম্বনার কথা বিস্তারিতভাবে আমরা পরে বলব, কিন্তু আপাতত শুধু এই তথ্যটুকু জানানো যাক যে, এই বইটি বেরোবার পর দেখা গেল এর আখ্যাপত্রে এই বইটিকেই ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা -১’ হিসেবে চিহ্নিত করা আছে। বস্তুত, বাংলা কাব্যপরিচয় পরিকল্পনার একেবারে শুরুর দিন থেকেই যে বইটিকে ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’র অন্তর্গত করেই প্রকাশ করার কথা ভাবা হচ্ছিল তার প্রমাণও দেওয়া সম্ভব। এই বইটির সঙ্গে একেবারে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, বইটির ‘ভূমিকা’য় কাননবিহারীর কাছে কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কাননবিহারী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন যে, তিনিই একদিন কবিকে প্রস্তাব দেন বাংলা ভাষায় একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করার। তার ‘সপ্তাহ দুয়েক পরে’ কবি তাঁকে ডেকে বলেন :

> তোমার কাব্যসংকলনের কথা ভেবেছি। সাধারণের জন্য ওরকম বই ত প্রশান্তরাই করছেন। তুমি বরং আর এক কাজ করো। আমরা শীঘ্র লোক-শিক্ষাসংসদের কাজ শুরু করব। লোক যাতে বাড়িতে পড়াশোনা করে

> বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে উপাধি পায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই পরীক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক চাই। তুমি ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যানডার্ড-এর ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী এমনি একখানি "বাংলা কাব্যপরিচয়" সংকলনের কাজ আরম্ভ করে দাও। গোড়া থেকে শুরু করে সত্যেন দত্তের সমসাময়িক কবিদের কাল পর্যন্ত রচনা বাছবে। প্রেমের কবিতা যতদূর সম্ভব বাদ দেবে।[১৬৩]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আখ্যাপত্রে বইটিকে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' ঘোষণা করা কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়, দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফলাফল। ফলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কেও তাঁদের আগের ঘোষণা পাল্টে নিয়ে ১৯৩৮-এর ১২ জুন লিখতে হল, 'কবি রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী একখানা বাঙ্গলা কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।... বিশ্বভারতীর "লোক শিক্ষা" পুস্তক মালার ইহাই প্রথম পুস্তক।'[১৬৪]

অর্থাৎ, এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, *বাংলা কাব্যপরিচয়*-ই এই গ্রন্থমালার প্রথম বই, এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যখন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠছে, তখনই আর-একটি বইয়ের জন্ম হল ঐ একই দাবিপত্র সমেত! বইটির নাম *পথের সঞ্চয়*।

১৯৩৯ সাল জুড়ে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠিতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' নামে প্রকাশিতব্য একটি বইয়ের কথা বলছেন। যেমন ১৭ ফেব্রুয়ারি লিখছেন, 'তাই আজ পাশ্চাত্য ভ্রমণ নিয়ে পড়ব মনে করচি।' (আকাদেমি পত্রিকা ৫, পত্র নং ১১২) ২৪ এপ্রিল লিখছেন, 'পাশ্চাত্য ভ্রমণের কপি দেখে শুনে দিয়েছি।' (পত্র নং ১১৮) এটি আসলে কোন বই? ১৯৩৬ সালে (আশ্বিন ১৩৪৩ব) *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* এবং *য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি* বইদুটিকে একমলাটের মধ্যে এনে প্রকাশিত হয় *পাশ্চাত্য ভ্রমণ* নামে একটি বই। কিশোরীমোহনের চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল যে 'আকাদেমি পত্রিকা'-য় সেখানে এই পত্রগুলির সংকলক শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন[১৬৫] যে, কিশোরীমোহনকে লেখা উপরিল্লিখিত 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' বলতে আসলে ১৯৩৬-এর *পাশ্চাত্য ভ্রমণ*-এর কোনো পরবর্তী সংস্করণের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের অবশ্য তা মনে হয় না, কেননা এই সময়ে বা এর পরে *পাশ্চাত্য ভ্রমণ* গ্রন্থটির কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ আর কখনই প্রকাশিত হয় নি। আমাদের মতে কবি এখানে প্রকাশিতব্য *পথের সঞ্চয়*-এর কথাই বলতে চাইছেন। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের ইংলন্ড যাত্রা ও প্রবাসকালে যে-সব ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত হয়েছিল এবং প্রকাশিতও হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকায় মুলত সেইগুলি জড়ো করে তৈরি হয়ে উঠল এই *পথের সঞ্চয়*। অবশ্য মূল লেখাগুলি ছিল

সাধু ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ তাদের বদল করে নিলেন চলিতে। এছাড়া অন্য নানারকম পরিমার্জনও করা হয়েছিল। বইটি প্রকাশিত হল ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। প্রকাশের পর কিশোরীমোহনকে কবি ২৪ সেপ্টেম্বর লিখলেন, 'পাশ্চাত্য ভ্রমণটা হয়তো বিদ্যালয়পাঠ্য হতেও পারে – ওর আর কোনো গুণ নেই।' (পত্র নং ১২২) 'বিদ্যালয়পাঠ্য' হয়ে উঠুক এই আগাম পরিকল্পনা থেকেই হয়তো বইটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু বইটি বেরোবার পর সরাসরি একে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত করার ভাবনা শুরু হল। বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের সচিব চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে কবি লিখলেন ২৮ নভেম্বর ১৯৩৯-এ:

> আমার একটা নিবেদন আছে। "পথের সঞ্চয়" নাম দিয়ে আমার বিলেত ভ্রমণের যে বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে — তার বাহ্য সাজ বদলিয়ে দিয়ে তাকে "লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ" শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দিন। ওটা সদ্য বের হয়েছে, নূতন বেশ ধরে মলাট বদলিয়ে পাঠকমহলে অবতীর্ণ হোলে ক্ষতি হবে না।[১৬৬]

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের 'নূতন বেশ' ধারণের পরামর্শ মোতাবেক দুটি গুরুত্বপূর্ণ বদল হল বইটিতে। প্রথমত রবীন্দ্রনাথেরই লেখা একটি নাতিদীর্ঘ 'ভূমিকা' যোগ হল। আর বইটির আখ্যাপত্রে এটিকে ঘোষণা করা হল 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা -১' হিসেবে ! অবশ্য, প্রকাশকাল-সহ সমস্ত তথ্য একই রয়ে গেল, বদল-সমেত বইটিকে পরবর্তী সংস্করণ বলে চিহ্নিত করা হল না। ফলে প্রথম সংস্করণ হিসেবেই রয়ে গেল ভিন্নরূপী দুধরণের *পথের সঞ্চয়*। (যেমন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'School of Cultural Text and Record'-এর উদ্যোগে নির্মিত 'বিচিত্রা' নামে যে অনলাইন রবীন্দ্ররচনাসম্ভারের ওয়েবসাইটে (<bichitra.jdvu.ac.in>) *পথের সঞ্চয়* প্রথম-সংস্করণের যে প্রতিলিপি আছে সেটি এই বদলের পূর্বেকার, অর্থাৎ তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকাটি নেই, সেটি 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা -১' হিসেবে চিহ্নিতও নয়।) ১৯৪০-এর ৯ জানুয়ারি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মারফৎ সর্বসাধারণের কাছে এই খবর পৌঁছল যে, 'উক্ত লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রথম দুইখানি পুস্তক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি হইল রবীন্দ্রনাথের "পথের সঞ্চয়" এবং অপরখানি হইল প্রমথ চৌধুরীর "প্রাচীন হিন্দুস্থান"।[১৬৭] অন্যদিকে খোদ বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে ১৯৪০ সালের 'Annual Report'-এ বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে লেখা হল :

Publication of such a series has engaged the attention of the poet for years, and it is a pleasure to record that his thoughts in this direction have now begun to materialize;... The first publication in this *Lokasiksha* or Popular Education Series was the Poet's *Pather Sanchay* or Letters from England and America, which was followed by Sj. Pramatha Chaudhuri's *Prachin Hindusthan* or History and Geography of Ancient India. Some more books in this series were in the press during the period under review.[১৬৮]

অন্য বইগুলির কথা আমরা পরে বলছি, আপাতত 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা -১' হিসেবে দাবি স্থির হল *পথের সঞ্চয়*-এর, পিছনে পড়ে রইল *বিশ্ব-পরিচয়* আর *বাংলা কাব্যপরিচয়*।

বিশ্ব-পরিচয় বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭-এর আগস্ট মাসে। তারপর থেকে এই বইটিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের একধরণের স্থায়ী অসন্তোষ কাজ করে যাচ্ছিল। তিনি বিজ্ঞানবিদ্ নন, বিজ্ঞানের পড়ুয়া, ফলে বিজ্ঞানবিষয়ক এই বইতে কিছু কিছু ত্রুটি থেকেই যাচ্ছিল, সেটা তাঁকে খেয়াল করিয়ে দিচ্ছিলেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা। ফলে পূর্ববর্তী মুদ্রণ অবিক্রীত থেকে যাওয়া সত্ত্বেও বারবার সংশোধন করে বইটির নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছিল। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে প্রথমবার প্রকাশিত হবার পর পৌষেই বেরলো 'সংশোধিত ও পরিবর্তিত' দ্বিতীয় সংস্করণ, পরের বছর (১৩৪৫ব) শ্রাবণে তৃতীয়, পৌষে চতুর্থ, এবং তার পরের বছর ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষে পঞ্চম সংস্করণও বেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ, এই পঞ্চম সংস্করণের একটি পুনর্মুদ্রণ যখন প্রকাশিত হল মাস তিনেক বাদে, চৈত্রে, তখন দেখা গেল সেই বইটিকে চিহ্নিত করা আছে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা -১' হিসেবে !!

এই বিচিত্র অদলবদলগুলির সঙ্গে নিশ্চয়ই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও তাল রাখতে পারছিলেন না, কেননা, খেয়াল রাখতে হবে, আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, ১৯৪১-এর জানুয়ারি তে প্রকাশিত হওয়া ১৯৪০-এর 'Annual Report'-এ কিন্তু *পথের সঞ্চয়*-কেই 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'-র বই হিসেবেই বলা আছে, *বিশ্ব-পরিচয়*-কে নয়।

যাইহোক, নিজের লেখালেখির পাশাপাশি এই গ্রন্থমালার জন্যে অন্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লিখিয়ে নেবার কাজটিরও তদারক করতে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথকেই। ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরের একেবারে শুরুতে, একটি তারিখহীন চিঠিতে (রবীন্দ্রনাথ তারিখের জায়গায় লিখেছেন, 'ইতি/তারিখ?') চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে কবি লিখছেন:

> অধ্যাপক প্রমথ সেন, অধ্যাপক তেজেশ্চন্দ্র সেনের ভূবিবরণ ও উদ্ভিদ বিবরণ প্রস্তুত হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তী ইংরেজি সাহিত্যের ধারা লিখবেন প্রতিশ্রুত। একজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ভূবৃত্তান্তের বই পাওয়া যাবে আশা করছি – তিনি কিয়দংশ লিখেও ফেলেছেন।
>
> প্রমথর হিন্দুস্থান প্রকাশ হোতে যদি কোনো কারণে দোষ [দেরি?] হয় – অন্তত মুদ্রিত বইখানি প্রমথর হাতে অবিলম্বে দেওয়া উচিত হবে – অতি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে তিনি বোধহয় হতাশ্বাস হয়ে পড়েছেন।[১৬৯]

প্রমথ চৌধুরীর *প্রাচীন হিন্দুস্তান* বইটির প্রসঙ্গ আমরা আগেই বিশ্বভারতী ‘Annual Report’-এ (১৯৪০) উল্লিখিত হতে দেখেছি। বইটির পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে বিস্তর মেরামতি করেছেন। এই চিঠি লেখার মাস পাঁচেক আগেই, ২৪ জুলাই (পোস্টমার্ক) ১৯৩৯-এ প্রমথ চৌধুরীকেই তিনি লিখেছিলেন :

> ওর মধ্যে আমার হাত চালিয়েছি অনেকখানি। তার কারণ, ওটাকে আমাদের লোকশিক্ষা সংসদের আদর্শে তৈরি করতে হোলো। ভয় আছে পাছে জিনিষটাকে না চিনতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠ। যাই হোক, ওটা এইবারে প্রেসে চড়বে – পূজোর [য] পূর্বেই আট-আনা সংস্করণের মাপে বেরবে।[১৭০]

পুজোর আগে অবশ্যই বেরোয় নি বইটি। পূজাবকাশের কালে মংপু থেকে তিনি কিশোরীমোহনের কাছ থেকে চেয়ে পাঠালেন বইটির প্রেস-প্রুফ, ‘চারুবাবুর কাছ থেকে প্রমথর লেখাটা নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল এখনো পাই নি। এই সময় পেলে সংশোধনের কাজ চলত।’[১৭১] রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে কবির সংশোধিত এই প্রেস-প্রুফটি সংরক্ষিত আছে। বইটি প্রকাশিত হল আখ্যাপত্র-অনুযায়ী অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে। তবে আমাদের মনে হয় অগ্রহায়ণ পেরিয়ে পৌষে গড়িয়ে গেছিল, কেননা ১০ জানুয়ারি ১৯৪০ (২৬ পৌষ ১৩৪৬ব) রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর কাছে জানতে চাইছেন, ‘এতদিনে হিন্দুস্থান পেয়ে থাকবে।’[১৭২] বইটির আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ নিম্নরূপ :

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা-২/ প্রাচীন হিন্দুস্থান/ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী/ বিশ্বভারতীর ‘সিল’/ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/ ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বইয়ের শুরুতে *১০–৮০* পৃষ্ঠা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা। যে ভূমিকাটি তাঁর *পথের সঞ্চয়* ও পরবর্তী অন্য কয়েকটি বইতে সাধারণ-ভুমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বইটি ১১৭ পৃষ্ঠার।

চারুচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটিতে প্রমথ চৌধুরীর বইটি ছাড়াও ছিল প্রমথনাথ সেনের কথা। তাঁর লেখা ‘ভূবিবরণ’-বিষয়ক বইটির নাম *পৃথ্বী-পরিচয়*। এটি প্রকাশ পেল ভাদ্র ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (সেপ্টেম্বর ১৯৪০)। এর আখ্যাপত্রের বিবরণ নিম্নরূপ :

পৃথ্বী-পরিচয়/ প্রমথনাথ সেনগুপ্ত/ বিশ্বভারতীর ‘সিল’/ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/ ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেখাই যাচ্ছে, এর আখ্যাপত্রে বা অন্যত্র ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’ কথাটি লেখা রইল না, গ্রন্থমালার ‘সাধারণ-ভূমিকা’টিও না। তার বদলে একটি স্বতন্ত্র ‘ভূমিকা’ লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে লোকশিক্ষা সংসদের কাজের জন্যেই যে এই বই রচনা তা স্পষ্ট করেই বললেন তিনি, আর শেষে লিখলেন, ‘লোকশিক্ষাদান সংকল্পকে সার্থক করার উদ্দেশে তাঁর সহায়তা পেয়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। এই শুভকার্যে তিনি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।’ এই বইটিকে নিঃসন্দেহে ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’র তৃতীয় গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’র চতুর্থ গ্রন্থ পশুপতি ভট্টাচার্য লিখিত *আহার ও আহার্য* নামের একটি বই। প্রকাশিত হল ফাল্গুন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (মার্চ ১৯৪১)। এই বইটি নির্মাণের পূর্বপট সম্পর্কে পশুপতি ভট্টাচার্যই একটি স্মৃতিকথায় বিস্তারিত জানিয়েছেন। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ কত গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই গ্রন্থমালাটি গড়ে তুলছিলেন, তার আশ্চর্য বিবরণ মেলে সেখানে। পশুপতি লিখছেন :

> একদিন হঠাৎ আমাকে [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, দেখ, তুমি যা লিখছ অমন ভাবে লিখলে চলবে না। বরং সমস্ত ফিজিওলজিটা একে একে ধারাবাহিকভাবে লিখে যাও, এতে কাজ হবে।
>
> আমি খাদ্য সম্বন্ধে আর পরিপাকক্রিয়া সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে লাগলাম। এ সম্বন্ধে লেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমি সেগুলা বন্ধুবর সজনীকান্ত দাসের মারফৎ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।... যখন খুবই অসুস্থ তখন একদিন আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন। তখন তিনি চোখেও তেমন দেখতে পান না এবং নিজের হাতেও কিছু লিখতে পারেন না। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে, এই অবস্থায় উনি আমার ঐ সব নীরস লেখা নিয়ে মাথা ঘামাবেন।... তিনি বললেন যে, এ অবস্থাতেই তিনি সেই লেখা অপরকে দিয়ে পড়িয়ে শুনিয়েছেন এবং বিশ্বভারতী থেকে লোকশিক্ষা পুস্তক হিসাবে সেগুলো নিজে ছাপিয়ে বই করবার মনস্থ করেছেন।[১৭৩]

এই বিবরণ পড়ে বিহ্বল লাগে! একই-সত্তায় এক স্বপ্নদ্রষ্টা কবি আর সেই স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দেবার উদগ্র সাধনায় রত এক জেদী সাধকের অন্তরমহলের খানিকটা যেন এখানে উন্মোচিত হয়ে যায়। চোখে ভালো দেখেন না, তবু অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছেন এই বই, কেননা দেশের মানুষের জন্যে তার কিছু স্বেচ্ছাবৃত দায় রয়ে গেছে ! এর কিছুদিন পরে, ৬ জানুয়ারি ১৯৪০, পশুপতি ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে এই দেশের মানুষের কথাটি তিনিই লিখবেন :

> কল্যাণীয়েষু — / পশুপতি, পরিভাষাবর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে বলে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে আপন অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনের কাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।[১৭৪]

এইখানে, এই বইটিকে ঘিরে কবির এক ব্যক্তিগত উদ্বেগের মুহূর্তের ছবি তুলে আনলে হয়তো ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৪০-এর ১৭ এপ্রিল শান্তিনিকেতন থেকে কবি এলেন কলকাতায়, উঠলেন অন্যান্যবারের মতোই বেলঘরিয়ায় নির্মলকুমারী মহলানবিশের আতিথ্যে। সেখান থেকে ২০ এপ্রিল রওয়ানা হলেন মংপু-কালিম্পং-এর উদ্দেশ্যে। এই অবসরযাপনের কালে ধীরেসুস্থে পুরোটা পড়বেন বলেই হয়তো সঙ্গে এনেছিলেন আরও অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে *আহার ও আহার্য*-এর পাণ্ডুলিপিটিও। কিন্তু অনবধানে সেটি ফেলে গেলেন বেলঘরিয়াতেই! মংপুতে পৌঁছেই, ২৩ এপ্রিল, উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন নির্মলকুমারীকে :

> আমার অভিভাবক বিশেষের উদ্দাম উৎসাহে বেলঘরিয়া সদনে আর যে একটা অপঘাত ঘটেছে সেটার জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। পশুপতি ডাক্তারের রচনার একটি পাণ্ডুলিপি এবং সুকুমার সেনের রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বই দুখানি নিরুদ্দেশ হয়েছে। যদি পাও তোমার আংটির সঙ্গে সেগুলিকে আত্মভাণ্ডারজাত করে রেখো না। এখানে সুস্থ থাকবার অন্য সকল সুযোগই আছে কেবল ঐ হারাধনগুলির শোকে দেহমন আছে পীড়িত।[১৭৫]

নির্মলকুমারীকে লেখা চিঠির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশে থাকত একধরণের লঘু ঠাট্টাসুলভ অন্তরঙ্গ ভঙ্গি, এই চিঠির মধ্যেও তা আছে। কিন্তু সেইটুকুকে সরিয়ে দিলে ‘হারানো’ পাণ্ডুলিপিটির জন্যে রবীন্দ্রনাথের

সত্যিকারের গভীর দুশ্চিন্তাটি অলক্ষ্য থাকে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, অবসরযাপনের কালেও তিনি নিয়ে যাচ্ছেন এই বইটির পাণ্ডুলিপি, সেটা 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' সম্পর্কে তাঁর গভীর উদ্দীপনা ও মনোযোগের একটি অতিরিক্ত প্রমাণ হিসেবে ধরা যেতেই পারে। যাইহোক, বইটি প্রকাশিত হবার পর তার আখ্যাপত্রে অবশ্য 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' কথাটি ছিল না। সাধারণ-ভূমিকাটিও না। তার বদলে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ৬ জানুয়ারি ১৯৪১-এর পত্রটিই ব্যবহৃত হয়েছিল 'ভূমিকা' হিসেবে। (প্রসঙ্গত, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণও আমরা দেখেছি। তার প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ব। সেখানে কিন্তু খুবই বড়ো হরফে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' কথাটি লেখা আছে। ভূমিকা-পত্রটি বাদ গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'সাধারণ ভূমিকা'টিই সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে।)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় শেষ দুটি বই সম্পর্কে লেখা হল, 'ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য "আহার ও আহার্য" বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার জন্য এই বহিটি লিখিয়াছেন।... "আহার ও আহার্য" বইখানির ঠিক আগে বাহির হইয়াছিল "পৃথ্বী-পরিচয়"।'[১৭৬] এত কিছু প্রমাণের পর এই দুটি বইকে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত বলে মেনে নিতে আর কোনো সংশয় থাকার কথা নয়।

শেষ বাক্যটি লিখতে হল এইজন্যে যে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ পরিক্রমা* নামে যে বিখ্যাত পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে এর থেকে কিছু ভিন্ন তথ্য জানানো আছে। জগদীন্দ্র ভৌমিক, কানাই সামন্ত, সুবিমল লাহিড়ী ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো শ্রদ্ধেয় ও সর্বমান্য রবীন্দ্রতথ্যজ্ঞ মানুষেরা বইটির নির্মাণপ্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন বলে তথ্যগুলি সন্তর্পনে বিবেচনা করে দেখতে হয়। এই বইতে দেওয়া একটি তালিকায় মোট ১৩টি গ্রন্থকে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত বলা আছে।[১৭৭] সেই তালিকাটি নিম্নরূপ:

> ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিশ্বপরিচয়,* ১৩৪৪ ২। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ,* ১৩৪৭ ৩। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাণতত্ত্ব,* ১৩৪৮ ৪। নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* ১৩৫২ ৫। পশুপতি ভট্টাচার্য, *আহার ও আহার্য,* ১৩৫২ ৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাস,* ১৩৫৪ ৭। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ব্যাধির পরাজয়,* ১৩৫৬ ৮। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার,* ১৩৫৬ ৯। নির্মলকুমার বসু, *হিন্দুসমাজের গড়ন,*

১৩৫৬ ১০। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, *পূজাপার্বণ,* ১৩৫৮ ১১। যোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলার নব্যসংস্কৃতি,* ১৩৫৮ ১২। সত্যেন্দ্রকুমার বসু, *হিউএনচাঙ,* ১৩৫৯ ১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ইতিহাস,* ১৩৬২

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হল, এই তালিকায় প্রমথ চৌধুরীর *প্রাচীন হিন্দুস্থান* এবং প্রমথনাথ সেনগুপ্তর *পৃথ্বী-পরিচয়* বইদুটির নামই নেই ! আমরা নানা তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এই বইদুটি নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত ছিল। অন্যদিকে পশুপতি ভট্টাচার্যের *আহার ও আহার্য* বইটির প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৩৫২ব, কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এইটি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের কাল, অথচ বইটি প্রথম সংস্করণ থেকেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত হয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। এই তালিকা অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে *বিশ্বপরিচয়* ছাড়া আর যে একটিমাত্র বই এই গ্রন্থমালার জন্যে বেরিয়েছিল সেটি হল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ*। (রথীন্দ্রনাথের *প্রাণতত্ত্ব* প্রকাশিত হয় কবির জীবনাবসানের পর ১৩৪৮ব-এর কার্তিক মাসে।) এটা ঠিকই যে *বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ* পরবর্তীকালে এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে, কি সেরকমটি ছিল? এই বইটির প্রকাশ যাতে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে তার জন্যে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, কেননা সেসময়ে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। ১৯৪০ সালের ২৫ এপ্রিল মংপু থেকে কবি তাঁর পুত্রকে লিখছেন, 'আজ বিবির চিঠি পড়ে মনটা দমে গেছে। বুঝতে পারচি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে সুরেন পেরে উঠবে না।... যত শীঘ্র পারিস ওর বইটা বের করে দিস্ ও যেন দেখে যেতে পারে।'[১৭৮] ৩ মে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়, তার অনেকটা আগেই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। ১ মে বইটি পড়ে রথীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন কবি, তাতে বইটির প্রশংসা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আছে এই সাবধানবাণীও, 'ব্যক্তিবিশেষের যে মতই থাক বিশ্বভারতী তো বলশেভী নীতি বা অন্যকোনো অর্থনৈতিক মত অবলম্বন করে সমাজ বিপ্লব সমর্থন করতেই পারে না।... এই বই বিশ্বভারতীর নামে বাজারে চালিয়ে দেওয়া কোনো মতেই হতে পারে না। এর বৈজ্ঞানিক বা বর্ণনার অংশে দোষ নেই কিন্তু বাকি অংশে আমাদের নামের ছাপ দেব কী করে।'[১৭৯] চিঠির এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার হওয়া উচিত যে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বইটি কোনোভাবেই 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র অন্তর্ভুক্ত হতেই পারে না। বইটির প্রথম সংস্করণে এরকম কোনো চিহ্নও ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের নিজের লেখা একটি প্রায় চার-পৃষ্ঠা জোড়া 'ভণিতা' থাকলেও তাতে এই গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে কোনো কথা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের লেখা

কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকাও সেখানে ছিল না। ১৩৪৭ব-তে প্রকাশিত *বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ*-কে ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা’-র অন্তর্গত বলা তাই যথার্থ বিচারে নির্ভুল হয় নি বলেই আমাদের মনে হয়।

আমরা আগেই বলেছি, *বাংলা কাব্যপরিচয়* বইটির আখ্যাপত্রে সেটিকে ‘লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা-১’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এইখানে সেই বইটির নির্মাণপ্রক্রিয়া ও সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটির কথা আলোচনা করলে সেটা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কিন্তু সেই আলোচনার আগে একটি কথা বলে নেওয়া উচিত। কলকাতার ‘সাহিত্যলোক’ প্রকাশনী থেকে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীর ‘ভূমিকা ও তথ্যসংকলন’-সহ *বাংলা কাব্যপরিচয়*-এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় আগস্ট ২০০৩-এ। সেই বইতে এই সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য সংকলিত করেছেন অধ্যাপিকা চক্রবর্তী, একত্রিত করেছেন প্রাসঙ্গিক অসংখ্য চিঠিপত্র। ফলে সেই চিঠি ও তথ্যগুলি পুনর্বার এখানে ব্যবহার করাটা বাহুল্য হবে বলেই আমাদের মনে হয়। আমরা সাধারণভাবে এর অতিরিক্ত কয়েকটি কথাই বলতে চাইব এখানে। ফলে, আমাদের বর্তমান আলোচনাকে *বাংলা কাব্যপরিচয়* গ্রন্থটির নির্মাণ-প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হিসেবে ধরা উচিত হবে না, অধ্যাপিকা চক্রবর্তীর অসামান্য সম্পাদনা কাজের পরবর্তী সংযোজন হিসেবে একে বিবেচনা করাটাই যথার্থ হবে।

আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা, যেখানে তিনি বলছেন, কীভাবে অল্পে অল্পে শুরু হল *বাংলা কাব্যপরিচয়*-এর পরিকল্পনা। কিন্তু, সেই সময়টা ঠিক কখন? কাননবিহারী তাঁর বইতে লিখেছিলেন যে তাঁর প্রাথমিক প্রস্তাবনাটির পরে পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা চলে যান এবং ‘বোধহয় সপ্তাহ দুয়েক পরে’ কলকাতা থেকে ফিরে একদিন তাঁকে ডেকে *বাংলা কাব্যপরিচয়*-এর কাজ শুরু করতে বলেন। আমাদের মতে এ হল ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের কথা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *রবীন্দ্রজীবনী*-তে জানাচ্ছেন, ‘বরাহনগরে কবি ১১ ফেব্রুয়ারি হইতে ৭ মার্চ পর্যন্ত ছিলেন।’[১৮০] মার্চ মাসেরই কোনো-এক সময় থেকে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হল। মে-জুন মাসে, আমরা দেখি, আলমোড়ায় অবস্থানকালে সেখান থেকে একাধিক চিঠিতে কবি কাননবিহারীর কাছে খোঁজ নিচ্ছেন এই সংকলনের অগ্রগতির ব্যাপারে। যেমন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৭-এর ১৫মে) তিনি লিখছেন, ‘তোমাদের কাজ পুরোপুরি চলছে শুনে নিশ্চিন্ত ও খুশী হলুম।...আশা করি, কাজটা শেষ করতে বেশী দেরি হবে না।’[১৮১] ‘কাজটা’ অর্থাৎ সংকলনের অংশটা কবে শেষ

হয়েছিল বলা মুশকিল তবে ছাপার কাজ শুরু হতে অনেকটাই দেরি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কাননবিহারীকে চিঠি লেখার ঠিক এক বছর বাদে, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ (১৬মে ১৯৩৮) কিশোরীমোহনকে কবি লিখছেন, 'কাব্য পরিচয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছি।' বইটির সূচি ও অন্যান্য সজ্জা কেমন হবে তাই নিয়ে ছাপা চলাকালীন কাননবিহারী, কিশোরীমোহন ও সুধীর করের মধ্যে চলেছিল বিস্তর টানাপোড়েন, রবীন্দ্রনাথকেই শেষ পর্যন্ত সেই গুরুতর মনোমালিন্যের মধ্যে ঢুকে একরকমের মিটমাট করতে হয়েছিল। সুমিতা চক্রবর্তী এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন তাঁর বইতে।

ছাপা যখন একেবারে শেষের মুখে, তখন দুটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিল বইটিকে কেন্দ্র করে। কবিদের সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনা সমন্বিত একটি 'পরিশিষ্ট' লেখবার ভার দেওয়া হয়েছিল নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে। তিনি সেটি লিখে দেওয়ার পর, এমনকী সেটি সম্পূর্ণ ছাপা হয়ে যাবারও পর, রবীন্দ্রনাথের খেয়াল হল, সেখানে কোনো কোনো কবির সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে কঠোর ভাষা, এই ধরণের বইয়ের পরিশিষ্টে যা অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। বিব্রত রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ১৬ মে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখলেন, 'বিশ্বভারতীর সুনামের বা সৌজন্যরীতির তলায় যদি কেউ বোমা পুঁতে রাখে, নিশ্চয় সেটা সরিয়ে দিয়ে আপনি আসন্ন বিস্ফোরণ থেকে রক্ষা করবেন।... পরিশিষ্ট অংশটা নিষ্কণ্টক করে দেবেন।'[১৮২] অবশ্য এ কথা লেখা সত্ত্বেও 'নিষ্কণ্টক' করার দায়িত্বটা তিনি নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন। দুদিন বাদে, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ব(১৮ মে ১৯৩৮) কিশোরীমোহনকে কবি জানালেন, 'কাব্যপরিচয়ের পরিশিষ্ট ভাগ থেকে বিপদজনক অংশ বর্জন করে সংশোধন করে পাঠিয়েছি আবার একবার শুধ্‌রে নিয়ে ছাপাতে হবে, দেরি কোরো না।... নন্দগোপালকে আমি জানিয়ে দিয়েছি, এর দায়িত্বটা আমার উপরেই রইল।'[১৮৩] রবীন্দ্রনাথের কথামতো কিশোরীমোহন সংশোধিত পরিশিষ্ট ছাপতেও শুরু করে দেন, কিন্তু ছাপতে গিয়ে বোঝা যায়, শুধু সংশোধন-করা পৃষ্ঠাগুলো ছাপলে চলবে না, পুরো পরিশিষ্ট-অংশটাই নতুন করে ছাপতে হবে। ২৭ মে একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে এই খবর জানান কিশোরীমোহন, 'প্রথম ফরমা ছাপা হয়ে গেছে। সবটাই ছাপতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বাদ গিয়েছে বলে শুধু সেই পাতা ছেপে দিলে চলছে না। মোট ৩০ পাতা ছাপতে হবে। বাকী অংশের (অর্থাৎ প্রথম ৮ পাতা ছাড়া) প্রুফ আপনার কাছে পাঠাব কি? নন্দবাবু নিজেও সবটা দেখেছেন।'[১৮৪] রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আছেন মংপুতে। গেছেন ২৪ এপ্রিল, কালিম্পং-মংপুতে দুমাসেরও বেশি সময় কাটিয়ে ফিরবেন ৫ জুলাই। এত দূর থেকে

ছাপার কাজের খুঁটিনাটি তদারক করা স্বভাবতই সমস্যার, অথচ এই পরিশিষ্ট-অংশটির দায়িত্ব তিনি আর অন্য কারো উপর তুলে দিতে ইচ্ছুক নন। বিব্রত রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহনের ২৭ মে-র চিঠির উত্তরে ২৯ তারিখ তাঁকে তাই লিখলেন, 'যদি অপব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে – তুমি মনে করো এই অংশটা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করলেই কাজ সহজ হবে তবে তাই কোরো। জেনো এখন থেকে গ্রন্থ ছাপানোর দায়িত্ব তোমারই। অতএব এই কাজে তোমাকে নিয়োগ আমি বিনা দ্বিধায় করচি। ক্রমাগত কাজ নষ্ট ও সময় নষ্ট হয়েছে, আর যেন না হয় এই আমার ইচ্ছা।'[১৮৫] কিশোরীমোহনের উপর শেষ সিদ্ধান্তের ভার তলে দিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিশোরীমোহন গ্রন্থন-বিভাগের সচিব চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, পরিশিষ্ট ছাড়াই আপাতত বইটি বের করে দেওয়া হোক, রবীন্দ্রনাথ ফিরলে তাঁকে দেখিয়ে পরে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। সেই সিদ্ধান্ত কিশোরীমোহন জানিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে ৫ জুন লেখা এক চিঠিতে, 'কাব্যপরিচয়ের পরিশিষ্ট সম্বন্ধে চারুবাবু বললেন যে আপাততো পরিশিষ্ট বাদ দিয়ে বইটি প্রকাশ করে দেওয়া হোক। পরে আপনি ফিরে এলে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে পরিশিষ্টটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করলেই চলবে। যাঁরা কাব্যপরিচয় কিনবেন তাঁদের বিনামূল্যে সেই পুস্তিকাটি দেওয়া হবে।'[১৮৬] (নিম্নরেখ কিশোরীমোহনেরই দেওয়া) এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী *বাংলা কাব্যপরিচয়* প্রকাশিত হয় 'পরিশিষ্ট'টি ছাড়াই। পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র 'পরিশিষ্ট' ছাপিয়ে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল কিনা, সে ব্যাপারে কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই।

বইটির প্রকাশের আগে দ্বিতীয় যে সমস্যাটি সেখা দিল সেটি অধিক গুরুতর। 'পরিশিষ্ট' নিয়ে বিস্তর হাঙ্গামার শেষে বই বেরোবার কথা জুনের মাঝামাঝি, মে মাসের শেষের দিকে খেয়াল হল কবিতা যাঁদের ছাপানো হয়েছে তাঁদের বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে তা ছাপানোর অনুমতি নেওয়া হয় নি। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথ নিজে নির্বাচক, অতএব গৌরবের এই নির্বাচনে কেউই আইনি-তর্ক তুলবেন না, এরকম কিছু অহেতুক আত্মসন্তুষ্টি থেকে এই ভুলের উদ্ভব। কিন্তু কানাঘুষোয়, অসমর্থিত-সূত্রে যখন 'অন্যরকম' খবর এসে পৌঁছোতে শুরু করল তখন গ্রন্থনবিভাগের দপ্তরে তখন হুঁশ ফিরল সকলের। তড়িঘড়ি ছাপানো হল এক অনুমতি-প্রার্থনার বয়ান। উপরে কবির নাম এবং তলায় নির্বাচিত কবিতা(গুলি)র প্রথম পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করে তা ২৫ মে তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হল কবিদের কাছে। প্রায় সবাই অবশ্য সম্মতি জানিয়েই উত্তর দিলেন। এই পুরো ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে বিস্তারিত লিখলেন কিশোরীমোহন, ৫ জুন :

নন্দবাবুর কাছ থেকে জানলাম যে কারোর কাছ থেকেই কোনো permission নেওয়া হয় নি। আইন অনুসারে এটার প্রয়োজন আছে।... এমন কথাও কানে এলো যে বই বাজারে প্রকাশিত হলেই আমাদের নামে উকীলের চিঠি দেবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তখন তাড়াতাড়ি একটি চিঠি ও পোষ্টকার্ড ছাপিয়ে সবাইএর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। ঠিকানা জোগাড় করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়েছিল।... সব permission ই প্রায় এসে গেছে। ২/১টি চিঠির জবাবে একটু আপত্তিসূচক সুর আছে। দুটি চিঠির copy এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। যাইহোক, এতে কিছু আসবে না। আমি কাল বই বাজারে প্রকাশ করে দেব।'[১৮৭]

কিশোরীমোহনের লেখা 'এতে কিছু আসবে না' বাক্যটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে তখনকার মতো আশ্বস্ত করেছিল। অবশ্য সেই স্বস্তি ছিল নিতান্ত সাময়িক। বইটি 'কাল' অর্থাৎ ৬ জুন 'বাজারে' প্রকাশ করা হয় নি, বিশ্বভারতীর কলকাতাস্থ দোকান থেকে বই বিক্রী শুরু হল ১৩ জুন দুপুর নাগাদ। আর সেইদিনই সন্ধেবেলায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কাছ থেকে এসে পৌঁছল এক কড়া চিঠি। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্দেশে ১৩ জুন তারিখেই লেখা সেই চিঠিটি এইরকম:

...সম্মতিদানের পূর্ব্বে জানিতে চাহি যে, আপনার নির্ব্বাচিত আমার কবিতাত্রয় কি ছাপা হইয়া গিয়াছে, না ছাপিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সত্যই সম্মতিলাভের জন্য এই পত্র, না বাহিরের ভদ্রতা মাত্র?

পরিশেষে দুঃখের সহিত মন্তব্য করিতে হইতেছে যে, যতীন্দ্রনাথ বাগচী নামে এ পত্র আসিয়াছে।... আপনাকে শ্রীচারুবিকাশ ভট্টাচার্য্য বলিয়া অভিহিত করিলে, আপনার কি মনে হয় জানিনা, কিন্তু নাম বা বদনাম সম্বন্ধে এ দরিদ্রের কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে।[১৮৮]

২৫ মে পাঠানো অনুমতিপত্রের জবাব এল ১৩ জুন, ঠিক যেদিন বই ছাড়া হল 'বাজারে', এই ঘটনার মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের কূটিল অভিপ্রায়ই খুঁজে পেয়েছিলেন কিশোরীমোহনেরা। পরের দিন, ১৪ জুন, সমস্ত খবর জানিয়ে তিনি চিঠি লিখলেন কালিম্পং-এ, রবীন্দ্রনাথের কাছে :

কাল (সোমবার) বেলা ১টার সময় আমরা "কাব্য পরিচয়" বিক্রয় আরম্ভ করি। সন্ধ্যার মধ্যে ১৮টি বই বিক্রী হয়ে যায়; ৭টি ৩৲ টাকা মূল্যের ও ১১টি ২৲টাকা মূল্যের। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময়ে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কাছ থেকে একটি চিঠি আসে। চিঠিটির নকল এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমরা ২৫শে মে তারিখে সব কবিদের কাছে যে ছাপা চিঠি সম্মতির জন্য পাঠিয়েছিলাম – এ চিঠি তারই জবাব। ২৫ শে মে থেকে এ পর্যন্ত এ চিঠির কোনো

জবাব আসে নি। কাল বই বিক্রী বিক্রী [য] আরম্ভ হবার ৫।৬ ঘন্টা পরেই এই চিঠি এসেছে। আমি তখনি বই বিক্রী বন্ধ করে দিই...। চারুবাবু... বই বিক্রী বন্ধ করতে নিষেধ করেন।... বই বিক্রী চলছে। যতীন্দ্রবাবুর কাছে আমাদের জবাবটি নিয়ে লোক গেছে।'[১৮৯]

প্রথম দিনই খুব অল্প সময়ে ১৮টি বই বিক্রি হয়ে যাওয়া প্রমাণ করে পাঠকমহলে এই বইকে নিয়ে যথেষ্ট কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছিল। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ '৪ আষাঢ়' (=১৯ জুন) কিশোরীমোহনকে লিখলেন, 'অল্প কিছুদিন হোলো যতীন বাগচি তার মেয়ের বিয়েতে আমার কাছ থেকে কবিতায় আশীর্বাদ চেয়ে নিয়েছে। আজ তার স্পর্দ্ধা দেখে বিস্মিত। ওর কবিতা কবিতা কোনোক্রমেই কাব্য পরিচয়ে যেন না যায়।'[১৯০] এই চিঠি পাওয়ার আগেই অবশ্য যতীন্দ্রনাথের কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছিল, ঐ ১৯ জুনই সে-খবর রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানিয়েছিলেন কিশোরীমোহন, 'বাগচীর কবিতাও সব বাদ গেল। তাঁর স্থানেও নন্দবাবু কবিতা বেছে দিয়েছেন। সেগুলি pressএ গেছে। পরশুর মধ্যে ছাপা হয়ে যাবে। সব হয়ে গেলে আপনাকে একটা বই পাঠিয়ে দোব।'[১৯১] শুধু যতীন্দ্রমোহন নয় অবশ্য, আপত্তি করেছিলেন জীবনময় রায়ও। বাদ দিতে হয়েছে তাঁরও কবিতা। ১৯ জুন যে কিশোরীমোহন লিখেছিলেন, 'পরশুর মধ্যে ছাপা হয়ে যাবে', এত সহজে অবশ্য সবটা মেটেনি। এরপরও, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ভ্রাতুষ্পুত্রের তরফে উকিলের চিঠি এসেছে, একহাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি করে, কেননা তাঁর পিতা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর কবিতা ছাপানো হয়েছে বিনা অনুমতিতে। সেই সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথনাথ বিশী-সহ অনেকেই নিজেদের কবিতা-নির্বাচন দেখে ক্ষুব্ধ। সেসব সুমিতা চক্রবর্তীর বইতে বিস্তারিতভাবেই বলা আছে। শেষ পর্যন্ত এই বই তুলে নিতে হল বাজার থেকে, ঠিক হল ছাপা হবে আদ্যন্ত সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। হতাশ রবীন্দ্রনাথ কাননবিহারীকে ৬ অক্টোবর লিখেছিলেন, 'সংকলনের কাজ আমার নয়, প্রমাণ হয়ে গেছে। যাঁদের লেখা নিয়েছি, তাঁরা বিরক্ত, পাঠকরাও উত্তেজিত। সকলেই দণ্ড উঁচিয়ে আছেন। ঠাণ্ডা রাখা হয়েছে ভবিষ্যতের আশা দিয়ে – সেই ভবিষ্যৎ আমার হাতে নয়।'[১৯২]

দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য জুলাই মাসে গড়ে দেওয়া হল একটি সম্পাদনা-পরিষদ। তার সদস্য পাঁচজন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে রবীন্দ্র-স্বাক্ষরিত যে নিয়োগপত্রটি পৌঁছলো তার বয়ান এইরকম, 'I hereby appoint a Board consisting of Sjs. Sajanikanta Das, Hiron Kumar Sanyal, Nanda Gopal Sengupta and Kishori Mohan Santra with Sj Charuchandra Bhattacharya as Secretary to advise

me in the selection of poems for the revised second edition of "বাংলা কাব্যপরিচয়". I hope they will kindly accept the office.'[১৯৩] অবশ্য, এতজন সদস্য থাকলেও এবারে মূল কাজটা করছিলেন সজনীকান্ত। তাঁর উদ্‌যোগে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতও হয়। সজনীকান্ত তাঁর *আত্মস্মৃতি* বইতে জানিয়েছেন, 'কিশোরীমোহন সাঁতরা তখন সেখানে প্রকাশনী বিভাগের কর্মকর্তা। পাণ্ডুলিপি তাঁহার জিম্মা করিয়া দিয়া হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম। সেটা ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ।'[১৯৪] সজনীকান্তের এই বিবরণ অবশ্য সত্যি নয়। পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছিল আরও কিছু পরে। ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮-এ সজনীকান্তই রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখছেন, 'আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবারে আমাদের নির্ব্বাচন সমিতির দরবারে পেশ করে তাঁদের অনুমতি পেলে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিয়ে আপনাকে দেখিয়ে আসব।'[১৯৫] সম্ভবত এই 'মিটিং'টি এবং এর পরে 'কাব্যপরিচয়'-সংক্রান্ত আরও কিছু মিটিং হয়। কিশোরীমোহন কবিকে ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৯ লিখেছিলেন, 'গত শুক্রবার [=২০ জানুয়ারি] বাংলা কাব্যপরিচয়ের শেষ মিটিং হয়ে গেছে। দুটি scheme তৈরী হয়েছে। এগুলি নিয়ে আগামী ২৭।২৮ জানুয়ারী সজনী ওখানে যাবে।'[১৯৬] সজনীকান্ত পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি নিয়ে কবির কাছে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ আর কোনোদিনই প্রকাশিত হয় নি। সেই 'পাণ্ডুলিপি'টিও রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত হয় নি বলে আজ আর জানার উপায় নেই তার সংশোধিত-রূপটি ঠিক কেমন হতে যাচ্ছিল !

৮। <u>*রবীন্দ্র-রচনাবলী*</u>

পূর্বকথন

রবীন্দ্রতথ্যপঞ্জি সংগ্রহের ভগীরথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। ১৩২৮-২৯ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছ'টি সংখ্যা[১৯৭] জুড়ে তাঁর 'রবীন্দ্র পরিচয়' শীর্ষক গবেষণাধর্মী লেখাটিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যপঞ্জি সংকলনের চেষ্টা। অবশ্য 'প্রথম' হওয়াটাই যে তার একমাত্র গৌরব তা নয়, সেকালের পক্ষে কত অবিশ্বাস্য অনুপুঙ্খে তথ্য-সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র, তা তাঁর লেখাটিতে একবার চোখ বোলালেই টের পাওয়া যায়। যদিও, এই লেখাটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঁচটি মাত্র বই নিয়েই (*কবিকাহিনী*

থেকে *রুদ্রচণ্ড*) তিনি আলোচনা করতে পেরেছিলেন। তখন তিনি বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ১৯২২ থেকে এর পাশাপাশি তাঁর কাঁধে চাপবে আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের (Meteriological Department)-এর অধ্যক্ষতার দায়িত্ব। ফলে কাজটি সম্পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা সম্পর্কে অজানা তথ্যের অনুসন্ধান তিন চালিয়ে গেছেন প্রায় সারাজীবন ধরেই।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসন(১৮৮৬-১৯৪৬) ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর *Rabindranath Tagore Poet and Dramatist* বইয়ের একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ও বাংলা বইয়ের একটি (১৯২৫ পর্যন্ত) তালিকা দেন।[১৯৮] নানাকারণে এই বইটি সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ ছিলেন, বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে বইটির একটি কঠোর সমালোচনা লেখেন তিনি নিজেই 'প্রবাসী' পত্রিকায়।[১৯৯] কিন্তু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও তালিকাটি ছিল মোটামুটি নির্ভরযোগ্য, এবং এটিকেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কাছ থেকেই সহায়তা নিয়ে এই বইয়ের তথ্যপঞ্জি তৈরি করে তুলেছিলেন টমসন, বইটি তিনি উৎসর্গও করেন প্রশান্তচন্দ্রকে।

১৯৩১ সালে বেরলো বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুস্তিকা *রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী* এবং তার পরের বছর ১৯৩২ সালে তাঁরই লেখা বই *রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী*। পুস্তিকাটি মাত্র ১৭ পৃষ্ঠার, তার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও গ্রন্থ নিয়ে যথাসম্ভব তথ্য-সংকলন করলেন প্রভাতকুমার। বইটিতে পূর্ণতর রূপে *কবিকাহিনী* থেকে *সঞ্চয়িতা* পর্যন্ত মোট ২৪৮টি বই সম্পর্কে বিপুল তথ্যরাজি একত্রিত হল। বই দুটি ঐতিহাসিক, কেননা এই দুটিই বাংলাভাষায় লেখা রবীন্দ্রতথ্যপঞ্জি-বিষয়ক প্রথম বই। এর সঙ্গে এ-ও উল্লেখ্য যে, ১৯৩১-এ প্রকাশিত পুস্তিকাটি প্রসঙ্গে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় একটি সমালোচনা লিখেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।[২০০] ১৭ পৃষ্ঠা পুস্তিকার ১১ পৃষ্ঠা দীর্ঘ সেই আলোচনায় প্রশান্তচন্দ্র দেখিয়েছিলেন যে সেখানে কত বিচিত্র স্খলন থেকে গেছে। প্রশান্তচন্দ্রের এই আশ্চর্য সমালোচনাটিই একটি পৃথক রবীন্দ্রতথ্যসম্ভার-বিষয়ক গবেষণা-নিবন্ধের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। প্রসঙ্গত, প্রশান্তচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর এই জীবনব্যাপী রবীন্দ্র-অনুসন্ধিৎসার প্রতি প্রণতি নিবেদন করে প্রভাতকুমারই লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রজীবনী লেখায় যে নানাবিধ অনুপ্রেরণা পাই, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রশান্তচন্দ্রের লিখিত কবির অচলিত কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। আজকাল সে-সব বই সহজপ্রাপ্য হয়েছে – মুদ্রিত হয়েছে রচনাবলীর মধ্যে, কিন্তু

সেকালে এ-সাহিত্য ছিল অজ্ঞাত।... 'রবীন্দ্রজীবনী' আমি যে লিখছি এবং এখনও সংস্করণ করে যাচ্ছি নানাভাবে – তার উৎস প্রেরণা প্রশান্তচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি।'[২০১]

সজনীকান্ত দাস বলতেন 'নষ্টোদ্ধার'। তাঁর *আত্মস্মৃতি* বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের 'নবম তরঙ্গ'-এর শিরোনামই এটি। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় বিভিন্ন লেখকদের দুষ্প্রাপ্য লেখালেখির উদ্ধারের নেশা কীভাবে পেয়ে বসল তাঁকে। আর এই ধারাবাহিকতাতেই বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম পেরিয়ে তাঁর 'তরণী' রবীন্দ্রনাথ-নামক 'বন্দরে আসিয়াই' ঠেকল শেষপর্যন্ত। সময়টা ১৯৩৯-এর অক্টোবর মাস। সজনীকান্ত লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনাগুলির একটি সুষ্ঠু পঞ্জী প্রস্তুত করিবার খেয়াল মাথায় আসিয়াছে। পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী' প্রভৃতি ঘাঁটিয়া নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত অনেক নামহীন ও কল্পিত-নামাঙ্কিত রচনা রবীন্দ্রনাথের বলিয়া চিহ্নিতও করিয়াছি। একবার খোদ কর্তাকে দিয়া যাচাই করিয়া লওয়ার প্রয়োজন।'[২০২] এরপর থেকেই আমরা দেখি এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের একাধিক চিঠির আদানপ্রদান হচ্ছে। সজনীকান্তের একটি চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই সংক্রান্ত প্রথম চিঠিটি লিখলেন ১১ অক্টোবর ১৯৩৯, 'আমার রচনাপঞ্জী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাও কোরো কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাবার আশা রেখো না। আমার পঞ্জিকার তারিখ আন্দাজের দ্বারা চালিত।' একথা লেখার পরেও অবশ্য সজনীকান্ত তাঁকে ক্রমাগত 'উদ্ধার হওয়া' সম্ভাব্য রচনাগুলি সম্বন্ধে অবহিত করে গেছেন, তিনিও সাধ্যমতো সে বিষয়ে উত্তর দিয়ে গেছেন। ২১ নভেম্বর তিনি সজনীকান্তের অনুসন্ধিৎসায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটি শংসাপত্রই লিখে দিলেন, 'শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন।' আর এই শংসাপত্রের সঙ্গে সজনীকান্ত প্রদত্ত ২৮টি রচনার একটি তালিকা থেকে দুটিকে বাদ দিয়ে বাকি ২৬টিকে 'নিঃশংসয়রূপে' নিজের বলে জানিয়েও দিয়েছেন স্বয়ং কবি।[২০৩] এইসমস্ত উদ্‌যোগেরই মুদ্রিত রূপ দেখা গেল 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত ৬টি সংখ্যাজুড়ে সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় রবীন্দ্রজীবনের গোড়ার দিকের অপ্রচলিত ও অগ্রন্থিত রচনা এবং *কবিকাহিনী* থেকে *কথা-চতুষ্টয়* (১৩০১ব) পর্যন্ত গ্রন্থের বিস্তৃত পঞ্জি প্রকাশিত হল সেখানে।

এই সমস্ত অসামান্য গবেষণাকে সামনে রেখেই ১৯৩৯ থেকে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের উদ্‌যোগে শুরু হল সম্পূর্ণাঙ্গ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* প্রকাশ করবার কাজ।

উদ্‌যোগ

নিজের সমস্ত লেখাকে ভবিষ্যতের জন্যে স্থায়ী করে রেখে যাবার প্রস্তাবটা রবীন্দ্রনাথ কখনই পছন্দ করে উঠতে পারেন নি। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে এই নিয়ে কবির 'বিরোধ' বহুকালের। আমরা আগেই দেখিয়েছি, ১৯২৪ সালে *চয়নিকা*-র প্রথম বিশ্বভারতী সংস্করণ প্রকাশ করবার আগে এই নিয়ে প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তাত্ত্বিক মতভেদের সূচনা। সেই *চয়নিকা*-র জন্যে লেখা একটি ভূমিকায় (যে-ভূমিকাটি শেষপর্যন্ত ছাপা হয় নি বইতে) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সাহিত্যে যাহা কিছু মরিয়াছে তাহার ভূতটাকে সৎকারের দ্বারা বিদায় না করিলে যাহা কিছু বাঁচিয়া আছে তাহার প্রতি অসৎকার করা হয়। অন্ধ মুদ্রাযন্ত্রের কালী সাহিত্যে সজীব ও নির্জ্জীবকে একই দাগে দাগাইয়া দেয় বলিয়াই এত উৎপাত বাড়ে এত জঞ্জাল জমিয়া ওঠে।'[২০৪] প্রশান্তচন্দ্র অবশ্য এই প্রসঙ্গে কবির সঙ্গে তর্ক করাটা কোনোকালেই থামাননি। যেমন, ১৯৩১ সালের ১৬ নভেম্বর, রবীন্দ্রনাথের পুরনো অগ্রন্থিত লেখা পড়তে পড়তে তিনি কবিকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলেছিলেন, সেখানে এই প্রসঙ্গেই লিখলেন :

> এবার সারা ছুটি ব'সে ব'সে আপনার পুরানো লেখা পড়ছি। এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনি তীব্র মন্তব্য করেছেন।... কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের দিক থেকেও কিছু বলবার আছে।
>
> ...আপনাকে সম্পূর্ণ জান্‌তে হলে পুরানো লেখা বাদ দেওয়া চলে না।...আজ যদি কালিদাসের কোন বাল্য-রচনা বেরিয়ে পড়ে তো আমার বিশ্বাস, যে, সে লেখা যতই কাঁচা হউক্ না কেন, তা পড়বার জন্য আপনারও আগ্রহ হবে।[২০৫]

এই সমস্ত অকাট্য যুক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কখনই পেরে ওঠেন নি, তবু তর্কটাও থামে নি কখনও !

প্রশান্তচন্দ্রেরই আগ্রহে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার একেবারে শুরুর দিকে, ১৯২২ নাগাদ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের একটি উদ্‌যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯২২-এর ২ জুলাই প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি এ বিষয়ে চকিত সাক্ষ্য দেয়, সেই চিঠিতে কবি জানতে চাইছেন, 'সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী ছাপবার কি রকম চল্‌চে।'[২০৬] উল্লেখ্য, তখনও 'ইন্ডিয়ান প্রেস' থেকে 'বিশ্বভারতী'র কাছে গ্রন্থপ্রকাশের ভার হস্তান্তরিত হয় নি, 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়'ও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবে এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।

১৯৩৯-এ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* প্রকাশের উদ্‌যোগ নিলেন গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের সচিব চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশ্বযুদ্ধের কারণে তখন কাগজ ও অন্যান্য সরঞ্জামের দাম অত্যধিক বেড়ে যায়। স্বভাবত, গ্রন্থালয়কে এই সময়ে ব্যয়সংকোচের দিকে নজর দিতে হচ্ছিল। তার মধ্যে রচনাবলী প্রকাশের মতো বৃহৎ আয়োজন বেশ ঝুঁকিরই ছিল। তবু এই দায়িত্ব সাহসের সঙ্গে তুলে নেন চারুচন্দ্র। পুলিনবিহারী সেন এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথায় :

> আর্থিক দিক দিয়ে বিশ্বভারতীর পক্ষে ১৩৩৯ সালে সময়ও অনুকূল ছিল না।... ফলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গ্রন্থাবলী অন্য প্রকাশককে দিয়ে প্রকাশ করবার প্রস্তাব অন্তত দু বার হয়েছিল কিন্তু তা কার্যে পরিণত হয় নি। এই রকমই একটি প্রস্তাব যখন নিষ্ফল হয় সেই সময় চারুচন্দ্র, বিশ্বভারতীর অর্থসম্বলের ক্ষীণতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ থেকেও সাহসে ভর করে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশে ব্রতী হন।... রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এ প্রস্তাবে প্রীত হয়েছিলেন কিন্তু এর আর্থিক ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন ও চারুবাবুকে বলেছিলেন 'এই বার গ্রন্থনবিভাগ ডুববে'...।[২০৭]

অন্য প্রকাশককে দিয়ে রচনাবলী প্রকাশ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, এই তথ্যটি কৌতুহলজনক, কিন্তু এর সম্পর্কে অনেক সন্ধান করেও বিস্তারিত কিছু আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি স্মৃতিকথায় এর অতিরিক্ত একটি তথ্য পাওয়া যায়, সেটাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখছেন, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করবার জন্য চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কোনও জায়গা থেকে কয়েক হাজার টাকার ঋণ সংগ্রহ করেছিলেন।... শোনা যায় এতগুলো টাকার ঋণ কি করে শোধ করা যাবে এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার শেষ ছিল না।'[২০৮] বিশ্বভারতীর Annual Report বা Audited Account দেখে আমরা অবশ্য এরকম কোনো তথ্য পাই নি যার থেকে বোঝা যায় বাইরের কোনো উৎস থেকে 'রচনাবলী'র জন্যে টাকা ধার করা হচ্ছে। তবে এই টাকার উৎস বিষয়ে অন্য একটি অনুমান করা সম্ভব।

'শান্তিনিকেতন প্রেস' কোনোদিনই 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়'-এর অধীনস্থ সংস্থা ছিল না। প্রেসের জন্যে আলাদা বাজেট হত, তার লাভ-লোকসানের হিসেব 'অডিট রিপোর্ট'-এ আলাদা করেই উল্লিখিত হত। এবং গ্রন্থালয়ের মতো তার আর্থিক-স্বাস্থ্য যে খুব ভালো ছিল, তা-ও বলা যাবে না। (এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে 'অন্তিম প্রসঙ্গকথা'য়)। সেইজন্য বছরের শুরুতে শান্তিনিকেতন প্রেস-কে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন 'ফান্ড' থেকে ঋণ

(Loan) নিতে হত। তবে সেই ঋণের পরিমাণ হাজার-চারেক টাকার বেশি হত না কখনই। আমরা ১৯৩৯, ১৯৪০ এবং ১৯৪১-এর 'Annual Report'-এ দেখেছি এই বিশ্বভারতী 'জেনারেল ফান্ড' থেকে 'শান্তিনিকেতন প্রেস' অনেকটা বেশি পরিমাণে ঋণ নিচ্ছে। যেমন ১৯৩৯-এ 'শান্তিনিকেতন প্রেস' নিল ১৪,৫২৪ টাকা ঋণ, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে নেওয়া হল ১৫,০৪৯ টাকা করে ঋণ। কেন এতটা বেশি ঋণ নিতে হচ্ছে? তার স্পষ্ট কারণ অবশ্য রিপোর্টে লেখা নেই। আমাদের অনুমান, এই টাকা নেওয়া হচ্ছে মুলত 'রচনাবলী' ছাপার খরচ সংগ্রহের জন্যে। বস্তুত, এই খরচটা (অন্তত আংশিকভাবে) 'শান্তিনিকেতন প্রেস'-এর নিজস্ব খরচ ছিল বলেই হয়তো রচনাবলীর খণ্ডগুলিতে 'প্রকাশনা' হিসেবে 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' কথাটির জায়গায় লেখা হবে শুধু 'বিশ্বভারতী'। (দ্রষ্টব্য : চিত্র-১০)

তবে এটা ঠিক, পুলিনবিহারী আর প্রতুলচন্দ্র দুজনের স্মৃতিচারণ থেকে এটুকু পরিষ্কার হয় যে, যথেষ্ট আর্থিক দুশ্চিন্তাকে সঙ্গী করেই প্রস্তুতি শুরু হল *রবীন্দ্র-রচনাবলী* প্রকাশের।

*রবীন্দ্র-রচনাবলী*র পরিকল্পনা বিষয়ে নানা তথ্যে পরিপূর্ণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চিঠিটি পাওয়া যায় সেটি কবিকে লেখা কিশোরীমোহনের একটি পত্র।[২০৯] (পূর্ণাঙ্গ পাঠের জন্যে দ্রষ্টব্য এই অধ্যায়ের শেষে 'সংযোজন-২')। চিঠিটি লেখার তারিখ ২২ জুন ১৯৩৯। অনেকগুলি বিষয় নিয়ে চিঠিটায় কথা বলেছেন কিশোরীমোহন, তার মধ্যে প্রথমটা হল, প্রথম ৫-৬টি খণ্ডে কী কী যাবে তার তালিকা বানিয়ে ফেলেছেন তিনি নিজেই :

> গুরুদেব, গ্রন্থাবলী প্রকাশের যে কথা হয়েছে তারমধ্যে প্রথম ৫।৬ খণ্ডে যে সব বই যেতে পারে তাদের প্রকাশের তারিখ অনুসারে (Chronologically) একটি তালিকা আমি করেছি। এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। প্রথম খণ্ডে যা যাবে তা অনিলবাবু নিয়ে গিয়েছেন।

এই কথাগুলি থেকে বোঝা যায়, একেবারে শুরুতে মূলত কিশোরীমোহনের (এবং নেপথ্যে অবশ্যই আছেন চারুচন্দ্র) উপরেই ছিল যাবতীয় সজ্জা ও সম্পাদনার ভার। সম্পাদনা-কাজে সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন প্রমুখের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে আরও কিছুকাল পরে। সেটা আমরা যথাস্থানে দেখব। দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে লিখলেন কিশোরীমোহন, তা হল, রচনাবলীতে গ্রন্থগুলি প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো থাকবে বটে, কিন্তু তার মধ্যে গানগুলি কীভাবে যাবে। কিশোরীমোহন জানতে চাইলেন :

আপনাকে আমি সেদিন লিখেছিলাম যে, প্রস্তাবিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আপনার লেখার চারটি বিভাগ হবে:– প্রথম – কবিতা, দ্বিতীয় – নাটক ও প্রহসন, তৃতীয় – উপন্যাস ও ছোটো গল্প এবং চতুর্থ – গদ্য-প্রবন্ধ প্রভৃতি। কিন্তু আপনার গানগুলির জন্য কোনো বিভাগ হবে কি-না আপনি একটু ভেবে দেখবেন। Indian Press যখন আপনার কাব্যগ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছিল তখন তারা আপনার সমস্ত গানগুলি একসঙ্গে একটি খণ্ডে (নবম খণ্ড) দিয়েছিল। আমাদের এই গ্রন্থাবলীর সংস্করণে প্রত্যেক খণ্ডেই আপনার সব বিষয়ের লেখা কিছু কিছু দেওয়া হবে। সেজন্য হয়তো প্রত্যেক খণ্ডেই কিছু গান দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু তার অসুবিধা হচ্ছে এই, যে গীতবিতানের যে-বর্তমান সংস্করণ হচ্ছে তাতে বিষয়-অনুযায়ী আপনি গান সাজিয়ে দিয়েছেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থাবলীতে সব বিভাগের লেখাই, যেমন গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি প্রকাশের তারিখ অনুসারে সাজাচ্ছি। গান যদি এই গ্রন্থাবলীর পদ্ধতি অনুসারে করতে হয় তাহলে প্রকাশের তারিখ অনুসারে (Chronologically) সাজাতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বের সংস্করণ গীতবিতানে যে রকম ছিল সে রকম করতে হয়। অথচ আমি জানি যে আপনি গানগুলি এখন বিষয়বস্তু অনুসারেই রাখতে চান। প্রথম খণ্ডের যে খসড়া দিয়েছি তাতে গান দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে এখুনি স্থির ক'রে ফেলা দরকার অর্থাৎ (১) গান প্রত্যেক খণ্ডে দেওয়া হবে কি-না (২) Indian Press এর সংস্করণের মতো সব একসঙ্গে দেওয়া হবে কি-না (৩) কী পদ্ধতি অনুসারে সাজানো হবে – বিষয়বস্তু অনুসারে – না প্রকাশের তারিখ অনুসারে।

এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা হয়েছিল তা আজ আমরা জানি। তবে এইখানে বলে রাখা ভালো যে, দীর্ঘ এই চিঠি আর তার মধ্যে উত্থাপিত নানা সমস্যার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রাথমিকভাবে একধরণের নিস্পৃহতাই দেখিয়েছিলেন। ২২ জুনের এই চিঠির উত্তরে ২৪ জুন কিশোরীমোহনকে কবি লিখেছিলেন, 'আমার সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর যে কাঠামো গড়ে তুলেছ তার সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। এ কাজটা তোমাদেরই, এর দায়িত্ব আমার নয়। বিপুল ও বিচিত্র এর ব্যবস্থা — এ সম্বন্ধে মন দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য...।'[২১০] নিজের সমস্ত রচনা ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রকাশের সম্বন্ধে তাঁর মনে যে দ্বিধা ছিল, তার থেকেই এই নিস্পৃহতার জন্ম নিয়ে থাকবে। তবে আমরা দেখব যে, অচিরেই তাঁর এই মনোভাবের অন্তত আংশিক বদল হবে, এই প্রকল্পের সঙ্গে তিনি নিজেও অনেকটাই জুড়ে যাবেন ভবিষ্যতে।

কিশোরীমোহনের চিঠিটিতে ছিল তৃতীয় আর-একটি প্রসঙ্গ। যে কোনো লেখকের বই, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের বই, নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় এই জরুরি প্রশ্নটারই সবার আগে মীমাংসা করতে হয় যে, ঠিক কোন পাঠ

ছাপা হবে। বিভিন্ন সময় পাঠের বিস্তর বদল ঘটাতেন কবি, তার মধ্যে থেকে কবির যথার্থ অভিপ্রায়টি বুঝে নেওয়া সহজ নয়। এই প্রসঙ্গে সুধীরচন্দ্র করের বিবরণটি খুবই যথার্থ মনে হয়, 'তাঁর কাছে প্রুফ গেলে কী যে কখন বদল হবে, তার ঠিক ছিল না। শান্তিনিকেতন প্রেসের লোকদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নূতন বই হলে কথাই ছিল না, কেবলি চলত অদল-বদল। বেশি পুরানো বইতে পরিবর্তন ঘটত কম।'[২১১] বস্তুত, এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিজে থেকে কোন পরিবর্তনের কথা বলে না দিলেও যে কোনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণের আগে কিশোরীমোহন বা গ্রন্থালয়ের তরফ থেকে কেউ-না-কেউ কবির কাছে নিশ্চিত হয়ে নিতেন যে সেই মুদ্রণে কিছু বদলের কথা কবি ভাবছেন কিনা। উদাহরণ হিসেবে আমরা *শ্যামলী* বইটি প্রথম পুনর্মুদ্রণের আগে ১১ জুলাই ১৯৩৮-এ লেখা একটি চিঠির একটি লাইন উদ্ধৃত করতে পারি, কিশোরীমোহন জানতে চাইছেন, '"শ্যামলী"র দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হোলো। এতে কি কিছু পরিবর্তনের আছে?'[২১২] না, বদল কিছু সেবার করেন নি অবশ্য কবি, *শ্যামলীর* এই পুনর্মুদ্রণটি বেরোয় শ্রাবণ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে। যাইহোক, *গীতবিতান* প্রসঙ্গে লিখিত আমাদের আলোচ্য চিঠিটিতে তাই কিশোরীমোহনের তৃতীয় জরুরি কথাটি ছিল এই :

> এ সম্বন্ধে আমি আরো যা ভেবেছি তা আপনাকে লিখছি। প্রথম – বর্তমান সময়ে আপনার যে বইগুলি প্রচলিত অবস্থায় আছে এবং যে ভাবে শেষ সংস্করণে আছে সেইভাবে ছাপা হবে। খুব বেশি কিছু ভুল চুক থাকলে সেটা সংশোধিত হবে। ছাপাও যাতে নির্ভুল হয় তার চেষ্টা করা হবে; কিন্তু নানা সংস্করণের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করবার কোনো চেষ্টা হবে না অর্থাৎ আমরা চলতি বইগুলি ছেপে চলবো মাত্র।

অর্থাৎ, পাঠান্তর ইত্যাদি নিয়ে বিপুল গবেষণাকাজ এড়িয়ে, শেষ (latest) সংস্করণ অনুযায়ী ছেপে দেওয়ার জন্য অনুমতি চাইছেন কিশোরীমোহন। এর সঙ্গে আরও কিছু কথা জরুরি লিখবেন তিনি। কিন্তু আগেই বলা হল, গুরুত্বপূর্ণ এইসব সম্পাদনাগত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব সবটাই এই সময়ে গ্রন্থনবিভাগের উপরেই ছেড়ে দিলেন কবি। প্রথম খণ্ডের কাজ চলেছিল জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। এই সময়ে *রবীন্দ্র-রচনাবলী* নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রতিক্রিয়া খুবই দুর্লভ। তিনি *গীতবিতান*-এর দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে ভাবিত, *আকাশপ্রদীপ* নিয়ে উদ্বিগ্ন, 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' বিষয়ে তৎপর, কিন্তু রচনাবলী নিয়ে তাঁকে কী চিঠিতে, কী আলাপচারিতায়, কোনো কথাই বলতে দেখা যায় না ! কিশোরীমোহন দু-একটা প্রশ্ন কখনও কখনও জানতে চান, যেমন, ২৩

আগস্টের এক চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন, 'রবীন্দ্ররচনাবলীর Block এর প্রুফ পাঠাচ্ছি। এর মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার যে ছবিগুলি আছে তাতে কে কে আছেন তা যদি একটু জানান তবে ভাল হয়। ছাপাতে হবে। গুরুদেবের ছবির ঠিক বয়সটিও লিখে জানাবেন।'[২১৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো 'উত্তর' এ-কালে খুবই দুর্লভ। বইটি বেরোলো সেপ্টেম্বরের শেষে। ২৯ সেপ্টেম্বর সেটি হাতে পেয়ে মংপু থেকে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে কবি লিখলেন, 'রচনাবলীর প্রথম খণ্ড পাওয়া গেল। রাজপুত্র যখন তেপান্তরের ন্যাড়া মাঠে চলেছেন রূপকথার দেশে, দূরবীন কষে দেখা গেল তাঁর তখনকার নির্বোধ চেহারাটা।'[২১৪] প্রতিক্রিয়াটি গ্রন্থনবিভাগের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের যতই নিরুৎসাহ থাক, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খুবই বড়ো করে এর প্রচার করতে পেরেছিলেন গ্রন্থনবিভাগের কর্তারা। যেমন, একদিকে বিশ্বভারতী ঘরের কাগজ 'Visva-bharati News'-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, প্রথম খণ্ডটি বেরোবার আগেই, এর বিষয়, আলংকরণ ও মূল্যের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল আলাদা করে 'Rabindra-rachanabali' শিরোনাম দিয়ে।[২১৫] প্রসঙ্গত জানানো যাক, এরকম বইয়ের নামটিকে 'শিরোনাম' হিসেবে ব্যবহার করে এত বিস্তারিত *আলোচনা* আগে-পরে আর কোনো বইয়ের ক্ষেত্রেই হয় নি। অন্যদিকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র 'গ্রন্থ পরিচিতি' বিভাগে ৮ অক্টোবর (অর্থাৎ প্রকাশের দিন দশেকের মধ্যে) প্রকাশিত হতে পেরেছিল প্রথম খণ্ডের অনুরূপ বিস্তারিত 'রিভিউ'।[২১৬] পাঠকও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিল এই প্রথম (ও পরবর্তী সবগুলি) খণ্ডকে। বিশ্বভারতীর ১৯৩৯-এর 'Annual Report'-এ লেখা হয়েছিল, 'It is a pleasure to record that that the first volume which come out just before the puja holidays has found a very good reception in the press. The edition is nearly sold out and a second impression had to be ordered.'[২১৭] খেয়াল রাখতে হবে এই 'Annual Report' প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৪০-এর মার্চ মাসে। সেপ্টেম্বরের একেবারে শেষে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর মার্চের মধ্যে তার নতুন মুদ্রণের আদেশ দিতে হচ্ছে, রচনাবলীর পাঠকপ্রিয়তার এটি নিশ্চিত প্রমাণ।

রচনাবলী-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত অনুৎসাহের অনেকখানি বদল হল দ্বিতীয় খণ্ডের সময়, বিশেষত সজনীকান্ত দাস এই সম্পাদনাকার্যে যুক্ত হবার পর। সজনীকান্ত তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, বিভিন্ন বিস্মৃত লেখা পুরনো পত্রিকার পাতা থেকে উদ্ধার করার ফলস্বরূপ 'রবীন্দ্রনাথ এমনই খুশী হইয়া উঠিলেন যে

আমি অচিরাৎ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র সম্পাদক-মণ্ডলীভুক্ত হইলাম; অক্টোবর হইতেই তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে লাগিল'।[২১৮] আমরা দেখেছি, ঠিক অক্টোবরে নয়, সেপ্টেম্বরের শেষেই প্রথম খণ্ডটি বেরোয়। সজনীকান্তের অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ হবার পর। আর এর সঙ্গে পুলিনবিহারী সেন। আমরা 'মধ্যবর্তী প্রসঙ্গকথা ৪'-এ বলেছিলাম অক্টোবর ১৯৩৯ থেকে রবীন্দ্রনাথেরই বিশেষ আগ্রহে পুলিনবিহারীকে গ্রন্থালয়ের 'সাম্মানিক অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটরি' পদে নিয়োগ করা হয়। পদটি 'সাম্মানিক' ছিল বলেই 'প্রবাসী'র চাকরিটিও করছিলেন পুলিনবিহারী, 'প্রবাসী'র অফিস থেকেই *রবীন্দ্র-রচনাবলী* সম্পাদনার কাজ দেখতেন তিনি। অবশ্য, একইসঙ্গে দুর্ভাগ্যের কথা হল, কিশোরীমোহন-রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশ সংক্রান্ত যে বিপুল তথ্য আমরা পাচ্ছিলাম, এই সময়কালে সেই তথ্য-উৎসটি থেকে আমরা বঞ্চিত হব। কিশোরীমোহন প্রসঙ্গে এখানে আর-দু-একটি কথা জানানো হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এপ্রিল ১৯৩৭ থেকে 'শান্তিনিকেতন প্রেস'-এর দেখভাল করার জন্যে একটি সাব-কমিটি করে দেওয়া হয় যার 'সেক্রেটরি' হন কৃষ্ণ কৃপালনী। কিশোরীমোহনের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তাঁকে পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয় ও এই সাব-কমিটির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই ধরণের সাব-কমিটিগুলি অনেকটা আলংকারিক দায়িত্ব পালন করে থাকে, এক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। রোজকার কাজ থেকে কার্যত অব্যাহতি দেওয়া হয় কিশোরীমোহনকে, কিন্তু তাঁর এতদিনের কর্মজীবনকে এইভাবে সম্মানিতও করেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ১৯৩৯-এর ২৮ নভেম্বর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা কিশোরীমোহনের একটা চিঠি থেকে এই কথাগুলি অনেকটা জানা যায়, 'আপনি শুনেছেন বোধহয় যে আমি ১লা অক্টোবর থেকে শান্তিনিকেততে[য] কৃপালনির জায়গায় ছ'মাসের জন্য বদ্‌লী হয়ে গেছি। বর্তমান সময়ে Publishing Department বা রবীন্দ্ররচনাবলীর সাথে আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ড আশাকরি আপনি দেখেছেন। একে সর্ব্বাঙ্গ[য]-সুন্দর করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম — শুধু bindingটা আমার হাতে ছিল না।'[২১৯] এই চিঠিতে কি কিশোরীমোহনের প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুর শোনা যায় না? আমাদের মনে হয়, অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি হয়তো তাঁর নিজের দায়িত্বটি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশ্য এখানে উল্লেখ থাক যে, কিশোরীমোহনের জীবৎকাল পর্যন্ত (মৃত্যু ২০ অক্টোবর ১৯৪০) রচনাবলীর 'প্রকাশক' হিসেবে তাঁরই নাম মুদ্রিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথম

চারটি খণ্ড এবং 'অচলিত সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডটি(প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৭ব) পর্যন্ত তিনিই ছিলেন 'প্রকাশক'। তাঁর মৃত্যুর পর অগ্রহায়ণ ১৩৪৭-এ প্রকাশিত *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ৫ম খণ্ড থেকে 'প্রকাশক' হলেন পুলিনবিহারী সেন।

যাইহোক, অক্টোবর থেকে মূলত সজনীকান্ত এবং পুলিনবিহারীর তদারকিতে শুরু হল দ্বিতীয় ও তৎপরবর্ত্তী খণ্ডগুলির কাজ। পুলিনবিহারী সেন কার্যত তখন থেকেই হয়ে উঠেছিলেন কিশোরীমোহনের বিকল্প। উপরন্তু তিনি রবীন্দ্র-তথ্যানুসন্ধানী। শুধু মুদ্রণ বিষয়ক জিজ্ঞাস্য নয়, পুলিনবিহারীর চিঠি ভরে থাকছে রবীন্দ্রনাথের লেখালেখির পাঠান্তর বিষয়ক নানা প্রশ্নেই। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর যে প্রথম চিঠিটি পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায় পুলিনবিহারীর আশ্চর্য দক্ষতার মহিমা। ৭ অক্টোবর ১৯৩৯-এ লেখা সেই চিঠিতে তিনি কবির কাছে জানতে চাইছেন :

> ভক্তিপূর্ণ প্রণামান্তে নিবেদন, রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোনো কোনো কাজ আমাকে দেওয়া হয়েছে সেই প্রসঙ্গে এই চিঠি লিখছি।
>
> দ্বিতীয় খণ্ডে "কড়ি ও কোমল" ছাপা হবে। তার "চুম্বন" কবিতার প্রথম লাইন, বর্ত্তমানে প্রচলিত সংস্করণে এইরূপ ছাপা আছে
>
> "অধরের <u>কোণে</u> যেন অধরের ভাষা"। "সঞ্চয়িতা"তেও এই লাইনটি এইরূপই আছে। কিন্তু পূর্ব্বতন সংস্করণে (কড়ি ও কোমল" ২য় সংস্করণ ও সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলী দেখেছি; প্রথম সংস্করণ দেখা হয় নি) ঐ লাইনটি এইরূপ আছে
>
> "অধরের <u>কাণে</u> যেন অধরের ভাষা।" 'ভাষা'র সঙ্গে 'কানে' অব্যবহার্য্য বলে মনে হচ্ছে না। তাই এ সম্বন্ধে আপনার নির্দ্দেশ প্রার্থনা করছি। আপনার কাছে যদি বই না থাকে, এই জন্য কবিতাটি অপর পৃষ্ঠায় নকল করে দিচ্ছি।[২২০]

প্রথম এই চিঠিটি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পুলিনবিহারী নিছক প্রকাশনার দায়িত্বটুকু সামলানোর কথা ভাবছেন না, তিনি স্বেচ্ছায় তুলে নিচ্ছেন তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ 'গ্রন্থসম্পাদনা'র দায় ! ২২ জুন কবিকে যে দীর্ঘ চিঠিটি লিখেছিলেন কিশোরীমোহন তাতে তাঁর প্রস্তাব ছিল 'নানা সংস্করণের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করবার কোনো চেষ্টা হবে না অর্থাৎ আমরা চলতি বইগুলি ছেপে চলবো মাত্র', এটা ছিল একজন বাস্তববুদ্ধিধারী সচেতন কর্মনেতার প্রস্তাব। পুলিনবিহারী এসে এই প্রস্তাবটি নিজের দায়িত্বেই সরিয়ে দিলেন। একটি কবিতার একটি শব্দের যাথার্থ্য বিচারের জন্য তিনি দেখতে চাইছেন কবিতাটির প্রায় সব মুদ্রিত রূপ,

অভাবনীয় এই অধ্যবসায় ! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৭[৯] অক্টোবরে কবি এর জবাব দেন, 'রচনাকালে আমি লিখেছিলুম "অধরের কানে" এতকাল ধরে সেটা বিকৃত হয়ে "অধরের কোণে" হয়ে চলে আসচে শুনে বিস্মিত হয়েছি। কোনো বুদ্ধিমান নিশ্চয় অধরের কান থাকা অসম্ভব মনে করে সংশোধন করে দিয়েছে।'[২২১]

পুলিনবিহারীর লেখা আর-একটি চিঠির উল্লেখও এখানে অনিবার্য। ১৮ অগ্রহায়ণ [১৩৪৬ব, = ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯] লেখা সেই চিঠি[২২২] থেকে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথাটি অধিক স্পষ্ট হয়ে আসে। অনেকগুলি সম্পাদনাগত জরুরি প্রশ্ন করে পাঠাচ্ছেন পুলিনবিহারী, কিন্তু তার আগে ভূমিকাস্বরূপ তিনি লিখছেন, 'রবীন্দ্ররচনাবলীর অবশ্যজিজ্ঞাস্য প্রশ্ন টুকরো টুকরো চিঠির আকারে আপনাকে পাঠানো হবে না, একসঙ্গে প্রশ্নাবলীর [আকারে] আপনার কাছে গিয়ে সমাধান জেনে নেওয়া হবে এই রকম কথা ছিল। কিন্তু দু-একটি বিশেষ জরুরি প্রশ্ন এসে পড়েছে বলে আবার চিঠির আকারে লিখছি।' এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের পক্ষে যথাযথ ছিল। তবে প্রথম খণ্ডের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন কার্যত সবটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন গ্রন্থনবিভাগের উপর, পুলিনবিহারীর চিরজিজ্ঞাসু সম্পাদকসত্তাটির ঠেলায় পড়ে আর যে তা সম্ভব হচ্ছে না সেটা বেশ বোঝা যায়। এই দ্বিতীয় খণ্ড থেকে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি ভূমিকা বাড়ল এই দিকেও যে, রচনাবলীর অন্তর্গত অন্তত কিছু বইয়ের জন্য একটি করে পৃথক ভূমিকা লিখে দিতে তাঁকে রাজি করালেন গ্রন্থনবিভাগের কর্তারা। নিশ্চয়ই চারুচন্দ্ররই মুখ্য ভূমিকা ছিল এই অসাধ্যসাধনে। পুলিনবিহারী এই চিঠিতে সেকথাও মনে করিয়ে দিয়ে লিখছেন :

> যে-যে বই ছাপা হচ্ছে তার একটি করে নূতন ভূমিকা লিখে দিতে আপনি স্বীকৃত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে এইসব বই যাচ্ছে,
>
> কাব্য — ভানুসিংহের পদাবলী
> কড়ি ও কোমল
> মানসী
> নাট্য — বিসর্জন
> উপন্যাস — রাজর্ষি
> প্রবন্ধ — চিঠিপত্র (বই)
> পঞ্চভূত
>
> বোধহয় শুধু কবিতার বইতেই আপনি ভূমিকা দিতে চেয়েছিলেন, ঠিক জানি না বলে পুরো তালিকাই দিলাম। বই ছাপা হয়ে গিয়ে থাকলেও ভূমিকা ছাপবার কোনো অসুবিধা হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই খণ্ডের প্রথম সংস্করণে শুধুমাত্র 'কড়ি ও কোমল'-এর জন্যেই একটি নূতন ভূমিকা (রচনাবলীতে 'কবির মন্তব্য' নামে ছাপা হয়) লিখে দিয়েছিলেন কবি। এই দ্বিতীয় খণ্ডটি ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির গোড়ায় প্রকাশিত হয়ে থাকবে, এবং এপ্রিল মাসের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে পুনর্মুদ্রণের উদ্‌যোগ শুরু হয় অচিরেই। প্রায় সেই একই সময়ে ছাপা হচ্ছিল তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণটি। দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত *মানসী* আর তৃতীয় খণ্ডের *সোনার তরী*-র জন্যে রবীন্দ্রনাথ একটি একত্রিত-ভূমিকা লিখে পাঠান। স্বভাবতই, দুটি আলাদা আলাদা খন্ডে তা ছাপা সম্ভব ছিল না। পুলিনবিহারীকে এবার কবির কাছে তদ্বির শুরু করতে হয় দুটি বইয়ের দুটি পৃথক ভূমিকা পাওয়ার জন্যে। এই প্রসঙ্গে পুলিনবিহারী কবির ব্যক্তিগত-সহকারী সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর (১৮৯৬-১৯৬৯) শরণাপন্ন হন। ৩ মে (১৯৪০) সুধাকান্তকে তিনি লেখেন :

> সুধাকান্তদা,
>
> মানসী ও সোনার তরীর জন্য গুরুদেব যে ভূমিকা রচনাবলীতে ছাপতে দিয়েছিলেন, সেটি পাঠাই। এটিতে একসঙ্গে দুটি বইয়ের ভূমিকা ছিল, কিন্তু আমাদের তো সব বই আলাদ আলাদা ছাপতে হচ্ছে। আলাদা খণ্ডেও যাচ্ছে। কাজেই দুটি বইয়ের আলাদা আলাদা ভূমিকা দরকার হয়, তাই গুরুদেব সোনার তরীর ভূমিকা আলাদা করে লিখে দিয়েছেন আর সেইটিই ছাপা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ হচ্ছে, তার জন্য মানসীর একটি ভূমিকা দরকার — প্রথম সংস্করণে যায় নি। মানসী ও সোনার তরীর যুক্ত ভূমিকা যেটি লিখেছিলেন সেটি পাঠাচ্ছি, এর মধ্যে শেষের দিকে যে অংশে সোনার তরীর উল্লেখ ও আলোচনা আছে সেইটুকু বাদ দিয়ে মানসীতে ছাপাব কি না? সেই অংশে লাল পেনসিলে দাগ দিয়ে দিলাম। গুরুদেবের মতামত সহ কপিটি আমাকে ফেরত দেবেন।...
>
> পুলিন[২২৩]

এই আর্জিতে কাজ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ *মানসী জন্যে* আলাদা ভূমিকাই লিখে দেন। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে সেটি যুক্ত হয়।

ভূমিকা লিখে দেওয়ার প্রস্তাবটি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথকে লেখা পুলিনবিহারীর ১৮ অগ্রহায়ণ-এর চিঠিতে ছিল আরও বেশ কিছু সমস্যার কথা, বিশেষত *কড়ি ও কোমল*, *সোনার তরী*, *শিশু*, *কথা ও কাহিনী* প্রভৃতি বইতে

রবীন্দ্রনাথ যে বিভিন্ন সংস্করণে কবিতার অদলবদল করেছেন, সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা, সঙ্গে তার সম্ভাব্য সমাধান। রবীন্দ্রনাথ চিঠিটিরই মার্জিনে মন্তব্য লিখে পুলিনবিহারী-নির্দেশিত প্রতিটি সমাধান মেনে নিয়েছেন!

সম্পাদনা-কাজে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পুলিনবিহারী কীভাবে নিতেন, রবীন্দ্রনাথেরই-বা সেখানে কতখানি ভূমিকা থাকত তার একটা চমৎকার উদাহরণ লক্ষ করা সম্ভব রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনার প্রসঙ্গে। সেই খণ্ডে *আত্মশক্তি* (১৩১২ব) বইটির অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করলেন পুলিনবিহারী, কিন্তু সেখানেই দেখা দিল কিছু গুরুতর প্রশ্ন। মজুমদার লাইব্রেরি থেকে ১৯০৫ সালে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল *আত্মশক্তি*। কিন্তু তারপরে বইটি আর কখনই কোথাও মুদ্রিত হয় নি। এই প্রথম সংস্করণে ছিল ১০টি প্রবন্ধ। তার মধ্যে ৫টি প্রবন্ধ পরবর্তীকালের কোনো-না-কোনো গ্রন্থে ঢুকিয়ে দেন কবি। যথা, সমূহ (১৯০৮) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এর 'স্বদেশী সমাজ', 'স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট', এবং 'সফলতার সদুপায়' নামের প্রবন্ধ তিনটি। *শিক্ষা* (১৯০৮) গ্রন্থে চলে যায় 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'। 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধটিকে *স্বদেশ* (১৯০৮) গ্রন্থে দিয়ে দেওয়া হয়। এবং সবক্ষেত্রেই, প্রবন্ধগুলিকে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সংক্ষেপিত করে দেন। ফলে পুলিবিহারীর সামনে এখন দুটি সিদ্ধান্তগত সমস্যা : ১) *আত্মশক্তি* নামের বইটি আদৌ রচনাবলীর মধ্যে জায়গা পাবে কি না ! ২) জায়গা পেলে তার প্রবন্ধগুলিকে কোন রূপে ছাপা হবে, পূর্ণাঙ্গ, না সংক্ষেপিত ? ফলে পুলিনবিহারী প্রথমে সরাসরি রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারস্থ হলেন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র (১৯মার্চ, ১৯৪০) তাঁকেই চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, '"আত্মশক্তি"র (১৩২৩ সাল) প্রবন্ধগুলি এখন আর এই নামে ছাপা হয় না, বিভিন্ন বইয়ে ছড়িয়ে আছে। 'আত্মশক্তি' নামটি রক্ষা করা স্থির করেছেন, কারণ আপনার আদর্শের মূল কথাটি ঐ একটি কথার মধ্যেই নিহিত আছে মনে হয়...। এই বইটির সূচনা উপলক্ষ্যে আপনার রাষ্ট্রীয় আদর্শের মূলকথাটি সম্বন্ধে কিছু লিখলে ভালো হয়।'[২২৪]

এই চিঠি লেখার পর প্রায় দশ দিন কেটে গেলেও এর কোনো উত্তর না-পেয়ে পুলিনবিহারী এবার শরণাপন্ন হলেন কবির ব্যক্তিগত সচিব অনিলকুমার চন্দ-র। ২৯ মার্চ তাঁকে এই প্রসঙ্গে যে চিঠি লিখলেন পুলিনবিহারী তাতে যে শুধু সমস্যাটার কথা জানালেন তা-ই নয়, দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর নিজের কী মত তা-ও লিখে দিলেন। চিঠিটি পুরোটাই এখানে উদ্ধারযোগ্য :

রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডের "প্রবন্ধ"-অংশে "আত্মশক্তি" বই দিয়েছি। এই বইখানি ছাপা হ'ত না, তার কারণ এর অধিকাংশ লেখাই পরে অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এখন রচনাবলীতে যথাসম্ভব পুরাতন titleগুলি রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে হওয়ায়, এবং "আত্মশক্তি" গুরুদেবের রাষ্ট্রীয় মতের বিশেষ দ্যোতক হওয়ায় "আত্মশক্তি" বইটি ঐ নামেই ছাপতে চাচ্ছি।

"আত্মশক্তি" বইখানি গুরুদেবকে দেখিয়ে ছাপার অনুমতি নিয়ে এসেছিলাম। তবু দু একটা বিষয়ে পুনরায় স্থিরনিশ্চয় হয়ে নিতে চাই।

১। "আত্মশক্তি"র কয়েকটি প্রবন্ধ পরে ছাপা হয় নি। বাদ পড়ে গিয়েছিল বা বাদ দেওয়া হয়েছিল। সে-কটি ছাপতে আপত্তি নেই তো?

আমাদের বলবার এই যে, সে লেখাগুলি কাঁচা লেখা নয় (যে জন্য সাধারণত বাদ দিতে চান) — ১৩১১ সালের লেখা। অতএব ছাপাই ভালো।

২। "আত্মশক্তি"র যে প্রবন্ধগুলি পরে অন্য বইতে ছাপা হয়েছিল, তার কোথাও কোথাও বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেই বাদ দেওয়া অংশগুলো এখন ছাপা হতে পারে তো?

আমাদের বলবার এই যে পূরোপূরিই[য] ছাপা হোক; সেগুলি কিছু দোষাবহ বলে তো আমাদের বোধ হয় না; "পঞ্চভূত", "চতুরঙ্গে"র এইরকম অনেক বর্জিত passage পুনরুদ্ধার করতে উনি সম্মতি দিয়েছেন বা ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। এগুলিও থাকা ভালো। সেই তো আবার [দুষ্পাঠ্য] দিতে হবে, তার চেয়ে এখনি যাক না। গুরুদেবকে এই দুটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছিলাম, উত্তর পাই নি। উনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত অনুমান করে কাল ms pressএ দেব ভাবছি। জ্ঞাতকারণ লিখি।

পুলিন[২২৫]

এই চিঠিতে সম্পাদক পুলিনবিহারীর আত্মবিশ্বাস (confidence) বিশেষভাবে খেয়াল করবার মতো। তিনি গ্রন্থালয়ে দীর্ঘদিনের কর্মী নন, সদ্য নিযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তিনি যেন জানেন 'গুরুদেব' কী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এখানে ! 'উনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত অনুমান করে কাল ms pressএ দেব ভাবছি', এই বাক্যটি এখানে কিশোরীমোহনও লিখতে পারতেন না হয়তো ! প্রসঙ্গত, পুলিনবিহারীর দুটি প্রস্তাবই মেনে নিয়ে সবকটি রচনা তাদের পূর্ণাঙ্গ আকারেই রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে *আত্মশক্তি* বইতে ছাপা হয়েছিল।

এই তৃতীয় খন্ডের আখ্যাপত্রে প্রকাশ কাল হিসেবে উল্লিখিত আছে '২৫ বৈশাখ, ১৩৪৭' (৮ মে, ১৯৪০)। তবে খণ্ডটি প্রকাশিত হয়ে গেছিল এপ্রিলের গোড়াতেই। সেটি হাতে পেয়ে কবি কিশোরীমোহন সাঁতরাকে ৬ এপ্রিল

১৯৪০-এ লিখে জানালেন, ‘তৃতীয় ভাগ রচনাবলী পাওয়া গেল।’[২২৬] অন্য দুটি খণ্ডের মতো এই খণ্ডও বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। এপ্রিলে প্রকাশিত হয়ে আগস্টের গোড়ায় তা নিঃশেষিত হয়ে গেলে তার নতুন সংস্করণ করার উদ্‌যোগ শুরু হয়ে যায়। পুলিনবিহারী ফের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাছের মানুষদের কাছে নানা প্রশ্ন করে নতুন সংস্করণটিকে সম্পাদনাগত-ভাবে নির্ভুল করে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। ৭ আগস্ট ১৯৪০-এ (সম্ভবত) অনিলকুমার চন্দকে এইরকমই একটি চিঠি লিখে তিনি জানতে চাইছেন :

> রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড এখন আবার ছাপা হবে।... সোনার তরী সম্বন্ধে দুটো-একটা প্রশ্ন পাঠাচ্ছি; উত্তর যেন সুধীরবাবু নূতন সংস্করণের জন্য নোট করে নেন, চিঠিটা নির্দেশসহ আমাকে যেমন ফেরত দিচ্ছেন সেইরকম দিলেই ভাল হয়। কথা কাহিনী সম্বন্ধে চিঠি লিখেছি আশা করি পেয়েছেন।’[২২৭]

‘নির্দেশ-সহ’ এইসব চিঠি নিশ্চয়ই পুলিনবিহারীর কাছে ফেরত গিয়েছিল, আমাদের দুর্ভাগ্য, সেগুলি রক্ষিত হয় নি। বস্তুত উপরে উদ্ধৃত চিঠিটিতেই পুলিনবিহারী জানিয়েছিলেন এইরকম এক মন-খারাপ-করা খবর যে, ‘গুরুদেবের কাছ থেকে লিখিত যা উত্তর ছিল তা আপিসে রাখতে দিয়েছিলুম এখন তা সব পাওয়াও যাচ্ছে না।’ গ্রন্থালয় কর্তৃপক্ষের এ এক অমার্জনীয় গাফিলতি বলেই ধরতে হয়। যাইহোক, পুলিনবিহারীর এই ক্রমাগত অনুসন্ধানের ফলেই আমরা পেয়েছি একের-পর-এক অসামান্য সম্পাদিত রচনাবলীর খণ্ড। তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

অন্যদিকে, সজনীকান্তর মূল উৎসাহ ছিল কবির অপ্রচলিত রচনাগুলির বিষয়ে। প্রথম খণ্ডে কাব্যগ্রন্থ শুরু হয়েছিল *সন্ধ্যাসঙ্গীত* থেকে, গদ্যগ্রন্থ *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, উপন্যাস *বউঠাকুরানীর হাট* এবং নাটক *বাল্মীকি-প্রতিভা* দিয়ে। এর আগেকার গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত বিপুল লেখালেখি আছে যা সজনীকান্ত ও অন্যদের গবেষণার মাধ্যমে ততদিনে অনেকখানিই জানা হয়ে গেছে। ফলে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে দরবার করলেন বাল্য ও কৈশোরের সেই সব অপ্রচলিত রচনা যাতে রচনাবলীর মধ্যে গ্রন্থিত করা যায়। *আত্মস্মৃতি* বইটির মধ্যে সজনীকান্ত এই প্রসঙ্গে নিজেই জানিয়েছেন, ‘কবি জোর গলায় বলিলেন, “সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি ইতিহাসের ধারা মানি নে।” শেষ পর্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয়-ধস্তাধস্তির পর “অচলিত সংগ্রহ” আখ্যা দিয়া ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’র কয়েকটি খন্ড প্রকাশে অনুমতি দিলেন।’[২২৮] রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই অচলিত সংগ্রহের ১টি খণ্ড প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে, আর কবির জীবনাবসানের অল্প পরে অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ব-এ অপর একটি

খণ্ড। এই দুটি খণ্ড গড়ে তোলার সম্পুর্ণ দায়িত্ব ছিল সজনীকান্ত আর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। এখানে আর-একটি তথ্যের দিকেও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র প্রতিটি খণ্ডই ছাপা হচ্ছিল গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্যের দায়িত্বে '৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা' ঠিকানার 'তাপসী প্রেস' থেকে। কিন্তু অচলিত খণ্ড দুটি ছাপা হয়েছে ভিন্ন জায়গা থেকে, ২৫।২, মোহনবাগান রো' ঠিকানার 'শনিরঞ্জন প্রেস' থেকে সৌরীন্দ্রনাথ দাসের মুদ্রণ-দায়িত্বে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই শনিরঞ্জন প্রেস থেকে ছাপা হত সজনীকান্ত দাসের সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'। অর্থাৎ, 'অচলিত সংগ্রহ' খণ্ডদুটির সামগ্রিক পরিকল্পনা শুধু সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথের উপর ছিল তা-ই নয়, ছাপার কাজেরও সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান তাঁদেরই নেতৃত্বে হয়েছে। পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়ায় পুলিনবিহারী বা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের আর কারো কিছুমাত্র ভূমিকা ছিল না।

আমরা বলেছি, অনেকটা সজনীকান্তেরই প্ররোচনায় *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র নির্মাণকার্যে অনেকখানি সামিল (involve) হলেন রবীন্দ্রনাথ। সজনীকান্তকেই লেখা অনেকগুলি চিঠিতে সেই 'সামিল' হয়ে ওঠার নানা প্রমাণ আমরা পেতে থাকি। চিঠিগুলি পাওয়া যাবে বিশ্বভারতী প্রকাশিত *চিঠিপত্র*-এর ঊনবিংশ খণ্ডে (বৈশাখ ১৪১১ব)।

> ১। ৩০ নভেম্বরের ১৯৩৯-এর চিঠি : 'রচনাবলী সম্বন্ধে সমস্যা তোমার দফতরে জমে উঠেচে।... তোমরা ঠিক করেছিলে সময় বাঁচাবার জন্য হাওড়ায় যান পরিবর্তন করা যাবে। আমি মনে করি তা না করে রচনাবলী প্রভৃতি নানা পরামর্শ মোকাবিলায় ঐ সময়ে চুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে।' (পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫, পত্র নং ২৭)
>
> ২। ৪ জানুয়ারি ১৯৪০-এর চিঠি : 'তোমার সময়মতো একবার এসো, বানানের মন্ত্রণাসভা বসানো যাবে। রচনাবলী সম্বন্ধেও হয় তো পরামর্শের প্রয়োজন থাকতে পারে। (পৃষ্ঠা ৩৮, পত্র নং ৩০)
>
> ৩। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০-এর চিঠি : 'আগামী রবিবারে পুলিন আসচেন রচনাবলী উপলক্ষ্যে। ঐ আলোচনা ক্ষেত্রে তোমার উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক।' (পৃষ্ঠা ৪২, পত্র নং ৩৩)

এই সমস্ত পরামর্শ-বৈঠকে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে যে প্রস্তাবগুলি দিচ্ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন রচনার পূর্ণাঙ্গ পাঠান্তর রচনাবলীর পরিশিষ্টে যোগ করা। মনে রাখা দরকার ১৯৩৮ সালে সজনীকান্ত এবং ব্রজেন্দ্রনাথেরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলী-র যে জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ খন্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে প্রতিটা খণ্ডে সম্পাদকদ্বয় প্রতিটি বইয়েরই

যথাসম্ভব ‘পাঠভেদ’ যুক্ত করতে পেরেছিলেন। সজনীকান্ত এক্ষেত্রেও সেরকমই কিছু চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। প্রস্তাবটি রবীন্দ্রনাথের খুবই পছন্দ হয় কিন্তু এবার সজনীকান্ত সম্ভবত আর এর দায়িত্ব নিতে চান নি। কবি ২৩ নভেম্বর ১৯৩৯-এ পুলিনবিহারীকেই চিঠি লিখে জানান, ‘সজনীকান্তর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছি যে রাজা ও রানী ও বিসর্জনের পাঠান্তরগুলি দ্বিতীয় খণ্ডেরই পরিশিষ্ট ভাগে প্রকাশ করা কর্তব্য — নইলে তার উপযোগিতা ব্যর্থ হবে।’[২২৯] রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ সত্ত্বেও সমগ্র পাঠান্তর কোনো খণ্ডেই ছাপা হয় নি অবশ্য, সজনীকান্ত তাঁর *আত্মস্মৃতি*তে এই নিয়ে সামান্য বাঁকা মন্তব্যও করেছেন, তবে আমাদের মনে হয়, এর যথার্থ ব্যবহারিক কারণ ছিল। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই যতগুলি সম্ভব খণ্ড প্রকাশ করে দেওয়াই গ্রন্থনবিভাগের কর্তাদের একটা লক্ষ্য ছিল, সেই কারণে আগেভাগেই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল ‘Every two months a new volume will be published.[২৩০] এই কথা পুরোটা রাখা যায় নি বটে কিন্তু অন্য-গ্রন্থ প্রকাশের মাঝখানেও অতিশয় দ্রুততায় চালাতে হচ্ছিল *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র কাজ। ফলে বঙ্কিমের রচনা প্রকাশে সজনীকান্তরা সময়ের যতটা সাহায্য পেয়েছিলেন, পুলিনবিহারীদের কাছে সেটা আশা করাও হত নিতান্ত বিলাসিতা। তবু, পুলিনবিহারীরই একক চেষ্টায় প্রতিটি খণ্ডে যুক্ত হয়েছিল অমূল্য ‘গ্রন্থপরিচয়’ অংশ। তাতে সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছিল পাঠভেদের নানা ইঙ্গিত, পরিস্থিতির বিচারে সেটাকে কম পাওয়া বলে মনে করতে ইচ্ছে করে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলীর সাতটি খণ্ড এবং একটি ‘অচলিত সংগ্রহ’ খণ্ডের প্রকাশ দেখে যেতে পেরেছিলেন।

অন্তিম প্রসঙ্গকথা : গ্রন্থালয়ের আর্থিক অবস্থা

গ্রন্থালয়ের একেবারে শুরুর দিন থেকেই ছিল আর্থিকভাবে স্বনির্ভর এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম আয়ের উৎস। স্বনির্ভর কথাটির এক্ষেত্রে তাৎপর্য হল, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর ‘রয়্যালটি’ ও অন্যান্য খাতে প্রাপ্য টাকা দিয়েও প্রত্যেক বছরে তার টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে, ফলে প্রতি বছর তার সর্বমোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত বিভিন্ন বছরের ‘Visva-Bharati Annual Report and Audited Account’-এর

সাহায্যে আমরা ১৯২৭ থেকে গ্রন্থালয়ের বইয়ের বিক্রি ও তার মোট লাভের একটি খতিয়ান তৈরি করতে পেরেছি। সারণির আকারে তা জানানো হল।

অর্থবর্ষ	মোট বিক্রি (Gross sale)	লাভ (Net Profit)
১৯২৭-২৮	২৭,৯০৬-১০-৬	১৮২৬-১৫-৪
১৯২৮-২৯	২৯,১০৮-১০-৬	৪৩৪৫-১২-১১
১৯২৯-৩০	৩২,৪০২-৭-৩	৮৫৬৭-১৩-১১
১৯৩০-৩১	৩৩,১৩০-২-৬	তথ্য জানা যায় নি
১৯৩১-৩২	৩৭,১৯৯-৩-৬	৪০৫৬-১-৫
১৯৩২-৩৩	৩২,২৫১-১১-৯	৩৮৫২-১১-৯
১৯৩৩-৩৪	২৭,৭৯১-১২-০	৫০৯৯-১১-১
১৯৩৪-৩৫	৩০,০০৩-১০-০	৫০২৪-১০-১১
১৯৩৫-৩৬	৩৩,৯৮১-২-৩	৩৭৩০-০-৩
১৯৩৬-৩৭	৩৪,৬৭২-৭-৬	৪২৬৪-১৪-০
’৩৭ অক্টোবর-’৩৮ মার্চ (৬মাস)	২৪,৯১০-৭-০	৩৭৫৪-৬-৯.৫
১৯৩৮-৩৯	৩৮,৯৭৬-১২-৩	১৮২৬-৩-৩
১৯৩৯-৪০	৪৭,১২০-১১-০	২৫০০-০-০
১৯৪০-৪১	৭৬,৪৬২-৪-৩	তথ্য জানা যায় নি

অর্থের বিবরণকে টাকা-আনা-পাই হিসেবে পড়তে হবে। তৃতীয় সারির ‘লাভ’ (Net profit) কথাটির তাৎপর্য : বই ছাপানোর যাবতীয় খরচের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, অন্যান্য লেখক এবং বিশ্বভারতীর সমস্ত প্রাপ্য ‘রয়্যালটি’ মেটানোর পর গ্রন্থালয়ের ‘নিজস্ব’ লাভ।

এই সারণীটি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হতে পারে, সেই চেষ্টা থেকে আমরা বিরত থাকছি। কিন্তু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ-সূত্রে পাওয়া প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা জরুরি।

পর্যবেক্ষণ/১ : প্রথমে পরপর ৫ বছর মোট বিক্রির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলার পর হঠাৎ **১৯৩২-৩৩** ও **১৯৩৩-৩৪** সালে তা কমে গেল ৫ হাজার টাকা প্রতি-বছর ! এর নানারকম কারণ থাকা সম্ভব। আমাদের অনুমান, ১৯২৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী যে মহা-আর্থিক মন্দা (‘The Great Economic Depression’) শুরু হয়েছিল, এটি অংশত তারই প্রভাব। মনে রাখা দরকার, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব ছিল

(পাশ্চাত্যের তুলনায়)-সীমিত, তবে এই ১৯৩২-৩৩ সাল নাগাদই এর ধাক্কা সবচেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে। ১৯৩২ সালের ৬ জুন, বরানগরে প্রশান্ত-রানী মহলানবিশের সঙ্গে কবির আলাপচারিতায় এই মন্দার প্রসঙ্গটি উঠে আসবে। প্রশান্তচন্দ্র তাঁর সেদিনের ডায়ারিতে লিখবেন:

> বর্ত্তমান depressionএর কথা[র] মাঝে [কবি] বললেন যে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এমন একটা দুর্গতির সময় এসেছে, এখন সকলকে adjust করতে হবে। এক সময়ে যেটা ছিল সবচেয়ে ধ্রুব, এখন সেটাই সবচেয়ে অনিশ্চিত। জমিদারীর অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়বে। প্রজারা খেতে না পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠবে, তখন একটা revolution ছাড়া উপায় নেই। আমাদেরও adjust করতে হচ্ছে, কিন্তু সময় লাগবে।[২৩১]

রবীন্দ্রনাথের বিবেচনামতো সকলের 'adjust' করে চলবার ফলই হয়তো দেখা যাচ্ছে ১৯৩২-৩৪ সালের বই বিক্রির হিসেবের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে আমরা আরও উল্লেখ করতে পারি যে, ১৯৩৩-৩৪ আর্থিক বছরের জন্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ একটি ঘাটতি-বাজেট (Deficit Budget) পেশ করতে বাধ্য হন। ১৯৩৩-এর Annual Report-এর শুরুর দিকে 'Financial Administration' প্রসঙ্গে জানানো হয়, 'Owing to severe economic depression and non-realisation of interest on certain invested funds the Samsad at its meeting on the 11th September[1933] was obliged to pass a deficit Budget of Rs. 12,600/-.'[২৩২]

<u>**পর্যবেক্ষণ/২**</u> : বিক্রি বাড়া সত্ত্বেও লাভের পরিমাণ কমেছে, এরকম বেশ কিছু উদাহরণ চোখে পড়ে। সাধারণভাবে তার কারণ হচ্ছে infrastructure-খাতে খরচের বৃদ্ধি। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০ অর্থবর্ষে লাভের পরিমাণ যে চোখে-পড়ার-মতো কম, তার কারণ এর থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই সময়ে কাগজ, ছাপার কালি ও মুদ্রণ-সম্পর্কিত অন্যান্য যন্ত্রপাতির দাম প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আমরা আগেই দেখেছি, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* যে প্রতি দু মাসে একটি করে খণ্ড বের করা যাচ্ছে না তার কারণ হিসেবে ১৯৩৯-এর 'Annual Report'-এ 'difficulty of obtaining paper and binding materials'-এর কথাই বলা হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ৩০ আগস্ট কিশোরীমোহনকে একটি চিঠিতে কবি জানাচ্ছেন, 'কাগজের অপেক্ষায় ছেলেবেলা ছাপা বন্ধ আছে।'[২৩৩] কাগজ জোগাড় হয়েছিল অচিরেই কিন্তু অন্য-সময় হলে এই

'অপেক্ষা'টাই করতে হত বলে মনে হয় না। এই সময়েই গ্রন্থালয় সংক্রান্ত কিছু বিভ্রান্তিমূলক খবর পেয়ে উত্তেজিত রবীন্দ্রনাথ **১৯৩৯**-এর ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁর পুত্রকে লিখেছিলেন, 'ইদানীং গ্রন্থপ্রকাশের কাজে শনির দৃষ্টি পড়েছে।... বিশ্বভারতীর হাতে আমার স্বাধীনতা খুইয়েছি, নইলে আগেকার মতো ইন্‌ডিয়ন প্রেসের হাতে বই ছাপার ভার দিতুম — তারা নিজের গরজে বইয়ের প্রচার করত।'[২৩৪] আকস্মিক এই অভিযোগের উত্তরে পুত্র রথীন্দ্রনাথকেই বোঝাতে হয়, ব্যাপারটা আদৌ সেরকম নয়, সমস্ত বইয়ের প্রচার ও বিক্রি খুবই দক্ষতার সঙ্গেই পরিচালিত হচ্ছে, একটি তারিখহীন চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে লেখেন:

> Publishing dept. কি অন্যায় করেছে ঠিক বুঝতে পারছি না। Indian Press থাকতে সবচেয়ে বেশি বই বিক্রি হয়েছে ২০০০৲ টাকার ও আমাদের দিয়েছে ৫০০৲। বিশ্বভারতী বিক্রি করছে ৩৫,০০০৲টাকার বই, শান্তিনিকেতনকে দিচ্ছে ৭০০০৲ royalty ও তোমাকে ৩/৪,০০০৲বছরে। অন্য কেও এর চেয়ে ভাল করতে পারত বলে মনে হয় না। তোমাকে কেও ভুল রকম খবর দিয়েছে —না হলে এত ভুল রকম বিশ্বাস কি করে হোলো?[২৩৫]

ছেলের চিঠিতে কবির বিভ্রান্তি দূর হয়েছিল নিশ্চয়ই। লক্ষণীয়, এই চিঠি থেকে বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রনাথকে আলাদা-আলাদা করে গ্রন্থালয় কত টাকা রয়্যালটি বাবদ দিত, সেই হিসেবটিও পরিষ্কার হয়ে যায়।

<u>পর্যবেক্ষণ/৩</u> : **১৯৪০-৪১** অর্থবর্ষে বিক্রি বেড়ে যায় এক ধাক্কায় প্রায় তিরিশ হাজার টাকা ! এতটা বেড়ে যাবার একটা কারণ নিঃসন্দেহে *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ একটা সময়ে যে বইটিকে তেমন-একটা গুরুত্ব দিতে চাননি, সেইটিই প্রথম দিন থেকেই গ্রন্থালয়ের আয়ের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী প্রকাশনা হয়ে উঠবে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছেও হিসেবটি খুবই বিস্ময়কর ছিল, **১৯৪১**-এর 'Annual Report'-এর ভাষায় সেই বিস্ময়ের ছাপ আছে, 'The period under review with a bumper sale of Rs. 76,462/4/3 as aginst Rs.47,120/11/10 of the previous financial year.'[২৩৬]

প্রসঙ্গত জানানো যাক, কবির মৃত্যু-বৎসরে (**১৯৪১-৪২**) মোট বিক্রির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় একলক্ষ টাকার বেশি, **১৯৪২** সালের Annual Report-এ লেখা হয়, 'It will be found from the detailed report that during the year under review the sale-figures have esceeded a lakh as aginst Rs.

70,000/- of the previous year'[২৩৭]. অন্যদিকে কবির জন্মশতবর্ষে (১৯৬১-৬২) সেটি গিয়ে পৌঁছোয় ১৮,১৭,৬৩৭ টাকায় ![২৩৮] জীবনের একেবারে প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের নামে ছড়া কাটা হয়েছে এই বলে যে তাঁর বই ওজন-দরে গুরুদাসের দোকানে পাওয়া যায়। সেই বিদ্বেষবাক্যের মধ্যে কিছু তথ্যগত সত্যও ছিল বটে। কিন্তু, এখন আমরা বলতেই পারি, বাঙলি পাঠক রবীন্দ্রনাথের বই পয়সা দিয়ে কিনেই পড়েছে, সবচেয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

প্রসঙ্গটি শেষ করার আগে 'শান্তিনিকেতন প্রেস'-এর আর্থিক অবস্থা নিয়েও অল্প কিছু কথা এখানে বলা যেতে পারে। আগেই আমরা বলেছি, 'গ্রন্থালয়'-এর মতো আর্থিক-স্বাস্থ্য 'প্রেস' কোনো কালেই অর্জন করতে পারে নি। ১৯৩০ সাল থেকে পরপর পাঁচটি বছরে 'শান্তিনিকেতন প্রেস'-এর লাভ-ক্ষতির হিসেব দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। বলা প্রয়োজন, সব তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বছরের বিশ্বভারতীর 'Annual Report' থেকে।

১৯৩০ : মোট ক্ষতি – ১৯৪-৮-০

১৯৩১ : মোট ক্ষতি – ৭৫৪-১৩-০

১৯৩২ : মোট লাভ – ৭১৫-১১-৬

১৯৩৩ : মোট লাভ – ১৪৬৪-৫-৫

১৯৩৪ : মোট ক্ষতি – ৪৭৬-১৪-৯

(অর্থের বিবরণকে টাকা-আনা-পাই হিসেবে পড়তে হবে।)

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, 'শান্তিনিকেতন প্রেস' বিভিন্ন সময়েই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তার জন্যে বিভিন্ন 'ফান্ড' থেকে তাকে ঋণ (loan) নিতে হয়েছে নানা সময়ে। সেই ধার বহু ক্ষেত্রেই শোধ করা সম্ভব হয় নি বছরের শেষে। তবে রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত দেখে গিয়েছিলেন যে এই প্রেস তার আর্থিক-সমস্যা কাটিয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। এ বিষয়ে ১৯৪১-এর 'Annual Report'-এ যা লেখা হয়েছিল তা খুবই আশাপ্রদ :

> The Santiniketan Press did excellent work during the year under report. The total business for the year 1940-41 amounted to Rs. 17,080/- as against 12,908/- for the previous year. It was carrying forward year after year a loss which stood at Rs. 2,529/-

on 31.3.40. It is worthy of note that the whole of this loss has been wiped out during the year.

আমাদের অনুমান, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র বিপুল চাহিদা ‘গ্রন্থালয়’ এবং ‘শান্তিনিকেতন প্রেস’ – উভয়েরই অর্থনৈতিক অবস্থাকে আশাব্যঞ্জক করে তোলার পিছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

ঘ. ‘প্রেস প্রুফ’ ও ছাপাখানার অন্দরমহল

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি বইয়ের ‘প্রেস প্রুফ’ রক্ষিত হয় নি। ছাপাখানার জিম্মা থেকে সেগুলিকে উদ্ধার করে আনার প্রয়োজনীয়তার কথাটা তৎকালীন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন নি। কিন্তু মূলত শেষদিকের অল্প যে কয়েকটি বইয়ের আছে, সেগুলির পাতায় চোখ বোলালে বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে মন। অসুস্থ শরীরেও তিনি নিজে হাতে প্রুফ সংশোধন করছেন, অক্ষরের ধাঁচ কী হবে, লাইনের স্পেসিং ঠিক কতটা রাখতে হবে, একটা-লাইনের পর আর-একটা লাইন ঠিক কোন রীতিতে বসানো হবে, তার অনুপুঙ্খ নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন সেই ‘প্রেস-প্রুফ’-এর পাতায় পাতায়, তার কিছু-নমুনাও যে আজ দেখতে পাচ্ছি আমরা, তাকে এক দুর্লভ সৌভাগ্য বলেই ভেবে নিতে ইচ্ছে করে।

রবীন্দ্রজীবনের শেষভাগে তাঁর বইয়ের প্রুফ দেখার দায়িত্বে ছিলেন সুধীরচন্দ্র কর, তাঁর ‘অফিসিয়াল’ পদটির নামই ছিল ‘প্রুফ রিডার’। কিন্তু সে দায়িত্ব সম্পূর্ণত সুধীরচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথ কখনই ছেড়ে দেন নি। যে কোনো বইয়েরই একাধিক প্রুফ দেখা হত, তার মধ্যে সাধারণত কোনো একবার রবীন্দ্রনাথই আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিতেন। সে সময়ে তাঁর কাছাকাছি থাকা অনেকের স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। যেমন রানী চন্দের কলমে ১৯৪১-এর ৯ জানুয়ারির বিবরণ এইরকম, ‘প্রেস থেকে তাঁর কবিতার একতাড়া প্রুফ এল। [*আরোগ্য* বইটির?] তিনি দেখে দিলেন; আবার তা প্রেসে পাঠানো হল। একটা ক্লান্তির নিশ্বাস[য] ফেলে গুরুদেব বললেন : এত লিখেছি জীবনে যে লজ্জা হয় আমার।’[২৪০] নিঃশ্বাস যতই ‘ক্লান্তি’ময় হোক, বইয়ের নির্ভুল ও সৌষ্ঠবময় প্রকাশের তাড়না তাঁর ক্লান্তিহীন, সেটা আমরা আগেই বারবার দেখেছি। আরও মাস দুয়েক পর, আর-একদিনের বিবরণ এইরকম, ‘এমন সময়ে প্রেস থেকে প্রুফ এল। হাতে নিয়ে খানিক নেড়েচেড়ে

কোলের উপর রেখে দিলেন। লিখে লিখে আর পারি নে। দেখ্-না, আমার একটা ছোটো গল্পের বই [*গল্পসল্প*] বের হবে।... এই শরীরেও হচ্ছে, সবই একটু একটু করে।'[২৪১]

এইসব প্রেস-প্রুফের মধ্যে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে দেওয়া নির্দেশগুলি সম্পর্কে আমরা একটু পরে বলছি। তার আগে জানানো যাক, সুধীরচন্দ্র করের মাধ্যমে প্রেসের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ রক্ষিত হত। ১৯৩৬ সালে গ্রন্থালয় প্রকাশ করল একটি বই, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'কে এক মলাটের মধ্যে এনে সেই বইটির নাম দেওয়া হল *পাশ্চাত্য ভ্রমণ*। ১৯৩৬-এর অক্টোবরে সেই বই বেরোবার যখন আয়োজন চলছে তখন শান্তিনিকেতন প্রেসের তরফ থেকে তার দ্বিতীয় প্রুফের সঙ্গে পাঠানো হল বইটির পাতা কীভাবে সাজানো হবে তার একটি নমুনা, কবি সেটি অনুমোদন করলে তবে তা মান্যতা পাবে। সেই নমুনাটি ছিল ঠিক এইরকম[২৪২] :

2nd Proof
2|10|36
5pm

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র

পাশ্চাত্য ভ্রমণ

হাফ টাইটেল ১ম পৃষ্ঠা
ফাঁক — ২য় পৃষ্ঠা
টাইটেল —৩য়, ৪র্থ পৃষ্ঠা
ভূমিকা—৫ম হইতে ৯ম পৃষ্ঠা
ফাঁক—১০ম পৃষ্ঠা

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র

হাফ টাইটেল—১১শ পৃষ্ঠা
ফাঁক—১২শ পৃষ্ঠা
উপহার—১৩শ পৃষ্ঠা
ফাঁক—১৪শ পৃষ্ঠা

পাতা এইভাবেই ত সাজান হবে। জানাবেন।

হরিপদ

2|10|36

এই ‘নোট’ যিনি পাঠাচ্ছেন তিনি হলেন হরিপদ পাল, শান্তিনিকেতন প্রেসের কর্মচারী, যাঁর ‘অফিসিয়াল’ পদটির নাম ছিল ‘Assistant Manager & Proof Reader’। এই দ্বিতীয় প্রুফটি দেখা শেষ হয়ে ছাপাখানায় ফেরত গেল ২৩ অক্টোবর ! ২১ দিন লাগল দ্বিতীয় প্রুফ দেখতে, একে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব বলা চলে। পুজোর ছুটির কাল, বিশ্বভারতীতে অন্যান্য ব্যস্ততা কম, শান্তিনিকেতনেই আছেন কবি, তবু দ্বিতীয় প্রুফ দেখার জন্যে এতদিন সময় লাগছে, এটা প্রমাণ করে গ্রন্থপ্রকাশে দেরি হওয়ার জন্যে একা ছাপাখানাকে দায়ি করার কোনো মানে হয় না। যাইহোক, সংশোধিত কপি ফেরত গেল সুধীরচন্দ্রের এই নোট সহ :

পাতা ঐভাবেই সাজাবেন
সুধীর কর
23|10|36

বলা বাহুল্য, এ আসলে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন-বাক্য। গ্রন্থনির্মাণ-প্রক্রিয়ার এতখানি খুঁটিনাটি সিদ্ধান্তের পিছনেও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার প্রয়োজন হত, এই কথাটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ-এর একটি প্রুফ দেখতে লাগল ২৩ দিন, তবে এতখানি বিলম্ব হওয়াটাই যে দস্তুর ছিল এটা বলা যাবে না। *বিশ্বপরিচয়*-এর চতুর্থ সংস্করণের দ্বিতীয় প্রুফে দেখছি পাঠানোর তারিখ ’19.12.38’, বিকেল ৫টায় (সমস্ত প্রুফ পাঠানোর আগে উপরের দিকে তার তারিখ আর সময় লিখে দেওয়া হত, ফেরত পাঠাতেও হত তারিখ-সহ), আর প্রুফ দেখে ফেরত পাঠানো হচ্ছে ‘৫/১/৩৯’, (সঙ্গে সুধীর করের স্বাক্ষর ও মন্তব্য : ‘দেখাবেন’) অর্থাৎ এক্ষেত্রে সময় লাগছে প্রায় ১৭ দিন। অন্যদিকে, আমরা এ-ও লক্ষ করেছি, *গীতবিতান*-এর একটি চতুর্থ প্রুফ পাঠানো হচ্ছে ’28.10.38’ বিকেল ৫টায়, ফেরত যাচ্ছে সুধীর করের স্বাক্ষর ও মন্তব্য (’দেখাবেন’)-সহ ঠিক তার পরের দিন, ২৯ অক্টোবর।

গ্রন্থালয়ের আর্থিক অবস্থা-প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে কাগজ ও অন্যান্য মুদ্রণ-উপকরণের যোগান কমে যাওয়া ও দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে ১৯৩৮-৪০ বছরগুলোতে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের লাভের পরিমাণ অনেকটা কমে আসে। এই আপদ্‌কালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে ১৯৩৯ থেকে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। প্রথম ব্যবস্থাটি হল গ্রন্থের মাপের বদল। প্রথম সংস্করণ কবিতার বইগুলি এতদিন তৈরি করা হচ্ছিল ২৫ সে.মি X ১৯ সে.মি মাপে। *সেঁজুতি* (সেপ্টেম্বর ১৯৩৮) বইটি থেকে তা কমিয়ে করা হল ২২ সে.মি X ১৩.৫ সে.মি। (দুটি মাপই সাধারণভাবে বলা হল। বাঁধাই, কাটিং ইত্যাদির

কারণে বিভিন্ন বইয়ের মাপে সামান্য অদলবদল পাওয়া যাবে।) কিন্তু *সেঁজুতি*-তেও (আর তার আগের কাব্যগ্রন্থগুলিতে তো বটেই) প্রতিটা কবিতা শুরু হত স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায়, প্রতিটি লাইনের মধ্যিখানে থাকত অধিক ফাঁক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এই ব্যবস্থাও রদ হল। *সেঁজুতি*র ঠিক পরের কাব্যগ্রন্থ *আকাশপ্রদীপ* (মে ১৯৩৯)-এর একটি প্রুফে দেখতে পাওয়া যাবে সুধীরচন্দ্রের এই লেখা[২৪৩] :

> গুরুদেবের স্থায়ী নির্দেশ —
>
> এখন থেকে গুরুদেবের কবিতার বইতে : —
>
> (১) যেখানে একটি কবিতা শেষ হবে, তারপরেই নূতন কবিতা আর একটি বসবে, আগের মতো কবিতা শেষ হওয়ার পাতা বাদ দিয়ে নূতন পাতায় নূতন কবিতা বসবে না।
>
> (২) কবিতার মধ্যে ফাঁক এক লাইন কি দুলাইনের বেশি দেওয়া হবে না।

এই নির্দেশ *আকাশপ্রদীপ* থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রতিটি কবিতার বইতে মানা হয়েছিল। অবশ্য এখানে উল্লিখিত থাক যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ (জীবনাবসানের পর ভাদ্র ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) *শেষ লেখা* বইটির মাপ *সেঁজুতি*-র মতো থাকলেও (অর্থাৎ, ২২ সে.মি X ১৩.৫ সে.মি) কবির ‘স্থায়ী নির্দেশ’টি মান্য করা হয় নি। প্রতিটি কবিতা শুরু হয়েছিল স্বতন্ত্র পৃষ্ঠাতেই।

সুধীরচন্দ্রের মারফৎ রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক খুঁটিনাটি নির্দেশ যেত প্রেসের কাছে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রেস-প্রুফগুলিতে তার বেশ কিছু রোমাঞ্চকর নমুনা ধরা আছে। যেমন *বিচিত্রিতা (১৯৩৩)*-র একটি প্রুফে আমরা দেখেছি ‘যাত্রা’ কবিতাটির শুরুর পৃষ্ঠার ডানদিকের কোণায় লেখা আছে সুধীরচন্দ্রের হাতের লেখায়[২৪৪] :

> যেখানে উপরের লাইন অসমাপ্ত ভাবে শেষ হইবে, নিম্নের লাইন ঠিক তার নীচ হইতে আরম্ভ হইবে।

পাঠক-মাত্রই জানেন, *বিচিত্রিতা*-র মোট ৩১টি কবিতার মধ্যে ‘যাত্রা’ কবিতাটির পঙ্‌ক্তি সজ্জার ধরনটি যে বেশ চোখে পড়ার মতো আলাদা। ১৮ মাত্রার মহাপয়ারে লেখা এই কবিতা, কিন্তু এই ১৮ মাত্রা কখনও ভেঙে আছে ৮-১০ মাত্রায় দুটো লাইনে, কখনও ১০-৮, কখনও ১৪-৪, কখনও ৪-১৪-এ। কখনও-বা পুরো ১৮ মাত্রার একটা গোটা লাইন। আবার কখনও ৮-৮-৪ বা ৪-১০-৪-এর তিনটি লাইনে ভাঙা লাইন। এতসব বিচিত্র সজ্জা যাতে বইতেও একেবারে কবির মনের মতো রূপে ধরা থাকে তারই নির্দেশ যাচ্ছে সুধীরচন্দ্রের মাধ্যমে প্রেসের

কম্পজিটরের কাছে। প্রায় প্রতিটি লাইনে দাগ দিয়ে-দিয়ে সেই বিচিত্র সজ্জাটি নির্ভুলভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টাটি আজও সুন্দর চোখে পড়ে। (দ্রষ্টব্য : চিত্র-২৪)

অবশ্য, লিখিত নির্দেশ শুধু নয়, কিছু-না-লেখাও কখনও কখনও কত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে *আকাশপ্রদীপ*-এর একটি প্রুফ[২৪৫] আমাদের সামনে তার নিদর্শন রেখে যায়। সেই প্রুফে আমরা দেখেছি সুধীরচন্দ্র তারিখ দিয়েছেন '২৭.৩.৩৯'। আর তাঁরই হাতে লেখা আছে যে সেটি হল '7^{th} Proof' !! একটি কাব্যগ্রন্থের জন্যে ৭বার প্রুফ দেখা হচ্ছে, নির্ভুল বই প্রকাশের জন্যে কবির এই অভাবনীয় আকুতি আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বাঙ্ময়, তা হল এই প্রুফে একটিও সংশোধনের চিহ্ন নেই! সংশোধনমসির আঁচড়-বিহীন সম্পূর্ণ 'সাদা' এই প্রুফটিই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থমালা নির্মাণের অন্দরমহলের উত্তেজনা-উদ্বেগ-পরিশ্রম ও প্রাপ্তির সার কথাটি বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম 'প্রুফ রিডার' সুধীরচন্দ্র করের মাধ্যমে পাঠানো নির্দেশাবলীর স্বরূপটি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন প্রুফ দেখার দায়িত্ব নেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভূমিকাটি সুধীরচন্দ্রের থেকে আলাদা হয়, সেইটি আলাদা করেই বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। প্রুফ দেখার কালে রবীন্দ্রনাথ যেটা পারেন, যেটা সহজবোধ্য কারণে আর-কারোর পক্ষেই সম্ভব না, সেটি হল, তিনি বদলে দিতে পারেন মূল 'Text'কেই। তার সামান্য কিছু — অবশ্য অত্যন্ত রোমাঞ্চকর — নিদর্শন প্রেস-প্রুফগুলির মধ্যে রক্ষিত হয়ে আছে। পাঠান্তরের পর্যালোচনা যেহেতু আমাদের গবেষণার অন্তর্গত নয়, তাই সে-বিষয়ে বিস্তারিত লেখার অবকাশ এখানে নেই। তবে, *আকাশপ্রদীপ* কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'কাঁচা আম'-এর বিখ্যাত ও আশ্চর্য শেষ লাইনটি ('ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।') যে কবিতাটির প্রাথমিকপাঠে ছিল না, যুক্ত হয়েছিল প্রুফ দেখার কালে (দ্রষ্টব্য : চিত্র-২৮), সেইটি চোখের সামনে দেখে শিহরণ জাগে বটে !

তাসের দেশ (১৯৩৩) নাটকের প্রুফেও এরকম আশ্চর্য সংযোজন-সংশোধনের নমুনা দেখা যায়।[২৪৬] (দ্রষ্টব্য : চিত্র-২৬ ও চিত্র-২৭)। অবশ্য আমরা এখানে এর ১৯৩৩-এর প্রথম সংস্করণের কথা বলছি না, বলছি ১৯৩৯ (মাঘ ১৩৪৫ব)-এর দ্বিতীয় ও ব্যাপকভাবে-পরিবর্তিত সংস্করণটির কথা। পরিবর্তন করেই নতুন প্রেসকপিটি ছাপাখানায় পাঠানো হয়, কিন্তু তার প্রতিটি প্রুফেও আবার নতুন করে সংযোজন-সংশোধনের পালা চলতে থাকে। যেমন নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বিখ্যাত গোলাম ও রাজার দ্বিরালাপটি প্রথম সংস্করণে ছিল এইরকম :

রাজা। তুমি তো সম্পাদক?

গোলাম। আজ্ঞা হ্যাঁ, আমি তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক।

রাজা। এই পবিত্র তাসভূমির কৃষ্টি যে তোমারই কলমের মুখে।

একথা বহুচর্চিত যে ‘Culture’ শব্দের বাংলা হিসেবে ‘কৃষ্টি’ শব্দটি রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ ছিল। ১৯৩৩-এই তাই এই শব্দটিকে নিয়ে খানিকটা ব্যঙ্গ করেছিলেন নাটকটির মধ্যে। এইবার সংশোধিত যে-রূপটি ছাপাখানায় গেল, সেখানে আমাদের আলোচ্য তিনটি সংলাপে বদল হল যৎসামান্য :

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক।

রাজা। এই পবিত্র তাসভূমির কৃষ্টি যে তোমারই কলমের মুখে।

এই অংশটি এইভাবে ছেপে যখন প্রথম-প্রুফ দেখবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে এল তখন তাঁর মনে হল ‘কৃষ্টি’ শব্দের ব্যঙ্গলক্ষ্য বুঝি পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয় নি। ফলে, এই প্রথম প্রুফে এই অংশটির অনেকটা বদল হল :

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি ! এটা কি জিনিষ ! এও কি ঘুঘু, না কদম্ব !

গোলাম। না মহারাজ, এ ভাষার নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

এই পৃষ্ঠাটির উপরে বাঁদিকে (সম্ভবত) সুধীর করের হাতের লেখায় এই নির্দেশ দেওয়া ছিল ‘ছাপাবেন’। কিন্তু সেই নির্দেশ কেটে দিয়ে (সম্ভবত) রবীন্দ্রনাথই ’২৩|১|১৯৩৯’ তারিখ দিয়ে লিখে দেন ‘দেখাবেন’। ফলে দ্বিতীয় প্রুফটিও অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে দেখানো হয়। সেখানে ফের এই অংশটি বদলে দেন রবীন্দ্রনাথ। এবার তার রূপ দাঁড়ায় :

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি ! এটা কি জিনিস ! মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

[‘জিনিস’ বানান আগের প্রুফে রবীন্দ্রনাথ ‘জিনিষ’-ই লিখেছিলেন। ছাপাখানাতেই ওটি সংশোধিত হয়।]

এই পর্যন্ত লিখে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল যে ‘কৃষ্টি’ নিয়ে তাঁর মনের মতো ঠাট্টা করা হল। এই শেষরূপটিই আজকের প্রচলিত পাঠের রূপ। মনে রাখা দরকার, ১৯৩৩ আর ১৯৩৯-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে ‘কৃষ্টি’ শব্দে তাঁর আপত্তির কথা আলাদা করে জানিয়ে ফেলেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘প্রবাসী’ ভাদ্র-কার্তিক ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘কালচার ও সংস্কৃতি’ প্রবন্ধটি (দ্র. *বাংলা শব্দতত্ত্ব*)। তাঁর এই দীর্ঘদিনের জমে-থাকা অপছন্দের রূপটি আর-একবার প্রকাশত হল *তাসের দেশ*-এর দ্বিতীয় সংস্করণে, তার যথার্থ রূপটি ধরা রইল এর একাধিক প্রেস-প্রুফের পাতায় !

সানাই (আগস্ট ১৯৪০) কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশ পর্বে একটা সময় কিশোরীমোহন-সুধীরচন্দ্রের মধ্যে বেশ সমস্যা ঘনিয়ে উঠেছিল। প্রুফ দেখা কিংবা ছাপা চলাকালীন রবীন্দ্রনাথের বারংবার বদল করবার প্রবণতা সেই সমস্যার মূলে বলে বিষয়টি এখানে বিস্তারিত বলা যেতে পারে। ১৩ আগস্ট ১৯৪০-এ অনিলকুমার চন্দকে লেখা কিশোরীমোহনের একটি চিঠিতে এই পুরো বিতর্কটি সম্বন্ধে জানা যায়।[২৪৭] (চিঠিটির পুরো বয়ানের জন্যে দ্রষ্টব্য এই অধ্যায়ের ‘সংযোজন-২’) *সানাই* বইটির ছাপা-বাঁধাই সম্পূর্ণ হবার পর প্রকাশিত হবার কথা ছিল ৫ আগস্ট ১৯৪০। এই একেবারে শেষ বেলায় রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা সংশোধন করেন এবং শান্তিনিকেতন প্রেসে সেই পাতাটি পুনরায় ছাপা শুরু হয়ে যায়! এরপর কিশোরীমোহন লিখছেন অনিলকুমারকে, ‘আন্দাজ ৫টার সময় পুলিন বাবু ‘প্রবাসী’ অপিস থেকে আমাকে Telephone করে বলেন যে, তিনি ‘প্রবাসী’ অপিসের ঠিকানায় সুধীরবাবুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন যে একটি কবিতা পরিবর্তিত হয়েছে এবং সংশোধিত অবস্থায় শান্তিনিকেতন প্রেসে সেটা ছাপা হচ্ছে। সে-টি ছেপে এলে আগের পাতার জায়গায় এটি বদলে নিয়ে বই বাঁধতে হবে এবং তারপরে বই প্রকাশিত হবে। আমি তার আগেই বইএর দোকানে বই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সে-কথাও পুলিনকে বলি। তখন পুলিন বলেন যে বইটা বন্ধ করাই ভালো।’ শুরু হবার আগেই বই বিক্রির সিদ্ধান্ত তড়িঘড়ি রদ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পছন্দ নয়, তিনি চান বই বিক্রি যেমন চলছে চলুক ! বস্তুত, *সানাই* বইটির ছাপার কাজ অনেকদিন আগেই বেশ কয়েকমাস আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পনা মোতাবেক বইটি এতদিন ‘বাজারে’ দেওয়া হয় নি, ১৩ মে ১৯৪০-এ কিশোরীমোহনকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে এই পরিকল্পনাটির কথা জানা যায়,

'...সানাই তাড়াতাড়ি বের করবার দরকার নেই। নবজাতক বইটা পাঠকদের ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে তাড়াতাড়ি তার উপরে আর-একটা নতুন বই চাপা দিলে রস ভোগে ব্যাঘাত হবে। আমার তো বোধহয় শ্রাবণ মাসে প্রকাশ হলেই ভালো হবে।'[২৪৮] ফলে অনেক দিনক্ষণ মেপেই ৫ তারিখটি স্থির করা হয়েছিল, সহসা কবিরই খেয়ালে তা বন্ধ হবার পরিস্থিতি তৈরি হল। অবশ্য, বন্ধ করতে শেষপর্যন্ত নিষেধই করলেন রবীন্দ্রনাথ। কিশোরীমোহন পূর্বোক্ত চিঠিতেই অনিলকুমার চন্দকে লিখছেন, 'পরে ৯ই তারিখে পুলিনবাবু আমাদের অপিসে Telephone করে জানান যে সুধীর করের কাছ থেকে তিনি 'প্রবাসী' অপিসের ঠিকানায় নিম্নলিখিত চিঠি পেয়েছেন যে "গুরুদেব বলেছেন – বই যখন বাজারে একবার বেরিয়েছে তখন তাহার বিক্রী না থামানোই ভালো। যেমন ছাপা আছে তেমনিই থাক। বিক্রী চলুক।"...আমি গুরুদেবের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। যাইহোক সব ঠিক মতোই চলছে; চিন্তার কোনো কারণ নেই।' এই চিঠিতে 'গুরুদেবের কাছ থেকে' যে-চিঠিটি পাওয়ার কথা কিশোরীমোহন লিখছেন সেটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ৭ আগস্ট। সেখানে তিনি লেখেন, 'সানাই প্রকাশ বন্ধ রাখবার কথা আমি বলিনি। সুধীর কর আমার বিনা অনুমতিতে এই কর্তৃত্ব চালনা করেচে — কাজটা তারি সমুচিত হয়েছে। তার নিষেধ বাণীতে কান না দিয়ে তোমার কর্তব্য তুমি করে যেয়ো।'[২৪৯] প্রকাশ বন্ধ করার জন্যে অনিলকুমার চন্দকে দোষ দেওয়াটা অবশ্য কিঞ্চিৎ গুরুদণ্ড দেওয়া হয়ে গেল বলে মনে হয়। কোনো কবিতা যদি একেবারে শেষবেলায় নতুন করে সংশোধিত হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়কে সম্মতি জানিয়ে তাঁর অনুচরদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায় অনিবার্যই হয়ে ওঠে!

আর একটি দিকে এখানে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। *সানাই*-এর প্রকাশকাল বইটির আখ্যাপত্র অনুযায়ী 'আষাঢ় ১৩৪৭'। অর্থাৎ জুন-জুলাই ১৯৪০। অন্যদিকে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী এর প্রকাশ '৩০ আগস্ট ১৯৪০'। এই দুটো তারিখই যে নির্ভুল নয় তা এবার আমরা স্থিরভাবে বলতে পারি। অনিলকুমার চন্দকে লেখা কিশোরীমোহনের চিঠির সাক্ষ্যে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ৯ আগস্ট ১৯৪০ (২৪ শ্রাবণ ১৩৪৭ব) তারিখ থেকে যেহেতু বিক্রি শুরু হল এই বইয়ের, তাই এই তারিখটিই এর প্রকাশকাল। এখানে উদ্বেগের কথাটি হল, বিভিন্ন বইয়ের প্রকাশকাল সংক্রান্ত যে তথ্য আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাই, তারও তাহলে মধ্যে কত তথ্যভ্রান্তি থেকে যেতে পারে !

যাইহোক, এই বইটির প্রুফ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে দেখেছিলেন। প্রেস-প্রুফে তাঁরই হস্তলিপিতে বানান সংশোধন, লাইন ঠিক করে তোলার নির্দেশ আমরা দেখেছি। এমনকী, প্রতিটি কবিতার শেষে কবিতা রচনার যে-তারিখগুলি দেওয়া আছে, সেই তারিখটি লেখার পদ্ধতিটাও কবি নিজের হাতে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। যেমন, 'মায়া' কবিতার শেষে লেখা ছিল ঠিক এইভাবে একটি তারিখ, '২২|৬|৩৮', রবীন্দ্রনাথ তাকে বদলে লিখে দিলেন '২২ জুন, ১৯৩৮'। (দ্রষ্টব্য : চিত্র- ২৯) এত খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রায়-আশি বছরের এক কবি এত তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন, আমাদের বিস্ময়ের সত্যি সীমা থাকে না !

সংযোজন -১

প্রথম বিশ্বভারতী-সংস্করণ *চয়নিকা* (বৈশাখ ১৩৩১ব) প্রকাশিত হবার আগে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তর্কের কথা আমরা মূল গবেষণায় বলেছি। তাঁর নিজের প্রথম যুগের কবিতাগুলি রক্ষিত হওয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, তর্ক ছিল তা-ই নিয়ে। এই তর্কটি, আমরা দেখেছি, কবি অতঃপর আজীবন চালিয়ে যাবেন। *চয়নিকা*-য় প্রকাশের জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত একটি 'ভূমিকা'র আকারে লিখে দেন, কিন্তু লেখাটি সেই *চয়নিকা*-য় বা তার পরে কখনও প্রকাশিত হয় নি। দুষ্প্রাপ্য সেই 'ভূমিকা'টি এখানে যুক্ত করা হল।

চয়নিকার ভূমিকার জন্য

কবির নিবেদন

চয়নিকায় কবিতার বাছাই কাজ আমার নিজের দ্বারা হয় নাই, হইবার কথাও নহে। কিন্তু যেহেতু কবিতাগুলির রচনা আমারই সেইজন্য এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকারী আমি।

এক-টুকরো লোহাকে আগুনে ফেলিলে প্রথমে তাহাতে তাপ, পরে তাহাতে দীপ্তি দেখা দেয়। সন্দেহ নাই সেই তাপ দীপ্তিরই পূর্ব্বাবস্থা। এ সম্বন্ধে যাঁরা বিজ্ঞানচর্চার প্রয়াসী তাঁরা তাপমান হাতে লইয়া জ্যোতিহীন তপ্ত অবস্থা হইতে দীপ্ত অবস্থার বিকাশক্রম সন্ধান করিতে পারেন। কিন্তু আলোকপদার্থকে যাঁরা জানিতে চান না, পাইতে চান, তাঁদের পালা আরম্ভ যখন হইতে লোহাটা দীপ্যমান।

কাব্যসম্বন্ধে সে কথা খাটে। আজকাল মনোবিশ্লেষণতত্ত্ব বলিয়া এক জাতের বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সেই বিজ্ঞানের তাপমান হাতে যাঁরা কাব্যের আদিগত ও বুদ্ধিগত অবস্থা বিচার করিতে চান কাব্যের তথ্যসংগ্রহ করিতে তাঁহাদিগকে আবর্জ্জনাকুণ্ড অন্বেষণ করিতে হইবে। যাঁরা কাব্যের রসসংগ্রহ করিতে চান তথ্যের প্রতি লোলুপতা তাঁদের পক্ষে বিঘ্নকর।

কবির জীবনে কাব্যের প্রকাশ ক্রমশ তাপনা হইতে দীপনায় আসিয়া পৌঁছে। যে অবস্থায় কাব্যে তাপনা আছে দীপনা নাই সে অবস্থার মধ্যেও কাব্যের কিছু কিছু আঁচ পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাকে কাব্য বলা চলে না। অতএব কাব্যের খাতিরে তাকে নির্ম্মমভাবে বাদ দেওয়া উচিত।

আমার রচনার লেখক যদিচ আমি তথাপি আমি যে তাহার বিচারক নহি একথা আমি মানিব না। অন্তত আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি কোন্ লেখা হইতে আমার কবিতা যথার্থভাবে সুরু হইয়াছে। যাঁরা নিজের রুচি অনুসারে চয়ন করিবেন তাঁরা সেই সীমানার বাহিরে গেলে কবির উপর অবিচার করিবেন।

"কড়ি ও কোমল" হইতে আমার কবিতার পূর্ব্বপ্রত্যন্তের আরম্ভ। তা'র আগের কোনো লেখাকেই আমি কাব্য বলিয়া স্বীকার করি না। কেবলমাত্র গোত্র ধরিয়া আমার কাব্যপংক্তিতে তাহাদিগকে স্থান দেওয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের সাজে, কাব্যরসিকের কদাচ নহে। এইজন্য সেই সকল ভূতপূর্ব্ব লেখার সম্বন্ধে সর্ব্বসমক্ষে আমি কবির দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছি। সাহিত্য জীবলোক; প্রেতলোক নহে। সাহিত্যে যাহা কিছু মরিয়াছে তাহার ভূতটাকে সৎকারের দ্বারা বিদায় না করিলে যাহা কিছু বাঁচিয়া আছে তাহার প্রতি অসৎকার করা হয়। অন্ধ মুদ্রাযন্ত্রের কালী সাহিত্যে সজীব ও নির্জ্জীবকে একই দাগে দাগিয়া দেয় বলিয়াই এত উৎপাত বাড়ে, এত জঞ্জাল জমিয়া ওঠে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংযোজন -২

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক অপ্রকাশিত চিঠি আমরা আমাদের মূল গবেষণায় ব্যবহার করেছি। তার মধ্যে থেকে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির পূর্ণাঙ্গ বয়ান নীচে উদ্ধৃত করা হল। চিঠিগুলি প্রতিটিই দীর্ঘ, এবং প্রায় গোটা চিঠিই গ্রন্থালয় ও গ্রন্থনির্মাণ সংক্রান্ত প্রসঙ্গিক কথাবার্তায় পূর্ণ। কিন্তু মূল গবেষণায় স্বাভাবিকভাবেই এদের পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি দেওয়া থেকে বিরত থেকেছি আমরা, তাতে গবেষণাটির সামগ্রিক পাঠযোগ্যতায় সমস্যা হত বলে আমাদের ধারণা। এখানে রইল চিঠিগুলির হুবহু ও পূর্ণাঙ্গ পাঠ। এর সবকটি চিঠি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত ও আমাদের জানাশোনা অনুযায়ী, অব্যবহৃতও বটে।

১. কিশোরীমোহনের লেখা রথীন্দ্রনাথকে

বিশ্বভারতী

৩/৭/২৩

১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজনীয়েষু

পূজনীয়েষু

১। আপনাকে আগেই "পলাতকা"র কাগজের কথা বলেছি। কালাচাঁদবাবু আবার কাগজের জন্য লিখেছেন। পলাতকা আগে antique কাগজে ছাপা ছিল। এবারও কি সেই কাগজে ছাপা হবে? আমাদের অন্যান্য বই 28lbs. Green label Double Crown Titagarh Paperএ ছাপা হচ্ছে। আপনার চিঠি না পেলে কাগজ পাঠাতে পারছি না।

২। এখন কি বই compose করা দরকার আপনি কালাচাঁদবাবুকে বলে দেবেন। নিম্নলিখিত বইগুলি এইমত আছে :-

(ক) চতুরঙ্গ – ৬০

(খ) চিত্রা – ৩

(গ) ছিন্নপত্র (ছাপা নাই)

(ঘ) ব্যঙ্গ কৌতুক ১৭

(ঙ) শান্তিনিকেতন ১ম ২৯

(চ) ঐ ৭ম (ছাপা নাই)

(ছ) ঐ ৮ম (ঐ)

(জ) শারদোৎসব ৫

(ঝ) সন্ধ্যাসঙ্গীত ৪৮

(ঞ) গীতলিপি ২য় (ছাপা নাই)

(ট) ঐ ৩য় ২

(ঠ) ঐ ৪র্থ (ছাপা নাই)

ইহার মধ্যে গীতলিপি ১০০০ Indian Pressএর কাছ থেকে আমাদের পাওনা আছে। কিন্তু কটা কোন্ ভাগ তা আপনি আমায় যে চিঠির copy দিয়েছেন তার মধ্যে লেখা নাই। আমি পন্ডিত মহাশয়ের কাছে লিখে পাঠাচ্ছি।

৩। কালাচাঁদবাবু এখন কড়ি ও কোমল ছাপ্‌তে চেয়েছেন। কড়ি কোমল [য] এখন ১৩৩ খানা Stockএ আছে।

৪। 'ভারতী'তে আমাদের এক পাতা করে বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। ভারতী কার্য্যালয় থেকে তিন মাসের জন্য ৩৬৲ টাকার বিল এসেছে। বিলের টাকাটা সম্বন্ধে কি করবো? যে যে পত্রিকায় আচার্য্যদেবের প্রবন্ধ বের হয় তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দাবী যদি করি তা হলে সেটা কি দোষের হবে ? আমি ত এবার থেকে তাই করব মনে করেছি। আপনি কি বলেন? "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার একজন প্রতিনিধি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁদের পত্রিকায় আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য এসেছিলেন। প্রশান্তদা আমাদের বই এর বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে শান্তিনিকেতনে প্রকাশ করবার জন্য তাঁদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁরা সম্মত হলেন না।

৫। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের Prospectus আমার কিছু দরকার। নানা স্থান থেকে রাশি রাশি চিঠিপত্র prospectus এর জন্য আসে। তা ছাড়া matriculation ইত্যাদি পাশ করা অনেক ছেলে নানা সন্ধান ও prospectus এর জন্য আসে। আমি prospectus এর জন্য বারবার ওখানে লিখেছি। আজ মাত্র একটি পূর্ব্ব বিভাগের prospectus একটি উত্তর বিভাগের ও একটি শ্রীনিকেতনের – মোট তিনখানি prospectus ডাকে ওখান থেকে এসেছে। কলকাতা officeর একটা প্রধান কাজ ত –propaganda ? তার জন্য এগুলি বিশেষ দরকার বলে মনে হয়।

৬। 'Modern Review' office আমাদের ৬০০ মত [?] "Robbery of the Soil ও Rural Reconstruction" ছেপে এসেছে। এগুলি কি করব? আপাতত আমি "For Favour of Review", 'With Compliments of the Secretary, Visva-bharati, Santiniketan, Bengal" এই রকম একটা করে label লাগিয়ে নানা খবরের কাগজের সম্পাদকদের কাছে পাঠাচ্ছি। এগুলো কি বিক্রয় করা হবে?

৭। Indian Press এর সঙ্গে এখনই একটা বইএর হিসাব করে ফেলা দরকার। আমার এখানে সব কাগজপত্র নাই। যা আছে তা থেকেই একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করেছি। আপনি হঠাৎ চলে যাওয়াতে সেটা আপনাকে দেখাতে পারি নি। আপনি কতদিনে ফিরবেন? যদি বলেন ত আমি যা করেছি ওখানে পাঠিয়ে দিই। আর হিসাব করবার জন্য যে সব কাগজপত্র তার সব এখানে নাই। আমি পাঠাবার পর ওখান থেকে কিছু হিসাব ঠিক করে নিতে হবে।

৮। কাগজ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ভাল ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছি। আমাদের সমস্ত বিভাগগুলির জন্য যে কাগজ দরকার তার জন্য নানা জায়গায় নানা রকমে খুচ্‌রা না কিনে একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করা দরকার। আমরা যেমন Publisher, Book-Seller, তেমনই আমরাই যদি Paper-merchants হই তবে অনেক কিছু সুবিধা হতে পারে। এ সম্বন্ধে ২।১ জন Paper-merchantsএর সঙ্গে কোথা বলেছি, এখন একবার রামানন্দবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে সব জানাব। আর আমাদের কি 28lbs Titagarh Paper (Double Crown, Green Label) এই সব বই ছাপা হবে ? আমার কাছে ঐ কাগজের যে ৪০ রিমের order ছিল সেটা বন্ধ করে রেখেছি। আপাতত কাগজের দরকার নাই এবং কাগজের বাজার ঘুরে দেখ্‌ছি বিলাতি কাগজে খুব সুবিধা হয়। তবে বিলাতি কাগজ সম্বন্ধে আপনার মত আমি জানি না।

তার উপরে নূতন যে বন্দোবস্ত কবার চেষ্টা করছি তাতে একু বেশ সুবিধা হবার সম্ভাবা দেখা যাচ্ছে। যাহোক ২।৫ দিনের মধ্যেই একটা কিছু করতে পারব বলে ম করি।

৯। Quarterlyর Circular Forms ছাপা হয়ে গেছে। কালকে[?] Distributionএ যাবে।

আমরা কাল নূতন বাড়ীতে এসেছি। এখন বাড়ীর মেরামত শেষ হয় নি। আমরাও সব গুছিয়ে নিতে পারি নি। ইতি –

শ্রীকিশোরী সাঁতরা

২. কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

Bhowanipore Calcutta

22/5/33

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শুক্রবার রাত্রে বাড়ী ফিরে গিয়ে আপনার চিঠি পেলাম। চিঠির বিষয়গুলি আমার কাছে একটু আশ্চর্য্য ঠেকায় আজ সে বিষয়ে একটু খোঁজ নিয়ে উত্তর দিচ্ছি।

আমিয়বাবুর সঙ্গে ঐ ছবিখানি সম্বন্ধে আমার টেলিফোনে যা কথাবার্তা হয় তাতে ঠিক হয় যে আমি ঐ ছবিখানির দাবী ছেড়ে দেবো এবং ওর বদলে আপনার বাবার কাছ থেকে আর একখানি ছবি চেয়ে নেবো। ব্লকখানি ও ঐ ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্বভারতী কিনে নেবেন। আমি অমিয়বাবুকে বলি যে ঐ ব্যবস্থা যদি আপনি বা বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষ অনুমোদন করেন তবে সেই মর্ম্মে আমায় জানালেই আমি ললিত বাবুকে ব্লকখানি আপনাদের হিসাবে দিয়ে দিতে বল্‌বো।

তারপর আমি আর এবিষয়ে কিছু শুনি নাই। দিন কয়েক আগে ললিতবাবু আমাকে এসে বলেন যে কিশোরী বাবু তাঁকে ঐ ব্লকখানি U. Ray & Sonsএ পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আমি তাতে তাঁকে বলি যে এ বিষয় আমাকে definite কিছুই জানানো হয়নি সুতরাং আমি তাঁকে কোন order দিতে পারিনা, যদি বিশ্বভারতী ওখানা কিনে নিতে চা'ন তবে আমি কোন আপত্তি কোরবোনা।

শুক্রবার রাত্রে আপনার চিঠিতে দেখছি যে কিশোরীবাবু এবং করুণা আপনাকে জানিয়েছেন যে বিচিত্রিতার ছাপা ঐ ব্লক না পাওয়ায় বন্ধ হয়ে রয়েছে। একথাও মনে হয়, যে আপনি যে লিখেছেন আমার

অসুবিধার দরুণ ওঁরা ঐ ব্লক সংগ্রহ করতে পারেননি, সেটাও কিশোরী বা করুণা আপনাকে লিখেছেন। যদি তাই তাঁরা লিখে থাকেন তবে তাতে তাঁদের কার্য্যশক্তির চেয়ে কল্পনাশক্তির উর্ব্বরতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা আমার সুবিধা অসুবিধার কথা দূরে থাক, এই ব্লকখানির সম্বন্ধে ললিতবাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা করার আগে, বা ললিত বাবু আমার বিনা অনুমতিতে দিতে অস্বীকার করার পরে, আমাকে মৌখিক, টেলিফোনে বা দুজন লিখে একটু জানান উচিত বা প্রয়োজন, এটাও তাঁরা মনে করেন নি।

বিচিত্রিতার ছাপায় বাধা পড়ার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু এর জন্য কোন দায়ীত্বই আমি নিতে প্রস্তুত নই, কেননা এবিষয়ে আপনার চিঠি পাওয়ার আগে আমি কিছুই জান্‌তে পাইনি। অমিয়বাবুর সঙ্গেও যা স্থির হয়েছিল সেটারও final কিছুই হয় নি।

Album এর সর্ত্ত বা term সম্বন্ধে আপনার বাবামহাশয়ের সঙ্গে কোন কোথা হয়নি, আমিয়বাবুর সঙ্গেও না। কেবলমাত্র গতবৎসর বোলপুরে আপনার সঙ্গে কিছু কোথা হয়েছিল বলে আমার ধারণা। তাতে এই স্থির হয় যে ওখানি Royalty basisএ আমি প্রকাশ কর্‌ব এবং মূল্য ৫৲– ৭।।৹টাকার মধ্যে হবে। Royalty কত হওয়া উচিত সেবিষয়ে কোন কোথা হয়নি। সেটা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকা ভাল। এবিষয়ে আপনার মতামত যদি জানান তো ভাল হয়, এবং Landscape এর জন্য অপেক্ষা কর্‌ব কিনা তাও জানাবেন।

আশা করি আপনারা সবাই ভালই আছেন। আপনার বাবামহাশয়কে আমার প্রণাম জানাবেন। আপনি ও প্রতিমাদেবী আমার নমষ্কার[য] জানবেন। ইতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩. <u>সুধীরচন্দ্র করের লেখা রবীন্দ্রনাথকে</u>

22-4-38

শ্রীচরণেষু,

শ্রীযুক্ত কাননবাবু 'বাংলা কাব্য পরিচয়ে'র দুটি সূচী তৈরি করে প্রেসে দিয়েছিলেন, তাঁর নির্দেশক্রমে তা কম্পোজ হয়েছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু এখানে থাকাকালীন বইর ফাইল কপি, সুচী এবং পরিশিষ্টাদি

দেখতে নিয়ে গোড়ার দিকের সূচীটির সাজানো-পদ্ধতি অন্যরকম করে দেন এবং শেষদিকের "কবিতার-প্রথম-লাইনের" বর্ণানুক্রমিক সুচীটি অনাবশ্যকবোধে বাদ দেন। তাঁর নির্দেশক্রমে সূচী পুনরায় যে-রকম সাজানো হয়ে কম্পোজ হয়েছে তার প্রুফ এ সঙ্গে আপনাকে পাঠালাম। এই বইর সূচী দ্রুত ছাপিয়ে যথাশীঘ্র কলকাতায় পাঠাবার জন্য কিশোরীবাবু বলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আপনাকে না দেখিয়ে সূচীতে অদলবদল করা অত্যন্ত গর্হিত এবং অভদ্রোচিত কাজ হয়েছে, এবং এ সব আমারই দুষ্ট ইচ্ছাকৃত — এই অভিযোগে কাল কাননবাবু আমাকে অভিযুক্ত করলেন। টাইটেল, সূচী, বইর প্রথম ফর্মা, সাজানোপদ্ধতি ইত্যাদি শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু দেখে থাকেন, এবং তিনি অফিসে তখন উপস্থিত থেকে সব দেখতে চাওয়ায় তাঁকে দেখানো হয় এবং তাঁর জরুরি কথামতো কাজ হয়। তবু আপনাকে আমাদের স্থানীয় পরিচালক হিসাবে উহা দেখানো উচিত ছিল। কিন্তু এদিকে গীতবিতানের জন্য তাড়া এবং কাব্যপরিচয়েরও ছাপাশেষ করার তাড়ায় আমার তা তত খেয়াল ছিল না। শেষ ছাপার অর্ডার দেওয়ার আগে সে ত্রুটি সংশোধনের সময় আছে ভেবে আজ সূচীর প্রুফ এবং কপি এসঙ্গে পাঠালাম।

বর্ণানুক্রমিক সূচী যদি দিতে হয় তবে সেটি কবিতার প্রথম লাইনের হবে, না, কবিদের নামের বর্ণানুক্রমিক হবে, তা আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ। শ্রীযুক্ত নন্দগোপালবাবু এবং শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে একটি সূচীর খসড়া এসঙ্গে দিলাম। কবিতার চেয়ে কবিদের নাম তবু কিছু পরিচিত। তাঁদের নাম ধরেই লোকে তাঁদের কবিতা এ বইতে খুঁজবে। সুতরাং, কবিদের নামানুক্রমিক শেষের দিকে সূচী দেওয়ার উপযোগিতা হয়তো থাকতে পারে ভেবে এ প্রস্তাবটি আপনাকে জানালুম। প্রেসে দেওয়ার আগে শ্রীযুক্ত কাননবাবুকেও এ প্রস্তাবটি জানিয়েছিলুম।

শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু গোড়ার দিকে একটি সূচী দেওয়ার কথাই বিশেষ করে বলে গেছেন। এখন, আপনার নির্দেশ পেলে ছাপা শেষ করতে পারি।

সূচীতে কি ভূমিকা ও পরিশিষ্ট লেখকের নাম উল্লেখ থাকবে ?

আশা করি, কুশলে আছেন। প্রণামান্তে, ইতি

প্রণত

সুধীর

৪. সুধীরচন্দ্র করের লেখা কিশোরীমোহন সাঁতরাকে

17.9.38

মান্যবর,

শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন সাঁতরা সমীপে –

সবিনয় নিবেদন,

২য় খণ্ড গীতবিতানের কপি প্রেসে দেবার আগে কয়েকটি বিষয়ে আপনার নির্দ্দেশের অপেক্ষা করছি।

গুরুদেবের নির্দেশ মতো আমি ২য় খণ্ড গীতবিতানের ১ম বড়ো ভাগ "প্রেমে"র গানগুলিকে আবার সাজাচ্ছি; পূর্বপত্রেই সেকথা আপনাকে জানিয়েছি। ২য় গীতবিতানে ১। প্রেম, ২। ঋতু, এবং ৩। বিচিত্র – এই তিনটি বড়ো ভাগ আছে। "প্রেমে"র কপি দেখে গুরুদেব পূর্বের সাজানোর শৃঙ্খলার মধ্যে কিছু অদলবদল করতে বলায়, মনে হচ্ছে, অন্য দুটি ভাগ দেখেও হয়তো এরূপ বলতে পারেন।

গুরুদেবের দেখার পর, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আর সব কপি সাজিয়ে নিয়ে বিষয়ানুক্রমিক সূচী ও শেষের বর্ণানুক্রমিক সূচী তৈরি করে নিলে, কোনো গান ভুলে বাদ পড়ল কি না, গোটা বই ছাপা হয়ে যাওয়ার আগেই, সেটা ধরা পড়তে পারে এবং সে হলে বাদ-পড়া গান সংগ্রহ করে নিয়ে ঠিকমতো জায়গায় কপিতেই তা বসিয়ে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ সংগ্রহের কপি নিশ্চিন্তভাবে প্রেসে দেওয়া যায়। তাতে বোধ করি, ছাপা চলবার সময়ে কোনো বাধা ঘটার সম্ভাবনা থাকেনা, – তা না হলে, বর্ণানুক্রমিক সূচী না তৈরি করে কপি প্রেসে দিলে যদি কোনো গান দৈবাৎ বাদ পড়ে থাকে, তবে পরে তা জানতে পেলেও আর ঠিক জায়গায় বসিয়ে নেবার উপায় থাকবে না। তা ছাড়া কপি প্রেসে দেবার আগে পাকাপাকিভাবে কপি সাজিয়ে, কপির উপরেই বানান এবং লাইন সাজানোর নির্দেশ ইত্যাদি ঠিক করে দিলে, ছাপার সময় প্রেসের এবং প্রুফ দেখারও কিছু অসুবিধা লাঘব হোতে পারে।

আগে দুটি সূচী তৈরি করে প্রথম সংস্করণের সূচীর সহিত তা মিলিয়ে নিয়ে কপি প্রেসে দেওয়াই যদি আপনি অনুমোদন করেন, তবে বর্ণানুক্রমিক এবং বিষয়ানুক্রমিক সূচী কী রকম হবে, সে নির্দেশও জানাবেন আশা করি।

সুচী তৈরি করে, এইভাবে সব কপি পাকাপাকি ভাবে সাজিয়ে প্রেসে দিতে হোলে, পূজার আগে একাজ শেষ করা যাবে না। এতে যে সময় লাগবে, সে কথা বুঝেই আপনি প্রেস অর্ডারে নির্দেশিত সময় পরিবর্তন সম্বন্ধেও বিবেচনা করবেন আশা করি।

আমি যা ভেবেছি, পূর্বার্থে জানালাম। এরপরে, আপনার যেরূপ নির্দেশ আসবে সেইরূপেই কাজে অগ্রসর হব। নমস্কারান্তে ইতি। নিবেদন।

(স্বাঃ) শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।

৫. কিশোরীমোহন সাঁতরার লেখা রবীন্দ্রনাথকে

21.9.38

শ্রীচরণেষু,

গুরুদেব, গত পরশু সুধীর বাবুর কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েছি। [দ্রষ্টব্য : সুধীরচন্দ্র করের লেখা ১৭.৯.১৯৩৮-এর চিঠি] গত ১১ই সেপ্টেম্বর আমি যখন ওখান থেকে আসি তখন সুধীরবাবুকে বলে এসেছিলাম যে তার পর দিন সকাল বেলাই যেন তিনি আপনার কাছ থেকে গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ডের প্রেস কপি ঠিক করে নেন এবং গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ড যেন সোমবার ১৯শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রেসে যায়। তার পরে সুধীরবাবু আমাকে এই চিঠি লিখেছেন, আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা যে সুধীরবাবু এই ভাবে করলে এতে অনেক দেরী হবে। ২।১ মাসের মধ্যে গীতবিতান, ২য় ভাগ প্রেসে যাবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। গতবারে ১৯শে জুলাই তাঁকে গীতবিতানের (১ম খণ্ড) সূচী করতে বলে এসেছিলাম। তার পরে ৭ই আগষ্ট আবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছু হয় নি দেখে কি ভাবে করতে হবে তা নিজে হাতে লিখে দিয়ে এসেছিলাম। এর পরে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে যখন যাই তখনও দেখি তিনি সূচী কিছুই আরম্ভ করেন নি। অথচ তখন বই ছাপা শেষ হয়ে গেছে। বই প্রত্যেক ফরমা যেমন যেমন ছাপা হবে ঠিক তখনই তখনই সূচী করতে আমি গোড়া থেকে বলেছিলাম। যাহোক, এর পরে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে হরিপদ ও সুধীরের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদেরই কথামত ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সূচী শেষ করতে আদেশ করেছিলাম। কিন্তু এতেও তাঁরা যথাসময়ে

করেন নি। শেষের দুদিন আপনার ঘরের পাশে আলো জ্বেলে পাখা চলিয়ে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত করেছেন। ঠিক এই ভাবে যদি চলে তবে গীতবিতান ২য় ভাগ এর সূচী করতে সুদীর্ঘ কাল দেরী হবে — এই আমার মনে হয়।

আমার মনে হয় — প্রেসে দেওয়া ভাল। যদি কিছু বাদ পড়ে যায় তবে শেষে বিবিধের মধ্যে দিলেই চলবে।

আমার অশেষ প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণত সেবক কিশোরী

৬. কিশোরীমোহনের লেখা রবীন্দ্রনাথকে

210, Cornwallis Street

Calcutta

22.6.39

শ্রীচরণেষু,

গুরুদেব, গ্রন্থাবলী প্রকাশের যে কথা হয়েছে তারমধ্যে প্রথম ৫।৬ খণ্ডে যে সব বই যেতে পারে তাদের প্রকাশের তারিখ অনুসারে (Chronologically) একটি তালিকা আমি করেছি। এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। প্রথম খণ্ডে যা যাবে তা অনিলবাবু নিয়ে গিয়েছেন। চারুবাবুর কাছে শুনলাম যে প্রথমেই 'জীবনস্মৃতি' যায় – এটা আপনার ইচ্ছা। এতে ভালোই হবে। এটি আপনার কবি ও লেখক জীবনের অবতরণিকা স্বরূপ হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কোথা আমার মনে পড়ছে – আপনাকেও একবার লিখেছি। 'বঙ্গবাসী' থেকে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" বইএ আপনার লেখা যে জীবনী আছে সেটা 'জীবনস্মৃতি'র পরিশিষ্টে ছাপবার জন্য দু'একবার আপনাকে বলেছি। আপনি অনুমতি দেন-নি কিন্তু সেদিন পূজার সংখ্যা "আনন্দবাজার" এটি ছেপে দিয়েছে। আমার মনে হয় যে এই লেখাটি, 'প্রতিভাষণ', চন্দননগর সাহিত্য সম্মিলনী ইত্যাদিতে আপনার নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন সেগুলি জীবনস্মৃতির পরিশিষ্টে গেলে খুব ভালো হয়। আমি এখুনি collected

Worksএ যে 'জীবনস্মৃতি' যাচ্ছে তার মধ্যেই দিতে বলছি না – যদিও দিলে ভালো হয় – কিন্তু আগামী সংস্করণ 'জীবনস্মৃতি'তে এগুলো যায় আমার খুব ইচ্ছা।

আপনাকে আমি সেদিন লিখেছিলাম যে, প্রস্তাবিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আপনার লেখার চারটি বিভাগ হবে:– প্রথম – কবিতা, দ্বিতীয় – নাটক ও প্রহসন, তৃতীয় – উপন্যাস ও ছোটো গল্প এবং চতুর্থ – গদ্য-প্রবন্ধ প্রভৃতি। কিন্তু আপনার গানগুলির জন্য কোনো বিভাগ হবে কি-না আপনি একটু ভেবে দেখবেন। Indian Press যখন আপনার কাব্যগ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছিল তখন তারা আপনার সমস্ত গানগুলি একসঙ্গে একটি খণ্ডে (নবম খণ্ড) দিয়েছিল। আমাদের এই গ্রন্থাবলীর সংস্করণে প্রত্যেক খণ্ডেই আপনার সব বিষয়ের লেখা কিছু কিছু দেওয়া হবে। সেজন্য হয়তো প্রত্যেক খণ্ডেই কিছু গান দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু তার অসুবিধা হচ্ছে এই, যে গীতবিতানের যে-বর্তমান সংস্করণ হচ্ছে তাতে বিষয়-অনুযায়ী আপনি গান সাজিয়ে দিয়েছেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থাবলীতে সব বিভাগের লেখাই, যেমন গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি প্রকাশের তারিখ অনুসারে সাজাচ্ছি। গান যদি এই গ্রন্থাবলীর পদ্ধতি অনুসারে করতে হয় তাহলে প্রকাশের তারিখ অনুসারে (Chronologically) সাজাতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বের সংস্করণ গীতবিতানে যে রকম ছিল সে রকম করতে হয়। অথচ আমি জানি যে আপনি গানগুলি এখন বিষয়বস্তু অনুসারেই রাখতে চান। প্রথম খণ্ডের যে খসড়া দিয়েছি তাতে গান দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে এখুনি স্থির ক'রে ফেলা দরকার অর্থাৎ (১) গান প্রত্যেক খণ্ডে দেওয়া হবে কি-না (২) Indian Press এর সংস্করণের মতো সব একসঙ্গে দেওয়া হবে কি-না (৩) কী পদ্ধতি অনুসারে সাজানো হবে – বিষয়বস্তু অনুসারে – না প্রকাশের তারিখ অনুসারে। অবশ্য মায়ার খেলা 'বাল্মিকী-প্রতিভা' প্রভৃতি বইএর আকারে ছাপা উচিত – আমি সেইভাবেই তালিকা করেছি। নাটকে যেসব গান আছে সেগুলি নাটকের মধ্যেই ছাপা হবে। বাকি গানগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে।

এ সম্বন্ধে আমি আরো যা ভেবেছি তা আপনাকে লিখছি। প্রথম – বর্তমান সময়ে আপনার যে বইগুলি প্রচলিত অবস্থায় আছে এবং যে ভাবে শেষ সংস্করণে আছে সেইভাবে ছাপা হবে। খুব বেশি কিছু ভুল চুক থাকলে সেটা সংশোধিত হবে। ছাপাও যাতে নির্ভুল হয় তার চেষ্টা করা হবে; কিন্তু নানা সংস্করণের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করবার কোনো চেষ্টা হবে না অর্থাৎ আমরা চলতি বইগুলি ছেপে চলবো মাত্র। অপ্রচলিত কোনো বই এখন ছাপা হবেনা। সেগুলির মধ্যে যদি ছাপবার মতো কিছু থাকে তবে আপনার দ্বারা

অনুমোদিত হলে ও আপনি দেখে দিলে শেষে এক খণ্ডে বা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হবে। যেসব লেখা এখনো বইএর আকারে প্রকাশিত হয়নি – মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় আছে – সেগুলির সম্বন্ধেও ঠিক এইরকম ব্যবস্থা হবে। এটা না করলে গ্রন্থাবলী প্রকাশে অসম্ভব রকম দেরি হয়ে যাবে। দ্বিতীয় – দু একখানি বই আপনি পরে অন্য নাম দিয়ে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত করেছেন। সেগুলি সেই পরিবর্তিত আকারেই এবং বর্তমান নামে প্রকাশিত হবে – যেমন "পাশ্চাত্য ভ্রমণ"। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এবং 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' – দুই খণ্ড পরিবর্তিত হয়ে এই নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ'ই ছাপবো। তবে উপরোক্ত বইগুলি প্রকাশের তারিখ অনুসারে যে সময়ে পড়বে সেই সময়ে এটি ছাপবো। ভূমিকাতেও এসব বিষয়ে কিছু কিছু মন্তব্য থাকবে। তৃতীয় – অনেক বই আগে পৃথকভাবে ছাপা হয়েছিল; পরে সেগুলি অন্য বই এর অন্তর্গত হয়ে আরো কিছু লেখার সঙ্গে ছাপা হয়েছে – যেমন, 'নদী'। এটি প্রথমে পৃথকভাবে ছাপা হয়েছিল – এখন 'শিশু'র মধ্যে আছে। 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' – এগুলিও তাই, এখন 'প্রহসনে'র মধ্যে আছে। 'কথা চতুষ্টয়' এর গল্পগুলি এখন 'গল্পগুচ্ছে'র মধ্যে আছে। আমরা গ্রন্থাবলীতে ছাপবার সময়ে এগুলি বর্তমানে যে বইএর মধ্যে আছে সেই বইএর মধ্যে ছাপবো। চতুর্থ – উপন্যাসের অংশটা শেষপর্যন্ত একটু কম পড়বে অথচ ব্যবসার দিক থেকে এটার অংশ বেশি থাকা ভালো; তাই আমি 'গল্প ও উপন্যাস' একসঙ্গে একটি বিভাগ করেছি। প্রত্যেক খণ্ডেই গল্পগুচ্ছ থেকে কিছু গল্প দেওয়া চলতে পারে। তাহলে শেষ পর্যন্ত এ অংশটা কম হবে না। আমাদের বর্তমান সংস্করণের গল্পগুচ্ছ মোটামুটি প্রকাশের তারিখ অনুসারে (Chronologically) সাজানো আছে। 'গল্পগুচ্ছ'র গোড়া থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক খণ্ডে কিছু গল্প দেওয়া চলতে পারে। অবশ্য প্রথম খণ্ডে কোনো গল্প যাচ্ছে না – জায়গায় কুলোবে না। 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' – উপন্যাস যাবে। পঞ্চম – প্রত্যেক বিভাগেই বইগুলি প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুসারে সাজানো হবে। এবং গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে আপনার সব লেখা লোকে পাবে। কিন্তু একই খণ্ডের মধ্যে যে প্রত্যেক বিভাগেই যে-ঠিক একই সময়ের লেখা পাবে তা হবে না – যতটা সম্ভব এটা করা হবে। কেননা তখন হয়তো আপনি কবিতা বেশি লিখেছেন, অথচ গল্প লেখেন নি। যেমন, প্রথম দিকে অনেক গদ্য-প্রবন্ধের বই বর্তমান সময়ে আর প্রচলিত নেই বলে সেখানে গদ্যর অংশ কম পড়বে; একথা আপনাকে আগে লিখেছি। বর্তমান সময়ে যেসব গদ্য-প্রবন্ধের বই প্রচলিত

আছে তাদের অধিকাংশই ১৩১৪ সাল থেকে প্রকাশিত এবং এক বৎসরের মধ্যে অনেক বইই প্রকাশিত হয়েছিল। এসময়ে গদ্যর অংশটা বেশি হচ্ছে।

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণত সেবক

কিশোরী

৭. কিশোরীমোহন সাঁতরার লেখা অনিলকুমার চন্দ-কে

13.8.40

প্রিয়বরেষু,

অনিলবাবু, আপনার চিঠি পেয়েছি। 'সানাই' নিয়ে ভাববার কিছুই নেই। 'সানাই' এখনি প্রকাশ করা স্থির হয়েছিল। কেন-না এখন একটু ফাঁক আছে পরে আর নেই। পূজার সময় 'ছেলে-বেলা' ও রবীন্দ্ররচনাবলীর 'পরিশিষ্ট' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হবার কথা আছে। Album ও হবে। পূজার পরেই 'রবীন্দ্ররচনাবলী ৫ম খণ্ড' প্রকাশিত হবে। X'masএর সময় 'পরিশিষ্ট ২য় খণ্ড' প্রকাশিত হবে। এতেই বুঝতে পারছেন তা-হলে আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এ-অবস্থায় এখুনি প্রকাশ স্থির করি এবং চারুবাবু তাতে সম্মতি দেন। পূর্ব ব্যবস্থা মতো সোমবার (৫ই আগষ্ট) প্রকাশিত হবার হবার [য] কথা ছিল এবং দুপুরে বইয়ের দোকানে পাঠানো হয়েছিল। আন্দাজ ৫টার সময় পুলিন বাবু 'প্রবাসী' অপিস থেকে আমাকে Telephone করে বলেন যে, তিনি 'প্রবাসী' অপিসের ঠিকানায় সুধীরবাবুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন যে একটি কবিতা পরিবর্তিত হয়েছে এবং সংশোধিত অবস্থায় শান্তিনিকেতন প্রেসে সেটা ছাপা হচ্ছে। সে-টি ছেপে এলে আগের পাতার জায়গায় এটি বদলে নিয়ে বই বাঁধতে হবে এবং তারপরে বই প্রকাশিত হবে। আমি তার আগেই বইএর দোকানে বই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সে-কথাও পুলিনকে বলি। তখন পুলিন বলেন যে বইটা বন্ধ করাই ভালো। কথাটা খুবই

সমীচিন[য]; কেন-না দুদিন আগে একটি কবিতার একরূপ নিয়ে বইটি বাজারে চলবে, আর দু-দিন পরে তার জায়গায় অন্যরূপ নিয়ে চলবে – এ-টি খুবই খারাপ দেখায়। এই ভাবে বইটির বিক্রয় বন্ধ করা হয়। গুরুদেবকে আমি আগেই লিখেছিলাম যে সোমবারে বই বাজারে দেওয়া হবে। এখন সংশোধিত অবস্থায় প্রকাশিত হল কি-না তিনি জানবার জন্য চিন্তিত হবেন মনে করে এটি যে সংশোধিত অবস্থায় পরে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেছি তা তাঁকে জানাই। এর পরে সুধীর বাবুরও কাছ থেকে আমাদের আপিসেও চিঠি আসে।

পরে ৯ই তারিখে পুলিনবাবু আমাদের অপিসে Telephone করে জানান যে সুধীর করের কাছ থেকে তিনি 'প্রবাসী' অপিসের ঠিকানায় নিম্নলিখিত চিঠি পেয়েছেন যে "গুরুদেব বলেছেন – বই যখন বাজারে একবার বেরিয়েছে তখন তাহার বিক্রী না থামানোই ভালো। যেমন ছাপা আছে তেমনিই থাক। বিক্রী চলুক।" তারপর বিক্রী চলছে। সুধির[য] বাবুর কাছ থেকে আমাদের অপিসে এ-বিষয়ে কোনো চিঠি আসেনি। আমি গুরুদেবের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। যাইহোক সব ঠিক মতোই চলছে; চিন্তার কোনো কারণ নেই।

আশাকরি ভালো আছেন। আমার প্রীতি নমস্কার জানবেন। ইতি

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

পুঃ আপনার বই কোনো লোকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

উল্লেখপঞ্জি ও টীকা

১. মুদ্রাযন্ত্রটি বর্তমানে বিশ্বভারতীর 'উত্তরায়ণ' চত্বরে 'কোণার্ক' বাড়িটির সামনে সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্যে রাখা আছে।

২. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ, মে ১৯৯৭, পৃ. ২৪০

৩. কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২ব, পৃ. ৩৯৬। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত *চিঠিপত্র* পঞ্চদশ খণ্ডে (শ্রাবণ ১৪০২ব) যদুনাথ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সংকলিত হয়েছে। কিন্তু তাতে এই চিঠিটি নেই !

৪. Dutta, Krishna & Robinson, Andrew (ed). *Selected Letters of Rabindranath Tagore.* UK: Cambridge University Press, p.195.

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪০৭ব, পৃ. ৮৮-৮৯

৬. কালিদাস নাগ, *ডায়েরি,* কলকাতা : প্যাপিরাস, জুলাই ১৯৯১, পৃ. ১১৩

৭. সুপ্তি মিত্র সংকলিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ শান্তিনিকেতন,* কলকাতা : রবীন্দ্রচর্চাভবন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ.৪

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 169(ii)

১০. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত।

১১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Visva-Bharati Papers. Smasad Proceedings. Vol. I

১২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড,* কলকাতা : বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪০৬ব, পৃ. ১৫৮-৫৯

১৩. *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ পরিক্রমা,* কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৭ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ৮

১৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

১৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ব, পৃ. ২৮৭।

১৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড,* কলকাতা : বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪০৬ব, পৃ. ১৫৮, পাদটীকা

১৭. সুপ্তি মিত্র সংকলিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ শান্তিনিকেতন,* কলকাতা : রবীন্দ্রচর্চাভবন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ১৭৭

১৮. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ.৩৮

১৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

২০. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 449 (ii)

২১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

২২. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

২৩. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

২৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

২৫. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

২৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

২৭. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Visva-Bharati Papers.

২৭ক. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৭৬

২৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

২৯. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৪০

৩০. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 449 (ii)

৩১. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৯৩, পৃ.৪২৭। বইটিতে সংবাদটির উপরে তারিখ হিসেবে জানানো আছে' ২০ জানুয়ারি ১৯২৫/ ৯ মাঘ ১৩৩১'। কিন্তু ২০ জানুয়ারি ৯ মাঘ ছিল না, ছিল ৭ মাঘ। আমরা এক্ষেত্রে ইংরেজি তারিখটাকে (২০ জানুয়ারি) সঠিক বলে ধরে নিয়েছি।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ১১১

৩৩. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৯৬

৩৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

৩৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, পৃ. ২৮৭। অপিচ, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ প্রবাসী*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ৭৫-৭৬। তবে, এখানে

মূল ‘প্রবাসী’ পত্রিকা থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হল এই কারণে যে, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বইটিতে কিছু ক্ষেত্রে বানানের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

৩৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। ‘প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন’।

৩৭. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১, পৃ. ২৮১। অপিচ, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ প্রবাসী*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ৮০। এক্ষেত্রেও একই কারণে মূল ‘প্রবাসী’র পাতা থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

৩৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 449 (ii)

৩৯. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, নবম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০০৩, পৃ. ২৪০

৪০. রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন সংগ্রহ। ‘প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন’।

৪১. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৪৭

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৭ব, পৃ. ১৭৫

৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ব, পৃ. ১৭৬

৪৪. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৪১

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৪৬. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৯৬

৪৭. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৪৮

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৪৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। ‘প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন’।

৫০. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। ‘প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন’।

৫১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, পঞ্চদশ খ খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৪১১ব, পৃ. ৯৩৬

৫৩. নির্মলকুমারী মহলানবিশ, *কবির সঙ্গে য়ুরোপে*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬ব, পৃ. ২৫৫-৫৬

৫৪. প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৫ব, পৃ. ৩৮-৪০। অপিচ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০০১, পৃ. ২৯০-৯২

৫৫. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৫৩

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

৫৭. প্রবাসী, ১৩৩৯ব বৈশাখ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৫০

৫৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 449 (ii)

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ.১১৬

৬০. The Visva-Bharati Quarterly, Vol. VII, No.1, April-July 1929, p. 193

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, নবম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০৪ব, পৃ. ৬৫

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯৩ব, পৃ. ৭৮

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-৩০৩

৬৪. The Visva-Bharati Quarterly, Vol. VII, No.1, April-July 1929, p. 178

৬৫. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

৬৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

৬৭. The Visva-Bharati Quarterly, Vol. 8, PartIII, 1930-31, p. 307

৬৮. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৬০

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ১১১

৭১. আকাদেমি পত্রিকা, ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৩, পৃ. ৩

৭২. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৮৭

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ.১১৬

৭৪. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৮৯

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৭৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 449(ii)

৭৭. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], ৭৯ নং পত্রের টীকা, পৃ. ১৭০

৭৮. অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, দেশ, ২৩ বৈশাখ ১৩৬৮ব, পৃ. ২১

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১০ব, পৃ. ১০৭

৮০. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 449(ii)

৮১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

৮২. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 449(ii)

৮৩. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত

৮৪. '১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা' পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যার ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় ছবিদুটির সাদাকালো প্রতিলিপি দেখা যাবে। বইটির প্রথম ব্লার্বে দেখা যাবে দ্বিতীয় ছবিটির একটি রঙিন প্রতিলিপি।

৮৫. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৬১

৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ১৫১-৫২

৮৭. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, দ্বিতীয় খণ্ড, বীরভূম : রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ প্রকাশন, ডিসেম্বর ১৯৫২, পৃ. ৫৪৩-৪৪

৮৮. বিশ্বভারতী পত্রিকা, নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩ব, পৃ. ১

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, একাদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮১ব, পৃ.৫৬

৯০. অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, দেশ, ২৩ বৈশাখ ১৩৬৮ব, পৃ. ২৫

৯১. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ৯০

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ১৭৫

৯৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক,* তৃতীয় খণ্ড কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৪০৬ব, পৃ. ৩৯৭, পাদটীকা- ২

৯৫. The Visva-Bharati Quarterly, Vol. 8, PartIII, 1930-31, p. 352

৯৬. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ৩০, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ ১৪০৩ব, পৃ. ২০

৯৭. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ১০০

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৯৯. The Visva-Bharati Quarterly, Vol. 8, PartIII, 1930-31, pp. 307-08

১০০. কবির খড়দহ বাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : তাপস মুখোপাধ্যায়, *খড়দহে রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : জাগরী, বৈশাখ ১৩৯৭ব।

১০১. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ২৮, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৪০২ব, পৃ. ৭৫

১০২. বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৯ব, পৃ. ৪৪২

১০৩. সুধীরচন্দ্র কর, *কবিকথা,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, মে ২০১৪, পৃ. ৮৪-৮৫

১০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ.২১৭

১০৫. নরেশ গুহ সম্পাদি, *কবির চিঠি কবিকে,* কলকাতা : প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৭১

১০৬. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৭৭

১০৭. সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, শারদীয় দেশ, ১৪০৩ব, পৃ. ৩৭। অপিচ, অসিতকুমার হালদার, *রবিতীর্থে,* কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, মাঘ ১৪১৫ব, পৃ. ১৫০-৫১। তবে *রবিতীর্থ* বইটিতে চিঠিটির তারিখ অনুল্লিখিত।

১০৮. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৪-৫

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১১০. সম্প্রতি (জানুয়ারি ২০১১) বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সহায়তায় কলকাতার 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশনী স্বতন্ত্র *বিচিত্রিতা* বইটি প্রকাশ করেছেন। প্রথমবার প্রকাশের পর এটিই সচিত্র *বিচিত্রিতার* দ্বিতীয় কোনো সংস্করণ। সম্পাদনা করেছেন আশিস পাঠক। অবশ্য বইটির আকার প্রথম সংস্করণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

১১১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রশান্তচন্দ্র রানী মহলানবিশ কালেকশন।

১১২. Visva-Bharati Annual Report & Audited Account. 1933, p. 42

১১৩. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৮৯

১১৪. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ১০

১১৫. *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৪৬

১১৬. Visva-Bharati Annual Report & Audited Account.1935, পৃ.১৪

১১৭. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৭

১১৮. Visva-Bharati Annual Report & Audited Account 1936, পৃ. ৪৮

১১৯. অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, দেশ, ২১ পৌষ ১৩৬৮ব, পৃ. ৮৯১

১২০. সুধীরচন্দ্র কর, *কবি-কথা,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, মে ২০১৪, পৃ. ৮৫

১২১. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৯৫

১২২. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩ব, পৃ. ৮৮৯

১২৩. এরকম একটি বিজ্ঞাপন দেখা যেতে পারে : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিচিত্রা, মে ১৯৩৫, তৃতীয় প্রচ্ছদ

১২৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 180

১২৫. দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২ব, পৃ. ২৪

১২৬. Visva-Bharati News, June 1937 এবং July 1937, পরপর দুটি সংখ্যায় এই আলমোড়া বাসের চমৎকার বিবরণ লিখেছেন কবির তৎকালীন ব্যক্তিগত সচিব ও আলমোড়ায় কবির ভ্রমণ-সঙ্গী অনিলকুমার চন্দ। A.K.C এই ছদ্মনামে ইংরেজিতে লেখা রচনাটির শিরোনাম ‘With Rabindranth in Almora’.

১২৭. বিশ্বভারতী পত্রিকা, নন্দলাল বসু সংখ্যা ১৩৭৩ব, পৃ. ৪

১২৮. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২০১

১২৯. সুধীরচন্দ্র কর, *কবি-কথা,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, মে ২০১৪, পৃ. ৩১

১৩০. Visva-Bharati Annual Report & Audited Account, 1937 (published in April 1938), p. 6

১৩১. উজ্জ্বলকুমার দে সংকলিত, *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ – বিশ্বভারতী নিউজ,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১৪০

১৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ২৭২

১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

১৩৪. Visva-Bharati Annual Report & Audited Account, 1939 (published in March 1940), p. 55

১৩৫. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৪১

১৩৬. Visva-Bharati Annual Report & Audited Account, 1939 (published in March 1940), p. 3

১৩৭. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৩

১৩৮. প্রণতি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থ*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮৫, পৃ. ১৮

১৩৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali). Serial no. 799. অপিচ, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ২০১১, পৃ. ৫২০-৫২২। এখানে পাওয়া যাবে চিঠিটির প্রায়-পূর্ণাঙ্গ পাঠ। তবে পাঠের সামান্য কিছু হেরফের থাকার কারণে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রক্ষিত মূল চিঠি থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৪০. সুধীরচন্দ্র কর, *কবিকথা*, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, মে ২০১৪, পৃ. ৪০

১৪১. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৬

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১৪৩. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, Serial no. 799

১৪৪. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ২৭

১৪৫. *গীতবিতান*-এর এই 'বিরলপ্রচার সংস্করণ'টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে, বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের সঙ্গে তার তফাৎ ইত্যাদি বিষয়ে বোঝার জন্যে দেখা যেতে পারে নিম্নলিখিত বই দুটি :

১। সুভাষ চৌধুরী, *গীতবিতানের জগৎ*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ডিসেম্বর ২০০৬

২। প্রবীর গুহ ঠাকুরতা, *রবীন্দ্রনাথের গান*, কলকাতা : প্যাপিরাস, সেপ্টেম্বর ২০১০

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, প্রবীর গুহঠাকুরতার সম্পাদনায় এই 'বিরলপ্রচার সংস্করণ'-এর অনুরূপ একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০০৭-এর ডিসেম্বরে কলকাতার দে'জ পাবলিশিং থেকে।

১৪৬. সুধীরচন্দ্র কর, *কবিকথা*, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, মে ২০১৪, পৃ. ৩৯-৪০

১৪৭. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, Serial no. 169(i)

১৪৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, Serial no. 169(i)

১৪৯. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ২৭-২৮

১৫০. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, Serial no. 799

১৫১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, Serial no. 223

১৫২. Visva-Bharati Annual Report & Audited Account, 1938 (published in July 1939), p. 30

১৫৩. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, Serial no. 169(ii)

১৫৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত ফাইল।

১৫৫. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৩৯

১৫৬. সুভাষ চৌধুরী, *গীতবিতানের জগৎ*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১২২, পাদটীকা

১৫৭. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, Serial no. 169(i)

১৫৮. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৪১

১৫৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, Serial no. 169(i)

১৬০. ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, বৈশাখ ১৩৯২ব, পৃ.৭৭

১৬১. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ২, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ১৫৭

১৬২. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ১৮

১৬৩. কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, *মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, কোন্নগর : শ্রীনাথ নিবাস, এপ্রিল ১৯৬৩, পৃ.৭০

১৬৪. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৬,পৃ. ২০২

১৬৫. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৬৮, ১১২ সংখ্যক পত্রের টীকা

১৬৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 223

১৬৭. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ২, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ১৭৪

১৬৮. Visva-Bharati Annual Report & Audited Account, 1940 (published in January 1941), p. 25

১৬৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. File no. 223

১৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব, পৃ. ৩১০

১৭১. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৪১

১৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব, পৃ. ৩১১

১৭৩. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, *শনিবারের চিঠি রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা*, কলকাতা : নাথ ব্রাদার্স, আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ৮৬১

১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬১-৬২

১৭৫. দেশ, ১৭ চৈত্র ১৩৬৮ব, পৃ. ৭৯১

১৭৬. সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ প্রবাসী*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ৪২৮-২৯

১৭৭. *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ পরিক্রমা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৭ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ৯৭-৯৮

১৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ২৫২

১৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

১৮০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৪০১ব, পৃ. ৮৯। তবে প্রভাতকুমারের বিবরণ-মতো '১১ ফেব্রুয়ারি হইতে ৭মার্চ পর্যন্ত' রবীন্দ্রনাথ একটানা বরাহনগরে ছিলেন, তা সম্ভবত ঠিক নয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি কবি বরাহনগর-বাড়ির গৃহকর্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখছেন, 'কাল কখন জোয়ারের মুখে বোটে ওঠা সম্ভব হবে আজ রাত্তির নটার সময় রথী জানাবে।... হয়তো সকাল ৭।৮টার সময় ডাক পড়বে। তুমি কি সন্ধ্যার দিকে আর একবার আসতে পারবে, জোড়াসাঁকো তো আজ ত্যাগ করে যাচ্ছি।' (দ্র. 'দেশ', ২১ পৌষ ১৩৬৮ব, পৃ.৮৯২) ফলে এই ১৯ ফেব্রুয়ারি তো কবি জোড়াসাঁকোতে ছিলেন বটেই, এরপর 'কাল' অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি যান চন্দননগর ('বোটে'), ২১ তারিখ সেখানে ছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'-এর ২০তম অধিবেশন, সেখানে তিনি যোগদান করেন। আমাদের মনে হয় এর পরেও বেশ কিছুদিন তিনি চন্দননগরেই ছিলেন, ২৭ তারিখেও দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে তিনি চিঠি লিখছেন 'House Boat/Padma' থেকে। (দ্র. *চিঠিপত্র*, সপ্তদশ খণ্ড, মাঘ ১৪০৪ব, পৃ. ৯৩)

১৮১. কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, *মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, কোন্নগর, শ্রীনাথ নিবাস, এপ্রিল ১৯৬৩, পৃ. ১৩৫

১৮২. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 223

১৮৩. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ২৭

১৮৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 169(i)

১৮৫. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ২৮

১৮৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 169(i)

১৮৭. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত ।

১৮৮. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 223। এখানে প্রসঙ্গত একটি কথা বলা যেতে পারে। সজনীকান্ত দাস তাঁর *আত্মস্মৃতি* বইতে তাঁর দেখা নানা মানুষের সম্পর্কে খারাপ-ভালো নানা মন্তব্য করেছেন, তার সবটাই যে খুব নিশ্চিন্তে মেনে নেবার মতো তা নয়। তবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন তা বর্তমান প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে বেশ বোধগম্য ঠেকে। তিনি বলেছেন, 'যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কেও ভাল লাগিয়াছিল। প্রথম পরিচয়েই তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম; এইটুকুও বুঝিয়াছিলাম তিনি হিসাবী ভদ্রলোক। তাঁহার কাব্যবুদ্ধি তাঁহার বিষয়বুদ্ধিকে কখনই পরাভূত করিতে পারে নাই। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার মান-অভিমান অনেক সময় পীড়াদায়ক বলিয়া ঠেকিয়াছে...'। (*আত্মস্মৃতি*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৯৮) এই একই 'পীড়া' এক্ষেত্রেও ভোগ করতে হচ্ছে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কর্তৃপক্ষকে।

১৮৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 169(i)

১৯০. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ২৯

১৯১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 169(i)

১৯২. কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, *মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, কোন্নগর, শ্রীনাথ নিবাস, এপ্রিল ১৯৬৩, পৃ. ১৩৭-৩৮

১৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, উনবিংশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১১ব, পৃ. ১০-১১

১৯৪. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৩২

১৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, উনবিংশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১১ব, পৃ. ৭৯

১৯৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 169(i)

১৯৭. লেখাটি পাওয়া যাবে 'প্রবাসী'র এই ছ'টি সংখ্যায় :

১। মাঘ ১৩২৮ব, পৃ. ৪৮৭-৪৯৯ ২। ফাল্গুন ১৩২৮ব, পৃ. ৫৯২-৬০০ ৩। চৈত্র ১৩২৮ব, পৃ. ৭৪৫-৭৫১

৪। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ব, পৃ. ২১৫-২২২ ৩। আষাঢ় ১৩২৯ব, পৃ. ৩৪২-৩৪৪ ৪। শ্রাবণ ১৩২৯ব, পৃ. ৫০৭-৫১৩

১৯৮. Thomson, Edward. *Rabindranth Tagore Poet and Dramatist.* London : Oxford University Press. 1926. pp. 309-318

১৯৯. লেখাটির শিরোনাম ছিল, 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেন্ড টম্সনের বহি'। দ্র. প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৪ব, পৃ. ৫১৩-৫১৮। অপিচ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চদশ ক, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৮১৮-৮২২

২০০. বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯ব, পৃ. ৪৪০-৪৫০

২০১. Visva-Bharati News, July-August 1972, pp. 3-4

২০২. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৭

২০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* ঊনবিংশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১১ব, পৃ. ২৬-২৯

২০৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'প্রশান্তচন্দ্র-রানী মহলানবিশ কালেকশন'।

২০৫. প্রশান্তকুমার পাল সম্পা., *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সং. [ফেব্রুয়ারি ২০০৫], পৃ. ২২৩

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২০৭. *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৭-৮

২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২০৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 169(i)

২১০. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৪০

২১১. সুধীরচন্দ্র কর, *কবি-কথা,* কলকাতা : সিগনেট প্রেস, মে ২০১৪, পৃ. ৪৫

২১২. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 169(i)

২১৩. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রাগুক্ত।

২১৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 223.

২১৫. উজ্জ্বলকুমার দে সম্পাদিত, *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ – বিশ্বভারতী নিউজ,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ২৩১-২৩২

২১৬. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২১০-১১

২১৭. Visva-bharati Annual Reportand Audited Account 1939, p. 27

২১৮. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৫০

২১৯. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। প্রশান্তচন্দ্র-রানী মহলানবিশ কালেকশন।

২২০. অনাথনাথ দাস ও সুবিমল লাহিড়ী সম্পাদিত, *পুলিনবিহারী জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৯, পৃ. ৬১-৬২

২২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬। ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠার মধ্যিখানে আর্টপেপারে মূল চিঠিটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপিও ছেপে দেওয়া আছে। তবে এই চিঠিটিকে কালানুক্রম ভঙ্গ করে কেন আগে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে তা বোধগম্য নয়।

২২৩. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 407

২২৪. অনাথনাথ দাস ও সুবিমল লাহিড়ী সম্পাদিত, *পুলিনবিহারী জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৯, পৃ. ৬৩

২২৫. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 407

২২৬. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৪৩

২২৭. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence. Serial no. 407

২২৮. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৫১

২২৯. অনাথনাথ দাস ও সুবিমল লাহিড়ী সম্পাদিত, *পুলিনবিহারী জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৯, পৃ. ৫৩

২৩০. উজ্জ্বলকুমার দে সম্পাদিত, *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ – বিশ্বভারতী নিউজ*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ২৩১। তবে দু মাসে একটি করে খণ্ড যে বের করা সম্ভব নয় তা কারণ-সহ জানিয়ে দেয় বিশ্বভারতীর ১৯৩৯-এর 'Annual Report', 'The original scheme was to publish 6 volumes during each year — but difficulty of obtaining paper and binding materials may not allow of such rapid progress.' (p.27)

২৩১. রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন ২৮, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৪০২ব, পৃ. ৬৮

২৩২. Visva-bharati Annual Reportand Audited Account 1933, p. 9

২৩৩. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পৃ. ৪৫

২৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ ১৪১৯ব, পৃ. ২৪৭

২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

২৩৬. Visva-bharati Annual Report 1941, p. 9

২৩৭. Visva-bharati Annual Report 1942, p. 6

২৩৮. দুটি তথ্যের জন্যেই দ্রষ্টব্য : *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ পরিক্রমা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৭ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ৫৮

২৩৯. Visva-bharati Annual Report 1941, p. 10

২৪০. রানী চন্দ, *আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কার্তিক ১৪০৭ব, পৃ. ৭৭

২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২৪১. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'Press Proofs', serial no. 12

২৪৩. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'Press Proofs', serial no. 1(i)

২৪৪. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Manuscript & Archival Material, Accession no. 92(i-ii)

২৪৫. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'Press Proofs', serial no. 1(ii)

২৪৬. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'Press Proofs', serial no. 5

২৪৭. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Bengali Correspondence, serial no. 169(ii)

২৪৮. আকাদেমি পত্রিকা ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৩, পত্র নং ১৩৪, পৃ. ৪৪

২৪৯. প্রাগুক্ত, পত্র নং ১৩৭, পৃ. ৪৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বিশিষ্টতা

ক. ঐতিহ্য

প্রাক্-রবীন্দ্র উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত রচনা একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বিষয়ে কথা বলতে গেলে তার আগেকার ধরনটি নিয়ে অল্প কিছু আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সুদূর ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জর্জ গর্ডন-এর ছাপাখানা থেকে বেরিয়েছিল মিস এমিলি ব্রিটল নামে এক লেখিকার *দি ইন্ডিয়া গাইড অর জার্নাল অফ এ ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ* নামের এক বই। এই বইটিই হয়তো কলকাতা থেকে ছাপা প্রথম সচিত্র বই, এতে কেপটাউন শহর ও সেই শহরেরই বিখ্যাত 'টেবিল মাউন্টেন'-এর দুটি খোদাই করা ছবির দেখতে পাওয়া যায়।

১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার 'ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানি'র ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। বইটিতে ছিল মোট ছ'টি ছবি, সবগুলোই কাঠখোদাই অথবা ধাতুখোদাই করে বানানো ব্লক দিয়ে নির্মিত। বইটির চিত্রকর হিসেবে রামচাঁদ রায়ের নাম জানানো আছে, অবশ্য ছ'টি ছবির মাত্র দুটিতেই ইংরেজিতে লেখা দেখা যায়, Engraved by Ramchaund Roy', বাকি চারটি ছবিতে কোনো স্বাক্ষর নেই। সুকুমার সেন অনুমান করতে চেয়েছেন যে, ওই চারটি স্বাক্ষরহীন ছবি সম্ভবত রামচাঁদ রায়ের আঁকা বা তৈরি করা নয়।[১] যাইহোক, রামচাঁদই যে বাংলা গ্রন্থচিত্রণের আদি-পুরুষের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী এ-বিষয়ে সব বিশেষজ্ঞই সহমত পোষণ করেন।

রামচাঁদ ছাড়া উনিশ শতকে বাংলা প্রকাশনার জগতে কাঠ ও ধাতুখোদাই করে ছবির ব্লক তৈরি করায় যাঁরা বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন তাঁরা হলেন, কাশীনাথ মিস্ত্রী, রামধন স্বর্ণকার, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত, হীরালাল কর্মকার, গোপীচরণ কর্মকার, নৃত্যলাল দত্ত, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ মিস্ত্রি প্রমুখ। খেয়াল করার বিষয় হল, প্রথগত ভাবে যাঁরা স্বর্ণকার বা কর্মকার, তার বাইরের বর্গের মানুষেরাও এই কাজে এসেছেন, দক্ষতা অর্জন করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক নগর কলকাতার মিশ্রচরিত্রের সঙ্গে মানানসই। জীবিকানির্বাহের এই উপায়টির ধীরে ধীরে যত

প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে তত বেশি দক্ষ মানুষ এতে আগ্রহভরে সামিল হয়েছেন। মনে রাখতে হবে, সাধারণ বাইয়ের পাশাপাশি ছাত্রপাঠ্য বইতেও প্রথম থেকেই ছবির ব্যবহার করা হচ্ছিল। ১৮১৭-তে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' তাঁদের একেবারে প্রথম বছরেই প্রকাশ করে *ডায়ালগস্ অন মেকানিক্স্ অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমি*-র মতো সচিত্র বই, যেখানে কাশীনাথ মিস্ত্রির কিছু ধাতুখোদাই ছবি ব্যবহৃত হয়েছিল। কাঠ ও ধাতু খোদাইয়ের বিশিষ্ট শিল্পী জন লসন-ও 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'র সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। ১৮১৯-এ সেখান থেকেই তাঁর *হিস্টরি অফ দি লায়ন* নামে যে বইটি প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁরই হাতে খোদাই করা সিংহের একটি চমৎকার ছবি স্থান পায়। জেমস লং তাঁর বিখ্যাত *ডেস্ক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ বেঙ্গলি ওয়ার্কর্স*-এ এই ছবিটি সম্পর্কে লিখেছিলেন[২] যে এটি দেখে একটি স্কুলের ছেলেরা নাকি এতই ভয় পেয়ে যায় যে স্কুল থেকে সবাই ছুটে বেরিয়ে আসে! এই বিবরণে অতিকথন থাকতে পারে, কিন্তু অতিকথনের মধ্যে দিয়েও সত্যের অনেকটা ইঙ্গিত ধরা পড়ে। মোট কথা, 'Engraved' বা খোদাই করা ছবির ব্যবহারে উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধেই বাংলা প্রকাশনার জগৎ যথেষ্ট কুশলতা অর্জন করতে পেরেছিল।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে, ১৯৫৪ সালে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে জড়িত এই কাজগুলি শেখানোর কথা ভাবতে থাকেন কেউ কেউ। ১৮৫৪ সালের মে মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি 'শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা।' সভার দুই সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হজসন প্রাট সধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে একটি বিজ্ঞাপন দেন, তার থেকে এই 'সভা'র উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু কথা জানা যায় :

> উক্ত বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, কাষ্ঠ, ধাতু প্রস্তরাদির তক্ষণবিদ্যা ও মৃৎপাত্র পুত্তলিকাদির গঠনোপযোগী বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।
>
> দেশীয় শিল্প সাধ্য ব্যবসায়ের উৎসাহ ও তদুন্নতি চেষ্টা, এতদ্দেশে চিত্রকর ও তক্ষকের অভাব নিরাকরণ করা, এবং হিন্দু মোসলমান ও ইংরাজ সন্তান যাহারা কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে উপজীবিকা প্রাপ্তির ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যবসায় প্রস্তুত করা প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য, এবং তৎকার্য্য সফল করণাভিপ্রায়ে এই সাহায্য প্রত্যাশা করা যাইতেছে।[৩]

এঁদেরই উদ্যোগে কলকাতার গরানহাটায় অচিরেই শুরু হয় শিল্প বিদ্যালয়ের কাজ। সেকালের শ্রেষ্ঠ কাঠ ও ধাতুখোদাইয়ের শিল্পীরা অনেকেই এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র।

খোদাই করে ব্লক বানানো ছাড়াও, উনিশ শতকেই ছবি ছাপার আর-একটি পদ্ধতি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। তার নাম 'লিথোগ্রাফি' (Lithography)। গ্রীক শব্দ *Lithos*-এর অর্থ 'পাথর'। পাথরের উপরেই ছবি ফুটে উঠবে এখানে, তবে তার জন্যে 'খোদাই' করবার দরকার পড়বে না, রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে মূল ছবিটির একটি প্রতিলিপি তৈরি করা যাবে পাথরের উপর, যা ব্যবহার করা যাবে ছাপার কাজে। এই পদ্ধতিটির উদ্ভাবন হয় জার্মানিতে ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে। উদ্ভাবক অ্যালয় সেনেফেল্ডার (Alois Senefelder) নামক এক বিজ্ঞানী। বাংলায় অবশ্য তারও দু দশক পর থেকে এর কিছু ব্যবহারের কথা আমরা জানতে পারি। 'সমাচার দর্পন' পত্রিকায় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় :

> নূতন ছাপা প্রকরণ।—...সম্প্রতি সমাচার আসিয়াছে যে জর্ম্মণি দেশে এক প্রকার নূতন ছাপা সৃষ্টি হইয়াছে সে অতি আশ্চর্য্য তাহার বিবরণ এই।
>
> এক প্রকার কালি করিয়াছে সেই কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া এক প্রকার কোমল পাথরের উপর চাপ দিলে তাবৎ অক্ষর কাগজ হইতে উঠিয়া ঐ পাথরে লাগে কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই পাথরের উপরে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে তাহাতে অন্য কালি দিয়া কাগজ ছাপাইলে উত্তম ছাপা হয় এবং এক লক্ষ ফর্দ্দ হইলেও কিছু মন্দ হয় না আদ্যন্ত সমান ছাপা হয়। এই রূপে যে ছাপা হইতেছে সে ছাপার কাগজ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আসিয়াছে এবং সে কল ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে এবং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শীঘ্র আসিবেক।[৪]

আশিস খাস্তগীর জানিয়েছেন, ঠিক এর 'পরের বছরেই কলকাতায় লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে ছাপার কাজ শুরু হয়ে যায়।'[৫] তিনি অবশ্য এর বিস্তারিত বিবরণ জানান নি। তবে ১৯২৫ থেকে যে লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে একাধিক ম্যাপ বা নক্‌শা ছাপা হচ্ছে সেই সংক্রান্ত অনেকগুলি সংবাদ 'সমাচার দর্পন'-এ প্রকাশিত হয়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* বইটির মারফৎ সেকথা আমরা জানতে পারি। যেমন, ১৯২৫-এর ১৫ অক্টোবর 'নূতন ছবি' এই শিরোনাম দিয়ে ওই কাগজে লেখা হয়েছিল, 'কলিকাতার পাথরীয়া ছাপাখানাতে খাজরী অবধি কানপুর পর্য্যন্ত গঙ্গানদীর এক নক্‌সা ছাপান গিয়াছে এবং গঙ্গার উভয় তীরে যত গ্রাম আছে সে সকল তাহাতে লিখিত আছে'।[৬] এই বিবরণে 'পাথরীয়া ছাপাখানা' বলতে লিথোগ্রাফিক প্রেসকেই বোঝানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের অলংকরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় খোদাই-করা কাজ, অথবা লিথোগ্রাফির মাধ্যমে সৃষ্টি।

এর পাশাপাশি আরও একটি ছবি-ছাপার পদ্ধতি উনিশ শতকের একেবারে শেষ থেকে বাংলাদেশে চালু হতে শুরু করে। আমাদের পক্ষে এ বিষয়ে অতিরিক্ত গৌরবজনক তথ্য হল, সেই পদ্ধতিটির কারিগরি-অগ্রগতির পিছনে অন্যতম এক নায়ক একজন বাঙালি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী(১৮৬৩-১৯১৫)।

এই কারিগরি-বিদ্যাটির পোষাকি নাম 'হাফটোন স্ক্রিন'। উইলিয়ান হেনরি ফক্স ট্যালবো (William Henry Fox Talbot, 1800-1877) নামের এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী প্রথম তাত্ত্বিকভাবে এই ধারণাটির কথা বলেন ১৯৩০-এর দশকে। অবশ্য এই পদ্ধতিতে ছাপার কাজ শুরু হয় অনেক পরে। ১৮৭৩-এর ২ ডিসেম্বর 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি গ্র্যাফিক' পত্রিকায় আমেরিকার 'স্টেইনওয়ে হল' নামের একটি ভবনের ছবি ছাপা হয় এই হাফটোন স্ক্রিনের সাহায্যে, সেটিকেই এই পদ্ধতিতে ছাপা প্রথম ছবির মর্যাদা দেওয়া হয়।

এই নতুন বিদ্যাটি একেবারে নিজের চেষ্টায় দ্রুত আয়ত্ত করে নেন উপেন্দ্রকিশোর, নিজেরই উদ্‌যোগে বিলেত থেকে বইপত্র ও যন্ত্রপাতি আনিয়ে নিয়ে। এই বিষয়ে তাঁর দক্ষতার কথাটি চমৎকার করে বুঝিয়েছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ[৭], আমরা তাঁর লেখার অনুকরণে সেটি সংক্ষেপে জানাচ্ছি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ১৮৯৭-এর ২ জুলাই উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ছাপাখানা 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স'-এর তরফ থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয় যে তাঁরা প্রত্যেক ইঞ্চি-পিছু ৭৫, ৮৫, ১২০, ১৩৩, ১৭০, ২৪০ এবং ২৬৬ বিন্দু-বিশিষ্ট হাফটোন স্ক্রিন তৈরি করতে পারেন। সেকালে তো এসব অকল্পনীয় ছিল বটেই, সিদ্ধার্থ ঘোষ জানাচ্ছেন, তার ১০০ বছর বাদেও, ১৯৯০-এর দশকের কলকাতাতেও কোনো মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ ১৩৩টি বিন্দুর বেশি সূক্ষ্ম হাফটোন স্ক্রিনের কথা শোনেন নি। তাহলে, এ কি উপেন্দ্রকিশোরের বিজ্ঞাপনী-চমক? সিদ্ধার্থ তাঁর লেখায় বুঝিয়েছেন এই দাবির আসল রহস্য। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ৮৫, ১২০ ও ১৩৩ সংখ্যা তিনটিকে দ্বিগুণ করলে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭০, ২৪০ ও ২৬৬। সিদ্ধার্থ ঘোষ জানাচ্ছেন, 'উপেন্দ্রকিশোর ৮৫, ১২০ ও ১৩৩ লাইনের গ্লাস স্ক্রিনের সাহায্যেই বিশেষ কৌশলে স্ক্রিন লাইনের দ্বিগুণ সুক্ষ্মতা আনতে পেরেছিলেন হাফটোন ছবিতে।' লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'পেনরোজ' ('Penrose's Pictorial Annual') নামের একটি পত্রিকা ছবি ও গ্রাফিক-আর্ট জগতের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য হয়। ১৮৯৭ থেকে ১৯১২-র মধ্যে এই পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোরের ন'-ন'টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 'হাফটোন ফটোগ্রাফি'-র উপর। এই গৌরব আজ অবধি দ্বিতীয় কোনো ভারতবাসী অর্জন করতে পারেন নি। এরই একটি লেখায় উপেন্দ্রকিশোর জানিয়েছিলেন স্ক্রিনের সূক্ষ্মতাকে এই

দ্বিগুণিত করে ছাপার কলাকৌশল।[৮] এই আশ্চর্য মানুষটির অসামান্য বৈজ্ঞানিকবীক্ষা ও শিল্পবোধ বাংলা মুদ্রণশিল্পকে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

হাফটোন-স্ক্রিন বিষয়ে উপেন্দ্রকিশোরের বিশেষজ্ঞতার আর-একটি চমকপ্রদ প্রমাণ আমরা এখানে দিতে চাই। উপেন্দ্রকিশোর-পুত্র সুকুমার রায়(১৮৮৭-১৯২৩) বিশ্বখ্যাত 'স্কুল অফ ফটো-এনগ্রেভিং লিথোগ্রাফি' নামক প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্যে ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে পৌঁছন। সেখান থেকে বাবা উপেন্দ্রকিশোর এবং মা বিধুমুখী দেবীকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি নিজের পড়াশোনার অগ্রগতির নানা খবরে পরিপূর্ণ। সেরকমই একটি চিঠিতে ১০ নভেম্বর [১৯১১] মা-কে সুকুমার জানাচ্ছেন তাঁর 'লিথোগ্রাফি' বা 'এন্‌গ্রেভিং'-এর ক্লাসের কথা এইরকম প্রশংসাভরা বাক্যে, 'সোমবার সন্ধ্যার সময় Lithography আর Collotype-এর জন্য একটা ক্লাশ হয়। এই সোমবার সেই ক্লাশে গিয়েছিলাম —Mr. Griggs-এর সঙ্গে আলাপ হ'ল — অতি চমৎকার লোক।... এমন যত্ন করে দেখান — আমার খুব ভাল লাগল।... কাল প্রুফ তোলা দেখছিলাম — কিছু কিছু নতুন শেখা গেল।'[৯] কিন্তু যখন 'হাফটোন'-বিষয়ক ক্লাসটি হচ্ছে, তার সম্পর্কে ছাত্র সুকুমারের মূল্যায়ন এর সম্পূর্ণ বিপরীত, ওই একই চিঠিতে মা-কে সেকথাও লিখে জানাচ্ছেন তিনি, 'হাফটোন আর three colour এরা যা করে সে কিছুই নয়। দু তিনটা three colour-এর প্রুফ তুলল একটাও রঙ ঠিক হয় নি। সেইগুলোকেই Touch ক'রে ব্লক করতে লাগল — আমাকে বলল প্রথম প্রুফে এর চেয়ে ভাল রং হয় না। আমি বললাম নেগেটিভ ঠিক হ'লে প্রায় ছবির মত প্রুফ হওয়া উচিত।' তো, এই-যে বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠানের মাস্টারমশাইদের থেকেও ছাত্র বেশি জানেন কোনো-একটা ব্যাপারে, তার একমাত্র কারণ তো এই যে ছাত্রটির পিতা সেই ব্যাপারে বিশ্বের অগ্রণী বিশেষজ্ঞ, বা, তাঁকে মৌলিক-অর্থে 'বিজ্ঞানী' বললেই ঠিকঠাক বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুকুমারেরও দুটি 'হাফটোন' বিষয়ক প্রবন্ধ পরবর্তীকালে ছাপা হবে গৌরবময় 'পেনরোজ' পত্রিকায়। এবং, সুকুমার নিজে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী ও স্নেহভাজন, এই কথাটিও এখানে স্মরণীয়।

উপেন্দ্রকিশোরের হাতে ১৮৯৫ সালে ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেন – এই ঠিকানায় গড়ে ওঠে 'ইউ রায়' নামের প্রতিষ্ঠানটি। তখন অবশ্য এটি শুধু ব্লক তৈরি করত, ছাপার কাজ করত না। ১৯১০ সালে ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটে আত্মপ্রকাশ করে 'ইউ. রায় এন্ড সন্স', একটি পুরোদস্তুর প্রকাশনা হিসেবে। অবশ্য তখনও এঁদের

নিজস্ব ছাপাখানা গড়ে ওঠেনি। সেটি গড়ে ওঠে ১৯১৩ বা ১৯১৪ সালে, সেইসময় থেকেই ফের ঠিকানা বদলে এটি উঠে আসে বিখ্যাত ১০০নং গড়পার রোডের 'রায়'-পরিবারের নিজস্ব বাড়িতে। আমরা আগেই দেখেছি, 'শান্তিনিকেতন প্রেস'টি গড়ে ওঠার সময়ে, ১৯১৮ সালে, রবীন্দ্রনাথের মনে পড়বে এই পরিবারটিরই কথা, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৬ জুন ১৯১৮ সালে তিনি লিখবেন, 'ছাপাখানাটাকে খাড়া করা গেছে। একজন লোকের দরকার যিনি বলে দিতে পারেন কি কি জিনিসের প্রয়োজন এবং তার খরচ কত। সুকুমারের ভাই শুনেছি ওস্তাদ। কিন্তু বড় ওস্তাদ না হলেও চল্‌বে – একজন লোক যাঁর ছাপাখানা চালাবার অভিজ্ঞতা আছে যিনি দরদস্তুর ও আইনকানুন জানেন এমন কাউকে দিন দুয়েকের জন্যে কি পাওয়া যায় না।'[১০] এই চিঠিতে সুকুমারের ভাই সুবিনয় রায়ের প্রসঙ্গ থাকলেও, আমরা দেখিয়েছি, শেষপর্যন্ত সুকুমার রায় নিজেই শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন নতুন প্রেসটির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিতে। পরবর্তীকালে, রবীন্দ্রনাথের অন্তত দুটি বই ছাপা হয় 'ইউ. রায় এন্ড সন্স' থেকে। প্রথমটি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পূরবী* (১৯২৫) এবং দ্বিতীয়টি ছবি-কবিতায় মেশানো বই *বিচিত্রিতা* (১৯৩৩)।

আমরা খেয়াল করে দেখেছি, উনিশ শতকে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের বইই সাধারণত অলংকৃত রূপে প্রকাশিত হত। অলংকৃত সমস্ত বইয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা কোথাও নেই, তবু এই বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণায় যা দেখা যায় তার থেকে আমরা সেই বইগুলিকে বিষয়গতভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। সেগুলি নিম্নরূপ :

ক) বটতলায় ছাপা নানাধরণের বই

খ) ধর্মগ্রন্থ (পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত-সহ)

গ) পঞ্জিকা

ঘ) মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় লেখা 'ধর্মীয়' আখ্যান (যেমন বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য)

ঙ) উনিশ শতকীয় নকশা-জাতীয় গ্রন্থ এবং প্রহসন (যেমন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, ১৮৬১। ১৮৭০-এ প্রকাশিত টেকচাঁদ ঠাকুরের সচিত্র *আলালের ঘরের দুলাল* কেও এই 'নকশা' জাতীয় গ্রন্থ হিসেবে ধরাই ভালো, কেননা 'উপন্যাস' নামের ফর্মটা তখনও সাধারণভাবে প্রচারিত হয় নি। *আলালের ঘরের দুলাল*-এর মধ্যে রয়ে গেছিল একধরণের লঘু চলন, সেটাও খেয়াল রাখা দরকার।)

চ) স্কুল ও উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্য গ্রন্থ

ছ) শিশুকিশোরের জন্য লেখা বই

জ) প্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ক গ্রন্থ (যেমন, *ঠাকুরদাদার হস্তিবিষয়ক ইতিহাস*, ১৮৫১। *উদ্ভিদবিচার*, ১৮৭৬)

ঝ) সঙ্গীত-বিষয়ক কিছু বই (যেমন *সঙ্গীততরঙ্গ*, ১৮১৮। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সেতার শিক্ষার বই *যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা*, ১৮৭৮)

ঞ) জীবনীগ্রন্থ (যেমন, প্যারিচাঁদ মিত্রের *ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত*, ১৮৭৮। যোগীন্দ্রনাথ বসুর *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, ১৮৯৩)

ট) কলকাতা ও তৎসংলগ্ন নগরের গড়ে ওঠা এবং তার ইতিহাস সম্পর্কিত বই (কালিদাস মৈত্রের *বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে*, ১৮৫৫)

ঠ) অনুবাদগ্রন্থ (যেমন *রবিনসন ক্রুশোর জীবনবৃত্তান্ত*, *পল এবং বর্জিনিয়ার জীবনবৃত্তান্ত*)

এই ১২টি বিষয়ের বাইরেও হয়তো কিছু সচিত্র বই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে এই তালিকায় *যে সমস্ত বই নেই*, তার ধরনগুলি বেশ স্পষ্ট। এই তালিকায় নেই কাব্যগ্রন্থ, নেই প্রবন্ধগ্রন্থ, নেই উনিশ শতকীয় ‘মেইনস্ট্রিম’ আখ্যানগুলি। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের বই বলতে যে ‘বিষয়’গুলিকে আমরা বুঝি, উনিশ শতকে সেই ধরণের বই অলংকৃত হয়ে প্রকাশিত হওয়াটা দস্তুর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের অলংকরণ বিষয়ে আলোচনার আগে এই ভূমিকাটুকু মনে রাখলে সুবিধা হতে পারে।

খ. রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ-ভাবনা

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের অলংকরণ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। অভীককুমার দে-র *রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ* বইতে সেই বিবরণ ধরা আছে। এছাড়া সুশোভন অধিকারী ‘১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি (ডিসেম্বর ২০১৩) থেকেই ধারাবাহিকভাবে ‘বিশ্বভারতীর বই’ শীর্ষক যে রচনা লিখে চলেছেন সেখানেও রবীন্দ্রগ্রন্থের অলংকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তিনি করছেন। এই দুই লেখকই ছবির শিল্পরূপ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ফলে রবীন্দ্রনাথের বই ধরে ধরে তার অলংকরণের বিস্তারিত বিবরণ রচনা আমাদের

গবেষণার পক্ষে বাহুল্য হবে। আমরা কেবল দেখতে চাইব, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বিষয়ে জীবনের বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ কী ভেবেছেন, তাঁর ভাবনার কোনো বিবর্তন লক্ষ করা যায় কি না, সেইটুকুই।

রবীন্দ্রনাথের দুই-শতাধিক বইয়ের মধ্যে অলংকৃত বা চিত্রশোভিত বইয়ের সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ১৩টি।[১১] সেগুলির নাম ও আনুষঙ্গিক তথ্য নিচে জানানো হল :

১। *চিত্রাঙ্গদা,* ১৮৯২। ৩২টি ছবি। প্রতিটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা। লিথোগ্রাফ প্রিন্টিং।

২। *শারদোৎসব,* ১৯০৮। যামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা প্রথম ও চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি। ভিতরে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা ১টি ছবি।

৩। *চয়নিকা,* ১৯০৯। ৭টি ছবি। সবকটিই নন্দলাল বসুর ওয়াশ পেইন্ট।

৪। *জীবন-স্মৃতি,* ১৯১২। ২৪টি ছবি। তার মধ্যে ২৩টি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইনিজ কালির ব্রাশ ড্রয়িং। একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা পেনসিল স্কেচের উপর গগনেন্দ্রনাথের কালি-তুলির ব্রাশ ড্রয়িং।

৫। *রক্তকরবী,* ১৯২৬। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ৯টি ছবি। তার সঙ্গে শেষ পৃষ্ঠায় 'টেল পিস' হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির কাটাকুটিতে গড়ে ওঠা একটি নকশা (Doodle)।

৬। *সহজপাঠ,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৩০। নন্দলাল বসুর উডকাট, লিনোকাটের বিখ্যাত ইলাস্ট্রেশন।

৭। *বিচিত্রিতা,* ১৯৩৩। ছবি দেখেই লেখা কবিতা। ৩১টি ছবি, ৩১টি কবিতা। যাঁদের ছবি আছে তাঁরা হলেন : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, গৌরী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ কর, সুনয়নী দেবী, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রতিমা দেবী, মনীষী দে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

৮। *প্রাক্তনী,* ১৯৩৫। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সামনে যেসব অভিভাষণ দিয়েছিলেন কবি, সেগুলিকে একত্রিত করে 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ' প্রকাশ করে এই পুস্তিকাটি। প্রচ্ছদ ও ব্যাককভারের ছবি ছাড়া আর ছিল ৮টি ছবি। শিল্পীরা হলেন মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

৯। *খাপছাড়া,* ১৯৩৭। রবীন্দ্রনাথের নিজের ইলাস্ট্রেশন। বেশিরভাগ পেনে আঁকা। কয়েকটি প্যাস্টেল, কয়েকটি জলরঙ।

১০। *সে,* ১৯৩৭। রবীন্দ্রনাথের নিজের ইলাস্ট্রেশন।

১১। *ছড়ার ছবি,* ১৯৩৭। নন্দলাল বসুর ৩৮টি ছবি।

১২। *বিশ্ব-পরিচয়,* ১৯৩৭। তিনটি ছবি। 'অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা', হ্যালির ধূমকেতু ১৯১০' এবং 'শনি ও পৃথিবীর আয়তনের তুলনা'। আলোকচিত্র নয়, এগুলি আঁকা ছবি। তবে শিল্পীনাম দেওয়া নেই। সম্ভবত কোনো বিদেশী প্রকাশনা থেকে ছবিগুলো 'কপি' করে দেওয়া হয়েছে।

১৩। *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,* ১৯৪১। দুটি মাত্র প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত এই পুস্তিকা নন্দলাল বসুর চিত্রাঙ্কিত। মোট তিনটি ছবি। একটি আখ্যাপত্রে, অন্যদুটি ছবি দুটি অধ্যায়ের 'টেল-পিস' হিসেবে ব্যবহৃত।

এই তালিকাটি বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয়েছে, গ্রন্থ-অলংকরণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিভিন্ন সময়ে নানা দ্বিধা কাজ করে গেছে। কথাটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

উপরের তালিকা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৯২ সালে প্রকাশিত *চিত্রাঙ্গদা*-ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম অলংকৃত গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথই কীভাবে তরুণ অবনীন্দ্রনাথকে (তখন তাঁর বয়স সবে ২০-২১ বছর) উৎসাহ দিয়ে ডেকে আনছেন এই বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের কাজ করবার জন্যে, প্রতি মুহূর্তে প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছেন তাঁকে, সে কথা অবনীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথায় :

> বসলুম পাকাপাকি স্টুডিয়ো ফেঁদে। রবিকা খুব উৎসাহ দিলেন। সেই স্টুডিয়োতেই সেই সময় রবিকা চিত্রাঙ্গদার ছবি আঁকতে আমায় নির্দেশ দিচ্ছেন, ফোটোতে দেখেছ তো? চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে, রবিকা বললেন, 'ছবি দিতে হবে।' আমার তখন একটু সাহসও হয়েছে, বললুম, 'রাজি আছি।' সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি।[১২]

আমরা আগেই দেখেছি, উনিশ শতকে সাধারণভাবে কাব্যগ্রন্থ অলংকৃত হয়ে প্রকাশিত হত না। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত অভূতপূর্ব। যদিও এর পশ্চাতে তাঁর দুজন কাছের মানুষের পরোক্ষ প্রেরণা কাজ করে থাকা সম্ভব। অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'রবিকা' তাঁর প্রেরণা, আমাদের মনে হয়, তরুণ অবনীন্দ্রনাথই তাঁর রবিকাকে পরোক্ষে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি নিতে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১)।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উৎসাহে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকাটি (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৯২ব/ এপ্রিল ১৮৮৫) ছিল একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। অবনীন্দ্রনাথই জানিয়েছেন এই পত্রিকার কাজ হবে বলে জ্ঞানদানন্দিনী নিজের

খরচে ‘লিথোগ্রাফ প্রেস করে দিলেন তাঁর বাড়িতে।’[১৩] [৪৯নং পার্ক স্ট্রিট-এ থাকতেন তখন জ্ঞানদানন্দিনী। লিথোগ্রাফ প্রেস কি এই ঠিকানাতেই খোলা হয়? ‘বালক’ পত্রিকায় ছাপাখানা হিসেবে ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস’-এরই নাম থাকত। তবে কি ছবিগুলি ছাপা হত পার্ক স্ট্রিটে, লেখা-অংশ ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে?] এই পত্রিকার পাতাতে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতায় অলংকরণ করেন হরিশ্চন্দ্র হালদার, লিথোগ্রাফ যন্ত্রেই তা সেগুলি ছাপা হয়। এই সময়েই একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) *স্বপ্নপ্রয়াণ* কাব্যগ্রন্থটি চিত্রিত করার কথা মাথায় এল অবনীন্দ্রনাথের, জোড়াসাঁকোর ধারে বইতেই পূর্বোল্লিখিত অংশে লিখছেন তিনি, ‘স্বপ্নপ্রয়াণে ছবি আঁকবার যখন খেয়াল হল তখন আমি ছবি আঁকায় একটু একটু পেকেছি।... ‘স্বপন রমণী আইল এমনি, নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ’ এমনি সব ছবি, তখন সত্যি যেন ‘খুলে দিল মনোমন্দিরের চাবি’।’ এই অলংকৃত ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ অবশ্য গ্রন্থাকারে বেরোয় নি, ঈশ্বরীপ্রসাদ নামে এক মুদ্রণশিল্পীর লিথোগ্রাফে ছবিগুলি প্রকাশিত হল ‘সাধনা’-য়, রবীন্দ্রনাথেরই পরামর্শে।

‘বালক’-এ হরিশ্চন্দ্র হালদারের কবিতার অলংকরণ এবং *স্বপ্নপ্রয়াণ*-এ অবনীন্দ্রনাথের অলংকরণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাব্যগ্রন্থে অলংকরণে প্রেরণা জুগিয়েছিল, তা আমরা বলতেই পারি।

যদিও সেইসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখার। প্রথমত, *চিত্রাঙ্গদা*-র ‘বিষয়’ কতকটা বড়ো অর্থে ‘পৌরাণিক’, ফলে সেদিক থেকে উনিশ শতকীয় গ্রন্থ-অলংকরণের ধারায় একে খুব বেশি ব্যতিক্রমী হয়তো বলা চলে না। আর দ্বিতীয় কথা, এইটিই অধিক জরুরি যে, *চিত্রাঙ্গদা*-র যে দ্বিতীয় সংস্করণ হল ১৮৯৪ সালে, (‘বিদায় অভিশাপ’ কাব্যটিকে জুড়ে নিয়ে *চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ* নামে) সেখানে কিন্তু ছবিগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বইটি যতবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, কখনই ছবিগুলি ব্যবহৃত হয় নি। একে কি গ্রন্থ-অলংকরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধার একটি চিহ্ন হিসেবে ধরা যায় না?

উনিশ শতকে *চিত্রাঙ্গদা* ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর-কোনো গ্রন্থ অলংকৃত হয়ে বেরোয় নি বটে, তবে আর-একটি বই বেরোতে পারত। সেটি হল, ‘বালগ্রন্থাবলী’ সিরিজের অন্তর্গত হয়ে *নদী* কাব্যগ্রন্থটি। *নদী* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেখানে কোনো চিত্র ছিল না। কিন্তু অলংকৃত করে প্রকাশ করবার পরিকল্পনাই যে প্রথম থেকে ছিল তা বোঝা যায় ১৮৯৫-এর অক্টোবর মাসের গোড়ায়[১৪] গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠি থেকে :

> অবন কি আমার সেই কবিতার বইয়ের ছবির কোন বন্দোবস্ত করতে পেরেছে? রাহাকে দিয়ে তার এনগ্রেভিং করিয়ে নেওয়াই বোধ হয় সব চেয়ে সুবিধে। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরবাবু কি তাঁর designএর কোন ব্যবস্থা করেছেন?[১৫]

বই প্রকাশিত হওয়ার আগে কোনো 'বন্দোবস্ত' করা যায় নি, তবে প্রকাশের পর একটি মুদ্রিত বইয়ের পাতায় পাতায় ২১টি ছবি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রকিশোরও স্বতন্ত্রভাবে এঁকেছিলেন কিছু ছবি। এঁকেছিলেন যে, তা কি রবীন্দ্রনাথ জানতেন? বলা মুশকিল। তবে অন্তত তাঁর রবিকা-কে এ বিষয়ে কিছুই জানান নি অবনীন্দ্রনাথ, এটা কিছু অবিশ্বাস্য *ঠেকে*। তবে ঘটনা হল, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে সচিত্র *নদী* কখনই প্রকাশিত হয়ে উঠতে পারে নি।

মোট কথা, গোটা উনিশ শতকে এক *চিত্রাঙ্গদা* ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো সচিত্র বই বেরোলো না। এরপর ফের ১৯০৮-এ *শারদোৎসব*-এ (১৯০৮) দেখা গেল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা একটি ছবি বইয়ের মধ্যে যুক্ত হয়েছে। এর প্রচ্ছদভাবনাও বেশ অভিনব, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা অলিভ রঙের জমির উপর সাদা রঙে উড়ে-যাওয়া হাঁস আর নীচে একগুচ্ছ কাশ। হঠাৎ *শারদোৎসব*-এ অলংকরণ ফিরে এল কেন? এর পিছনে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব কম, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশি। তখন সবে 'ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস' রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের দায়িত্ব পেয়েছে, আর এই প্রকাশনীটির দায়িত্বে আছেন চারুচন্দ্র। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'আমি যখন কলিকাতার ইন্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউসের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম, তখন আমি এই পুস্তক প্রকাশ করি। ইহাকে লোচন-রোচন করিবার জন্য ইহার আকার করি একটু নূতন ধরণের, — প্রাচীন পুঁথির আকারের, এবং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া ইহার প্রচ্ছদের ও মুখপাতের জন্য দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লই।'[১৬]

শারদোৎসব-এর হাফটোন ছবির 'সাফল্য'-এ উৎসাহিত হয়েই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ *চয়নিকা* (১৯০৯)-র জন্যে অলংকরণের কথা ভাবতে পারলেন। আর এইসূত্রে তাঁর পরিচয় হল নন্দলাল বসুর সঙ্গে। আমাদের গবেষণার 'ইন্ডিয়ান প্রেস' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এইটিই অলংকরণ-সম্পর্কে এই সময়কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'প্রোজেক্ট', কেননা এই প্রথমবার গীতিকবিতার অলংকরণের জন্যে ভাবছেন তিনি, *চিত্রাঙ্গদার* কাহিনিমূলকতা বা *নদী*-র ল্যাণ্ডস্কেপের থেকে গীতিকবিতার অনির্বচনীয়

ভাববস্তুকে ছবিতে ধরা নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন কাজ ছিল। ছবির নন্দন আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু নন্দলালের ছবি যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেছিলেন তার প্রমাণ বইটি প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত মন্তব্যটিতে ধরা আছে, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন, 'এই ছবিগুলোর জন্যই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম কারণ এগুলি আমার রচনা নয়। নন্দলালের পটে যেরকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল।'[১৭] 'নন্দলালের পট' যে তিনি পছন্দ করেছিলেন তা স্পষ্ট করেই বোঝা যায় এখানে।

১৯০৮-এর *শারদোৎসব,* ১৯০৯-এর *চয়নিকা*-র পথ বেয়ে এল ১৯১২-র *জীবন-স্মৃতি*। শারদোৎসব-এর মতো এরও ছবির প্রাথমিক পরিকল্পনা ও উদ্‌যোগ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নয়। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর *পিতৃস্মৃতি* বইতে গোড়ার কথাটা জানিয়েছেন, 'সেই সময়ে বাবার লেখা জীবনস্মৃতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমি এই বইয়ের জন্য তাঁকে [গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে] ধরি ছবি এঁকে দিতে। এই ছবিগুলির দ্বারাই বোধ করি তাঁর শিল্পী-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।'[১৮] আমরা 'ইন্ডিয়ান প্রেস-পর্ব' অধ্যায়ে জানিয়েছিলাম যে *জীবন-স্মৃতি* ছাপার দায়িত্ব ছিল মূলত রথীন্দ্রনাথ এবং কবির-জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর। ফলে বইটির সজ্জা রথীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পিত এই বিবরণ খুবই বিশ্বাসযোগ্য। তবে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিয়েই কাজ করা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে ছবিগুলির ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন তার অনেক প্রমাণ আমরা আগে দিয়েছি। বইটি প্রকাশিত হলে বিলেত থেকেই বিভিন্নজনের কাছে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলির সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন তিনি, তার একটি উদাহরণই এখানে যথেষ্ট হবে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৪ ডিসেম্বর ১৯১২) আমেরিকার ইলিনয় থেকে লিখছেন কবি, 'গগনের এই ছবিগুলি যে আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে জড়িত হয়ে রইল এতে আমি ভারি আনন্দ বোধ করচি।'[১৯]

বিশ শতকের এই সময়টাই গ্রন্থ-অলংকরণকে বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে খোলা-মনে গ্রহণ করার কাল। গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালকে পাশে নিয়ে বিভিন্ন সংরূপের বইতেই ছবি দেওয়ার কথা ভাবতে পারছেন তিনি। গীতিকবিতা, আত্মজীবনী এমনকী ছোটগল্পের বইতেও! আমরা দেখেছি, উনিশ শতকের গ্রন্থ-অলংকরণের ধারায় এই সংরূপের গ্রন্থগুলি কিন্তু সাধারণভাবে অলংকৃত হয়ে প্রকাশিত হত না।

আমরা এক্ষুণি বললাম, ছোটগল্পের বইয়ের কথা। না, রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প-গ্রন্থ শেষপর্যন্ত চিত্রভূষিত হয়ে প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এর কাছাকাছি সময়ে কোনো-একটি চিত্রশোভিত গল্পসংকলনের আয়োজন যে চলছিল তাতে সন্দেহ নেই। অসিতকুমার হালদারকে লেখা নন্দলাল বসুর একটা তারিখহীন চিঠি থেকে বিষয়টা জানা যায় :

ভাই অসিত

অবনিবাবুকে যে পত্র লিখেছিলে তাহা পেয়েছি —। তুমি গল্পগুচ্ছের প্রথম ভাগ আমায় দিয়া গিয়াছ — তাতে কেবল দুটা দাগ দেওয়া আছে। তাহার মধ্যে জীবিত না[ও] মৃত তুমি আঁকচ এবং মধ্যবর্তিনী আমি আঁকচি। কাবুলিওলাটা পুরাতনটা দিলে চলিবে না? ছবিখানি খোঁজ করিব। না পেলে আবার আঁকতেই হবে। যে ভাগ গল্পগুচ্ছ আমায় দিয়াছ তাতে রবিবাবু কি কি দাগ দিয়েচেন জানালে আমি সুরু[য] করতে পারি — ইহাতে ১৩টা গল্প, সবগুলই কি দাগ দিয়েচেন?

১। জীবিত না[ও] মৃত ২। শুভদৃষ্টি ৩। সমস্যা পূরণ ৪। যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ ৫। প্রায়শ্চিত্ত ৬। শুভা ৭। বিচারক ৮। একটা আষাঢ়ে গল্প। ৯। মধ্যবর্তিনী। ১০। উলুখড়ে[য] বিপদ। মেঘ ও রৌদ্র। ১২। ক্ষুধিত পাষাণ। ১৩। ফেল্।

ইহার মধ্যে কোনগুলি আঁকতে হবে —।

তুমি যে ছবি করচ তার একটা সাইজ কাগচে কেটে পাঠিও।...[২০]

[নিম্নরেখ নন্দলালের দেওয়া। সাধু-চলিত ভ্রান্তি মূল চিঠির অংশ।]

শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিঠির সম্পাদক শ্রীগৌতম হালদার জানিয়েছেন তারিখহীন এই চিঠিটি লেখা ১৯১২ সালে। ১৯১২ বা তার আশেপাশে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়, দুটি বাংলা, একটি ইংরেজি অনুবাদে। সেগুলি হল *আটটি গল্প* (নভেম্বর ১৯১১), *গল্প চারিটি* (মার্চ ১৯১২) এবং রজনীরঞ্জন সেনের অনূদিত ১৩টি গল্প নিয়ে *The Glimpses of Bengal Life* (১৯১৩)। এই তিনটি বইতে কোনো ছবি নেই, আর সবচেয়ে বড়ো কথা এর কোনোটিতেই ‘জীবিত ও মৃত’ বা ‘মধ্যবর্তিনী’ গল্পদুটিও নেই। সেইজন্যে মনে হয় ১৯০৮-০৯-এ প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডের *গল্পগুচ্ছ*-র (যার প্রথম খণ্ডের কথা বলা হচ্ছে এই চিঠিতে) অনুরূপ কোনো সংকলন-গ্রন্থের কথা ভাবা হচ্ছিল এইসময়ে, এবার সচিত্র। এই পরিকল্পনা কোনো অজানা কারণে পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু এই সময়ে সচিত্র-গ্রন্থের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থাটি স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু এরপরে সচিত্র-গ্রন্থ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন দ্বিধা তৈরি হয়ে উঠছিল ?

কেন এই প্রশ্নটি উঠতে পারে, সে কথা ব্যাখ্যা করার আগে একটি কথা বলে নেওয়া জরুরি। গ্রন্থ-অলংকরণ মানেই তো কেবলমাত্র চিত্রাবলির ব্যবহার নয়। নানারকম কারুকার্য বা ডিজাইনের মাধ্যমেও বইয়ের পাতাকে সাজিয়ে তোলার চল উনিশ শতক থেকেই ছিল, আজও আছে। সেরকমভাবে রবীন্দ্রনাথেরও অন্তত একটি বইকে সাজানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা 'নিজস্ব উদ্‌যোগ'-পর্বে দেখেছি যে *ক্ষণিকা* বইটির প্রকাশের দায়িত্ব কবি তুলে দেন প্রেমতোষ বসুর হাতে এবং সঙ্গে এই নির্দেশও দেন যে, 'ছাপাটা একটু সুদৃশ্য সুপাঠ্য সুবিন্যস্ত করা আপনার উপর ভার রহিল।'[২১] কিন্তু এই তিনটি পরপর-বসানো বিশেষণের ভার সম্ভবত প্রেমতোষের পক্ষে একটু বেশি হয়ে গিয়ে থাকবে, তিনি নানারঙের কালি ও নানারকমের কারুকার্যে বইটি ভরিয়ে তুলতে উৎসাহী হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথকে তাই তাঁকে বিশেষভাবে লিখে দিতে হল, 'সাজসজ্জা সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র চিন্তা ও বিলম্ব না করিয়া আপনি এইভাবে ছাপাইয়া যান।...গ্রন্থের পত্রে পত্রে বর্ডার দিয়া ছাপা আমার চক্ষে কোন মতেই শোভন ঠেকিল না – ভাল লাগাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু চক্ষু মেলিয়া কিছুতেই ভাল লাগাইতে পারিলাম না – অতএব আপনার অনেক বৃথা কষ্টের কারণ হইলাম বলিয়া বিনীতভাবে মার্জনা চাই।'[২২]

পাতায় 'বর্ডার' দেওয়া অলংকরণের যে ধরন সেটাকে যে রবীন্দ্রনাথ কখনই পছন্দ করে উঠতে পারেন নি সেটা বেশ বোঝা যায়। বইয়ের ছিমছাম সরল সাজই তাঁর চিরকালের পছন্দের।

এবার চিত্রাবলির ব্যবহার প্রসঙ্গেও তাঁর দ্বিধার কথাটি বুঝিয়ে বলা যাক।

প্রথম যে কথাটি খেয়াল করা দরকার সেটি হল, *চয়নিকা* বা *জীবন-স্মৃতি*র মতো চিত্রশোভিত বইগুলি পরবর্তীকালে সাধারণভাবে নিরলংকৃত হয়েই প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯০৯-এ প্রথমবার বেরোবার পর *চয়নিকা*-র একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছেল, সেখানে নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিগুলি ছিল। এই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কবে তা স্থিরভাবে জানা যায় না অবশ্য। কিন্তু ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে যখন তৃতীয় সংস্করণ বেরোচ্ছে তখন তুলে নেওয়া হল ছবি, এবং পরবর্তীকালে সেই সচিত্র-*চয়নিকা* আর কখনও ফিরেও আসে নি। যদিও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকেও তার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হবে। যে-*জীবন-স্মৃতি*র ছবিগুলির অত প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম প্রকাশের সময়, সেই বইও পরবর্তী কোনো মুদ্রণে সচিত্র

প্রকাশিত হয় নি। বলা প্রয়োজন, কবির জীবৎকালে ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে অন্তত একবার এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে অন্তত তিনবার *জীবন-স্মৃতি* প্রকাশিত হয়েছে।

আরও খেয়াল করে দেখার যে, *রক্তকরবী*কে বাদ দিলে ১৯১২ সালের *জীবন-স্মৃতির* পর তাঁর অলংকৃত গ্রন্থগুলি মূলত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। *খাপছাড়া, সে* এবং *ছড়ার ছবি*। এই তিনটি বই বাদে, *বিশ্বপরিচয়*-এর অলংকরণ প্রয়োজন-ভিত্তিক, বিজ্ঞানের বইতে যেমন হয়। *প্রাক্তনী* নামের পুস্তিকাটির অলংকরণে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা ছিল না। ওটি গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিতও হয় নি। ১৯৪১-এর জুলাই মাসে *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ* পুস্তিকাটি প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ, তাঁর অলংকরণ ও অন্যান্য ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্তের জন্যে দায়ি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও পুলিনবিহারী সেন। অর্থাৎ, শিশুদের বইয়ের সঙ্গে ছবির চেনা সমীকরণটি বাদ দিলে অন্য সংরূপের বইতে ছবি দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

না, আমাদের উপরিলিখিত বাক্যটির একটু সংশোধন প্রয়োজন। আর-এক ধরণের একটি বই খুবই চিত্র-সর্বস্ব হয়ে বেরোতে পারত ১৯১২-র পরেও। সেই ‘বই’-এর নাম ‘বরণডালা’। আমরা ‘বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়-পর্ব’-এ বইটির নির্মাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে ১৭ আগস্ট ১৯২৯-এ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একটি অপ্রকাশিত চিঠি উদ্ধৃত করে আমরা দেখিয়েছি সেই ‘বই’তে ছবি সংযোজনার ব্যাপারে কী বিপুল আয়োজন চলছে। এখানে তার দুটি অংশ পুনরুদ্ধৃত করছি আমরা।

> ১। ‘রঙিন Block ৮ খানার মধ্যে ৪ খানা হ’য়ে গিয়েছে, ২।৩ দিনের মধ্যে বাকি ৪ খানা হ’য়ে যাবে। এক রঙের block নিয়ে দুশ্চিন্তা [?] নেই যতো তাড়াতাড়ি দরকার করানো যায়...’
>
> ২। ‘আমার মতে ছবির selection এখনও ঠিক suitable হয় নি। রঙীন ছবির আরও variety চাই। আমার ইচ্ছা আপনার বিচিত্রার ঘরে যেসব পুরনো ছবি আছে তার থেকে কিছু বেছে নেওয়া, অবনবাবুর অন্তত ২।১ খানা নেওয়া, এবং কবির নিজের অন্তত একখানা (তাতে সব দিক দিয়ে বইয়ের value বাড়বে, সাধারণ পাঠকের কাছে এবং collector দেরও কাছে)। এক রঙের ছবি গগনবাবুর [দুষ্পাঠ্য]খানা দেওয়া হচ্ছে, নন্দবাবুর [দুষ্পাঠ্য]খানা, সুরেনের ১ খানা। আমার মতে এখনও আরেকটু variety দরকার, না হলে সব বেশি একরকম হয়ে যাবে।’

এই প্রস্তাবিত ‘বই’টি শেষপর্যন্ত বেরোয় নি, চিত্রশোভিত একটা বই ১৯২৯ সালে বের করার কথা তো ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সে তথ্য অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। আসলে আমাদের যেটা মনে রাখতে হয়

সে হল, এই ‘বরণডালা’র পরিকল্পনা করা হয়েছিল ‘বিবাহে উপহারযোগ্য’ একটি ‘সংকলন’ হিসেবে। আর তারই সূত্রে এই বইটিতে ছবির কথা ভাবা।

আমরা বললাম, সাধারণভাবে তাঁর ‘বই’ চিত্রশোভিত করে প্রকাশ করার আগ্রহ কমে এসেছিল রবীন্দ্রনাথের। তার আর-একটি পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, তাঁর জীবনের শেষভাগে পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তার অনেকগুলিই কিন্তু চিত্রভূষিত। সেই অলংকরণকে রবীন্দ্রনাথ অনুমোদনও করছেন। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তার কোনোটিই অলংকৃত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে না। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি রচনার কথা বলা যেতে পারে এখানে। শেষের কবিতা উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে চৈত্র সংখ্যাগুলিতে। পত্রিকায় প্রকাশকালে এর বিভিন্ন কিস্তিতে মুদ্রিত হয়েছিল দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর আঁকা সাতটি ছবি। ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এই পরিকল্পনার কথা জেনে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (১৯২৮-এর ২৫ জুলাই) তাঁকে লিখেছিলেন, ‘ভালোই হয়েছে। আমার বিশ্বাস দেবীর হাতে ছবি আরো ভালো হবে। ওর তুলিতে রস আছে শুধু রূপ নয়। আপনি নির্ভয়ে ওর পরে ভার অর্পণ করতে পারবেন।’[২১] কিন্তু এত ভরসা সত্ত্বেও, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *মহুয়া* কিন্তু চিত্রবিহীন ভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল, সেই কথাটা খেয়াল করবার। ঠিক একই রকমভাবে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে শারদীয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় বেরোচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ‘ল্যাবরেটরি’ গল্প, সেখানে ছিল শৈল চক্রবর্তীর আঁকা চারটি ছবি। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রগতিসংহার’ গল্পটি, এবার শৈল চক্রবর্তী এঁকেছিলেন পাঁচটি ছবি। গল্পদুটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কিন্তু নিরলংকৃত হয়েই প্রকাশিত হয়। এই ছবি রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত পছন্দ করে উঠতে পারছেন না, এই সম্ভাবনাটি যদি ধরেও নিই, তা-ও যে সময়পর্বটা চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের নবজন্মের কাল, যে সময়ে শিশুপাঠ্য-গ্রন্থ ছাড়া সাধারণ আর কোনো গ্রন্থে তিনি চিত্রভূষণের কথা ভাবছেন না, সে কি কতকটা গ্রন্থ-অলংকরণ সম্পর্কে তাঁর এই সময়কালের মনোভাবের ইঙ্গিতবাহী নয়?

অবশ্য ‘ইঙ্গিত’ পড়ার প্রয়োজন নেই। আমরা একটি নির্দিষ্ট প্রমাণ দিচ্ছি এখানে, গ্রন্থ-অলংকরণ বিষয়ে তাঁর শেষ জীবনের মনোভাবটা এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে। ১৯১২তে তাঁর আত্মজীবনী *জীবন-স্মৃতি* বেরিয়েছিল ছবি-সহ। ১৯৪০-এ যখন তাঁর আর-এক আত্মজীবনী *ছেলেবেলা* প্রকাশ করার বন্দোবস্ত শুরু হল, তখন

জীবন-স্মৃতি-র প্রেরণায় সেখানে চিত্র-সংযোজনার কথা ভাবতে শুরু করলেন গ্রন্থনবিভাগের কর্তারা। সেই খবর পাওয়া মাত্র কিশোরীমোহন সাঁতরাকে ১৯৪০-এর ১০ সেপ্টেম্বর কবি লিখলেন, 'এই বইটাতে আমি কোনরকম ছবি দিতে চাই নে। এর ছবি লেখারই মধ্যে। *সাহিত্যের মধ্যে অকারণ ছবি এনে চোখ ভোলানো ছেলেমানুষি।* ছবি দেবার চেষ্টাও কোরো না।'[২২] (বাঁকানো হরফ আমাদের) এই চিঠি পেয়ে কিশোরীমোহন ১২ সেপ্টেম্বর যে উত্তর লিখলেন তাতে তিনি স্বীকার করলেন যে রথীন্দ্রনাথের পরামর্শে ছেলেবেলা বইটিতে ছবি দেবার কথা ভাবা হয়েছিল বটে :

> জীবনস্মৃতির প্রথম সংস্করণ যেভাবে ছবি দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল সেইভাবে 'ছেলেবেলা' প্রকাশ করবার আমার ইচ্ছা ছিল। রথীদাও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত ছিলেন এবং তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। কিন্তু আপনার আগের চিঠিতে এটি আপনার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ হবে জানতে পেরে ছবি না দেওয়াই আমি স্থির করি।[২৩]

কে ছবি আঁকছিলেন *ছেলেবেলা*-র জন্যে সেটা আমরা জানতে পারি নি। বই প্রকাশিত হল ছবি ছাড়াই, কিশোরীমোহন উপরে উদ্ধৃত চিঠিতেই জানিয়েছিলেন, 'কাল সন্ধেবেলা ২০০ বই এর ছাপা ফর্মা পেয়েছি এবং বিনা ছবিতে সেসব বাঁধাবার ব্যবস্থা করেছি। পরশুর মধ্যে বই প্রকাশ করতে পারবো আশা করছি।' কিশোরীমোহনের লেখা 'বিনা ছবিতে বাঁধাবার ব্যবস্থা' করার কথা থেকে মনে হয় ছবিগুলি ছাপাও হয়ে গেছিল, বাঁধাবার সময় একেবারে শেষমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের কথা অনুযায়ী ছবি বাদ দিয়েই বাঁধানো হয়।

তাই আমরা বলতে পারি, লেখার মধ্যেকার ছবিকেই জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি এত বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন যে লেখার বাইরের ছবি তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে ধীরে ধীরে।

রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছদ-ভাবনা প্রসঙ্গেও হয়তো কতকটা এইরকমই কথা বলা যায়।

উনিশ শতকের প্রচ্ছদ-রীতিকে মান্য করেই শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের আদিযুগের বইগুলির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা। শুভেন্দু দাশমুন্সী তাঁর 'প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে একটি পত্র ও কয়েকটি প্রবণতা' নামের চমৎকার প্রবন্ধটিতে[২৪] উনিশ শতকের এই প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্রের রীতির কয়েকটি মূল প্রবণতাকে আমাদের খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন।

ক) প্রচ্ছদের (এবং আখ্যাপত্রের) মধ্যেই পূর্ণবাক্যে লেখক-প্রকাশকের নাম ও অন্যান্য বিবরণ জানানো।

খ) গ্রন্থনাম, লেখকনাম ও অন্যান্য বিবরণের শেষে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহারও ছিল প্রায় ব্যতিক্রমহীন।

গ) নকশা-রেখা (Designer Ruler)-র সাহায্যে গ্রন্থনাম-লেখকনাম-প্রকাশকনামকে পৃথক করে দেওয়া

ঘ) বইয়ের বিষয় বা সংরূপ আখ্যাপত্রেই জানিয়ে দেওয়ার রীতি

এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের একেবারে শেষে, ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত একটি ছোট কাব্যগ্রন্থের আখ্যাপত্রের ছবি সংযোজিত 'চিত্রমালা' বিভাগে দেওয়া হল (দ্রষ্টব্য : চিত্র-১)। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের লেখা সেই 'খণ্ডকাব্য'টির নাম *লুক্রেশিয়া*। সেই ছবিতে কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ করা সম্ভব হবে। সেই আখ্যাপত্রে মোট সাতটি পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়েছে। লেখকনাম জানানো হয়েছে পূর্ণবাক্যে, এইভাবে, 'শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বিরচিত।' প্রকাশকের নাম-ঠিকানাও পূর্ণবাক্যে, '৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে/ শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার কর্ত্তৃক/ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।' সেই সঙ্গে লক্ষণীয়, ছটি নকশা-রেখা ব্যবহার করে কীভাবে ছোট সেই পাতাটিকে (বইটির মাপ মাত্রই ১৫.৫ X ১০ সে.মি) অন্তত ছ'টি বা সাতটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, বইটির সংরূপ (এক্ষেত্রে 'খণ্ডকাব্য') আখ্যাপত্রেই লিখে দেওয়া আছে। আমরা দেখব, উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকেরও গোড়ার দিকে এই প্রচলিত ধরনটি রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনাতেও হুবহু মান্য করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের বেশ কিছু বইয়ের 'প্রচ্ছদ' আজ আর দেখবার উপায় নেই। কেননা কোনো সংগ্রহালয়েই প্রচ্ছদ-সহ বইগুলি নেই, বড়োজোর যা দেখা সম্ভব তা হল আখ্যাপত্র। যেমন, স্বপন মজুমদার তাঁর বিখ্যাত *রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি*-তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ১০টি বইয়ের মধ্যে (*কবিকাহিনী* থেকে *প্রভাতসঙ্গীত*) মাত্র একটিরই প্রচ্ছদের বিবরণ জানাতে পেরেছেন, সেটি হল *রুদ্রচণ্ড*। আর দুটি বই, *বাল্মীকি-প্রতিভা* ও *কাল-মৃগয়া*-তে আখ্যাপত্র আর প্রচ্ছদ আসলে একই। বাকি সাতটি বইয়ের প্রচ্ছদ ঠিক কেমন ছিল তা জানা যায় না।

প্রথম যুগে এই প্রচ্ছদ-নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ঠিক কতখানি ছিল? *বাল্মীকি-প্রতিভা* বইটির প্রসঙ্গে শরৎকুমারী চৌধুরানীর 'ভারতীর ভিটা' শীর্ষক স্মৃতিকথাটি এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখছেন ভারতী-গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনার পর কীভাবে তৈরি হয়ে উঠল *বাল্মীকি-প্রতিভা*-র প্রচ্ছদটি,

‘অনেক গবেষণার পর আর্ট ষ্টুডিয়োর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে ভারতীর মলাটের ব্লক প্রস্তুত হয় এবং তখনকার পক্ষে ছবিখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন।’[২৫] এই ভারতী-গোষ্ঠীর মধ্যে যে তরুণ রবীন্দ্রনাথও একজন ছিলেন তা শরৎকুমারী তাঁর এই স্মৃতিকথাতেই বারবার লিখে গেছেন, ফলে অনুমান করে অসঙ্গত হবে না যে এই ‘অনেক গবেষণা’র মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরও কিছু ভূমিকা থাকা সম্ভব।

এই বিববরণ সত্ত্বেও, ‘প্রচ্ছদ’ নিয়ে খুব মৌলিক চিন্তা রবীন্দ্রনাথের আদি যুগের বইগুলি নিয়ে করা হয়েছে বলে মনে হয় না। *বাল্মীকি-প্রতিভা*-র প্রচ্ছদও নিতান্ত উনিশ শতকীয় চেনা ধাঁচেই তৈরি। কাঠখোদাই ছবি, চারপাশে ফুলকাটা-নকশার বর্ডার। প্রকাশনার বিবরণ পূর্ণাঙ্গ বাক্যে। গ্রন্থনাম ও অন্যান্য বিবরণের পর পূর্ণচ্ছেদ-সহ সব চেনা বৈশিষ্ট্যই এই বইয়ের প্রচ্ছদে বর্তমান। আমরা উনিশ শতকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুটি বইয়ের আখ্যাপত্রের ছবি দিলাম (দ্রষ্টব্য : চিত্র-২ ও চিত্র-৩), যথাক্রমে *ভগ্নহৃদয়* (১৮৮১) এবং *কথা-চতুষ্টয়* (১৮৯৪)। *ভগ্নহৃদয়*-এ দেখা যাবে তিনটি নকশা-রেখার ব্যবহার। আর, বইটির সংরূপ (এক্ষেত্রে ‘গীতি-কাব্য’) আখ্যাপত্রেই জানিয়ে দেওয়া আছে। *কথা-চতুষ্টয়* আরও ১৩ বছর বাদে উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রকাশিত হচ্ছে বলেই বোধহয়, নকশা-রেখা দিয়ে আখ্যাপত্রকে ভাগ করার ধরনটি সেখানে অনুপস্থিত, বইয়ের সংরূপও জানানো হয় নি সেখানে। তবে পূর্ণবাক্য এবং পূর্ণচ্ছেদগুলি সেখানেও বিদ্যমান।

বিস্ময়ের হল, সেই ধাঁচের একঘেয়েমির দিকে তাঁর কোনো-কোনো বন্ধু দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তা পরিবর্তিত হয় নি। *চিত্রা* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৬-এর মার্চে। বইটি হাতে পেয়ে কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার মলাটের লিপিপদ্ধতি বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা লিখে পাঠান কবিকে :

> মলাটে, টাইটেলপেজে, প্রথম পৃষ্ঠায় যেখানে মোটা করিয়া “চিত্রা” লেখা আছে, তাহার পর আবার একটা অনতিসূক্ষ্ম, মাথা কাটা তালের ছড়ির মত পূর্ণচ্ছেদ কেন? ইহা কি দেখিতে খারাপ দেখায় না? আমার ত দেখায়। বিলাতী পুস্তকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, এরূপ স্থলে কোথাও ফুলস্টপ্ থাকে না। সেনটেন্সের শেষে ভিন্ন আর কোথাও ফুলস্টপ্ ব্যবহার হয় না। বাঙ্গালার ছাপা গভর্ণমেন্ট কি এতই উদার যে এ সমস্ত নিষ্কর্মা পূর্ণচ্ছেদগুলি পদচ্যুত করিতেছে না?[২৬]

দুর্ভাগ্য হল, এই দৃষ্টি-আকর্ষণী স্পষ্ট বাক্যগুলি সত্ত্বেও গ্রন্থনাম ও লেখক-নামে পূর্ণচ্ছেদ-সহ প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র লেখার ধরনটা আরও অনেকদিন পরিবর্তন করা হয় নি। আমরা বিশ শতকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুটি বইয়ের আখ্যাপত্রের ছবি সংযোজিত করেছি, (দ্রষ্টব্য : চিত্র-৪ ও চিত্র-৫) যথাক্রমে ১৯০১-এ প্রকাশিত *গল্প*

বইটির ও ১৯০৩-এ মজুমদার লাইব্রেরি প্রকাশিত *কাব্য-গ্রন্থ*-র সপ্তম ভাগের ছবি। দুটিতেই নকশা-রেখাও ফের দেখা যাবে। অবশ্য *কাব্য-গ্রন্থ*তে লেখকনাম পূর্ণবাক্যে নেই (যেমন আছে *গল্প*-এ : 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।')। তবে পূর্ণচ্ছেদগুলি এই দুটি বইতেই পাওয়া যাবে।

এটা ঠিক যে বিশ শতকের শুরু থেকে এই উনিশ শতকীয় ধরনটা আস্তে আস্তে বদলাতে থাকবে। ইন্ডিয়ান প্রেস-পর্বে এসে পুরোনো রীতি আর আমরা কখনই দেখতে পাব না। উদাহরণ হিসেবে ইন্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত *কাব্যগ্রন্থ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯১৫) আখ্যাপত্রের একটি ছবি দেওয়া হল (দ্রষ্টব্য : চিত্র-৬)। সেখানে নকশা-রেখা, পূর্ণবাক্য, পূর্ণচ্ছেদ বা গ্রন্থের সংরূপ জানিয়ে দেওয়া-র প্রচেষ্টা, কিছুই দেখা যাবে না।

উনিশ শতকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের যে-একটিমাত্র বইয়ের প্রচ্ছদ এই রীতির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সেটি হল *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২)। বইটির অলংকরণ নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এর প্রচ্ছদ তৈরি হয়েছিল খাকি রঙের কাগজে। তার উপরে খয়েরি রঙে তুলির টানে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' লেখা। (দ্রষ্টব্য : চিত্র- ১১) অবশ্য, এই বইয়েরও আখ্যাপত্রে যথারীতি পূর্ণবাক্য ও পূর্ণচ্ছেদ-সহ যাবতীয় বিবরণ পাওয়া যাবে।

বিশ শতকের প্রথম কয়েকটা বছর বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদ ও বাঁধাইয়ে আসবে বেশ কিছুটা বদল। মূলত ইন্ডিয়ান প্রেসের সৌজন্যেই উনিশ শতকীয় রীতি থেকে সরে যাবে রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী। যেমন, *শারদোৎসব* (১৯০৮)-এর প্রচ্ছদে অলিভ সবুজ রঙের জমির উপর উড়ন্ত হাসের ছবি, নীচে ডানদিকের কোণায় কাশফুল। ছবিটি হাফটোনে ছাপা। বাঁ দিকে নীচে একটু বাঁকাভাবে গ্রন্থনাম লেখা, এমনভাবে যেন বকের ঠোঁট তাকে স্পর্শ করে ফেলবে একটু পরেই। আর বাঁদিকে একেবারে নীচে রবীন্দ্র-হস্তলিপিতে তাঁর নামস্বাক্ষর। প্রচ্ছদ করা, আগেই বলা হয়েছে, যামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তেমনি ১৯০৯-এ আলপনার ধরণে *চয়নিকা*-র প্রচ্ছদ, ১৯১২তে *ছিন্নপত্র* ও *জীবনস্মৃতি*র এমবস্-করা ফুলের ছবি দেওয়া প্রচ্ছদ নিশ্চয়ই শিল্পী, প্রকাশকের সঙ্গে লেখকেরও নতুন ভাবনার সাক্ষ্য বহন করে।

তবে, যে-ধরণের বই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রচ্ছদ-ভাবনার যথার্থ চিহ্ন (signature) হয়ে উঠবে, সেইরকম বই বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়-পর্ব থেকেই দেখা পাওয়া যাবে। কেন একথা বলছি আমরা সেটা বোঝানর জন্যে ইন্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত *কাব্যগ্রন্থ*-এর(১৯১৫) দুটি আলাদা ধরণের প্রচ্ছদের ছবি দেওয়া হল (দ্রষ্টব্য : চিত্র-১২ ও চিত্র-

১৩)। দুটিই খুবই উৎকৃষ্ট কাপড়ের বাঁধাই, একটিতে (অলিভ-সবুজ মলাট, চিত্র-১৩) সোনার জলে খোদাই করে গ্রন্থনাম লেখা। কিন্তু এগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রুচিবৈশিষ্ট্য যেন ধরা পড়ে না। এইধরণের মলাট অন্য যেকোনো লেখকের বইয়েরই হতে পারত হয়তো।

কাকে আমরা বলছি 'রাবীন্দ্রিক রুচি' সেটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরে, যখন *বীথিকা* কাব্যগ্রন্থটি ছাপানোর কাজ চলছে, রবীন্দ্রনাথ তার প্রচ্ছদের ব্যাপারে এই সুস্পষ্ট নির্দেশ পাঠালেন কিশোরীমোহনের কাছে :

> মলাটে সাদা অক্ষরে 'বীথিকা' যেন লেখা থাকে, আমি অলঙ্কৃত করে দেবো না। এই রকম সাজসজ্জা বাঙালে রুচি, নিজের বই সম্বন্ধে নতুন লেখকের গদগদ স্নেহের সোহাগ এতে প্রকাশ পায়। জাপানীরা তলোয়ারে কারুকার্য্য করে, খাপ রাখে অত্যন্ত সাদা, যেহেতু তারা আর্টিস্ট — যদিচ পূর্ব্ববঙ্গ পেরিয়েও পুর্ব্বতর দেশে তাদের জন্ম।[২৭]

আমরা অবশ্য যে প্রথম-সংস্করণ *বীথিকা* দেখেছি (আমাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহেই আছে একটি কপি) তাতে ঠিক সাদা হরফে নয়, গাঢ় কালচে-খয়েরি রঙে লেখা আছে গ্রন্থনামটি। মলাটটি হাল্কা সবুজাভ-সাদা ও সাদা এই দু-রঙের জমিতে তৈরি। কিন্তু এই নিতান্ত নিরংলকৃত ধরনটাই বিশেষভাবে 'রাবীন্দ্রিক'-ধরন। উদাহরণস্বরূপ আমাদের সংযোজিত চিত্র-১৫ থেকে চিত্র-১৮ পর্যন্ত চারটি ছবি দেখা যেতে পারে। এর মধ্যে *পত্রপুট* (১৯৩৬)-এর প্রচ্ছদটি (দ্রষ্টব্য : চিত্র-১৬) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা ধরন। দুটি হালকা রঙের অসমান ক্ষেত্র, তার উপরে কাব্যগ্রন্থের নাম ও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর। উপরে উল্লিখিত চিঠিতে যদিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমি অলঙ্কৃত করে দেবো না', তবু এটাও ঘটনা যে, একাধিক বইয়ের প্রচ্ছদই তিনি এঁকেছেন বিভিন্ন সময়ে। অবশ্য 'অলঙ্কৃত' করা সেটাকে বলা যায় না হয়তো। *মহুয়া* (১৯৩০), *বন-বাণী* (১৯৩২), *পরিশেষ* (১৯৩২), *দুই বোন* (১৯৩৩), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪), *শেষ সপ্তক* (১৯৩৫) প্রভৃতি নানান বইয়ের প্রচ্ছদ রবীন্দ্রনাথেরই আঁকা ছবি বা লিপি দিয়ে তৈরি। (উদাহরণ হিসেবে *শেষ সপ্তক* কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদের চিত্র দেওয়া হল, দ্রষ্টব্য : চিত্র- ১৫) অবশ্য, এটাও খেয়াল রাখবার যে, উপরের চিঠিটা যখন লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ (চিঠিটি রচনার তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) তার পর থেকে শিশুপাঠ্য বইগুলি ছাড়া আর কোনো বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি আর এঁকে বা লিখে দেন নি। একেবারে নিরাভরণ নিরলংকৃত

হয়েই বেরিয়েছে তাঁর পরবর্তী সমস্ত বই। 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার' বলেছিলেন কবি একদিন। তাঁর বইও একেবারে সকল বাহ্যিক 'অলংকার' ত্যাগ করেই নিজস্বতা অর্জন করতে চেয়েছে ধীরে ধীরে। *বিচিত্রিতা* (১৯৩৩) একদিন সজ্জিত হয়ে উঠেছিল দামি মরোক্কান লেদারের জ্যাকেটের উপর এম্‌বস করা নন্দলাল বসুর ছবিতে (দ্রষ্টব্য : চিত্র- ১৪)। রুচিশীল বৈভব দৃষ্টি কেড়েছিল সেদিন। জীবনের একেবারে শেষপর্যায়ে এসে যেন তার সাধনা হয়ে উঠল অলংকার ঝরিয়ে ফেলারই সাধনা। ১৯৩৯-এর ৭ মে 'অত্যুক্তি' নামের একটি কবিতায়[২৮] কবি লিখেছিলেন :

মন যে দরিদ্র, তার

তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার।

কল্পনাভাণ্ডার হতে তাই করে ধার

বাক্য-অলংকার।

'দরিদ্র' মনেরই দরকার হয় বাক্য-অলংকার দিয়ে সাজিয়ে-কথা বলা, মন যখন ধনী হয়ে ওঠে সাজানো-কথার দিন তখন ফুরোয়। কবিতার এই বোধ যেন এসে পৌঁছোতে থাকে গ্রন্থশরীরেও। কবিজীবনের একেবারে শেষদিকে প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র আমরা সংযোজিত করেছি। (দ্রষ্টব্য : চিত্র- ১৭ ও চিত্র- ১৮)। ১৯৩৯-এর মে মাসে প্রকাশিত *আকাশ-প্রদীপ* কাব্যগ্রন্থে গেরুয়া রঙের এক-রঙা জমির উপর লেখা ছিল কেবল গ্রন্থ-লেখক ও প্রকাশকের নাম। আর কোনো রেখা, রঙ, ছবি, কিছুই নেই। সমস্ত অতিরেকের সম্পূর্ণ বিসর্জন। বলাবাহুল্য, ভিতরে কোনোরকম অলংকার কবি অনেকদিনই পরিত্যাগ করেছেন। আর তারও এক বছর পর ১৯৪০-এর আগস্টে যখন প্রকাশিত হল *সানাই*, তার প্রচ্ছদ থেকে সরে গেল প্রকাশনার নামটিও। উপরের দিকে অল্প জায়গাজুড়ে গ্রন্থ ও লেখকনাম ছাড়া গোটা মলাটটাই যেন ছেড়ে রাখা রইল খাঁ-খাঁ করা গেরুয়ার জন্যে, বীরভূমের মাটির রঙের সঙ্গে মলাটের রঙ মিলে তৈরি করে তুলল এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌন্দর্য। শূন্যতার ছড়ানো আভায় অলংকৃত হয়ে উঠল কবির শেষতম গ্রন্থগুলি।

টীকা ও তথ্যপঞ্জি

১. সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩১

২. Long, J. A Descriptive Catalogue of Bengali Works. Calcutta : Sanders Cons & Co. 1855. p. 38

৩. 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার ২৫ মে ১৮৫৪ তারিখের সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞাপনটি উদ্ধার করেছেন অধ্যাপক স্বপন বসু। দ্র. *উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ*, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৩।

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, অগ্রহায়ণ ১৪১৫ব, পৃ. ৩৭৯-৮০। এই বইতে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার তারিখ লেখা আছে '২৭ জানুয়ারি ১৮২১। ১৬ মাঘ ১২২৭'। ২৭ জানুয়ারি আর ১৬ মাঘ অবশ্য একই দিন হতে পারে না।

৫. আশিস খাস্তগীর, *উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা*, কলকাতা : সোপান, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৪

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, অগ্রহায়ণ ১৪১৫ব, পৃ. ৮০

৭. সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'ছবি ছাপার কল-কৌশল ও উপেন্দ্রকিশোর', *কলের শহর কলকাতা*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ১২৮-১৩৬

৮. উপেন্দ্রকিশোরের এই ৯টি লেখা 'ফ্যাক্সিমিলি' আকারে পড়তে চাইলে দ্রষ্টব্য : Raychowdhury, Upendrakishore. *Essays on Half-Tone Photography.* Kolkata : Jadavpur University. 2014. স্ক্রিনের সূক্ষ্মতাকে দ্বিগুণ করে ছাপার কলাকৌশল যে-লেখায় উপেন্দ্রকিশোর জানাচ্ছেন তার শিরোনাম, 'How Many Dots?', এটি পাওয়া যাবে বইয়ের ৩৯-৪১ পৃষ্ঠায়।

৯. সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত, *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১৭১

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪০৭ব, পৃ. ৮৮-৮৯

১১. এই ১১টি বইয়ের অধিকাংশ ছবি দেখা যাবে অভীককুমার দে রচিত *রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ* বইতে। আর দেখা যেতে পারে 'পরিকথা' পত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (মে ২০১১)-টি। খুবই যত্ন নিয়ে 'পরিকথা' ছবিগুলি ছেপেছেন। বইয়ের বাইরে পত্রিকার পাতাতেও রবীন্দ্রনাথের যেসব লেখালেখি অলংকৃত হয়েছে তারও অনেকগুলি ছবি এখানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

১২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জোড়াসাঁকোর ধারে', সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রচনাসংগ্রহ ১ স্মৃতিকথা*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৬৬-৬৭। এই উদ্ধৃতিটিতে যে 'ফোটো'র কথা বলা আছে, *চিত্রাঙ্গদা*-র

অলংকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথকে, সেই ছবি দেখা যেতে পারে '১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা' পত্রিকার ২য় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার (ডিসেম্বর ২০১৫) ৫১ পৃষ্ঠায়।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

১৪. *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ১৪-তে মুদ্রিত গগনেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলীর সম্পাদক (সম্পাদনা যিনি করেছেন তাঁর নাম জানানো হয় নি) এই চিঠিটির তারিখ অনুমান করেছেন 'October 1896'. কিন্তু এই চিঠি এই সময়কালের হতেই পারে না, বস্তুত এটি ঠিক তার এক বছর আগেকার। আমাদের এইরকম অনুমানের কারণ নিম্নরূপ :

ক) এই চিঠিতে আছে 'বিষম ঝড়ের' কথা। এই 'ঝড়' হল ১৮৯৫-এর অক্টোবরে শিলাইদহের ঘটনা। তুলনীয়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লেখা ১৬ আশ্বিন ১৩০২ (২ অক্টোবর ১৮৯৫)-এর চিঠির এই কথা, 'দিন দুয়েক হইতে রীতিমত ঝড়ের দাপটে পড়িয়াছি। কতকটা সাইক্লোনের মত।'

খ) এই চিঠিতে আছে 'দ্বিজেন রায়ের চিঠি'র কথা, 'তাঁরা সস্ত্রীক বোটে করে এই অঞ্চলে আস্‌চেন'। তুলনীয়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ৭ অক্টোবর ১৮৯৫-এ লেখা চিঠি, 'সম্ভবতঃ আপনি সে সময়ে শিলাইদহে বিরাম করিবেন। আমাদের উক্ত স্থানে 'আগমন' 'গোপনীয়' ভাবে সংগঠিত হইবে...'।

১৫. *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ১৪, পৌষ ১৩৯২ব, পৃ. ৩২

১৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবি-রশ্মি*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : এ. মুখার্জি এন্ড কোং, পঞ্চম সংস্করণ (তারিখের উল্লেখহীন), পৃ. ৮৮

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪০৭ব, পৃ. ৮

১৮. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ব, পৃ. ১২৬

১৯. শারদীয়া দেশ, ১৩৭৩ব, পৃ. ২২

২০. শারদীয় দেশ, ১৪১৪ব, পৃ. ৬০-৬১

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯৩ব, পৃ. ২২৫

২২. *আকাদেমি পত্রিকা*, ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পত্র নং ১৩৯, পৃ. ৪৫

২৩. রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। Correspondence File (Bengali), Serial no. 169(i)

২৪. প্রবন্ধটি পাওয়া যাবে শুভেন্দু দাশমুন্সীর *টইপাড়ায় টহলদারি* (সপ্তর্ষি প্রকাশনী, ২০১১) বইয়ের ৫১ – ৭২ পৃষ্ঠায়

২৫. শরৎকুমারী চৌধুরাণী, 'ভারতীর ভিটা', রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পা., বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ব, পৃ.১১৩

২৬. দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫ব, পৃ. ১৫৭

২৭. *আকাদেমি পত্রিকা*, ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পত্র নং ১৬, পৃ. ৭-৮

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অত্যুক্তি", 'সানাই', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৭৬৪

উনিশ শতকের একটি বইয়ের আখ্যাপত্র

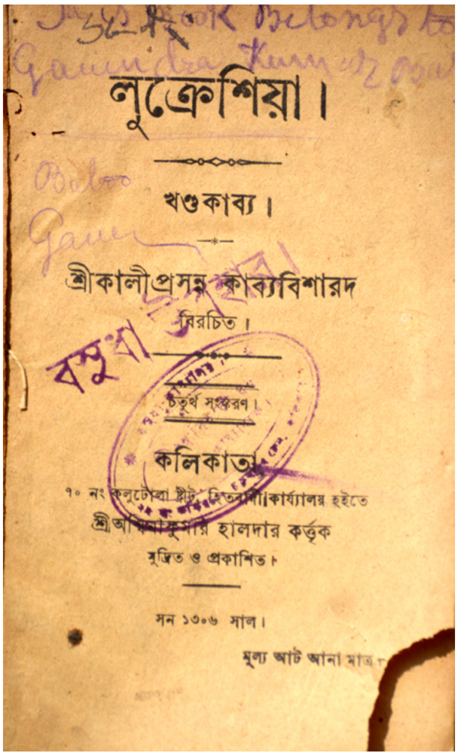
লুক্রেশিয়া।
খণ্ডকাব্য।
শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
বিরচিত।
চতুর্থ সংস্করণ।
কলিকাতা
কার্য্যালয় হইতে
হালদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১৩০৬ সাল।
মূল্য আট আনা মাত্র।

চিত্র -১ / 'লুক্রেশিয়া' কাব্যগ্রন্থ, ১৮৯৯

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের আখ্যাপত্র ঃ উনিশ শতক

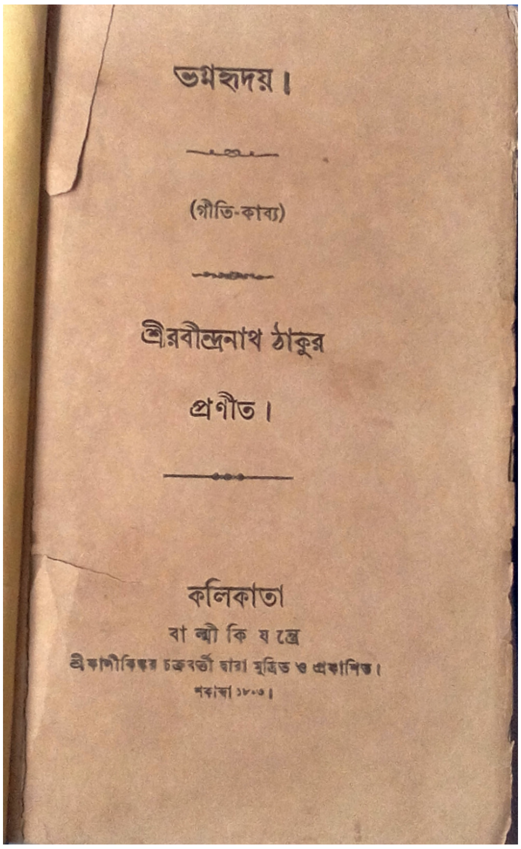
ভগ্নহৃদয়।
(গীতি-কাব্য)
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।
কলিকাতা
বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শকাব্দা ১৮০৩।

চিত্র -২ / ভগ্নহৃদয়, ১৮৮১

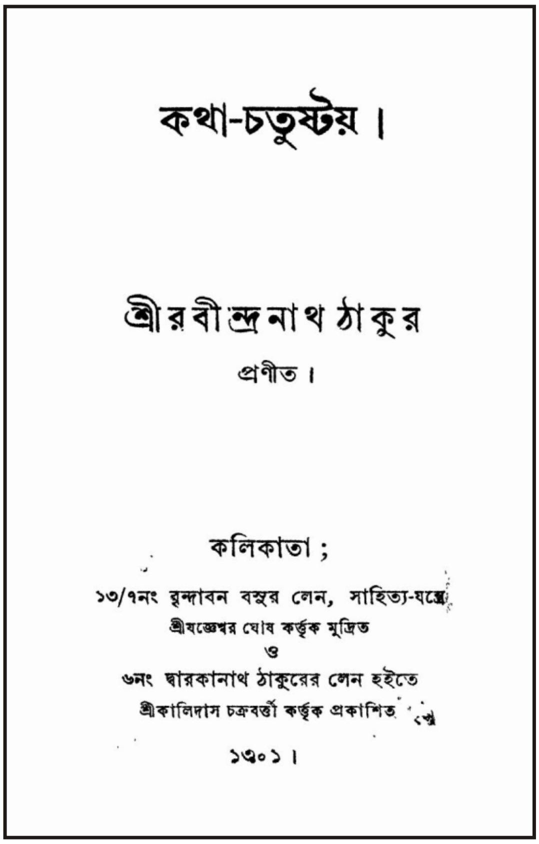
কথা-চতুষ্টয়।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।
কলিকাতা;
১৩/৭নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩০১।

চিত্র -৩ / কথা-চতুষ্টয়, ১৮৯৪

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের আখ্যাপত্র ঃ বিশ শতক

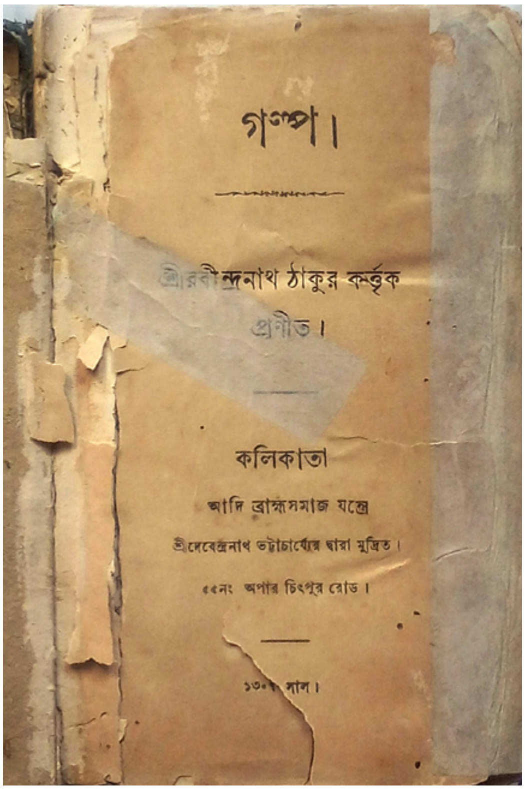
গল্প।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত।
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১৩০ সাল।

চিত্র -৪ / গল্প, ১৯০১

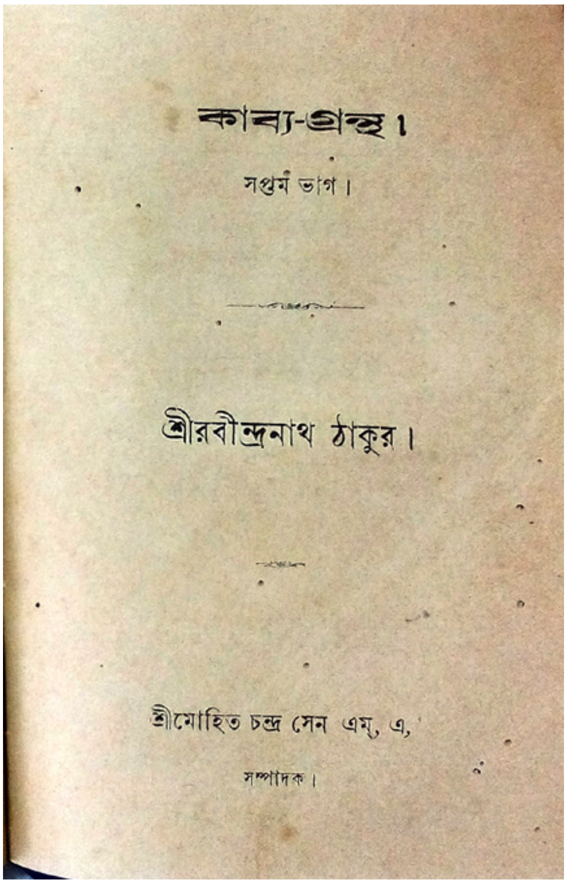
কাব্য-গ্রন্থ।
সপ্তম ভাগ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,
সম্পাদক।

চিত্র -৫ / কাব্য-গ্রন্থ, সপ্তম ভাগ,
মজুমদার লাইব্রেরি, ১৯০৩

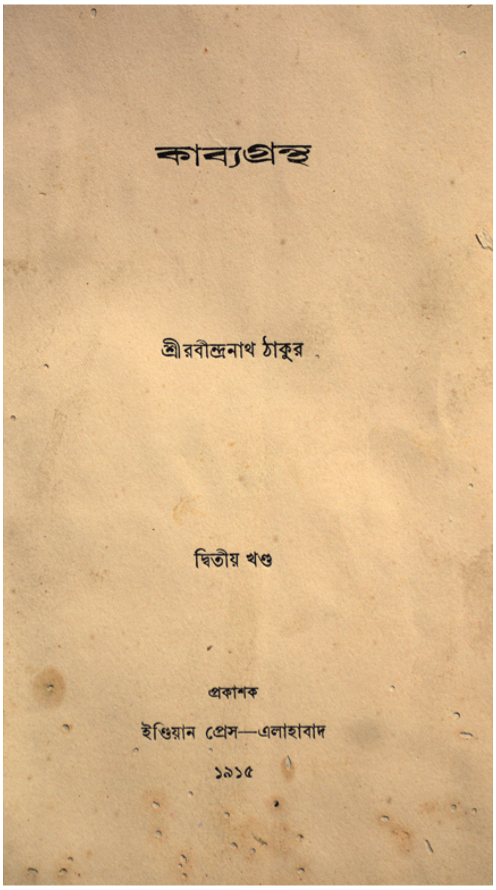
কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ
১৯১৫

চিত্র -৬ / কাব্যগ্রন্থ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৫

বিভিন্ন বইয়ের আখ্যাপত্র

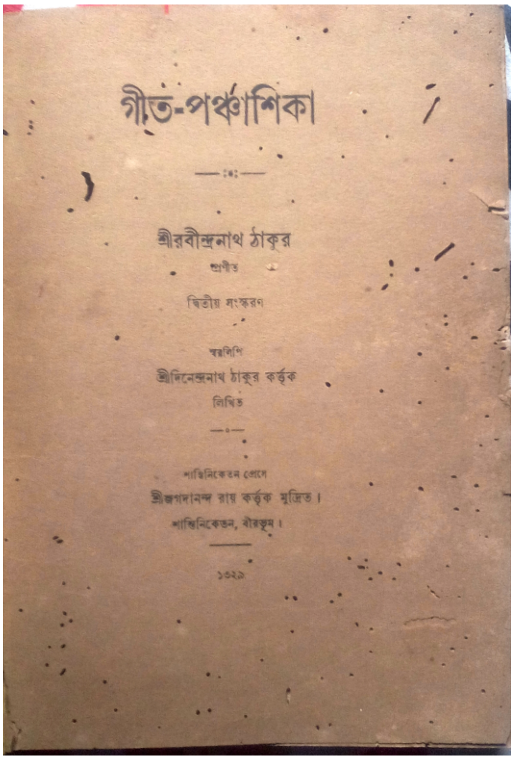

চিত্র -৭ / গীতপঞ্চাশিকা, ১৯১৮
'শান্তিনিকেতন প্রেস' থেকে ছাপা প্রথম বই

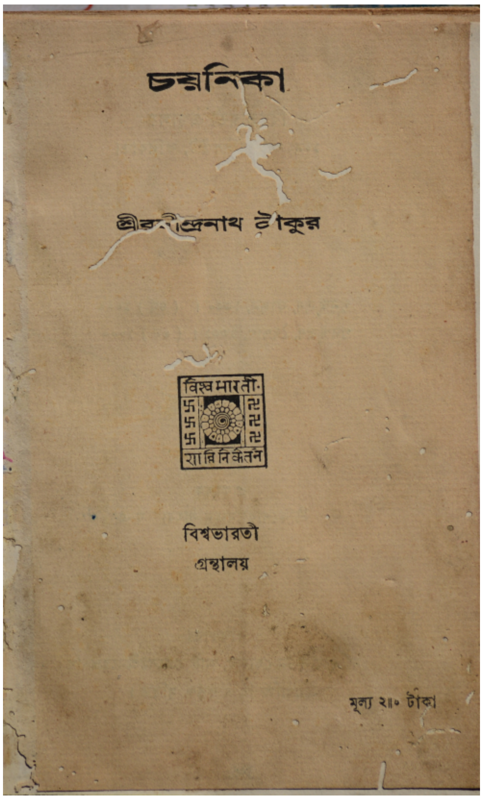

চিত্র -৮ / চয়নিকা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৩১ব
'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহৃত হল এখানে

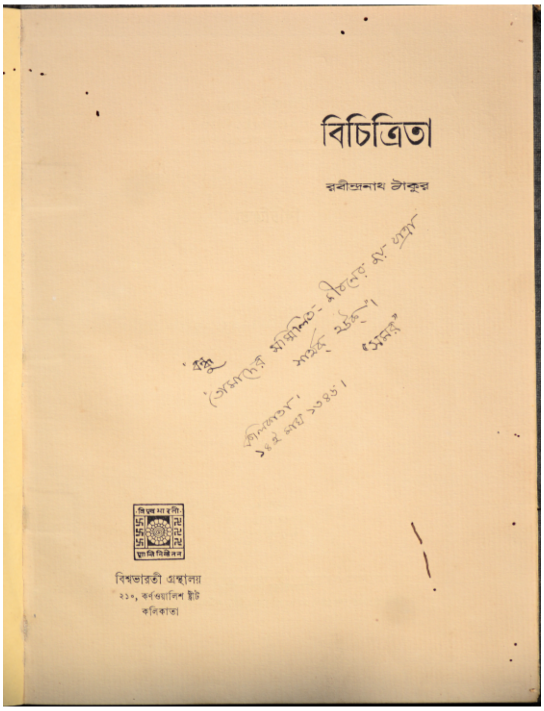

চিত্র -৯ / বিচিত্রিতা, ১৯৩৩
আখ্যাপত্রের বিন্যাসে বদল লক্ষণীয়

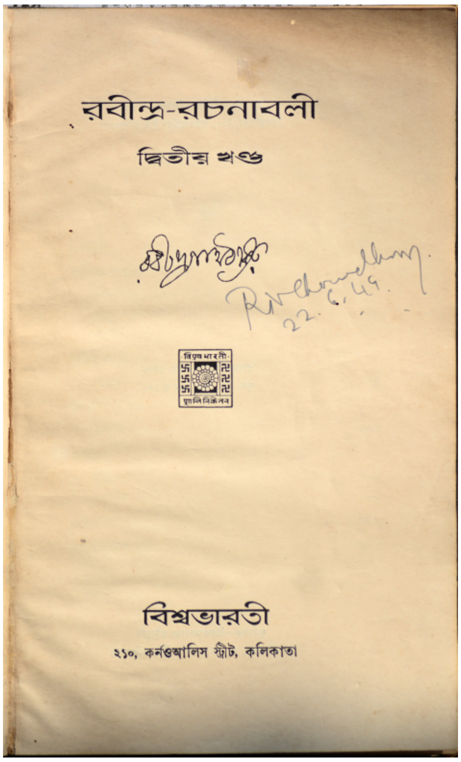

চিত্র -১০ / রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৪০
'প্রকাশনার নাম শুধু 'বিশ্বভারতী'

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিভিন্ন প্রচ্ছদ

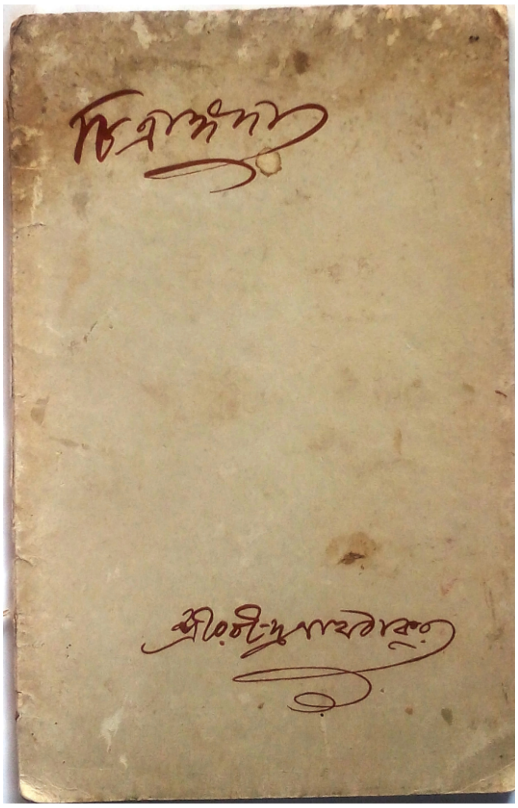

চিত্র -১১ / চিত্রাঙ্গদা ১৮৯২

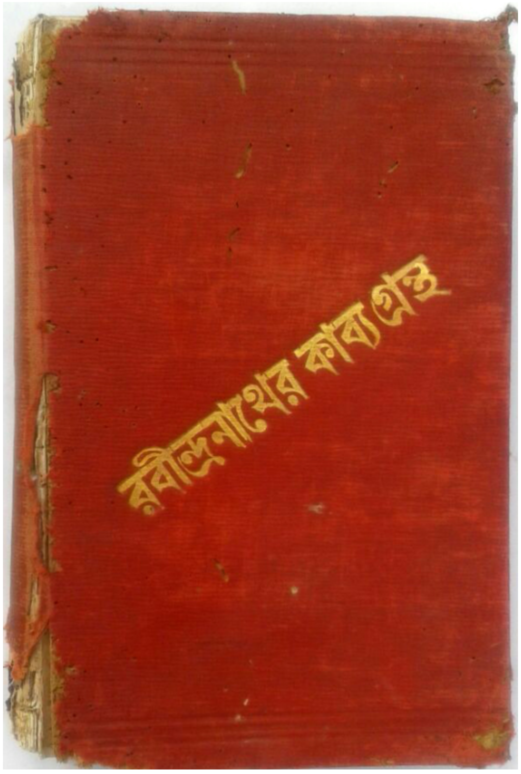

চিত্র -১২ / কাব্যগ্রন্থ, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১৫
বাঁধাইয়ের একটা ধরণ

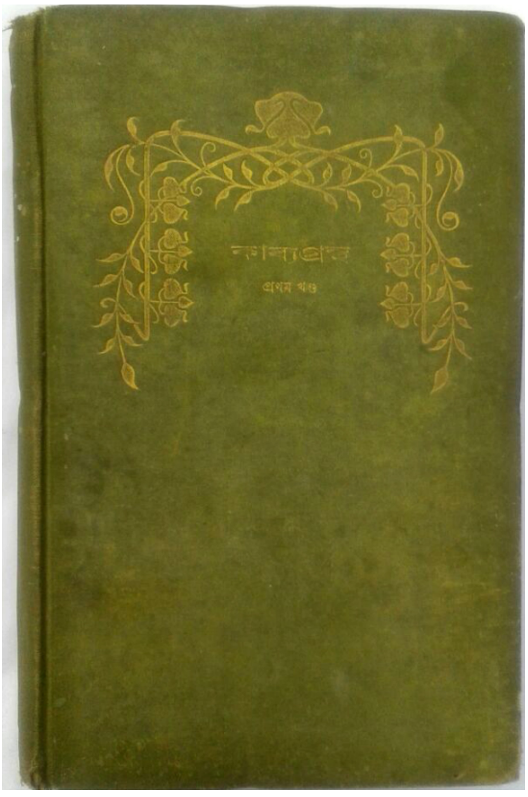

চিত্র -১৩ / কাব্যগ্রন্থ, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১৫
বাঁধাইয়ের আর-এক ধরণ

চিত্র -১৪ / বিচিত্রিতা, ১৯৩৩
মরোক্কান লেদারের বৈভবময় জ্যাকেট

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন প্রচ্ছদ

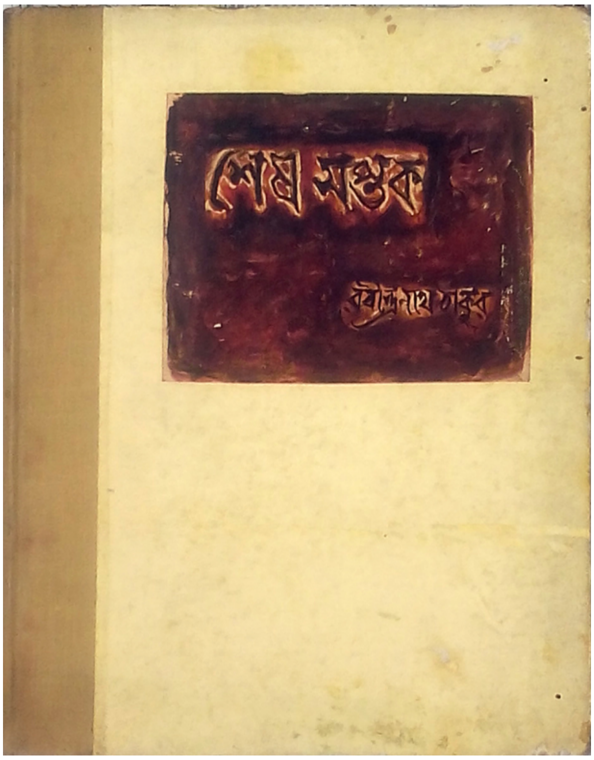

চিত্র -১৫ / শেষ সপ্তক, ১৯৩৫, রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রচ্ছদ

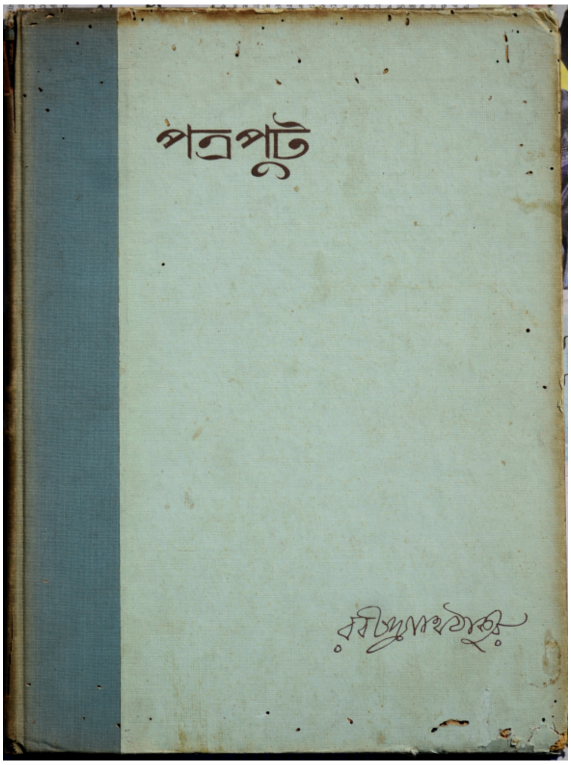

চিত্র -১৬ / পত্রপুট, ১৯৩৬,
গ্রন্থালয়-পর্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ধরণ

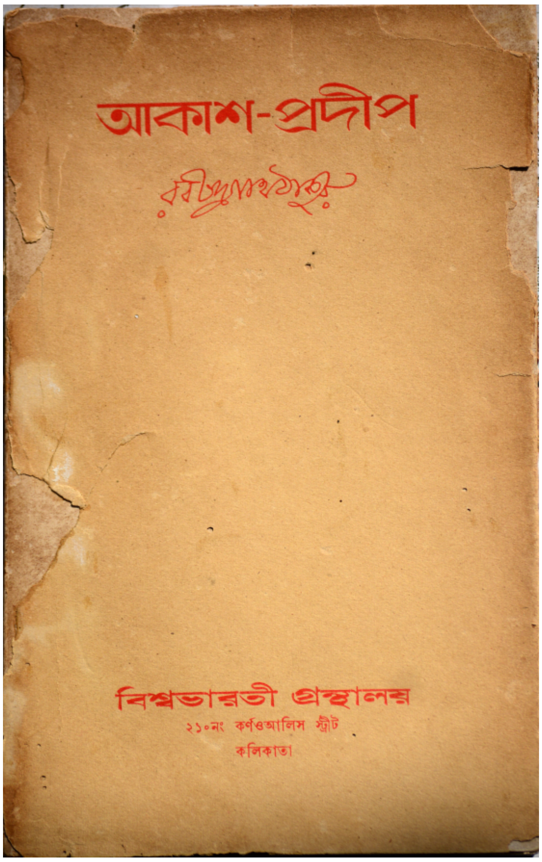

চিত্র -১৭ / আকাশ-প্রদীপ, ১৯৩৯,
সামনে বড় করে প্রকাশনার নাম লেখা

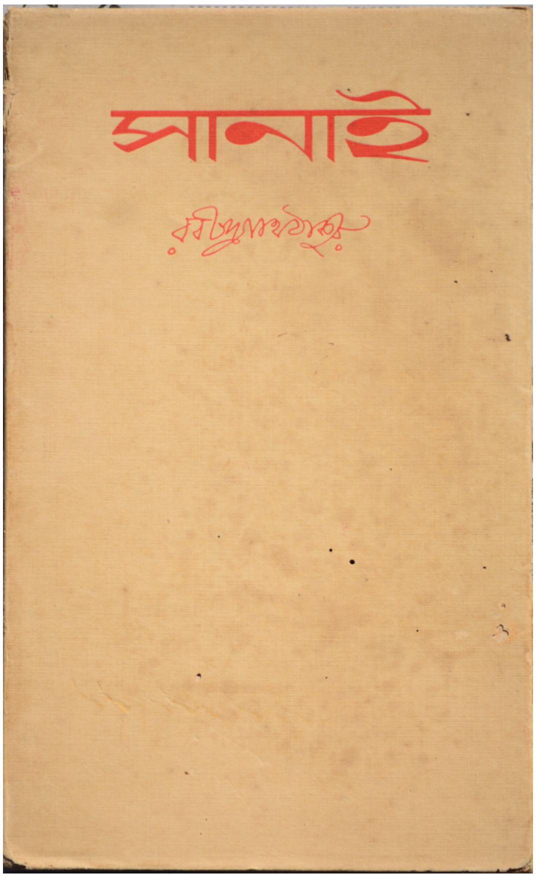

চিত্র -১৮ / সানাই, ১৯৪০
প্রকাশনার নামবিহীন প্রচ্ছদ

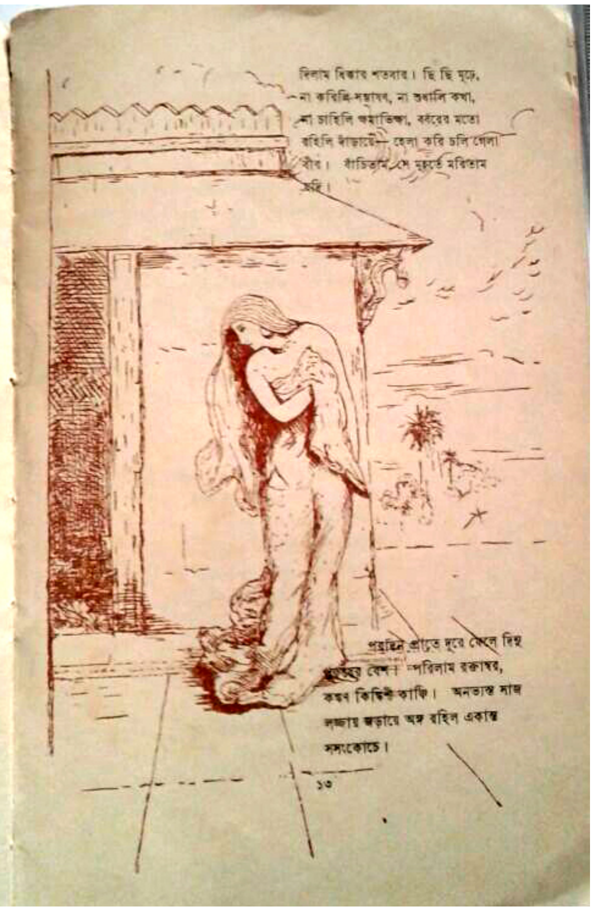

চিত্র -১৯ / চিত্রাঙ্গদা, ১৮৯২, অবনীন্দ্রনাথের অলংকরণ

চিত্র -২০ / চয়নিকা, ১৯০৯, নন্দলাল বসুর অলংকরণ

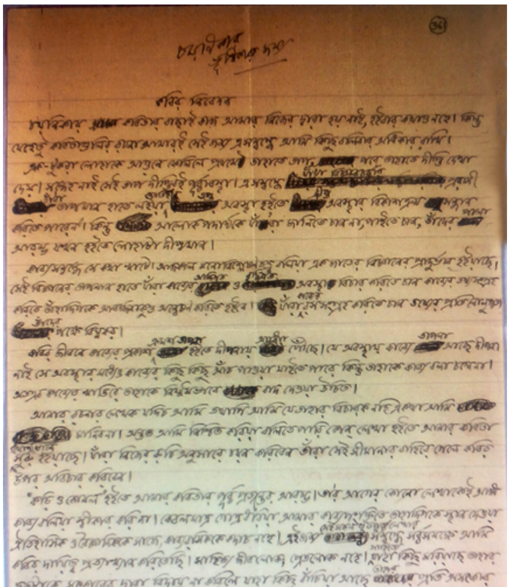

চিত্র -২১ / চয়নিকা (১৯২৪)-এর
জন্যে লিখিত অপ্রকাশিত ভূমিকা

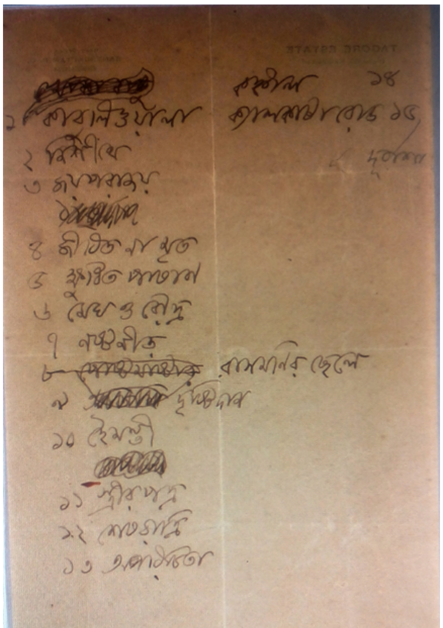

চিত্র -২২ /রবীন্দ্রনাথের নিজের বাছাই করা
'শ্রেষ্ঠ' গল্পের তালিকা

প্রেস-প্রুফ

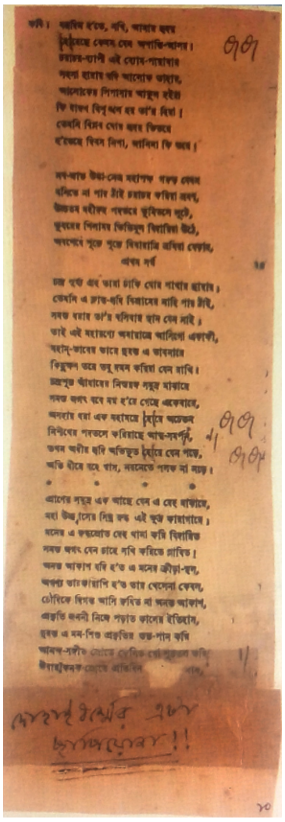

চিত্র -২৩ / ভগ্ন-হৃদয়, ১৯১১ সালে প্রকাশিতব্য
সংস্করণের প্রুফে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

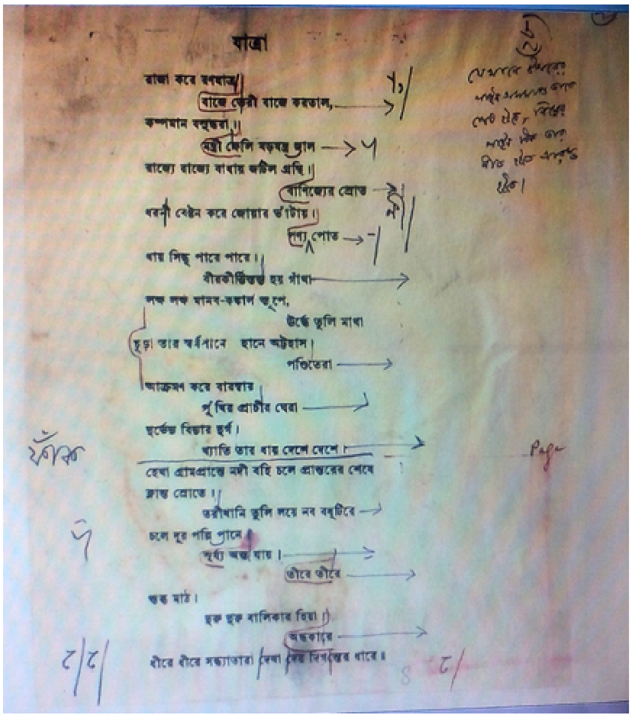

যাত্রা

যাত্রা করে [illegible]
বাজে ভেরী বাজে করতাল,
কম্পমান বসুন্ধরা।
মন্ত্রী ফেলি ষড়যন্ত্র জাল
রাজ্যে রাজ্যে বাধায় জটিল গ্রন্থি।
বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার ভাঁটায়।
পণ্য পোত
যায় সিন্ধু পারে পারে।
বীরকীর্তিস্তম্ভ হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানব-কঙ্কাল স্তূপে,
ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চূড়া তার স্বর্গপানে হানে অট্টহাস।
পণ্ডিতেরা
আক্রমণ করে বারবার
পুঁথির প্রাচীর ঘেরা
দুর্ভেদ্য বিদ্যার দুর্গ।
খ্যাতি তার ব্যাপ্ত দেশে দেশে।
হেথা গ্রামপ্রান্তে নদী বহি চলে প্রান্তরের শেষে
ক্লান্ত স্রোতে।
তরীখানি তুলি লয়ে নব বধূটিরে
চলে দূর পল্লি পানে।
সূর্য অস্ত যায়।
তীরে তীরে
শূন্য মাঠ।
হুরু হুরু বালিকার হিয়া।
অন্ধকারে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয় দিগন্তের ধারে।

চিত্র -২৪ / 'যাত্রা' কবিতায়
সুধীর করের প্রুফ সংশোধন

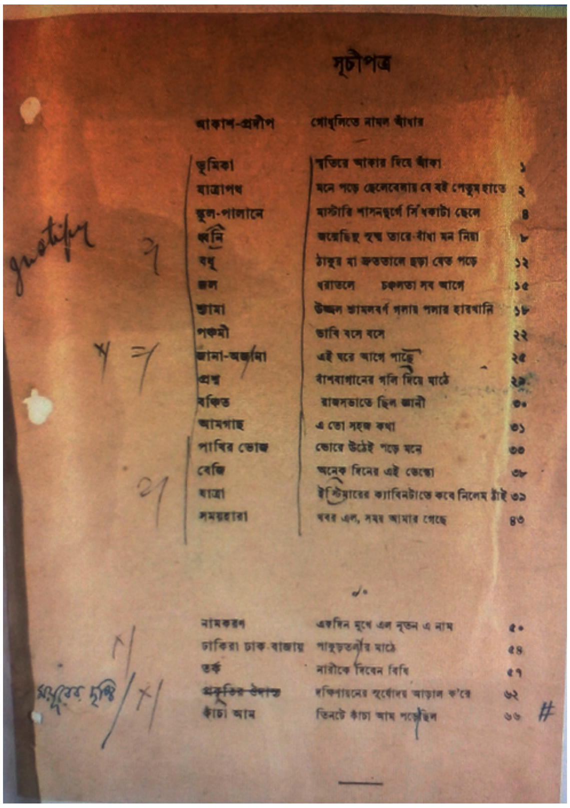

সূচীপত্র

আকাশ-প্রদীপ	গোধূলিতে নামল আঁধার	
ভূমিকা	স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা	১
যাত্রাপথ	মনে পড়ে ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে	২
স্কুল-পালানে	মাস্টারি শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে	৪
ধ্বনি	জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে-বাঁধা মন নিয়া	৮
বধূ	ঠাকুর মা দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে	১২
জল	ধরাতলে চঞ্চলতা সব আগে	১৫
শ্যামা	উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ গলায় পলার হারখানি	১৮
পঞ্চমী	ভাবি বসে বসে	২২
জানা-অজানা	এই ঘরে আগে পাছে	২৫
প্রশ্ন	বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে	২৯
বঞ্চিত	রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী	৩০
আমগাছ	এ তো সহজ কথা	৩১
পাখির ভোজ	ভোরে উঠেই পড়ে মনে	৩৩
বেজি	অনেক দিনের এই ডেস্কো	৩৮
যাত্রা	ইস্টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাঁই	৩৯
সময়হারা	খবর এল, সময় আমার গেছে	৪৩

৺৹

নামকরণ	একদিন মুখে এল নূতন এ নাম	৫০
ঢাকিরা ঢাক বাজায়	পাকুড়তলীর মাঠে	৫৪
তর্ক	নারীকে দিবেন বিধি	৫৭
~~প্রকৃতির উদ্ধার~~	দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে	৬২
কাঁচা আম	তিনটে কাঁচা আম পড়েছিল	৬৬

চিত্র -২৫ / আকাশ-প্রদীপ, ১৯৩৯,
সুধীর করের প্রুফ সংশোধন

প্রেস-প্রুফ

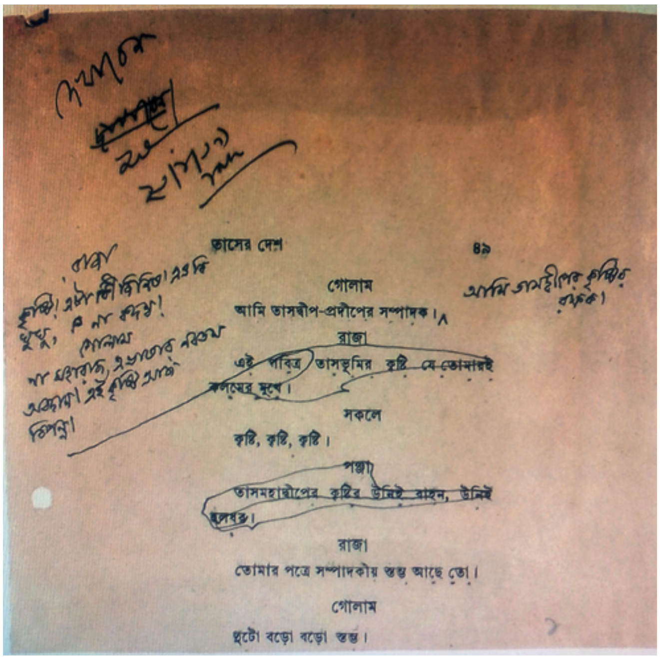

তাসের দেশ ৪৯

গোলাম

আমি তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক।

রাজা

এই পবিত্র তাসভূমির কৃষ্টি যে তোমারই কলমের মুখে।

সকলে

কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

পঞ্জা

তাসমহাদ্বীপের কৃষ্টির উনিই বাহন, উনিই রক্ষক।

রাজা

তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো।

গোলাম

দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

চিত্র -২৬ / তাসের দেশ, ১৯৩৩,
রবীন্দ্রনাথের প্রুফ সংশোধন

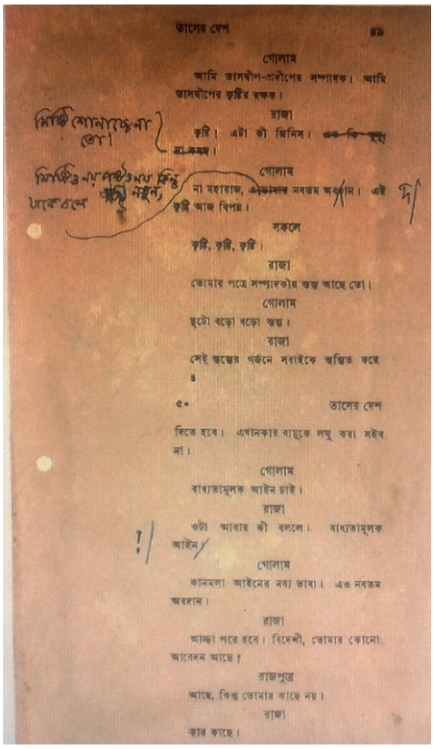

তাসের দেশ ৪৯

গোলাম

আমি তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা

কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। ~~ও-ও কি খুব না কমর~~।

গোলাম

না মহারাজ, ~~একেবারে~~ নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে

কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা

তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো।

গোলাম

দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

রাজা

সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে

৪

৫০ তাসের দেশ

দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সইব না।

গোলাম

বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা

ওটা আবার কী বললে। বাধ্যতামূলক আইন/

গোলাম

কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

রাজা

আচ্ছা পরে হবে। বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে?

রাজপুত্র

আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়।

রাজা

কার কাছে।

চিত্র -২৭ / তাসের দেশ, ১৯৩৩,
রবীন্দ্রনাথের প্রুফ সংশোধন

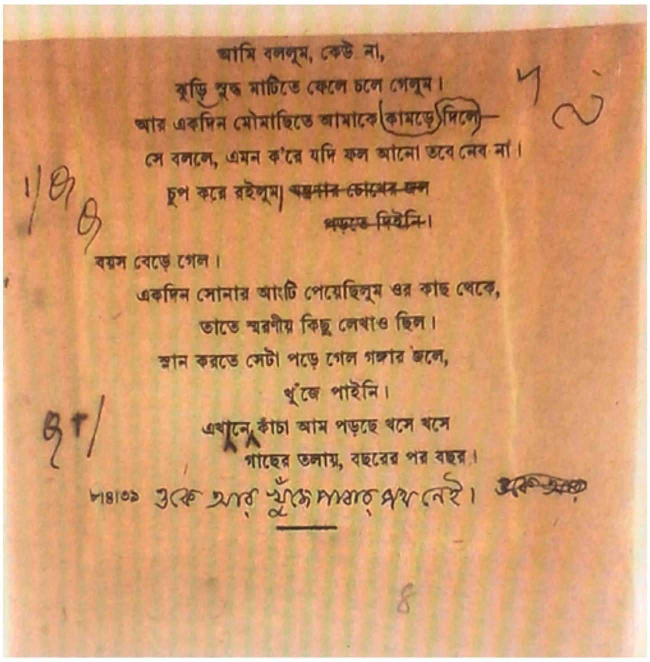

আমি বললুম, কেউ না,
ঝুড়ি সুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।
আর একদিন মৌমাছিতে আমাকে কামড়ে দিলে—
সে বললে, এমন ক'রে যদি ফল আনো তবে নেব না।
চুপ করে রইলুম। ~~যন্ত্রণার চোখের জল পড়তে দিইনি~~।

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে,
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে,
খুঁজে পাইনি।
এখানে কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
৮।৪।৩৯ ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

চিত্র -২৮ / আকাশ-প্রদীপ, 'কাঁচা আম' ১৯৩৯,
রবীন্দ্রনাথের প্রুফ সংশোধন

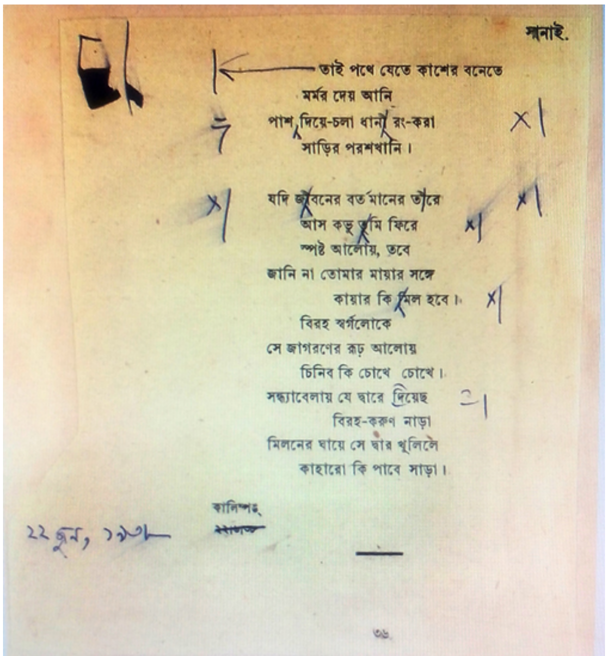

সানাই.

তাই পথে যেতে কাশের বনেতে
মর্মর দেয় আনি
পাশ দিয়ে-চলা ধানী রং-করা
সাড়ির পরশখানি।

যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোয়, তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।
বিরহ স্বর্গলোকে
সে জাগরণের রূঢ় আলোয়
চিনিব কি চোখে চোখে।
সন্ধ্যাবেলায় যে দ্বারে দিয়েছ
বিরহ-করুণ নাড়া
মিলনের ঘায়ে সে দ্বার খুলিলে
কাহারো কি পাবে সাড়া।

কালিম্পঙ
~~শান্তিনিকেতন~~
২২ জুন, ১৯৩৮

৩৬

চিত্র -২৯ / সানাই, ১৯৪০,
রবীন্দ্রনাথের প্রুফ সংশোধন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের বিজ্ঞাপন

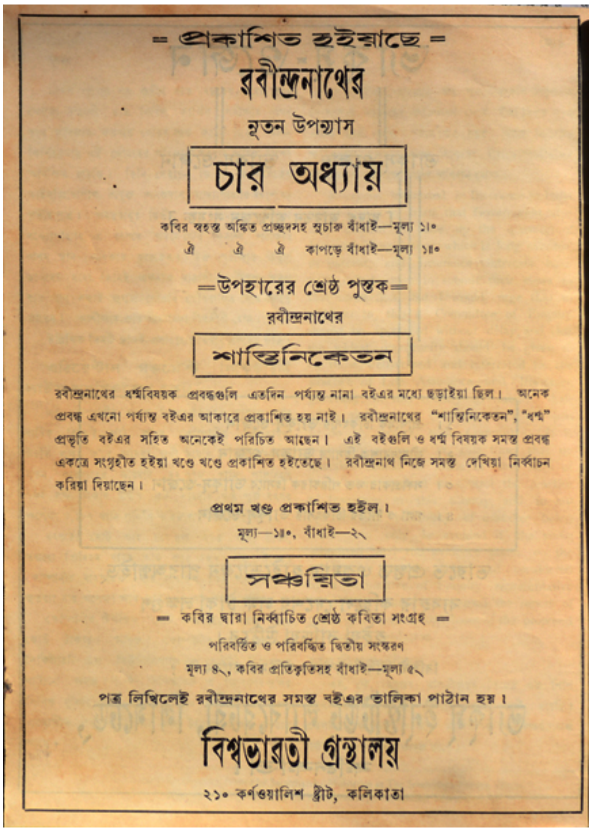

চিত্র -৩০ / বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ব

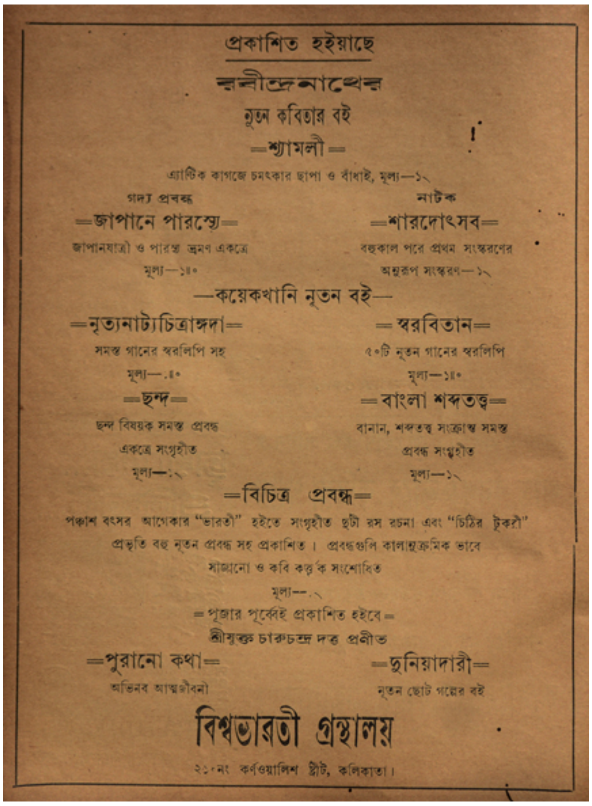

চিত্র -৩১ / বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৪৩ব

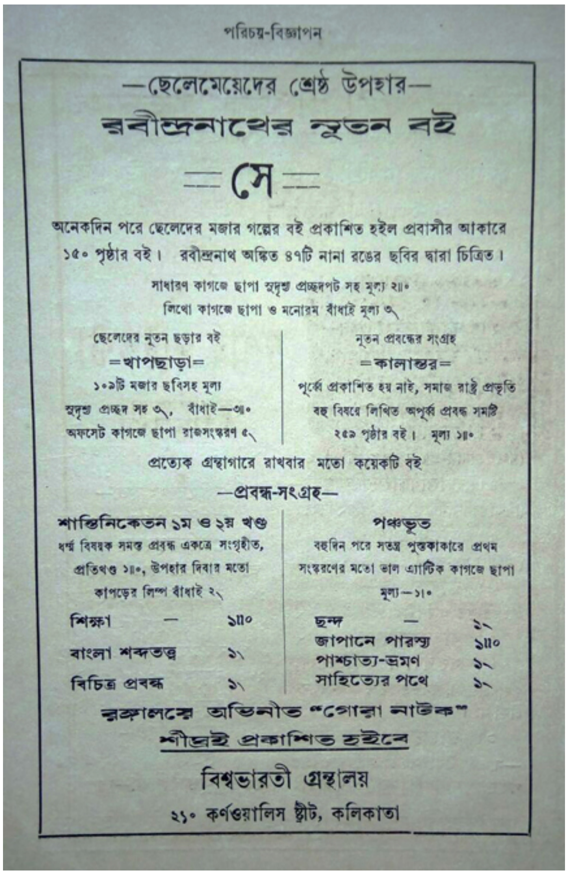

চিত্র -৩২ / পরিচয়, ভাদ্র ১৩৪৪ব

পরিশিষ্ট

প্রকাশনা তথ্য-সহ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বইয়ের কালানুক্রমিক তালিকা

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সংখ্যা ঠিক কতগুলি তা বলা সহজ নয়, কবে কোন বই প্রকাশিত তা সবটা নির্ভুলভাবে বলা আরও কঠিন ! কেন, তা আমরা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি :

সমস্যা ১। ধরা যাক *চয়নিকা*-র কথা। বইটি প্রথম প্রকাশিত হল ১৯০৯-এ, ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে। এই একই নামে ১৯২৬ সালে বিশ্বভারতী থেকে যে বইটি প্রকাশ হল পাঠক-পছন্দের কবিতায় ভরে, সেটি কি একই বই? নামের মিল ছাড়া আর কোনো মিলই নেই যাদের মধ্যে, তাদের কি একই বই ধরা চলে?

গল্পগুচ্ছ বইটি সম্বন্ধেও অনেকটা একই সমস্যা। ১৯০০ সালে প্রকাশিত দুখণ্ডের *গল্পগুচ্ছ* (দ্বিতীয় খণ্ডটির নাম অবশ্য ছিল *গল্প*), ১৯০৮-০৯এ প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডের *গল্পগুচ্ছ* আর ১৯২৬-২৭এ প্রকাশিত তিন খণ্ডের *গল্পগুচ্ছ* কি একই 'বই'? তাদের 'বিষয়' (Content) স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি করে আলাদা।

সমস্যা ২। *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* (১৮৮১) আর *য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি* (১৮৮০) দুই মলাটের মধ্যে এনে ১৯৩৬ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হল *পাশ্চাত্য ভ্রমণ* নামের একটি বই। এটিকে কি রবীন্দ্রনাথের একটি 'বই' বলে গণ্য করা হবে? একটি নতুন 'টাইটেল' কি একটি নতুন 'বই'? বলা বাহুল্য, এটা আগের সমস্যাটির ঠিক উল্টো। আগেরটায় 'টাইটেল' এক, বিষয় আলাদা, এটায় 'বিষয়' পুরাতন, 'টাইটেল' ভিন্ন।

সমস্যা ৩। ধরা যাক, *স্মরণ* বইটির প্রকাশকাল কবে, এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে? এর চেনা উত্তর হল ১৯০২। ১৯০২তে মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত *কাব্য-গ্রন্থ*-এর ৬ষ্ঠ ভাগে স্মরণ শিরোনামের একটি বিভাগ ছিল বটে, কিন্তু সেইটেই কি স্মরণ কাব্যগ্রন্থ ? প্রথমত সেখানে 'জীবনদেবতা' বা 'মরণ' নামের বিভাগও ছিল, সেগুলিকে কেউ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ বলেন না, তাহলে ঐ 'স্মরণ'টিকে কেন আলাদা গ্রন্থ ধরা হবে তার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর দেওয়া মুশকিল। দ্বিতীয়ত, ঐ 'স্মরণ' ভাগটির কবিতাগুলি আর ১৯১৪তে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত প্রথম আলাদা-গ্রন্থ *স্মরণ*-এ প্রকাশিত কবিতা কি সম্পূর্ণ অভিন্ন? না, তা-ও না। পূর্বোল্লিখিত 'মরণ' বিভাগটিরও তিনটি কবিতা স্বতন্ত্র *স্মরণ*-এ যুক্ত হয়। ফলে *স্মরণ*-এর যথার্থ প্রকাশকাল ১৯১৪-ই ধরা উচিত কিনা তা নিয়ে তর্ক থেকেই যায়।

সমস্যা ৪। *কথা, কাহিনী* আর *কথা ও কাহিনী*– এই তিনটিকে কি তিনটি আলাদা গ্রন্থ ধরা হবে? রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তিনটি বই পাশাপাশি একাধিক মুদ্রণ ছাপা হয়ে এসেছে, এই কথাটা মনে রাখলে সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

সমস্যা ৫। ১৮৮১তে বেরিয়েছিল *বাল্মীকি-প্রতিভা*। ১৮৯৩-এ প্রকাশিত হল *গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা*। এই দুটোকে যদি আলাদা বই ধরি তাহলে *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *বিদায়-অভিশাপ* (১৯১২) এবং ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত *চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপ* এই তিনটি বইকে আলাদা-আলাদা বই ধরতে হয় ! কী হবে এর সমাধান?

সমস্যা ৬। *চিরকুমার সভা* বইটি আর-এক জটিল সমস্যার উৎস। *রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী*-র অন্তর্গত হয়ে ১৯০৪-এ প্রকাশিত হল 'চিরকুমার সভা। এটি তখন একটি 'আখ্যান', প্রকাশিতও হয়েছিল অন্য আরও চারটি ছোটগল্পের সঙ্গে একই বিভাগে। সেই আখ্যানটিই অল্পকিছু সংস্কার সাধনের পর যখন *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র ৮ম খণ্ডে(১৯০৮) ফের প্রকাশিত হল, তার নাম গেল বদলে, নতুন নাম হল 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। এখন, প্রথম প্রশ্ন হল এই দুটি কি দুটো আলাদা বই? তারপরে, ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হল এই আখ্যানেরই নাট্যরূপটি, তার নাম দেওয়া হল 'চিরকুমার সভা' ! তাহলে এখানে মোট কটা বই ধরব আমরা ?

এছাড়া, আমরা আগেই বারবার দেখেছি, বইয়ের আখ্যাপত্রের দেওয়া তারিখ, এমনকী বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত তারিখ কোনোটিকেই সম্পূর্ণ নির্ভুল প্রকাশকাল বলে গণ্য করা যায় না। (উদাহরণ হিসেবে, 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় পর্ব' অধ্যায়ের ''প্রেস প্রুফ' ও ছাপাখানার অন্দরমহল' শীর্ষক অংশে *সানাই* কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল বিষয়ে আলোচনা দেখা যেতে পারে) তবু, এই বিষয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অভাবে আমাদের এই দুটি উৎসের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের এই তালিকায় প্রকাশ-তারিখ হিসেবে দুটি সময়কাল দেওয়া আছে, বাঁকানো দাগের (/) আগে ও পরে। আগের সময়টি সাধারণত বইয়ের আখ্যাপত্র থেকে পাওয়া। পরের সময়টি সাধারণত 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ' অনুসারী। তবে লক্ষ করার বিষয়, অনেকসময়ে এই দুটি তারিখের মধ্যে রয়ে গেছে এক নিরুপায় অসংগতি !

তালিকা/১: স্বতন্ত্র বই

	বইয়ের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশনা ও প্রকাশক	মুদ্রাযন্ত্র, মুদ্রাকর, মুদ্রণসংখ্যা
১	কবি-কাহিনী	'সংবত ১৯৩৫'/৫ নভেম্বর ১৮৭৮	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	সরস্বতী যন্ত্র, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ৫০০
২	বন-ফুল	'১২৮৬' /৯ মার্চ ১৯৮০	মতিলাল মণ্ডল	গুপ্তপ্রেস, মতিলাল মণ্ডল, ১০০০
৩	বাল্মীকি-প্রতিভা	'ফাল্গুন ১৮০২ শক'/ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১	প্রসন্নকুমার বিশ্বাস (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত)	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্তী, ১০০০
৪	ভগ্নহৃদয়	'শকাব্দা ১৮০৩'/২৩ জুন ১৮৮১	কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী	বাল্মীকি যন্ত্র, কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৫	রুদ্রচণ্ড	'শকাব্দা ১৮০৩'/ ২৫ জুন ১৮৮১	কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী	বাল্মীকি যন্ত্র, কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৬	য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র	'শকাব্দা ১৮০৩'/ ২৫ অক্টোবর ১৮৮১	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	বাল্মীকি যন্ত্র, কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ২০০০
৭	সন্ধ্যা সঙ্গীত	'সন ১২৮৮'/ ৫জুলাই ১৮৮২	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৮	কাল-মৃগয়া	'অগ্রহায়ণ ১২৮৯'/ ৫ ডিসেম্বর ১৮৮২	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ২৫০
৯	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	'পৌষ ১৮০৪ শক'/ ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১০	প্রভাত-সঙ্গীত	'বৈশাখ ১৮০৫ শক'/ ১১মে ১৮৮৩	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১১	বিবিধ প্রসঙ্গ	'ভাদ্র ১৮০৫ শক'/ ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১২	ছবি ও গান	'ফাল্গুন ১৮০৫ শক'/ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১৩	প্রকৃতির প্রতিশোধ	'সন ১২৯১'/ ২৯ এপ্রিল ১৮৮৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১৪	নলিনী	'সন ১২৯১'/ ১০মে ১৮৮৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১৫	শৈশব সঙ্গীত	'সন ১২৯১'/ ২৯মে ১৮৮৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১৬	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	'সন ১২৯১'/ ১ জুলাই ১৮৮৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১৭	আলোচনা	আখ্যাপত্রে প্রকাশতথ্য নেই /১৫ এপ্রিল ১৮৮৫	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
১৮	রবিচ্ছায়া	'বৈশাখ ১২৯২'/ ২ জুন ১৮৮৫	যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১০০০
১৯	কড়ি ও কোমল	'১২৯৩ সন'/ ১৭ নভেম্বর ১৮৮৬	পীপ্‌ল্‌স লাইব্রেরি	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০

২০	রাজর্ষি	'সন ১২৯৩'/ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
২১	চিঠিপত্র	'১৮৮৭'/ ২জুলাই ১৮৮৭	শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং	ভূষণ প্রেস, শশীভূষণ দত্ত, ১০০০
২২	সমালোচনা	'সন ১২৯৪'/ ২৬ মার্চ ১৮৮৮	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পিপেল্‌স্ প্রেস, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১০০০
২৩	মায়ার খেলা	'অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক'/ ২২ ডিসেম্বর ১৮৮৮	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
২৪	রাজা ও রাণী	'২৫ শ্রাবণ ১২৯৬ সাল'/ ৯ আগস্ট ১৮৮৯	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
২৫ক	য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি (ভূমিকা) প্রথম খণ্ড	/৫ মে ১৮৯০	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
২৫খ	য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি দ্বিতীয় খণ্ড	'৮ আশ্বিন ১৩০০ সাল'/২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০৩০
২৬	বিসর্জন	'২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭'/ ১৫ মে ১৮৯০	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ৫০০
২৭	মানসী	'১০ পৌষ, ১২৯৭'/ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯০	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ২২০
২৮	চিত্রাঙ্গদা	'২৮ ভাদ্র, ১২৯৯'/ ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯২	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী
২৯	গোড়ায় গলদ্‌	'৩১ ভাদ্র, ১২৯৯'/ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯২	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ৫০০
৩১	সোনার তরী	'১৩০০'/ ২ জানুয়ারি ১৮৯৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	সাহিত্য যন্ত্র, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ২৫০
৩২	ছোট গল্প	'১৫ ফাল্গুন ১৩০০'/ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৩৩	চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ	'১৬ শ্রাবণ ১৩০১'/ ৩১ জুলাই ১৮৯৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী
৩৪	বিচিত্র গল্প ১	'১৩০১'/ ৫ অক্টোবর ১৮৯৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	সাহিত্য যন্ত্র, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১০১০
৩৫	বিচিত্র গল্প ২	'১৩০১'/ ৫ অক্টোবর ১৮৯৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	সাহিত্য যন্ত্র, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১০১০
৩৬	কথা-চতুষ্টয়	'১৩০১'/ ৫ অক্টোবর ১৮৯৪	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	সাহিত্য যন্ত্র, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১০১০
৩৭	গল্প-দশক	'১৩০২'/ ৩০ আগস্ট ১৮৯৫	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	সাহিত্য যন্ত্র, গোপালচন্দ্র রায়, ১০০০
৩৮	নদী ('বাল্যগ্রন্থাবলী ২')	'১৩০২ মাঘ ২২'/ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ২০৫০
৩৯	চিত্রা	'১৩০২ ফাল্গুন'/ ১১মার্চ ১৮৯৬	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০৫০

৪০	চৈতালী (*কাব্যগ্রন্থাবলী*-র অন্তর্গত হয়ে)[১]	'১৩০৩ আশ্বিন ১৫'/ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৪১	মালিনী (*কাব্যগ্রন্থাবলী*-র অন্তর্গত হয়ে)[২]	'১৩০৩ আশ্বিন ১৫'/ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৪২	বৈকুণ্ঠের খাতা	'চৈত্র ১৩০৩ সাল'/ ৫ এপ্রিল ১৮৯৭	কালিদাস চক্রবর্ত্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৪৩	পঞ্চভূত	'১৩০৪'/ ১২ মে ১৮৯৭	সুর কোম্পানি	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৪৪	কণিকা	'৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ সাল'/১৯ নভেম্বর ১৮৯৯	হেমচন্দ্র চক্রবর্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৫৫০
৪৫	কথা	'১লা মাঘ, ১৩০৬ সাল'/ ১৪ জানুয়ারি ১৯০০	হেমচন্দ্র চক্রবর্তী	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬০০
৪৬	কাহিনী	'২৪ ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল'/ ১২ মার্চ ১৯০০	দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬০০
৪৭	কল্পনা	'২৩ বৈশাখ, ১৩০৭ সাল'/ ৫মে ১৯০০	দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬০০
৪৮	ক্ষণিকা[৩]	আখ্যাপত্র নেই/ ২৬ জুলাই ১৯০০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারত যন্ত্র, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৬৫০
৪৯	নৈবেদ্য	'আষাঢ়, ১৩০৮'/ ৪ জুলাই ১৯০১	মজুমদার লাইব্রেরি, অমূল্যনারায়ণ মজুমদার	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১০০০
৫০	চোখের বালি	'১৩০৯'/ ৫ এপ্রিল ১৯০৩	মজুমদার লাইব্রেরি, সুবোধচন্দ্র মজুমদার	কালিকা যন্ত্র, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১০০০
৫১	স্মরণ (*কাব্য-গ্রন্থ* ষষ্ঠ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[৪]	'১৩১০ সন'/	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	মেটকাফ্ প্রেস, ১১০০
৫২	শিশু (*কাব্য-গ্রন্থ* সপ্তম ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[৫]	'সন ১৩১০। ২ আশ্বিন'/	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১১০০
৫৩	কর্ম্মফল	'১৩১০ সন'/ ১৯০৩	কুন্তলীন আফিস, এইচ বসু	কুন্তলীন প্রেস, পূর্ণচন্দ্র দাস। ছবির মুদ্রক ফটো টাইপ কোম্পানি ও ইউ.রায় এন্ড সন্স্।
৫৪	চিরকুমার সভা (*রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী*-র অন্তর্গত হয়ে)[৬]	'১৩১১'/ ২৯ আগস্ট ১৯০৪	হিতবাদী কার্য্যালয় ,অশ্বিনীকুমার হালদার	হিতবাদী কার্য্যালয় ,অশ্বিনীকুমার হালদার, ১০,০০০
৫৫	বাউল (*স্বদেশ* নামক গান-কবিতায় মেশানো সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে)[৭]	'১৩১২'/ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ৫০০
৫৬	আত্মশক্তি	'১৩১২' (আশ্বিন)/ ১৯০৫ (অক্টোবর?)	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না
৫৭	ভারতবর্ষ	'১৩১২'/ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৫৮	খেয়া	/১০ আগস্ট ১৯০৬	কেদারনাথ দাশগুপ্ত	মজুমদার প্রেস, তমিজুদ্দি মুন্‌শি, ১০০০

৫৯	নৌকাডুবি	'১৩১৩'/ ২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬	বসুমতী আফিস, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বসুমতী মেসিন, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২০০০
৬০	বিচিত্র প্রবন্ধ (*গদ্যগ্রন্থাবলী*-র প্রথম ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[৮]	'১৩১৪ বৈশাখ'/ ১৬ এপ্রিল ১৯০৭	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৬১	চারিত্রপূজা	/২৮মে ১৯০৭	ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স (মজুমদার লাইব্রেরি)[৯]	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ২০০০
৬২	প্রাচীন সাহিত্য (*গদ্যগ্রন্থাবলী*-র দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১০]	/১৩ জুলাই ১৯০৭	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৬৩	লোকসাহিত্য (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ৩য় ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১১]	/২৬ জুলাই ১৯০৭	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৬৪	সাহিত্য (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ৪র্থ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১২]	/১১ অক্টোবর ১৯০৭	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৬৫	আধুনিক সাহিত্য (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ৫ম ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১৩]	/১০ অক্টোবর ১৯০৭	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৬৬	হাস্যকৌতুক (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ৬ষ্ঠ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১৪]	/১০ ডিসেম্বর ১৯০৭	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৬৭	ব্যঙ্গকৌতুক (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ৭ম ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১৫]	/২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৬৮	প্রজাপতির নির্বন্ধ (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ৭ম ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১৬]	/২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৬৯	প্রহসন (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ৯ম ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১৭]	/১৬ এপ্রিল ১৯০৮	মজুমদার লাইব্রেরি, সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৭০	রাজা প্রজা (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ১০ম ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১৮]	/৩০ জুন ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৭১	সমূহ (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ১১শ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[১৯]	/২৫ জুলাই ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৭২	স্বদেশ (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ১২শ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[২০]	/১২ আগস্ট ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫০
৭৩	সমাজ (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ১৩শ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[২১]	/ ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৭৪	কথা ও কাহিনী[২২]	/ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	[কান্তিক প্রেস], হরিচরণ মান্না, ১০০০
৭৫	শারদোৎসব	'৭ ভাদ্র ১৩১৫'/ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, (প্রচ্ছদ মুদ্রিত কুন্তলীন প্রেস থেকে)১০০০
৭৬	শিক্ষা (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ১৪শ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[২৩]	/১৭ নভেম্বর ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫৬

৭৭	মুকুট	/৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০৫৬
৭৮	শান্তিনিকেতন ১	/২৪ জানুয়ারি ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৭৯	ধর্ম্ম (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ১৬শ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[২৪]	/২৫ জানুয়ারি ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না
৮০	শব্দতত্ত্ব (*গদ্যগ্রন্থাবলী* ১৫শ ভাগের অন্তর্গত হয়ে)[২৫]	/২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না
৮১	শান্তিনিকেতন ২	/২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৮২	শান্তিনিকেতন ৩	/৫ মার্চ ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৮৩	শান্তিনিকেতন ৪	/১২ মার্চ ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৮৪	শান্তিনিকেতন ৫	/১৫ এপ্রিল ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৮৫	শান্তিনিকেতন ৬	/১৫ এপ্রিল ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৮৬	শান্তিনিকেতন ৭	/২ জুন ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৮৭	শান্তিনিকেতন ৮	/১৫ জুন ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৮৮	প্রায়শ্চিত্ত	/১৫ অক্টোবর ১৯০৯	হিতবাদী লাইব্রেরি, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৮৯	শান্তিনিকেতন ৯	/২৫ জানুয়ারি ১৯১০	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৯০	শান্তিনিকেতন ১০	/২৯ জানুয়ারি ১৯১০	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৯১	গোরা (দুটি খণ্ডে)[২৬]	/১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০[২৭]	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না
৯২	গীতাঞ্জলি	/৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, সতীশচন্দ্র মিত্র	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৯৩	শান্তিনিকেতন ১১	/৮ অক্টোবর ১৯১০	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, সতীশচন্দ্র মিত্র	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৯৪	রাজা	/৬ জানুয়ারি ১৯১১	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, সতীশচন্দ্র মিত্র	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৯৪	শান্তিনিকেতন ১২	/২৪ জানুয়ারি ১৯১১	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, সতীশচন্দ্র মিত্র	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৯৫	শান্তিনিকেতন ১৩	/১০ মে ১৯১১	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, সতীশচন্দ্র মিত্র	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০

৯৬	আটটি গল্প	/২০ নভেম্বর ১৯১১	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, পাঁচকড়ি মিত্র	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৯৭	ডাকঘর	/১৬ জানুয়ারি ১৯১২	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
৯৮	গল্প চারিটি	/১৮ মার্চ ১৯১২	আদি ব্রাহ্মসমাজ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	রণগোপাল চক্রবর্ত্তী, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১০০০
৯৯	জীবন-স্মৃতি	‘১৩১৯’/ ২৫ জুলাই ১৯১২	নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	রণগোপাল চক্রবর্ত্তী, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১০০০
১০০	ছিন্নপত্র	‘১৩১৯’/ ২৮ জুলাই ১৯১২	নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	রণগোপাল চক্রবর্ত্তী, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১০০০
১০১	অচলায়তন	/২ আগস্ট ১৯১২	রণগোপাল চক্রবর্ত্তী	রণগোপাল চক্রবর্ত্তী, আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১০০০
১০২	উৎসর্গ	‘১৩২১ জ্যৈষ্ঠ’/ ২৮মে ১৯১৪	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
১০৩	গীতি-মাল্য	/২ জুলাই ১৯১৪	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
১০৪	গীতালি	‘১৩২১ কার্তিক’/[নভেম্বর ১৯১৪][২৮]	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১০৫	শান্তিনিকেতন ১৪	‘১৯১৫’[২৯]	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১০৬	শান্তিনিকেতন ১৫	‘১৯১৬’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১০৭	শান্তিনিকেতন ১৬	‘১৯১৬’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১০৮	শান্তিনিকেতন ১৭	‘১৯১৬’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১০৯	ফাল্গুনী	‘১৯১৬’/[উৎসর্গপত্রের তারিখ ১৫ ফাল্গুন ১৩২২ = ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬]	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১১০	ঘরে বাইরে	‘১৯১৬’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১১১	বলাকা	‘১৯১৬’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১১২	সঞ্চয়	‘১৯১৬’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১১৩	পরিচয়	‘১৯১৬’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১১৪	চতুরঙ্গ	‘১৯১৬’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১১৫	গল্পসপ্তক	[১৯১৬ অক্টোবর]	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
১১৬	গুরু	‘ভূমিকা’র তারিখ ১ ফাল্গুন ১৩২৪ = ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত	ব্রাহ্মমিশন প্রেস, অবিনাশচন্দ্র সরকার
১১৭	পলাতকা	‘অক্টোবর ১৯১৮’	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু, ১০০০
১১৮	জাপান-যাত্রী	‘শ্রাবণ ১৩২৬’/ ২১ জুলাই ১৯১৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চিন্তামণি ঘোষ	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়
১১৯	অরূপরতন	‘ভূমিকা’র তারিখ মাঘ ১৩২৬/[ফেব্রুয়ারি?] ১৯২০	[ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস], চিন্তামণি ঘোষ	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়

১২০	পয়লা-নম্বর	'বৈশাখ ১৩২৭'/ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী ৫ এপ্রিল ১৯২০ অর্থাৎ ২৩ চৈত্র ১৩২৬-এ প্রকাশ	শিশির পাবলিশিং হাউস	কান্তিক প্রেস, কমলাকান্ত দালাল, ১০০০
১২১	ঋণ-শোধ	'১৯২১'/২ অক্টোবর ১৯২১	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	কালিকা প্রেস, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ১০০০
১২২	মুক্তধারা	'বৈশাখ ১৩২৯'/ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশ ১৩২৯-এর ১৪ আষাঢ় = ২৮ জুন ১৯২২	প্রবাসী কার্য্যালয়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	ব্রাহ্মমিসন প্রেস, অবিনাশচন্দ্র সরকার, ৪০০০
১২৩	লিপিকা	'১৯২২'/ ১৭ আগস্ট ১৯২২	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	কান্তিক প্রেস, কালাচাঁদ দালাল, ১০০০
১২৪	শিশু ভোলানাথ	'১৯২২'/ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২২	ইন্ডিয়ান প্রেস	কান্তিক প্রেস, কমলাকান্ত দালাল, ১০০০
১২৫	পূরবী	[১৩৩২ শ্রাবণ]/আগস্ট? ১৯২৫	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, করুণাবিন্দু বিশ্বাস	ইউ. রায় এন্ড সন্স, কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, ২১০০
১২৬	গৃহপ্রবেশ	'আশ্বিন ১৩৩২'/১২ অক্টোবর ১৯২৫	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, করুণাবিন্দু বিশ্বাস	প্রবাসী প্রেস, অবিনাশচন্দ্র সরকার, ১০০০
১২৭	প্রবাহিণী	'অগ্রহায়ণ ১৩৩২'/ [নভেম্বর? ১৯২৫]	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, করুণাবিন্দু বিশ্বাস	
১২৮	চিরকুমার সভা (নাটক)[৩০]	'ফাল্গুন ১৩৩২'/ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশ ২৯ চৈত্র ১৩৩২ = ১২ এপ্রিল ১৯২৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, করুণাবিন্দু বিশ্বাস	ভারতবর্ষ প্রন্টিং ওয়ার্কস, নরেন্দ্রনাথ কোঙার, ১১০০
১২৯	শোধ-বোধ	/১৯ জুন ১৯২৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	ভারতবর্ষ প্রন্টিং ওয়ার্কস, নরেন্দ্রনাথ কোঙার, ১১০০
১৩০	নটীর পূজা	'১৩৩৩'/ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১০০০
১৩১	শেষ বর্ষণ (ঋতু-উৎসব সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে)[৩১]	'১৩৩৩'/ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ২১০০
১৩৩	রক্তকরবী	'১৩৩৩'/ ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১৩৪	লেখন	'ভুমিকা' লেখার তারিখ ৭ নভেম্বর ১৯২৬/ প্রকাশ ১৯২৭[৩২]		[রোটা প্রিন্ট-যন্ত্র, বার্লিন]
১৩৫	শেষ রক্ষা	'শ্রাবণ, ১৩৩৫'/ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৮	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০

১৩৬	যাত্রী[৩৩]	'জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬'/ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ = ৯ আশ্বিন ১৩৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১৩৭	পরিত্রাণ	'জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬'/ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ = ১৩ আশ্বিন ১৩৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১৩৮	যোগাযোগ	'১৩৩৬ আষাঢ়'/ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ =	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ২১০০
১৩৯	তপতী	'১৩৩৬ ভাদ্র'/ ২৯ জানুয়ারি ১৯৩০ = ১৫ মাঘ ১৩৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১২৭	প্রবাহিণী	'অগ্রহায়ণ ১৩৩২'/ [নভেম্বর? ১৯২৫]	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, করুণাবিন্দু বিশ্বাস	
১৪০	শেষের কবিতা	'১৩৩৬ ভাদ্র'/ ৩১ জানুয়ারি ১৯৩০ = ১৭ মাঘ ১৩৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ২১০০
১৪১	মহুয়া	'১৩৩৬ আশ্বিন'/ [অক্টোবর ১৯৩০]	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	আর্ট প্রেস, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ২১০০
১৪২	ভানুসিংহের পত্রাবলী	'১৩৩৬ চৈত্র'/ ২ আগস্ট ১৯৩০ = ১৭ শ্রাবণ ১৩৩৭	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১৪৩	রাশিয়ার চিঠি	'বৈশাখ ১৩৩৮'/ ২২ জুন ১৯৩১ = ৭ আষাঢ় ১৩৩৮	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ৩১০০
১৪৪	বন-বাণী	'১৩৩৮ আশ্বিন'/ ২ জানুয়ারি ১৯৩২ = ১৭ পৌষ ১৩৩৮	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১৪৫	পরিশেষ	'ভাদ্র ১৩৩৯'/২৬ নভেম্বর ১৯৩২(১০ অগ্র)	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১৪৬	পুনশ্চ	'আশ্বিন ১৩৩৯'/ ৩০ নভেম্বর ১৯৩২ = ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১৪৭	দুই বোন	'১৩৩৯ ফাল্গুন'/ ৩০ মার্চ ১৯৩৩ = ১৬ চৈত্র ১৩৩৯	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
১৪৮	মানুষের ধর্ম্ম	'১৯৩৩'/ [মে ১৯৩৩]	ভূপেন্দ্রলাল ব্যানার্জি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ভূপেন্দ্রলাল ব্যানার্জি
১৪৯	চণ্ডালিকা	'ভাদ্র ১৩৪০'/ ৪ অক্টোবর ১৯৩৩ = ১৮ আশ্বিন ১৩৪০	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০

১৫০	তাসের দেশ	'ভাদ্র ১৩৪০' (উৎসর্গ পত্রের তারিখ ৩১ ভাদ্র)/ ৪ অক্টোবর ১৯৩৩ = ১৮ আশ্বিন ১৩৪০	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৫১	বিচিত্রিতা	'শ্রাবণ ১৩৪০'/ ৪ অক্টোবর ১৯৩৩ = ১৮ আশ্বিন ১৩৪০	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	ইউ.রায় এন্ড সন্স, করুণাবিন্দু বিশ্বাস, ১১০০
১৫২	বাঁশরী	'অগ্রহায়ণ ১৩৪০'/ ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৪ = ১১ মাঘ ১৩৪০	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২১০০
১৫৩	মালঞ্চ	'চৈত্র ১৩৪০'/ ৩ এপ্রিল ১৯৩৪	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২১০০
১৫৪	চার অধ্যায়	'পৌষ ১৩৪১'/ ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৪	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস,প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৪০০
১৫৫	শেষ সপ্তক	'২৫ বৈশাখ ১৩৪২'/ ৮মে ১৯৩৫	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৫৬	সুর ও সঙ্গতি[৩৪]	'ভূমিকা'র তারিখ 'মাঘ, ১৩৪১'/ ১ আগস্ট ১৯৩৫ = ১৬ শ্রাবণ ১৩৪২	ভারতী ভবন, কুন্দভূষণ ভাদুড়ী	মডার্ন আর্ট প্রেস, ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫৭	বীথিকা	'ভাদ্র ১৩৪২'/ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ = ২ আশ্বিন ১৩৪২	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৫৮	নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	'ফাল্গুন ১৩৪২'/ ১১ মার্চ ১৯৩৬ = ২৭ ফাল্গুন	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৫৯	পত্রপুট	'১৩৪৩ ২৫ বৈশাখ'/ ৮ মে ১৯৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৬০	ছন্দ	'আষাঢ় ১৩৪৩'/ ১০ জুলাই ১৯৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৬১	জাপানে-পারস্যে[৩৫]	'শ্রাবণ ১৩৪৩'/ ২০ আগস্ট ১৯৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,১০০০
১৬২	শ্যামলী	'ভাদ্র ১৩৪৩'/ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৬৩	সাহিত্যের পথে	'আশ্বিন ১৩৪৩'/ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৬৪	খাপছাড়া	'মাঘ ১৩৪৩'/ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ = ৮ ফাল্গুন ১৩৪৩	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২১০০
১৬৫	সে	'বৈশাখ ১৩৪৪'/ ১৫ জুলাই ১৯৩৭ = ৩১ আষাঢ় ১৩৪৪	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২১০০

১৬৬	কালান্তর	'বৈশাখ ১৩৪৪'/ ২৫ জুলাই ১৯৩৭ = ৯ শ্রাবণ	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৬৭	ছড়ার ছবি	'আশ্বিন ১৩৪৪'/ ৫ অক্টোবর ১৯৩৭	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২১০০
১৬৮	বিশ্ব-পরিচয়	'আশ্বিন ১৩৪৪'/ ৮ অক্টোবর ১৯৩৭	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৬৯	প্রান্তিক[৩৬]	'পৌষ ১৩৪৪'/ ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ = ২৫ মাঘ ১৩৪৪	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৭০	চণ্ডালিকা (নৃত্যনাট্য)[৩৭]	'ফাল্গুন ১৩৪৪'/	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৭১	পথে ও পথের প্রান্তে	'১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ'/ ৩১ জুলাই ১৯৩৮	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুলিনবিহারী সেন	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৭২	সেঁজুতি	'ভাদ্র ১৩৪৫'/ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৭৩	বাংলাভাষা পরিচয়	'১৯৩৮' [মাঘ ১৩৪৫, জানুয়ারি ১৯৩৯][৩৮]	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭৪	প্রহাসিনী	'পৌষ ১৩৪৫'/ [জানুয়ারি ১৯৩৯][৩৯]	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৭৫	আকাশ-প্রদীপ	'বৈশাখ ১৩৪৬' [৪০]/ ৪ মে ১৯৩৯	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১০০০
১৭৬	শ্যামা	'ভাদ্র ১৩৪৬'/ ১০ নভেম্বর ১৯৩৯	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১০০০
১৭৭	পথের সঞ্চয়	'ভাদ্র ১৩৪৬'/ [নভেম্বর ১৯৩৯][৪১]	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৭৮	নবজাতক	'বৈশাখ ১৩৪৭'/ ২০ এপ্রিল ১৯৪০	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৭৯	সানাই	'আষাঢ়, ১৩৪৭'/ ৩০ আগস্ট ১৯৪০[৪২]	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৮০	চিত্রলিপি	সেপ্টেম্বর ১৯৪০	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৮১	ছেলেবেলা	'ভাদ্র ১৩৪৭'/ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ = ৪ আশ্বিন ১৩৪৭	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৮২	রোগশয্যায়	'পৌষ ১৩৪৭'/ ২০ ডিসেম্বর ১৯৪০	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুলিনবিহারী সেন	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৮৩	তিনসঙ্গী	'পৌষ ১৩৪৭'/ ১ জানুয়ারি ১৯৪১	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুলিনবিহারী সেন	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১৮৪	আরোগ্য[৪৩]	'ফাল্গুন ১৩৪৭'/ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ = ২২ মাঘ ১৩৪৭	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুলিনবিহারী সেন	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০

১৮৫	জন্মদিনে	‘১লা বৈশাখ, ১৩৪৮’/ ৮মে ১৯৪১	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুলিনবিহারী সেন	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৮৬	গল্পসল্প	‘বৈশাখ ১৩৪৮’/ ১০মে ১৯৪১	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুলিনবিহারী সেন	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৮৭	ছড়া*	‘ভাদ্র, ১৩৪৮’	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুলিনবিহারী সেন	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০
১৮৮	শেষলেখা*	‘ভাদ্র ১৩৪৮’	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুলিনবিহারী সেন	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১০০

টীকা

১. স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ হিসেবে *চৈতালী*র প্রথম প্রকাশ ১৯১২, ২২ মার্চ। প্রকাশক ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। অবশ্য এর আগে *কাব্য-গ্রন্থ* (১৯০৩)-এর বিভিন্ন পর্যায়ে এর কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।

২. স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে *মালিনী*র প্রথম প্রকাশ ১৯১২, ২৩ মার্চ। প্রকাশক ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। অবশ্য এর আগে *কাব্য-গ্রন্থ* নবম ভাগে (১৯০৩) এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

৩. *ক্ষণিকা*-র আখ্যাপত্র নেই। এই তথ্য দেওয়া হল স্বপন মজুমদারের *রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি* মান্য করে। তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয়*-এ জানিয়েছেন (পৃ. ১২৮) বইটির প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রেমতোষ বসু। ছাপার ভার রবীন্দ্রনাথ প্রেমতোষ বসুর উপরেই দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু ‘অফিসিয়াল এন্ট্রি’ হিসেবে স্বপন মজুমদারের দেওয়া তথ্যই যথাযথ মনে হয়।

৪. স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ হিসেবে *স্মরণ*-এর প্রথম প্রকাশ ১৯১৪-র ২৫ মে, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে।

৫. স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ হিসেবে *শিশু*-র প্রকাশ ১৯০৯ সালে, ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে।

৬. স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে *চিরকুমার সভা*-র প্রকাশ ১৯২৬-এর ২২ এপ্রিল, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে। কিন্তু *রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী*তে এটির রূপ ‘গল্প’-এর। ১৯২৬-এ প্রকাশিত হবে একই নামের ‘নাট্য’রূপটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী*-র ‘রঙ্গচিত্র’ বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল এই ‘চিরকুমার সভা’। সেই ‘রঙ্গচিত্র’ বিভাগের বাকি লেখাগুলি ছিল ‘মানভঞ্জন’ ‘ঠাকুর্দা’ ‘মুক্তির উপায়’ এবং ‘রাজটীকা’। অর্থাৎ বাকি সবকটা ছিল ছোটগল্পই।

৭. স্বতন্ত্র *বাউল*-এর প্রকাশ *স্বদেশ* নামক সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশের ঠিক তিনদিন পরেই, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, মজুমদার লাইব্রেরি থেকেই ! অবশ্য *স্বদেশ* সংকলনের ‘বাউল’ অংশে যতগুলি গান ছিল স্বতন্ত্র *বাউল*-এ তার থেকে ৮টি গান কম আছে।

৮. *বিচিত্র প্রবন্ধ* স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে, ১৯২৮-এর ৩০ জুলাই। এই স্বতন্ত্র বই আর *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’-এর তফাৎ বিস্তর।

৯. প্রকাশনার জায়গায় দুটি নাম কেন তার ব্যাখ্যার জন্যে দ্রষ্টব্য মূল গবেষণার ‘মজুমদার লাইব্রেরি পর্ব’।

১০. স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে *প্রাচীন সাহিত্য*-র প্রকাশ ১৯৩২ সালে, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

১১. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *লোকসাহিত্য*-র প্রকাশ ১৯৩২-এ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

১২. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *সাহিত্য*-র প্রকাশ ১৯৩৪-এ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

১৩. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *আধুনিক সাহিত্য*-র প্রকাশ ১৯৩৪-এর ৪ আগস্ট, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

১৪. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *হাস্যকৌতুক*-এর প্রকাশ ১৯৩২-এর ২২ মার্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

১৫. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *ব্যঙ্গকৌতুক*-এর প্রকাশ ১৯৩২-এ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

১৬. *রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী*-র অন্তর্গত হয়ে যে 'চিরকুমার সভা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৪-এ, *প্রজাপতির নির্বন্ধ* কার্যত তারই ভিন্ন নামে প্রকাশ। দুইয়ের তফাৎ খুব বেশি নয়।

১৭. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *প্রহসন*-এর প্রকাশ ১৯৩১ সালে, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

১৮. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *রাজা প্রজা*-র প্রকাশ ১৯৩২-এর ২৩ নভেম্বর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

১৯. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *সমূহ*-র প্রকাশ ১৯২৯-এ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

২০. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *স্বদেশ*-এর প্রকাশ ১৯৩৩-এর ৩০ ডিসেম্বর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

২১. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *সমাজ*-এর প্রকাশ ১৯২৭-এর ১৬ এপ্রিল, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

২২. *কথা ও কাহিনী*-র প্রথম সংস্করণের কোনো কপি আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় নি। প্রশান্তকুমার পাল *রবিজীবনী*র ষষ্ঠ খণ্ডে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত তথ্য জানিয়েছেন।

২৩. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *শিক্ষা*-র প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫-এর ১৫ সেপ্টেম্বর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে।

২৪. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *ধর্ম* রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কখনই প্রকাশিত হয় নি। লক্ষ করার বিষয়, *গদ্যগ্রন্থাবলী* ১৫শ ভাগ প্রকাশিত হচ্ছে ১৬শ ভাগের পরে।

২৫. স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে *শব্দতত্ত্ব* নামের কোনো বই আর কখনই প্রকাশিত হয় নি। তবে ১৯৩৫-এ *বাংলা শব্দতত্ত্ব* নামে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে যে বইটি বেরোবে সেটিতে এই বইটির সবগুলি প্রবন্ধ যুক্ত হবে। সঙ্গে থাকবে আরও ১২টি অতিরিক্ত প্রবন্ধ। *বাংলা শব্দতত্ত্ব*-র নামটি আলাদা বলে আমাদের এই তালিকায় তার স্বতন্ত্র স্থান হবে।

২৬. *গোরা*-র একটি অসম্পূর্ণ (৪৪টি পরিচ্ছেদ-সহ) গ্রন্থরূপ প্রকাশিত হয়েছিল কুন্তলীন প্রেস থেকে ১৯০৯-এর ৩ এপ্রিল। এই দুটি খণ্ডের প্রকাশ একই সঙ্গে।

২৭. এই তারিখটি প্রশান্তকুমার পাল তাঁর *রবিজীবনী*-র ষষ্ঠ খণ্ডে (জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১০৯) জানিয়েছেন।

২৮. *গীতালি* প্রকাশিত হচ্ছে এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে। তাই বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে এর 'এন্ট্রি' নেই। সেকারণেই প্রকাশের নির্দিষ্ট দিনটি জানা যায় না। ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত পরবর্তী বইগুলির ক্ষেত্রেও একই সমস্যা।

২৯. আখ্যাপত্রে শুধু '১৯১৫' লেখা আছে । এলাহাবাদ থেকে ছাপা বলে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে 'এন্ট্রি' নেই।

৩০. *রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী*র অন্তর্গত হয়ে 'চিরকুমার সভা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৪-এর ২৯ আগস্ট। তবে সেটি ছিল আখ্যানরূপ। আর এটি নাটক।

৩১. রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে *শেষ বর্ষণ*-এর কোনো স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি।

৩২. দ্রষ্টব্য, আমাদের মূল গবেষণার *লেখন*-সংক্রান্ত আলোচনা

৩৩. 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা-যাত্রীর পত্র' কে একমলাটের মধ্যে এনে এই বই। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা-যাত্রীর পত্র' রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

৩৪. মূলত সংগীত-সম্পর্কীয় নানা ভাবনায় জড়ানো চিঠির সংকলন, সবগুলি পত্রই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা। বইয়ের আখ্যাপত্রে তাই রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ উভয়েরই নাম আছে, তবে রবীন্দ্রনাথের নামটি অপেক্ষাকৃত বড়ো হরফে। বইয়ের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের লেখা।

৩৫. ১৯১৯ সালে প্রকাশিত *জাপান-যাত্রী* আর অপ্রকাশিত 'পারস্য-যাত্রী' একমলটের মধ্যে এনে এই সংকলন। 'পারস্য-যাত্রী' রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় নি।

৩৬. এটি মোট ৩৩ পৃষ্ঠার বই, ফলে 'পুস্তিকা'র তালিকায় যাওয়া সমীচীন ছিল। তবে সংগতি বজায় রাখার জন্যে এই তালিকায় রাখা হল।

৩৭. এটি মোট ৩১ পৃষ্ঠার বই, ফলে 'পুস্তিকা'র তালিকায় যাওয়া সমীচীন ছিল। তবে সংগতি বজায় রাখার জন্যে এই তালিকায় রাখা হল। আরও উল্লেখ্য, স্বরলিপি সহ এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৪৫ব-এ।

৩৮. দ্র. ২৯ জানুয়ারি ১৯৩৯-এ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি, 'ভাষাপরিচয়ের প্রচারের ভার তোমরা নেবে কথা ছিল। চেষ্টা কোরো, অনেক দুঃখে প্রেস থেকে বেরিয়েছে...'। (আকাদেমি পত্রিকা ৫, পৃ.৩৭)

৩৯. দ্র. ৮ জানুয়ারি ১৯৩৯-এ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি, 'প্রহাসিনী আশা করি মুদ্রণ শেষ করবে আর দুদিন বাদে। তার পরে?' (আকাদেমি পত্রিকা ৫, পৃ. ৩৭)

৪০. প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে ভুল করে লেখা ছিল 'বৈশাখ ১৩৪৫'।

৪১. বইটি নভেম্বরের শেষের দিকে প্রথমে সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ডিসেম্বরে সাজ-বদলিয়ে এটিকে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'-র অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করা হয়। (দ্র. মূল গবেষণার 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রসঙ্গে আলোচনা)

৪২. অনিলকুমার চন্দকে লেখা কিশোরীমোহন সাঁতরার একটি চিঠির সাক্ষ্যে আমরা দেখিয়েছি *সানাই* প্রকাশিত হয়েছিল ৯ আগস্ট ১৯৪০। (দ্র. আমাদের মূল গবেষণার 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়-পর্ব'-এর ''প্রেস প্রুফ' ও ছাপাখানার অন্দরমহল' অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা।)

৪৩. ৩৯ পৃষ্ঠা জোড়া ৩৩টি ছোট কবিতার এই বই। একে 'পুস্তিকা' বলাই সমীচীন। তবে সংগতি বজায় রাখার জন্যে এই তালিকায় রাখা হল।

* রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের পর প্রকাশিত।

তালিকা/২ : সংকলন গ্রন্থ ও রচনাবলী

(১৯০৭-০৯-এ মজুমদার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত ১৬ খণ্ডের *গদ্যগ্রন্থাবলী*-র প্রতিটি কার্যত একটি করে স্বতন্ত্র বই। যে-বইগুলি নিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য মূল তালিকা/১-এ দেওয়া হয়েছে। তাই এই ১৬টি খণ্ডের বিবরণ পুনর্বার এখানে দেওয়া হল না।)

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	প্রকাশকাল	প্রকাশনা ও প্রকাশক	মুদ্রাযন্ত্র, মুদ্রাকর, মুদ্রণসংখ্যা
১	কাব্যগ্রন্থাবলী (সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত)	১৩০৩ আশ্বিন ১৫/ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, কালিদাস চক্রবর্তী, ১০০০
২	গল্পগুচ্ছ	/১১ অক্টোবর ১৯০০	মজুমদার এজেন্সি, অমূল্যনারায়ণ রায়	আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১১০০
৩	গল্প[১]	/৪ মার্চ ১৯০১	মজুমদার লাইব্রেরি, অমূল্যনারায়ণ রায়	আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১১০০
৪	কাব্য-গ্রন্থ (প্রথম ভাগ।প্রথম খণ্ড)[২]	১৩১০ সন/১০ ডিসেম্বর ১৯০৩	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	ভারত-মিহির যন্ত্র, স্যান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১১০০
৫	কাব্য-গ্রন্থ (প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ড)	১৩১০ সন/[১০] ডিসেম্বর ১৯০৩	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	ভারত-মিহির যন্ত্র, স্যান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১১০০
৬	কাব্য-গ্রন্থ (দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম খণ্ড)	১৩১০ সন/ ১০ ডিসেম্বর ১৯০৩	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	মেট্‌কাফ্ প্রেস, ১১০০
৭	কাব্য-গ্রন্থ (দ্বিতীয় ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ড)	১৩১০ সন/ ১০ ডিসেম্বর ১৯০৩	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	মেট্‌কাফ্ প্রেস, ১১০০
৮	কাব্য-গ্রন্থ (তৃতীয় ভাগ)	১৩১০ সন/	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	মেট্‌কাফ্ প্রেস, ১১০০
৯	কাব্য-গ্রন্থ (চতুর্থ ভাগ)	১৩১০ সন/ ২০ ডিসেম্বর ১৯০৩	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, অনুকূলচন্দ্র পারিহাল, ১১০০
১০	কাব্য-গ্রন্থ (পঞ্চম ভাগ)	১৩১০ সন/	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	মেট্‌কাফ্ প্রেস, ১১০০
১১	কাব্য-গ্রন্থ (ষষ্ঠ ভাগ)	১৩১০ সন/	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	মেট্‌কাফ্ প্রেস, ১১০০
১২	কাব্য-গ্রন্থ (সপ্তম ভাগ)	১৩১০ সন/	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১১০০
১৩	কাব্য-গ্রন্থ (অষ্টম ভাগ)	১৩১০ সন/	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, অনুকূলচন্দ্র পারিহাল, ১৪০০
১৪	কাব্য-গ্রন্থ (নবম ভাগ। প্রথম খণ্ড)	১৩১০ সন/ ১২ ডিসেম্বর ১৯০৩	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, অনুকূলচন্দ্র পারিহাল, ১১০০
১৫	কাব্য-গ্রন্থ (নবম ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ড)	১৩১০ সন/ ১২ ডিসেম্বর ১৯০৩	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	মেট্‌কাফ্ প্রেস, ১১০০
১৬	কাব্য-গ্রন্থ (নবম ভাগ। তৃতীয় খণ্ড)	১৩১০ সন/ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪	মজুমদার লাইব্রেরি, এস.সি মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, ১১০০

১৭	রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদীর উপহার)	১৩১১ সাল/ ২৯ আগস্ট ১৯০৪	হিতবাদী-কার্য্যালয়, অশ্বিনীকুমার হালদার	হিতবাদী-কার্য্যালয়, অশ্বিনীকুমার হালদার, ১০০০০
১৮	স্বদেশ[৩]	১৩১২/ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫	[মজুমদার লাইব্রেরি], সুহাসচন্দ্র মজুমদার	দিনময়ী প্রেস, হরিচরণ মান্না, ৫০০
১৯	গান	/২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮	সিটি বুক সোসাইটি, যোগীন্দ্রনাথ সরকার	উইলকিন্স মেসিন প্রেস, জে এন বসু, ১০০০
২০	গল্পগুচ্ছ (প্রথম ভাগ)	১৯০৮/ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কালিকা যন্ত্র, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১০৫০
২১	গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় ভাগ)	১৯০৮/ ১২ অক্টোবর ১৯০৮	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	প্যারাগন প্রেস, গোপালচন্দ্র রায়, ১০৫০
২২	গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় ভাগ)	১৯০৮/ ০২ জানুয়ারি ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	কালিকা যন্ত্র, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১০৫০
২৩	গল্পগুচ্ছ (চতুর্থ ভাগ)	১৯০৯/ ০৪ জানুয়ারি ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস	প্যারাগন প্রেস, গোপালচন্দ্র রায়, ১০৫০
২৪	গল্পগুচ্ছ (পঞ্চম ভাগ)	১৩১৫/ ০৮ এপ্রিল ১৯০৯	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতমিহির যন্ত্র, মহেশ্বর ভট্টাচার্য, ১০৫০
২৫	চয়নিকা[৪]	১৯০৯	ইন্ডিয়ান প্রেস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ইন্ডিয়ান প্রেস, পাঁচকড়ি মিত্র
২৬	গান	১৯০৯	ইন্ডিয়ান প্রেস, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ইন্ডিয়ান প্রেস, পাঁচকড়ি মিত্র
২৭	গান	/২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৪	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত	কান্তিক প্রেস, হরিচরণ মান্না, ১০০০
২৮	ধর্ম্মসঙ্গীত[৫]	/২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস, শরৎশশী রায়
২৯	কাব্যগ্রন্থ প্রথম খণ্ড	১৯১৫/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
৩০	কাব্যগ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ড	১৯১৫/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
৩১	কাব্যগ্রন্থ তৃতীয় খণ্ড	১৯১৫/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
৩২	কাব্যগ্রন্থ চতুর্থ খণ্ড	১৯১৫/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
৩৩	কাব্যগ্রন্থ পঞ্চম খণ্ড	১৯১৫/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
৩৪	কাব্যগ্রন্থ ষষ্ঠ খণ্ড	১৯১৫/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
৩৫	কাব্যগ্রন্থ সপ্তম খণ্ড	১৯১৬/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
৩৬	কাব্যগ্রন্থ অষ্টম খণ্ড	১৯১৬/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
৩৭	কাব্যগ্রন্থ নবম খণ্ড	১৯১৬/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

৩৮	কাব্যগ্রন্থ দশম খণ্ড	১৯১৬/	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু	ইন্ডিয়ান প্রেস, অপূর্বকৃষ্ণ বসু
৩৯	সঙ্কলন	'প্র'[শান্তচন্দ্র মহলানবিশ] লিখিত 'ভূমিকা'র তারিখ ৯ আগস্ট ১৯২৫ / বে.লা.ক্যা অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর ১৯২৫	করুণাবিন্দু বিশ্বাস	নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস, শরৎশশী রায়
৪০	গীতি-চর্চা[৬]	১৩৩২ পৌষ	করুণাবিন্দু বিশ্বাস	
৪০	ঋতু উৎসব	১৩৩৩/ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ২১০০
৪১	গল্পগুচ্ছ	'ভূমিকা'-র তারিখ ১৩৩৩ শ্রাবণ/ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	গদাধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৪২০০
৪২	গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড	/১০ ডিসেম্বর ১৯২৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	গদাধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৪২০০
৪৩	গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ড	/৭ জানুয়ারি ১৯২৭	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	গদাধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৪২০০
৪৪	সংকল্প ও স্বদেশ[৭]	১৩৩৫ চৈত্র/ [১৯২৯, মার্চ-এপ্রিল]	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ১১০০
৪৫	সঞ্চয়িতা	পৌষ, ১৩৩৮/ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩১	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	মডার্ন আর্ট প্রেস, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ৩০০০
৪৬	গীত-বিতান প্রথম খণ্ড	আশ্বিন ১৩৩৮/ ১০ জানুয়ারি ১৯৩২	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ২২০০
৪৭	গীত-বিতান দ্বিতীয় খণ্ড	আশ্বিন, ১৩৩৮/ ১০ জানুয়ারি ১৯৩২	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ২২০০
৪৮	গীত-বিতান তৃতীয় খন্ড	শ্রাবণ, ১৩৩৯/ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জগদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়, ২২০০
৪৯	পাশ্চাত্য ভ্রমণ[৮]	আশ্বিন ১৩৪৩/ ২ অক্টোবর ১৯৩৬	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শান্তিনিকেতন প্রেস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫০	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড	আশ্বিন, ১৩৪৬/ ২৪ অক্টোবর ১৯৩৯	বিশ্বভারতী[৯], কিশোরীমোহন সাঁতরা	তাপসী প্রেস, গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
৫১	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড	পৌষ, ১৩৪৬/	বিশ্বভারতী, কিশোরীমোহন সাঁতরা	তাপসী প্রেস, গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
৫২	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড	২৫ বৈশাখ, ১৩৪৭/ ৮মে ১৯৪০[১০]	বিশ্বভারতী, কিশোরীমোহন সাঁতরা	তাপসী প্রেস, গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
৫৩	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড	শ্রাবণ, ১৩৪৭/	বিশ্বভারতী, কিশোরীমোহন সাঁতরা	তাপসী প্রেস, গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য

৫৪	রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ	আশ্বিন, ১৩৪৭/	বিশ্বভারতী, কিশোরীমোহন সাঁতরা	শনিরঞ্জন প্রেস, সৌরীন্দ্রনাথ দাস
৫৫	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭/	বিশ্বভারতী, পুলিনবিহারী সেন	তাপসী প্রেস, গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
৫৬	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড	ফাল্গুন, ১৩৪৭/	বিশ্বভারতী, পুলিনবিহারী সেন	তাপসী প্রেস, গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
৫৭	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৭ম খণ্ড	আষাঢ়, ১৩৪৮/	বিশ্বভারতী, পুলিনবিহারী সেন	তাপসী প্রেস, গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য

টীকা

১. এটি কার্যত আগের *গল্পগুচ্ছ* বইটির দ্বিতীয় খণ্ড

২.*কাব্য-গ্রন্থ*-এর প্রতিটি ভাগই মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত

৩. গানে-কবিতায় মেশানো একটি সংকলন-গ্রন্থ। *কাব্য-গ্রন্থ* চতুর্থ ভাগে 'স্বদেশ' নামের একটি অংশ ছিল। তার সঙ্গে আরও কিছু কবিতা ও গান যোগ করে এই বই।

৪. রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে *চয়নিকা*-র অনেকগুলি সংস্করণ হয়, সেগুলি একে-অন্যের থেকে বেশ খানিকটা করে আলাদা। কিন্তু ১৯২৬-এর ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে পাঠক-পছন্দের কবিতায় নির্ভর করে যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে এই প্রথম সংস্করণের মিল খুবই অল্প। গ্রন্থনাম এক হলেও এই সংস্করণটিকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ধরা উচিত কি না, তা নিয়ে তর্ক থাকা সম্ভব।

৫. এটি বস্তুত ১৯১৪-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত *গান*-এর দ্বিতীয় খণ্ড।

৬. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত এই বই শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে নির্মিত গীতিসংকলন। মোট ২০০টি গান, তার মধ্যে তিনটি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। বাকিগুলি রবীন্দ্রনাথের। আখ্যাপত্রে 'লেখক' হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরই নাম ছিল।

৭. মজুমদার লাইব্রেরি প্রকাশিত *কাব্য-গ্রন্থ* চতুর্থ ভাগে (১৯০৩, ডিসেম্বর) দুটি ভাগ ছিল যাদের শিরোনাম ছিল 'সংকল্প' ও স্বদেশ'। এই বইটি সেই চতুর্থ ভাগেরই একটি সংস্করণ। তবে 'টাইটেল' আলাদা বলে এই তালিকায় আলাদা করে রাখা হল।

৮. *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* এবং *য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি* বইদুটিকে এক মলাটের মধ্যে এনে এই সংকলন।

৯. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*র খণ্ডগুলিতে প্রকাশনার নামে 'গ্রন্থালয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি, আখ্যাপত্রে না, আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠাটিতেও না।

১০. আখ্যাপত্রেই প্রকাশ-তারিখ '২৫ বৈশাখ ১৩৪৭' লেখা থাকলেও বইটি প্রকাশিত হয়ে গেছিল এপ্রিলের একেবারে গোড়ায়। তৃতীয় খণ্ড রচনাবলীটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহনকে ৬ এপ্রিল ১৯৪০-এ লিখছেন, 'তৃতীয় ভাগ রচনাবলী পাওয়া গেল।' (আকাদেমি পত্রিকা ৫, পৃ. ৪৩)

তালিকা/৩ : স্বরলিপি-গ্রন্থ

১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'সংকলিত ও ব্যাখ্যাত' *স্বরলিপি-গীতিমালা* বইতে প্রথম রবীন্দ্রনাথের ১১৬টি গানের আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। তারপর ১৩০৭-এ সরলা দেবী সংকলিত *শতগান* বা কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত ছ'টি ভাগে *ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি*-র মতো বইতেও রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। তবে এই বইগুলোতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরও অনেক গীতিকারের গানের স্বরলিপিই স্থান পেয়েছে।

নিচে দেওয়া হল রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত সেইসব স্বরলিপি-গ্রন্থের নাম যেগুলিতে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের গান সংকলিত হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	**গ্রন্থের নাম**	**প্রকাশকাল**	**প্রকাশক/ মুদ্রাকর**	**স্বরলিপি-সহ গানের সংখ্যা**	**স্বরলিপিকার**
১	প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)[১]	১৩১৬ব/ ১৫ অক্টোবর ১৯০৯	হিতবাদী লাইব্রেরি, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি/ হিতবাদী প্রেস, এন.বি দাস	২৩	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২	গীতলিপি, প্রথম খণ্ড	১৬ জানুয়ারি ১৯১০	রণগোপাল চক্রবর্তী	১৮	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩	গীতলিপি, দ্বিতীয় খণ্ড	২০ জুন ১৯১০	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র	১৭	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪	গীতলিপি, তৃতীয় খণ্ড	২৫ আগস্ট ১৯১০	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র	১৫	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫	গীতলিপি, চতুর্থ খণ্ড		ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র	১৫	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬	গীতলিপি, পঞ্চম খণ্ড	২৫ এপ্রিল ১৯১১	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র	১৬	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭	গীতলিপি, ষষ্ঠ খণ্ড		ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র	১৩	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮	গীতলেখা, প্রথম ভাগ	১৩২৪ব		২৯	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯	গীতলেখা, দ্বিতীয় ভাগ	১৩২৫ব		২৮	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০	গীতলেখা, তৃতীয় ভাগ	১৩২৭ব		২৪	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১	গীতপঞ্চাশিকা[২]	আশ্বিন ১৩২৫ব	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চিন্তামণি ঘোষ/ শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়	৫০	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২	বৈতালিক	চৈত্র ১৩২৫ব	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চিন্তামণি ঘোষ/ শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়	৩৫[৩]	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩	কেতকী	শ্রাবণ ১৩২৬ব	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চিন্তামণি ঘোষ/ শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়	৩১+২[৪]	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪	শেফালী	ভাদ্র ১৩২৬ব	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চিন্তামণি ঘোষ/ শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়	২৮	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫	গীত-বীথিকা	বৈশাখ ১৩২৬ব	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, চিন্তামণি ঘোষ/ শান্তিনিকেতন প্রেস, জগদানন্দ রায়	২১	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬	কাব্যগীতি	পৌষ ১৩২৬ব		২৩	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৭	নবগীতিকা, প্রথম খণ্ড	১৩২৯ব		৩৪	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮	নবগীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড	১৩২৯ব/ ২০ ডিসেম্বর ১৯২২		৫৯	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯	বসন্ত	১৩৩০ব		২৩+১	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০	মায়ার খেলা	আষাঢ় ১৩৩২ব		সম্পূর্ণ গীতিনাট্য	ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
২১	গীতিমালিকা, প্রথম ভাগ	১৩৩৩ব		৪০	[দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর][৫]
২২	গীতিমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ	পৌষ ১৩৩৬ব		৫০	[দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

২৩	বাল্মীকি-প্রতিভা	আশ্বিন ১৩৩৫ব		সম্পূর্ণ গীতিনাট্য	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪	তপতী	১৩৩৬ব		১০	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৫	স্বরবিতান -১	ভাদ্র ১৩৪২ব	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা/ শান্তিনিকেতন প্রেস/ জগদানন্দ রায়	৫০	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৬	নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	বৈশাখ ১৩৪৩ব	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা/ শান্তিনিকেতন প্রেস/ জগদানন্দ রায়	সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য	শৈলজারঞ্জন মজুমদার
২৭	স্বরবিতান -২	আশ্বিন ১৩৪৩ব	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা/ শান্তিনিকেতন প্রেস/ জগদানন্দ রায়	৫০	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৮	স্বরবিতান -৩	বৈশাখ ১৩৪৫ব	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা/ শান্তিনিকেতন প্রেস/ জগদানন্দ রায়	৫০	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদনা : শৈলজারঞ্জন মজুমদার)
২৯	নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	চৈত্র ১৩৪৫ব	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা/ শান্তিনিকেতন প্রেস/ জগদানন্দ রায়	সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য	শৈলজারঞ্জন মজুমদার
৩০	নৃত্যনাট্য শ্যামা	ভাদ্র ১৩৪৬ব	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা/ শান্তিনিকেতন প্রেস/ জগদানন্দ রায়	সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য	সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী (সম্পা: শৈলজারঞ্জন মজুমদার)

৩১	স্বরবিতান - ৪	চৈত্র ১৩৪৬ব	বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কিশোরীমোহন সাঁতরা/ শান্তিনিকেতন প্রেস/ জগদানন্দ রায়	৫০	কাঙ্গালীচরণ সেন (সম্পাদনা : শৈলজারঞ্জন মজুমদার)

টীকা

১. *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকের এইটিই প্রথম সংস্করণ, মুদ্রিত হয়েছিল স্বরলিপি-সহ। সেই কারণে এই তালিকাতেও বইটিকে রাখা হল।

২. *গীতপঞ্চাশিকা* 'শান্তিনিকেতন প্রেস' থেকে ছাপা প্রথম বই।

৩. *বৈতালিক* গ্রন্থে ছিল মোট ৩৬টি গানের স্বরলিপি। তার মধ্যে একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান।

৪. *কেতকী* গ্রন্থে ছিল মোট ৩১টি গানের স্বরলিপি, সঙ্গে তাদেরই মধ্যে দুটি গানের সুরান্তর

৫. প্রথম প্রকাশিত *গীতমালিকা*-র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে স্বরলিপিকারের নাম দেওয়া ছিল না। পরবর্তী মুদ্রণে সেটি যুক্ত হয়।

তালিকা/৪ : পুস্তিকা

UNESCO-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো বই ৫০ পৃষ্ঠার কম হলে তাকে ‘গ্রন্থ’-এর মার্যাদা দেওয়া হয় না, তাকে ‘পুস্তিকা’(Booklet) বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের ‘পুস্তিকা’র সংখ্যা অসংখ্য। তার একটি তালিকা দেওয়া হল এখানে। উল্লেখ থাক যে, *বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রান্তিক, রোগশয্যায়, আরোগ্য, শেষ লেখা* প্রভৃতি বইগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০-এর কম হলেও, সংগতি রক্ষার্থে আমরা সেগুলিকে মূল তালিকাতেই স্থান দিয়েছি। এখানে রইল বাকি ‘পুস্তিকা’র তালিকা। মনে রাখা দরকার, এর মধ্যে বেশিরভাগই রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ, অথবা কোনো একটি প্রবন্ধ কোনো বিশেষ কারণে আলাদা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই পুস্তিকা।

এই তালিকা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। প্রথমত, পুস্তিকাগুলি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য পাওয়া কার্যত অসম্ভব আজ। আর দ্বিতীয়ত সমস্ত প্রকাশিত পুস্তিকার নাম জড়ো করা গেছে সে দাবী করাও সমীচীন হবে না।

১। রামমোহন রায়, ১৮ মার্চ ১৮৮৫

২। মন্ত্রি অভিষেক, ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

৩। ছেলেভুলানো ছড়া, ১৮৯৫

৪। নদী, ২২ মাঘ ১৩০২

৫। ব্রহ্মৌপনিষদ, ৭ মাঘ ১৩০৬

৬। ব্রহ্মমন্ত্র, ৮ মাঘ ১৩০৭

৭। ঔপনিষদ ব্রহ্ম, শ্রাবণ ১৩০৮

৮। বাঙ্‌লা ক্রিয়া-পদের তালিকা, ১৩০৮

৯। বাউল, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

১০। বিজয়া-সম্মিলন, ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৫

১১। রাজভক্তি, ১৯০৬

১২। দেশনায়ক, ১৮ মে ১৯০৬

১৩। সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী, ১৩১৪

১৪। পথ ও পাথেয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

১৫। ব্রহ্ম সঙ্গীত, ২০ জানুয়ারি ১৯০৯

১৬। বিদ্যাসাগর চরিত, ১৯০৯

১৭। ব্রহ্ম সঙ্গীত ১৬ জানুয়ারি ১৯১০

১৮। ধর্ম্মশিক্ষা, ১৭ জানুয়ারি ১৯১২

১৯। ধর্ম্মের অধিকার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

২০। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, ২২ আগস্ট ১৯১৭

২১। শিক্ষার মিলন, ১৪ আগস্ট ১৯২১

২২। সত্যের আহ্বান

২৩। বর্ষা-মঙ্গল, শ্রাবণ ১৩২৯

২৪। বসন্ত, ফাল্গুন ১৩২৯/ ৩ অক্টোবর ১৯২৩ (বিশ্বভারতী-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রথম 'বই')

২৫। বর্ষা-মঙ্গল, শ্রাবণ ১৩৩২

২৬। শেষ বর্ষণ, ভাদ্র ১৩৩২

২৭। আচার্য্যের অভিভাষণ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

২৮। ঋতুরঙ্গ, ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

২৯। পল্লিপ্রকৃতি, ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

৩০। সমবায়নীতি, ২৭ মাঘ ১৩৩৫

৩১। নবীন, ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭/ ১০ মার্চ ১৯৩১

৩২। গীতোৎসব, ২৮ ভাদ্র ১৩৩৮

৩৩। প্রতিভাষণ, ১১ পৌষ ১৩৩৮

৩৪। শাপ-মোচন, ১৫ পৌষ ১৩৩৮

৩৫। দেশের কাজ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

৩৬। কালের যাত্রা, ভাদ্র ১৩৩৯

৩৭। ৪ঠা আশ্বিন, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

৩৮। মহাত্মাজীর শেষ ব্রত, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

৩৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, জানুয়ারি ১৯৩৩

৪০। শিক্ষার বিকিরণ, ৯ জুন ১৯৩৩

৪১। ভারতপথিক রামমোহন, ডিসেম্বর ১৯৩৬

৪২। শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ, শ্রাবণ ১৩৪১

৪৩। শ্রাবণ-গাথা, শ্রাবণ ১৩৪১

৪৪। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

৪৫। প্রাক্তনী, পৌষ ১৩৪৩

৪৬। অভিভাষণ (শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভাষণ), ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

৪৭। মহাজাতি সদন, ১৯ আগস্ট ১৯৩৯

৪৮। অন্তর্দেবতা, ৭ পৌষ ১৩৪৬

৪৯। প্রসাদ, ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৯

৫০। সভ্যতার সঙ্কট, ১ বৈশাখ ১৩৪৮

তালিকা/৫ : পাঠ্যগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ- রচিত, সংকলিত, সম্পাদিত পাঠ্যগ্রন্থের তালিকা তৈরি করেছেন প্রথমে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র, *রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয়*) এবং পরে পুলিনবিহারী সেন (দ্র. *পুলিনবিহারী জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য*, পৃ. ৩২৩-৩৬২)। পুলিনবিহারীর তালিকাটি অধিক তথ্যসমৃদ্ধ। পুলিনবিহারীর তালিকাটিকে মান্য করেই এখানে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের *রচিত* পাঠ্যগ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশকাল দেওয়া হল। তবে এর অনেকগুলিই আবার সংকলন-গ্রন্থ। অর্থাৎ, বিভিন্ন বইতে ছড়ানো রবীন্দ্রনাথেরই একাধিক লেখার ছাত্রপাঠ্য সংকলন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরও একাধিক লেখক আছেন এমন বইয়ের নাম এখানে দেওয়া হল না। পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্যে পুলিনবিহারী-সংকলিত তালিকাটি দ্রষ্টব্য।

১। সংস্কৃতশিক্ষা, প্রথম ভাগ, ১৮৯৬

২। সংস্কৃতশিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯৬

৩। ইংরাজি-সোপান, প্রথম খণ্ড, ৭মে ১৯০৪

৪। ইংরাজি-সোপান, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫ জুন ১৯০৬

৫। ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা, ১৯০৯?

৬। ইংরেজি-সহজশিক্ষা, প্রথম ভাগ, পৌষ ১৩৩৬

৭। ইংরেজি-সহজশিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ, চৈত্র ১৩৩৬

৮। পাঠসঞ্চয়, ২০ মে ১৯১২

৯। বিচিত্র পাঠ, ১৯১৫

১০। পাঠপ্রচয় চতুর্থ ভাগ, ১৩৩৬

১১। সহজ পাঠ, প্রথম ভাগ, ১৩৩৬

১২। সহজ পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৩৬

গ্রন্থপঞ্জি : বাংলা

আমাদের গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের রচনার জন্যে সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত *রবীন্দ্র রচনাবলী*-র জন্মশতবার্ষিক সংস্করণটি। এছাড়া আমাদের দেখতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বইয়ের প্রথম অথবা তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত অন্যান্য সংস্করণ। গ্রন্থপঞ্জিতে বাহুল্যবোধে তার তালিকা দেওয়া হল না।

অনাথনাথ দাস ও সুবিমল লাহিড়ী সম্পাদিত, *পুলিনবিহারী জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৯

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রচনাসংগ্রহ ১ স্মৃতিকথা,* সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫

অভীককুমার দে, *রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ,* কলকাতা : পুস্তক বিপণি, মে ১৯৯২

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৩ব

অরুণ সেন (সম্পা.), *বই যথা,* কলকাতা : অবভাস, ডিসেম্বর ২০১২

অসিতকুমার হালদার, *রবিতীর্থে,* কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, মাঘ ১৪১৫ব

আশিস খাস্তগীর, *উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা,* কলকাতা : সোপান, জানুয়ারি ২০১৪

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *পুরাতনী,* কলকাতা : রূপা অ্যান্ড কোং, প্রথম সংস্করণ, তারিখের উল্লেখহীন ('ভুমিকা' রচনার তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ১৯৫৬)

উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, জানুয়ারি ২০০৯

উজ্জ্বলকুমার দে সংকলিত, *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ – বিশ্বভারতী নিউজ,* কলকাতা : পুস্তক বিপনি, আগস্ট ২০১৩

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, *মানুষ রবীন্দ্রনাথ,* কোন্নগর : শ্রীনাথ নিবাস, এপ্রিল ১৯৬৩

কালিদাস নাগ, *ডায়েরি,* কলকাতা : প্যাপিরাস, জুলাই ১৯৯১

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র কথা,* কলকাতা : জয়শ্রী পুস্তকালয়, ১৯৯১

গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত, *রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা,* আগরতলা : ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি, ১৯৬১

গৌতম ভদ্র, *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?,* কলকাতা : ছাতিম বুক্‌স, জুন ২০১১

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবি-রশ্মি,* ২য় খণ্ড, কলকাতা : এ মুখার্জি এন্ড কোং, পঞ্চম সংস্করণ (তারিখ অনুল্লিখিত)

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ১৯৮১

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ-প্রসঙ্গ*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০০১

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৯৩

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ২, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০২

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৬

চিত্রা দেব, *অনালোচিত রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : মডার্ন কলাম, ১৯৮৫

জগদীশ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত*, কলকাতা : ভারবি, জুন ২০০৮

তাপস মুখোপাধ্যায়, *খড়দহে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : জাগরী, বৈশাখ ১৩৯৭ব

দিনেন ভট্টাচার্য, *বানানের রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরি, ডিসেম্বর ২০০৩

দীনেশচন্দ্র সিংহ, *প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*, কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি ২০০৭

দীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০১১

নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *তরুণ রবি*, কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬১

নরেশ গুহ সম্পাদি, *কবির চিঠি কবিকে*, কলকাতা : প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৯৫

নির্মলকুমারী মহলানবিশ, *কবির সঙ্গে য়ুরোপে*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬ব

পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, প্রথম খণ্ড, বীরভূম : রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদপ্রকাশন, ১৯৬৮

পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, দ্বিতীয় খণ্ড, বীরভূম : রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ প্রকাশন, ডিসেম্বর ১৯৫২

পুলিনবিহারী সেন, *রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮০ব

প্রণতি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থ*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৫

প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও অভীককুমার দে সম্পদিত, *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ মাসিক বসুমতী*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ২০১৩

প্রণবেশ মাইতি, বাংলা সাহিত্যের অলংকরণ, কলকাতা : সহজপাঠ ও যাপন, নভেম্বর ২০১৪

প্রবাসী ষষ্ঠীবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, কলকাতা : প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭ব

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী*, শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী, তারিখ অনুল্লিখিত [১৯৩২]

—*রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭ব

—*রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭ব

—*রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪০৬ব

—*রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক,* চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪০১ব

—*রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি,* প্রথম খণ্ড, শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, ১৩৮৫ব

—*শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৪০৭ব

প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, *কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তারিখের উল্লেখহীন, প্রথম সংস্করণ, [ফেব্রুয়ারি ২০০৫]

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৯১ব

—*রবিজীবনী,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৪ব

—*রবিজীবনী,* চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৫ব

—*রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৯০

—*রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৩

—*রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, মে ১৯৯৭

—*রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০১

—*রবিজীবনী,* নবম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০০৩

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, *রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০২

বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস,* কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ২০১৪

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎবর্ষ পরিক্রমা, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৭ জুলাই ১৯৭৪

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়,* কলিকাতা : সাহিত্য-নিকেতন, মাঘ ১৩৫০ব

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, অগ্রহায়ণ ১৪১৫ব

ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, বৈশাখ ১৩৯২ব

মৃণাল ঘোষ, *ছবির রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১২

মৈত্রেয়ী দেবী, *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬০

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি,* কলকাতা : জিজ্ঞাসা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব

— চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৯ব

—*চিঠিপত্র,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১০

—*চিঠিপত্র,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০০ব

—*চিঠিপত্র,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ব

—*চিঠিপত্র,* নবম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪০৪

—*চিঠিপত্র,* দশম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৪০২ব

—*চিঠিপত্র,* একাদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮১ব

—*চিঠিপত্র,* দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯৩

—*চিঠিপত্র,* ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, মার্চ ১৯৯২

—*চিঠিপত্র,* চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২২ শ্রাবণ ১৪০৭ব

—*চিঠিপত্র,* ঊনবিংশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১১ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *বাংলা কাব্যপরিচয়,* ভূমিকা ও তথ্যসংকলন সুমিতা চক্রবর্তী, কলকাতা : সাহিত্যলোক, আগস্ট ২০০২

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ ১, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ ১৪২০ব

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ ২, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ ১৪২০ব

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ ৩, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ ১৪২০ব

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ ৪, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ ১৪২০ব

রানী চন্দ, *আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কার্তিক ১৪০৭ব

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ,* অর্ণব নাগ সম্পাদিত, কলকাতা : সূত্রধর, জানুয়ারি ২০১৫

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ভক্ত ও কবি,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৭

শান্তা দেবী, *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা,* কলকাতা : দে'জ, ২০০৫

শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯

শুভেন্দু দাশমুন্সী, *টইপাড়ায় টহলদারি,* কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১১

শোভন সোম, *বাংলার ছাপাচিত্রকলা ১৮১৬- ১৯৪৭,* কলকাতা : সহজপাঠ ও যাপন, জানুয়ারি ২০১৬

শোভন সোম সম্পাদিত, *রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯২-১৯৭০) জন্মশতবর্ষে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য,* কলকাতা : অনুষ্টুপ, তারিখের উল্লেখহীন

সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

—রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৩৯৫ব

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, *শনিবারের চিঠি রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা*, কলকাতা : নাথ ব্রাদার্স, আগস্ট ১৯৯৮

সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত, *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ১৯৯৬

সিদ্ধার্থ ঘোষ, *কলের শহর কলকাতা*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯১

সুকুমার সেন, *পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ*, কলকাতা : কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২

সুধীরচন্দ্র কর, *কবিকথা*, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, মে ২০১৪

—রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়, কলকাতা : ভারতী লাইব্রেরি, আশ্বিন ১৩৬৭ব

সুপ্তি মিত্র সংকলিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ শান্তিনিকেতন*, কলকাতা : রবীন্দ্রচর্চাভবন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

সুবিমল মিশ্র সম্পাদিত, *শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় জগদানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : দে বুক স্টোর (পরিবেশক), জানুয়ারি ২০১৪

সুভাষ চৌধুরী, *গীতবিতানের জগৎ*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ডিসেম্বর ২০০৬

সৃষ্টিধর দাস, *দ্য বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি এবং রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : আশাদীপ, জানুয়ারি ২০১০

সোমব্রত সরকার, *বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ বৃত্তান্ত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০১৫

সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ প্রবাসী*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রস্মৃতি*, কলকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউস, পৌষ ১৩৬৪ব

স্বপন চক্রবর্তী সম্পাদিত, *রবীন্দ্রনাথ শিল্পরূপ পাঠরূপ গ্রন্থরূপ*, কলকাতা : অবভাস, জুন ২০১১

স্বপন বসু ও গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *পুরোনো বাংলা বই*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ২০১৬

স্বপন মজুমদার, *রবীন্দ্রগ্রন্থসুচি*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব, কলকাতা : জাতীয় গ্রন্থাগার, ১৩৯৫ব

গ্রন্থপঞ্জি : ইংরেজি

Bose, P. N. & Moreno, H.W.B. *A Hundred Years of Bengali Press Being A history of the Bengali newspapers from their inception to the present day.* Calcutta : Oriental Press. 1920

Chaudhuri, Sukanta. *The Metaphysics of Text.* New Delhi : Cambridge University Press. 2010

Dutta, Krishna & Robinson, Andrew. *Rabindranath Tagore The Myriad-minded man.* New Delhi : Rupa & Co. 2003

Dutta, Krishna & Robinson, Andrew ed. *Selected Letters of Rabindranth Tagore.* UK : Cambridge University Press. 1997

Ghosh, Anindita. *Power in Print.* New Delhi : Oxford University Press. 2006

Gupta, Abhijit & Chakravorty, Swapan ed. *Print Areas Book History in India.* Delhi : Permanent Black. 2004

Home, Amal ed. *The Calcutta Municipal Gazette/ Tagore Memorial Special Supplement.* Kolkata : Kolkata Municipal Corporation. January 2002

Kripalani, Krishna. *Rabindranath Tagore A Biography.* Calcutta : Visva-Bharati. 1980

Kundu, Kalyan et al. *Rabindranath Tagore and the British Press.* London : The Tagore Centre. 1990

Rayhowdhury, Upendrakishore. *Essays on Half-Tone Photography.* Kolkata : Jadavpur University. 2014.

Roy, Supriya (compiled). *Tagoreana in The Modern Review.* Santiniketan : Rabindra-Bhavana. April 1998

Tagore, Rathindranath. *On the Edges of Time.* Kolkata : Visva-Bharati. June 1981

Thomson, Edward. *Rabindranth Tagore Poet and Dramatist.* London : Oxford University Press. 1926

পত্রপত্রিকা-পঞ্জি

অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, *১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা*, ডিসেম্বর ২০১৩

— *১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা*, জুন ২০১৪,

— *১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা*, ডিসেম্বর ২০১৪

— *১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা*, জুন ২০১৫

— *১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা* , ডিসেম্বর ২০১৫

শিবাশিস দত্ত সম্পাদিত, *অবভাস,* ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আকাদেমি পত্রিকা* ৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্র, মে ১৯৯৩

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* কার্তিক১৮১১ শক (কার্তিক, ১২৯৬ব)

অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, *দেশ,* ২৩ বৈশাখ ১৩৬৮ব

—*দেশ,* ২১ পৌষ ১৩৬৮ব

—*দেশ,* ১৭ চৈত্র ১৩৬৮ব

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, *দেশ,* নন্দলাল বসু সংখ্যা, ১৯৮২

অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, *শারদীয় দেশ,* ১৩৭৩ব

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত,*শারদীয় দেশ,* ১৩৯৫ব

— *শারদীয় দেশ,* ১৩৯৮ব

— *শারদীয় দেশ,* ১৪০১ব

— *শারদীয় দেশ,* ১৪০৩ব

— *শারদীয় দেশ,* ১৪১৪ব

অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, *দেশ, সাহিত্য সংখ্যা,* ১৩৭৩ব

— *দেশ, সাহিত্যসংখ্যা,* ১৩৭৫ব

— *দেশ, সাহিত্যসংখ্যা,* ১৩৭৮ব

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, *দেশ, সাহিত্যসংখ্যা* ১৩৮২ব

শারদীয়া প্রতিক্ষণ, ১৩৯৩ব

সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *ধ্রুবপদ,* বার্ষিক সংকলন ৬, ২০০২

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *পরিকথা,* ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০১১

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *প্রবাসী,* অগ্রহায়ণ ১৩১৯ব

— *প্রবাসী,* মাঘ ১৩২৮ব

— *প্রবাসী,* ফাল্গুন ১৩২৮ব,

— *প্রবাসী,* চৈত্র ১৩২৮ব,

— *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ব,

— *প্রবাসী*, আষাঢ় ১৩২৯ব,

— *প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩২৯ব,

— *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ব

— *প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ব

— *প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩৩৪ব

— *প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩৩৫ব

— *প্রবাসী*, বৈশাখ , ১৩৩৯ব

— *প্রবাসী*, চৈত্র ১৩৪৩ব

— *প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩৫০ব

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *প্রবাসী*, ফাল্গুন ১৩৫২ব

সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বাহা*, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৮, মে ২০১৫

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিচিত্রা*, কার্তিক ১৩৩৯ব

— *বিচিত্রা*, বৈশাখ ১৩৩৯ব

— *বিচিত্রা*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ব

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত, *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯ব

— *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কার্তিক ১৩৪৯ব

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ব

সুধীরঞ্জন দাস সম্পাদিত, *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ব

সুশীল রায় সম্পাদিত, *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, নন্দলাল বসু সংখ্যা, ১৩৭৩ব

— *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩ব

— *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩ব

— *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২ব

অনাথনাথ দাস সম্পাদিত, *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ২৮, শ্রাবণ ১৪০২ব

— *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ২৯, শ্রাবণ ১৪১৩ব

— *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ৩২, পৌষ ১৪০৪ব

— *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ৩৩, শ্রাবণ ১৪০৫ব

— *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ৩৪, পৌষ ১৪০৫ব

— *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ৩৫, শ্রাবণ ১৪০৬ব

শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ১৪, পৌষ ১৩৯২ব

স্বপন মজুমদার সম্পাদিত *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ৩৬, পৌষ ১৪০৬ব

— *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ৩৭, শ্রাবণ ১৪০৭ব

— *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ৪৭, পৌষ ১৪১৪ব

সবুজকলি সেন সম্পাদিত, *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ৪৩, পৌষ ১৪১২ব

অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্রভাবনা*, রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি সংখ্যা, তারিখের উল্লেখহীন, [১৯৮৮]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, *সোমপ্রকাশ*, ১৪ শ্রাবণ ১২৯১ব

The Visva-Bharati Quarterly, Vol. VII, No.1, April-July 1929

The Visva-Bharati Quarterly, Vol. 8, PartIII, 1930-31

The Visva-Bharati Quarterly, Pulinbehari Sen Memorial Number, Vol. 48, No. 1-4, May 1982-April 1983

The Visva-Bharati Quarterly, Nandalal Centenary Number, Vol. 49, No. 1-4, May 198-April 1984

Visva-Bharati News, July 1932 থেকে September 1941 পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা

Visva-Bharati News, July-August 1972

ক্যাটালগ

Catalogue in Progress, No. 13, Rabindra-Bhabana Archives, Visva-Bharati, May 1990

Catalogue in Progress, No. 15, Rabindra-Bhabana Archives, Visva-Bharati, December 2014

Long, J. A Descriptive Catalogue of Bengali Works, 1855

রিপোর্ট

Visva-Bharati Annual Report & Audited Account 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1939, 1940, 1941, 1942

ওয়েবসাইট

<www. bichitra.jdvu.ac.in>